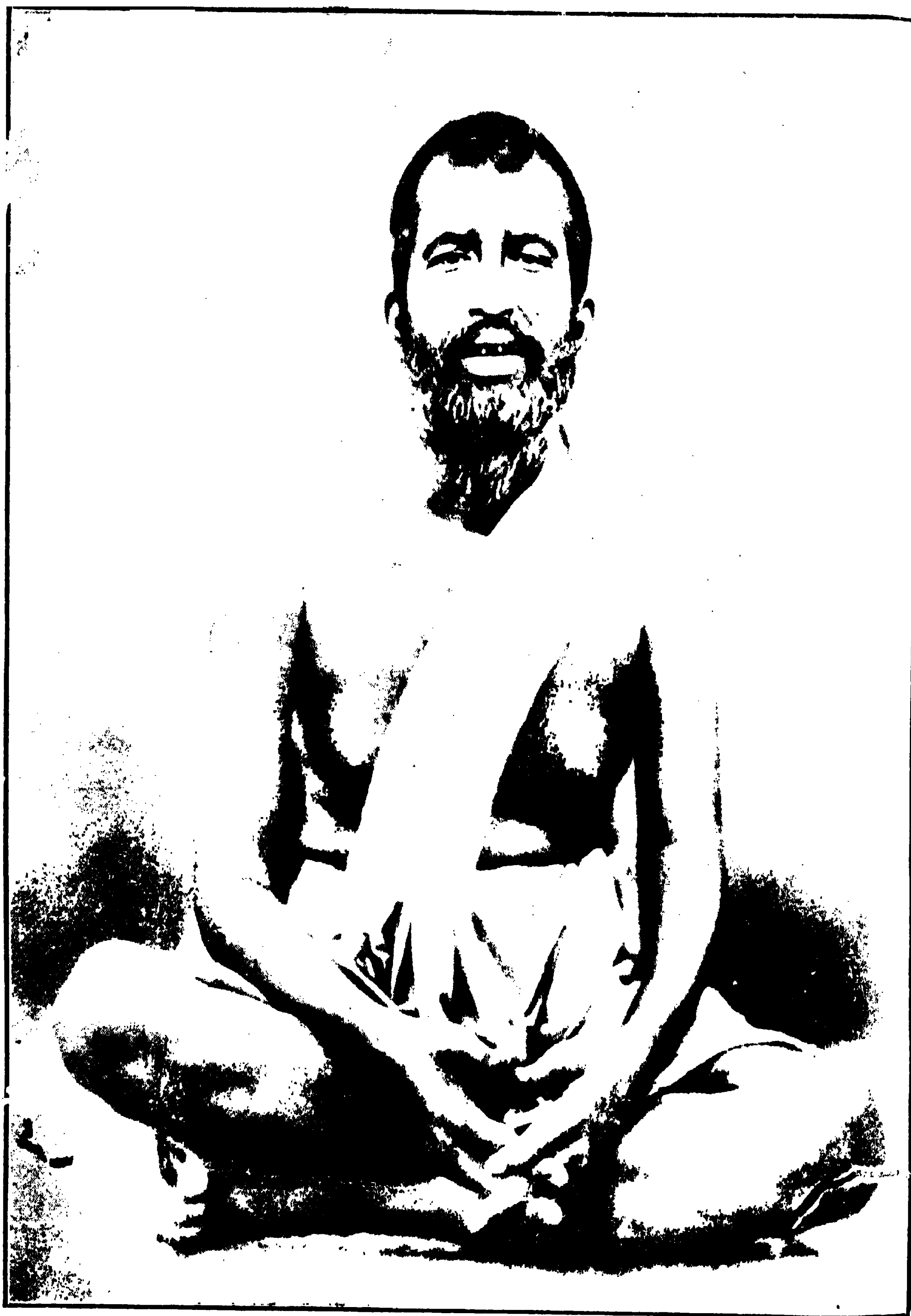




Sri Sri Ramkrishna Paramhansa Deb.

শ୍ରীশ୍ରীରାମକୃଷ୍ଣକଥାମୃତ ।

(শ୍ରীম—কথিত)

চতুর্থ ভাগ ।

“তব কথামৃতং তপ্তজীবনম্, কবিত্ববীড়িতং কল্মষাপহম্ ।

শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্, ভুবি গৃণাস্তি যে ভুরিদা জনাঃ ॥”

শ্রীমদ্ভাগবত, গোপীগীতা ।

দ্বিতীয় সংস্করণ । আশ্বিন, সন ১৩২১ ।

PUBLISHED BY

PRAVAS CHANDRA GUPTA.

13-2. Gurooprasad Chowdhury's Lane,

Calcutta.

PRINTED AT THE
LAKSHMI PRINTING WORKS,

64-1, 64-2, Sukea's Street,

CALCUTTA

বীথান ১৮০ আনা ।]

[Copyrighted by the Author

The Right of Translation, Reproduction, Adaptation and all other

Rights are reserved.

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোজয়তি ।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব ।

স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥

(গীতা, ২ অঃ ; ৫৪ ।)

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।

পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূম্ ॥

আত্মস্থামৃষয়ঃ সর্বৈ দেবর্ষি নারদস্তথা ।

অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রহ্মর্ষি মে ॥

(গীতা, ১০ অঃ ; ১২, ১৩ ।)

শ্রীশ্রীগুরুদেব

শ্রীপাদপদ্মভরসা ।

পূজা ও নিবেদন ।

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥

মা,

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা আবার উপস্থিত। আজ নবম্যাদি কল্লারম্ভ। আমাদের নৈবেদ্য গ্রহণ কর। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত চতুর্থভাগ, এবারের নৈবেদ্য।

মা, তোমার ও বাবার আশীর্ব্বাদে শ্রীকথামৃত আবার প্রকাশিত হইল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত চরিত্রের তেত্রিশ খানি চিত্র ইহাতে সন্নিবেশিত আছে। ভগবদ্ভক্তগণ ধ্যান করিবেন।

ভক্তদের জন্ম এবারে একটি বিশেষ শুভসংবাদ আছে। ঠাকুর বলি-
তেছেন, 'মা, এখানে মারা আন্তরিক টানে আসবে
তারা মেন সিদ্ধ হয়'। (২২২ পৃষ্ঠা) এই শুভ অঙ্গীকারবাণী ভক্তদের
ষেন সদা স্মরণ থাকে।

এবার ভক্তসমাগমকথা অনেক আছে। ছোট নরেন, পূর্ণ, নারা'ণ প্রভৃতি
শেষের ছোকরা ভক্তদিগের জন্ম ব্যাকুলতা; নরেন্দ্রের প্রতি পুনঃ পুনঃ
সম্মাসের উপদেশ; অধরকে চাকরী হইতে নিবৃত্তির উপদেশ; ৬জন্মাষ্টমী-
দিবসে গিরীশের স্তব ও তাঁহার প্রতি ঠাকুরের উৎসাহবাণী—এই সকল চিত্র
ভক্তেরা ধ্যান করিবেন, সন্দেহ নাই।

ঠাকুরের নানাবিধ ঐশ্বরীয় অবস্থা বর্ণনা করা মানুষের অসাধ্য । তাঁহার বাল্যাবস্থা বা পরমহংস অবস্থার কয়েকখানি চিত্র সন্নিবেশিত হইল । আর সিদ্ধিলাভের পর সাধনাবস্থায় যে সকল অমানুষিক ভাব ও অদ্ভুত দর্শন হইত, তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস এই ভাগে পাওয়া যাইবে । * * *

এই গ্রন্থে বিবৃত শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত ও ঠাকুরের নানাবিধ অবস্থাও একস্থানে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে ;—আমরা তাঁহার নিজের মুখে যাহা শুনিয়াছি ও নিজের চক্ষে যাহা দেখিয়াছি ।

মা, ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্বে যখন শ্রীশ্রীকথামৃত-প্রণয়ন-ভ্রূহ-ব্রত তোমার অকৃতী সন্তান গ্রহণ করে, তুমি আশীর্বাদ করিয়াছিলে ও অভয় প্রদান করিয়াছিলে । শ্রীশ্রীনরেন্দ্র প্রভৃতি গুরুভায়েরাও যার পর নাই উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন । এখনও শ্রীযুক্ত বাবুরাম, শশী, গিরীণ প্রভৃতি ভায়েরা সর্বদা উৎসাহ দিতেছেন ।

মা, তোমার আশীর্বাদ ও অভয়বাণী এ দাসামুদাসের একমাত্র অবলম্বন ।

এক্ষণে করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি, কৃপা করিয়া আশীর্বাদ কর, যেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত একমাত্র বাবার সেবা, তোমার সেবা, ও তোমাদের সন্তানদের ও ভক্তদের আনন্দবর্দ্ধনে উৎসর্গীকৃত হইয়া থাকে । ইতি

নবম্যাদি কল্পারম্ভ ও দেবীর বোধন ।

কলিকাতা, ২৭এ সেপ্টেম্বর, ১৯১০ ;

১০ই আশ্বিন, ১৩১৭ ।

একান্ত শরণাগত, দাসামুদাস,

মা, তোমার অকৃতী সন্তান,

শ্রীম—

মা, তোমার আশীর্বাদে চতুর্থভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল । কোজাগর পূর্ণিমা, আশ্বিন, ১৩২১ ।

শ্রীম—

শ্রীশ্রীমার আশীর্বাদ । সপ্তদশবর্ষ পূর্বে ।

বাবাজীবন,—

* * *

তাঁহার নিকট যাহা শুনিয়াছিলে, সেই কথাই সত্য । ইহাতে তোমার কোন ভয় নাই । এক সময় তিনিই তোমার কাছে এ সকল কথা রাখিয়াছিলেন ; এক্ষণে আবশ্যকমত তিনি প্রকাশ করাইতেছেন । ঐ সকল কথা ব্যক্ত না করিলে লোকের চৈতন্য হইবে নাই, জানিবে । তোমার নিকট যে সমস্ত তাঁহার কথা আছে তাহা সবই সত্য । এক দিন তোমার মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল, তিনিই ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন । * * ২১ আষাঢ়, ১৩০৪ ।

শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত ।

Three Classes of Evidence.

ঠাকুরের জন্মাবধি ঘটনাগুলি লইয়া তাঁহার চরিতামৃত ধারাবাহিকরূপে বিবৃত করিয়া প্রকাশ করিবার অনেক দিন হইতে ইচ্ছা আছে । শ্রীশ্রীকথামৃত অন্ততঃ ছয় সাত ভাগ সম্পূর্ণ হইলে শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত অবলম্বন করিয়া এইটী লিখিবার উপকরণ পাওয়া যাইবে ।

এ সম্বন্ধে তিন প্রকার উপকরণ (materials) পাওয়া যায় ।

১ম Direct and Recorded on the same day অর্থাৎ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমুখে বালা, সাধনাবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে অথবা ভক্তদের সম্বন্ধে নিজ চরিত যাহা বলিয়াছেন,—আর যাহা ভক্তেরা সেই দিনই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । শ্রীশ্রীকথামৃতে প্রকাশিত শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত এই জাতীয় উপকরণ । শ্রীম নিজে যে দিন ঠাকুরের কাছে বসিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন, ও তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছিলেন, তিনি সেই দিন রাত্রেই (বা দিবাভাগে) সেইগুলি স্মরণ করিয়া দৈনন্দিন বিবরণে Diaryতে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । এই জাতীয় উপকরণ প্রত্যক্ষ (Direct) দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত । বর্ষ, তারিখ, বার, তিথি সমেত ।

২য় Direct but unrecorded at the time of the Master অর্থাৎ ঠাকুরের শ্রীমুখে ভক্তেরা নিজে যাহা শুনিয়াছিলেন, আর এক্ষণে স্মরণ করিয়া বলেন । এ জাতীয় উপকরণও খুব ভাল । আর অগ্ৰাণু অবতারে প্রায় এইরূপই হইয়াছে । তবে চব্বিশ বৎসর হইয়া গিয়াছে । লিপিবদ্ধ থাকিতে যে ভুলের সম্ভাবনা, তাহা অপেক্ষা অধিক ভুলের সম্ভাবনা ।

৩য় Hearsay and unrecorded at the time of the Master ঠাকুরের সমসাময়িক ৬হুদয় মুখোপাধ্যায়, ৬রামচাটুর্ঘ্যে, প্রভৃতি অগ্ৰাণু ভক্তগণের নিকট হইতে ঠাকুরের বালা ও সাধনাবস্থা সম্বন্ধে আমরা যাহা শুনিয়াছি,—অথবা ৬কামারপুকুর, জয়রামবাটী, শ্রামবাজার-নিবাসী বা ঠাকুরগোষ্ঠীর ভক্তদের মুখ হইতে তাঁহার চরিত সম্বন্ধে যাহা শুনিতে পাই,—সেগুলি তৃতীয় শ্রেণীর উপকরণ ।

শ্রীশ্রীকথামৃত-প্রণয়নকালে শ্রীম প্রথম জাতীয় উপকরণের উপর নির্ভর করিয়াছেন । তাঁহার ধারাবাহিক চরিতামৃত যদি ভিন্ন আকারে শ্রীম—প্রকাশ করেন, সেও প্রধানতঃ এই প্রথম শ্রেণীর উপকরণের উপর, অর্থাৎ শ্রীমুখকথিত চরিতামৃতের উপর নির্ভর করিয়া লেখা হইবে ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থ ভাগ সূচি, ৩৪৬.

শ্রীমুখকথিতচরিতামৃত ।

বাল্য ।

পিতা ৬খুদিরাম ৯৪ ; জন্ম ; গয়াতে ৬খুদিরামের স্বপ্ন ৫৩২৮১ ;
পিতৃবা, ৬হলধারীর পিতা,—ঠাহার নিষ্ঠা ও ভাবাবস্থা ; দূর হতে বেল
ফুল ও বেল পাতা আনা ; সন্ধ্যা, ধ্যান, ও অশ্রু ; রামষাত্রায় ভাব ৯৪ ;
ঠাকুর কে—৫৩ ; লাহাদের বাটীতে শাস্ত্রপাঠ শ্রাবণ ৯২ ;

সিদ্ধিলাভের পর সাধনাবস্থা ।

পঞ্চবটী, বেলতলা, কালীঘর, কুটী ।

পঞ্চবটীমূলে, বামনীর সাহায্যে সাধন ২০৩ ;

পঞ্চবটীতে হত্যা দেওয়া (জ্ঞানের জন্ত) ২০৩ ;

কুঠীর কাছে হোমাগ্নির গায় জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জলিত হওয়া ৩০১ ;

পঞ্চবটীতে সাধনকাল ঠাকুরের প্রার্থনা ২০৯ ;

পঞ্চবটীতে ঈশ্বরীর সঙ্গে কথা ২৭৯ ;

কালীঘরে সিদ্ধাই প্রার্থনা করা ও জগন্মাতার নিষেধ ৩০৬ ;

বেলতলায় তন্ত্রের সাধন ৬৭, ২০৩, ২৭১ ;

আত্মার রমণ দর্শন ও ঠাকুরের ষট্চক্র ভেদ ২৭৭, 'তার পরেই এই অবস্থা' ;

পুরাণ, তন্ত্র ও বেদমতে সাধন ২০৩ ;

পঞ্চবটীমূলে মাধবীতলায় তোতাপুরীর বেদান্তের উপদেশ ও ঠাকুরের
তিন দিনে সমাধি ২৮১ । বামনীর বারণ, 'বাবা বেদান্ত শুন না' ২৮১ ;

জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও হঠযোগ সাধন ২৮২ ;

উন্মাদ, 'রাম' 'রাম' করিয়া ও রামলালা লইয়া ৪৫, ৮৪, ১২১, ২০৩, ২৬৬ ;

প্রেমোন্মাদ ২৩৫ ; দেবভাব (পূজা করলে শাস্ত) ৪, ২৪৭ ;

পরমহংস অবস্থা ১২১ ১৩০, ২০৮ ;

কুটীর উপর ভক্তদের জন্ত ব্যাকুল হ'য়ে চীৎকার,—'তোরা কে
কোথায় আছিস্ আর' ২৮২ ; সেজোবাবুর চৌদ্দ বৎসর ধরে সেবা ২৮১, ৩৩০ ;

পঞ্চবটীতে একটি ছেলে দর্শন,—সেই রাখাল—৩৩০ ;

সেজোবাবু, শঙ্কুমল্লিক প্রভৃতি পাঁচজন গৌরবর্ণ রসদার দর্শন ৩২৯ ;

চ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সিদ্ধিলাভের পর সাধনাবস্থা ।

৬ দেবেন্দ্র ঠাকুরের সঙ্গে দেখা ১৬৩ ; দক্ষিণেশ্বরে আশ্বিনে ঝড় ২৫৪ ।

দক্ষিণেশ্বরে সুলক্ষণা ব্রাহ্মণীর পুষ্কান্তে সমাধি ২৪৭ ;

তীর্থ ।

৬ কাশীধামে সম্যাসীর মঠ দর্শন ১৬৫ ; চিন্ময় শিব দর্শন ২৫৬ ; সোনার
অন্নপূর্ণা দর্শন—২৫৭ ।

শ্রীবৃন্দাবন দর্শন ৫৭ (ভেক গ্রহণ) ১৮৩ ; যমুনাপুলিনে রাখালকৃষ্ণ
দর্শন ; ঋষঘাটে বসুদেবকোড়ে বালগোপাল দর্শন ; মথুরায় রাখালকৃষ্ণকে
স্বপ্নে দর্শন ৫৭ ।

কামারপুকুর, শিওড়, শ্রামবাজার ।

৬ হেমাজিনী দেবী, হৃদয়ের মা, ঠাকুরের শ্রীচরণ পূজা করেন ৫৩ ।
রঘুবীরের জমী রেজেষ্ট্রী ৬৮ ।

১০ । ১১ বৎসরের সময় আনুড়ের মাঠে প্রথম দর্শন ও সমাধি—৩২৯ ।

কর্ত্তাভজা ৯৩ ; ঘোষপাড়ার মত (সরী পাথর) ১৫৪ ; শ্রামবাজারের
তাঁতীরা ১২০ ; কামারপুকুরে শিবরাম ১৮৬৯-৭০, ১২১ ।

গৌরান্দের ভাব—শ্রামবাজারে দর্শন ৫৩, (মহাসংকীৰ্ত্তন) ১৯০, ১৯১

সঞ্চয়ে অক্ষম—জন্মভূমিতে—“আম পেড়ে নিয়ে চলতে পাল্লেম না ।”

শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন ।

মুসলমানের মেয়ে রূপে জগন্মাতার দর্শন ৩ ;

রতির মার বেশে জগন্মাতার আদেশ ‘তুই ভাবেই থাক’ ৩ ;

গৌরান্দ্র দর্শন—কালাপেড়ে কাপড় পরা ৩, ১৯০ ;

রাখালের মধ্যে গোপাল দর্শন ৬ ;

কালীঘরে দর্শন—সব চিন্ময়—জগন্মাতাই জীব জগৎ ৪২ ;

বৃন্দাবনে যমুনাপুলিনে রাখালকৃষ্ণ দর্শন ;—ঋষঘাটে বসুদেবকোড়ে বাল-
গোপাল দর্শন ৫৭ ;

মথুরায় রাখালকৃষ্ণকে স্বপ্নে দর্শন ৫৭ ;

ভগবতী দর্শন—চিড়িয়া খানায় (Zoological gardens) সিংহদৃষ্টে
৬৬ ; কুমারীর মধ্যে ভগবতী দর্শন ৮৯ ; বেলতলায় দর্শন ৬৭, ২৭১ ।

ভগবতী দর্শন, শ্রামপুকুর বাটীতে—‘ভয়ঙ্কর কালকার্মিনী’ ৩০৪ ;

বাবুরাম মধ্যে দেবীমূর্ত্তি দর্শন ১১৩ ;

শ্রীমুখকথিতচরিতামৃত । ঠাকুরের নানাবিধ ঈশ্বরীয় অবস্থা । ৫

দর্শন—কালীঘরে অধ্যাত্মপাঠসময়ে শ্রীরামলক্ষ্মণ দর্শন ২৭০ ;

কুঠীর সম্মুখে অজ্জুনের রথে কৃষ্ণসারথি দর্শন ২৭০ ।

শ্যামবাজারে শ্রীগৌরাজ্জ দর্শন ;—বটতলায় দিগম্বর বালকমূর্তি পরমহংস দর্শন ৫০, ২৭০ ; বেলতলায় ব্রহ্মযোনি দর্শন ; ও কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি ২৭১

সচ্চিদানন্দ ও মায়া দর্শন ;—পঞ্চবটী হইতে বকুলতলা পর্য্যন্ত চৈতন্যদেব ও তাঁহার সংকীৰ্ত্তন-দল ২৭২, গঙ্গাগর্ভ হইতে উথিত মহাপ্রমূর্তি দর্শন, ২৭২ ।

কেশব সেনের সঙ্গে দেখার পূর্বে ঘরের মধ্যে কেশব ও তাঁহার দল,—সমাধি অবস্থায় দর্শন ২৮০ ; অথও সচ্চিদানন্দ দর্শন, ২৮০ ।

আনন্দের কোরাণা মধ্যে ছুটি পরমহংসরূপ দর্শন, শ্যামপুকুরে ৩০৩ ;

‘ডাক্তার নারায়ণ’ ;—নারায়ণ অন্তর্য্যামিরূপে ‘মাহুৎ নারায়ণ’ ২৯৮ ;

সূর্য্যস্বরূপ ও জ্যোতি দর্শন, শ্যামপুকুর বাটীতে ৩০৭ ;

বগাশীপুলে সব রামময় দর্শন—আবার নিরাকার অথও সচ্চিদানন্দ দর্শন, ‘সাকার থেকে নিরাকারে যাচ্ছে’ ৩২৮ ।

পঞ্চবটীতে নানারূপ জ্যোতিঃ দর্শন—নিত্যলীলা দর্শন ২০৪ ;

শুদ্ধ-আত্মা—নরেন্দ্র, পূর্ণ, নিরঞ্জন প্রভৃতি মধ্যে নারায়ণ দর্শন ২৬৬ ;

সমাধিস্থ নরেন্দ্রকে লাল জ্যোতিঃ মধ্যে দর্শন—নিকটে কেদার ও চুনীকে দর্শন, ২৮০ ; কেশব ও ব্রাহ্মভক্তগণ দর্শন, ২৮০ ।

ঠাকুরের নানাবিধ ঈশ্বরীয় অবস্থা ।

বালকের অবস্থা বা পরমহংস অবস্থা ।—‘ক্ষোভ বাসনা গেলেই এই’ ৫০ ; বালকের ত্রায় বিশ্বাস—৭১ ; ‘আমার মা চাই’—৭৫ ; কেন অম্মুখে ঠাকুর অধৈর্য্য ৮৬, ৮৯ ; শরতের হিম লাগান—২১৩ ; বাল্য, পৌগণ্ড, যুবার অবস্থা—২৩৫ ; ঠিক পাঁচ বছরের বালক ‘যেমন রামলালের ভাই’ ১২২ ; দক্ষিণেশ্বরে ছুটি সাধু সঙ্গে—২৩১ ; শ্যামপুকুরে পনের ষোল বছরের পরমহংস দর্শন—৩০৪ ; দক্ষিণেশ্বরে বালকবৎ ৭৬ ।

ঠাকুরের নানাবিধ সাধ—ছুটি ছকা খেয়ে কৃষ্ণকিশোরের একাদশী ৯৯, সোণার গোট পরবার ১৮৭, জরির সাজ পরবার ১৮৮, শগুর বাড়ী যাবার ২৩৩, আলোয়ানের সাধ ২৫০ ।

শ্রীনাথান ভাব—কেদার দৃষ্টে ৯ ; শ্রীমতীর বিরহপদ শুনিয়া (শ্যামদাসের কীর্ত্তন) ১৫৮ ; যশোদার ভাব—রাখাল দৃষ্টে ৬ ;

শ্রীগৌরীদেবের ভাব—পেনেটী মহোৎসবে ২৮ ; শ্যামবাজারে ৫৩ ; যত্ন মল্লিকের বাগানে ১৭৮ ; রাধিকাগোষ্ঠামী সঙ্গে ১৯১ ।

বলরামের ভাব—প্রিয় মুখুর্য্যে প্রভৃতি সঙ্গে ২২৩ ;

ষিগুপ্তীষ্টের আবির্ভাব ও খৃষ্টান মিশ্রের প্রতি কৃপা—৩০৩ ;

অক্রোধপরমানন্দ, অহেতুককৃপাসিন্ধু—নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজে—২২ ;

ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা—প্রাণকৃষ্ণের সহিত কথা—৬ ; ঠাকুরের দর্শন—সব চিন্ময় ১৬৬ ; ব্রহ্মাণ্ড একটি শালগ্রাম ২৫৭ ;

শ্রীমন্দির দর্শন ও উদ্দীপন—নন্দনবাগান সমাজগৃহ দর্শনে, ২০ ;

দেবভাব—‘পূজা না করলে শান্ত হতুম না’—৪ ; রাম কেদার প্রভৃতির পূজা—২৫ ; শিবলিঙ্গ পূজা—১২২ ।

প্রেমোন্মাদ—‘রাম’ ‘রাম’ করে পাগল ৪৫ ; শিবলিঙ্গবোধে পূজা ১২২ ;

অহঙ্কার নিঃসূল । দক্ষিণেশ্বরে মণিসঙ্গে (‘আমি খুঁজে পাচ্ছি না’)—১১৫ ; বিচার আমি—তিনিই রেখেছেন—১৪১ ;

ঠাকুরের ছুটি সাধ—(বলরামের বাটী, ৩৭থযাত্রা)—২৭১ ;

প্রহ্লাদের অবস্থা—দক্ষিণেশ্বরে রামলালের ভক্তমাল পাঠ—৩৩ ;

সর্বত্র সমদর্শী—মহিমার নিকট শাস্ত্রপাঠ শ্রবণে সমাধিস্থ—৮২ ;

সন্তান ভাব—কালীঘরে মার পূজা ৩৪ ;

বাৎসল্য-ভাব—৬, ১০৩ ;

ঠাকুরের দাস-ভাব—‘চিদানন্দরূপঃ শিবোহং’ মহিমার মুখে শুনিয়া ৮৩ ;

বিজ্ঞানীর অবস্থা—‘মা সব জানে’—৮৯ ;

সীতার ঞ্চায় ব্যাকুল ভাব—দক্ষিণেশ্বরে মণি প্রভৃতি সঙ্গে ৩৬ ;

ভক্তসঙ্গে নৃত্য—বলরামের বাটী রথের সম্মুখে—১২৯ ; জ্ঞানানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ—বলরামের বাড়ীতে শশধরাদি সঙ্গে—১৩০ ; অধরের বাড়ীতে—১৪৫ ; দক্ষিণেশ্বরে জন্মমহোৎসবে—১০৪ ; নীলকণ্ঠাদি সঙ্গে—২৪৪ ; পেনেটী মহোৎসবে—২৬ ; বলরামের বাড়ী রথযাত্রায়—১৩০, ২৬১ ।

সংকীৰ্ত্তনানন্দে ২৭, ১১০, ১২৯, ১৩৪, ১৪৫, ১৫৮, ২২৫, ২৪১ (নীলকণ্ঠ সঙ্গে), ২৬১, ২৬৩, ২৬৫, (বলরামের বাটীতে, ৩৭থযাত্রায় প্রভাতে ঠাকুরের নৃত্য ও নাম সংকীৰ্ত্তন) ।

জগন্মাতার সহিত কথা—শিবপুরে বাউলের দল ও ভবানীপুরের ভক্তদের সঙ্গে—১৩২ ; কোমলগরের ভক্ত ও নরেন্দ্রাদি সঙ্গে—১৭৪ ;

রাধিকা গোস্বামী দর্শন দিনে দক্ষিণেশ্বরে—১৯৯ ;

ঠাকুরের ভাবাবস্থায় অন্তর্দৃষ্টি—অধরের বাড়ী—নরেন্দ্রাদি সঙ্গে—১৭০ ; অভক্তের জিনিষ ত্যাগ—দক্ষিণেশ্বরে রাত্রে আহারের সময়, লাটু ও মাষ্টার সঙ্গে—১৬৭ ;

নানা সাধনের জন্য ব্যাকুলতা,—বৈষ্ণবের ভেক প্রভৃতি—দক্ষিণেশ্বরে রাধিকা গোস্বামী প্রভৃতি সঙ্গে—১৯১ ; কেশবের বাড়ীতে নিরাকারের ভাব—১৯৩ ;

অমাবস্থায় জগন্মাতার পূজা ও ঠাকুরের ভাবাবেশ—দক্ষিণেশ্বরে রাধিকা গোস্বামী দর্শন দিন—১৯৮ ;

ঠাকুরের প্রকৃতিভাব—বলরামের বাড়ী গোপালের মা দৃষ্টে—১৪৮ ; শ্যামপুকুরে মণি সঙ্গে—৩১৬ ;

ঠাকুর ভক্তবৎসল—১৮৯, ৩১৪ । সহজ অবস্থা—শিবপুরের বাউল প্রভৃতি দর্শন দিনে মণি সঙ্গে ১৪০ ।

ভক্তজন্য চিন্তা—রাখালের জন্ম ১৮২ । নরেন্দ্রের জন্ম কাশ্মী ১৮৯ । একজন ভক্তের কণ্ঠের জন্ম চিন্তা ২০৬ । বলরামের জন্ম ৩২০ । মণির জন্ম ৩৩৪ । কিশোরী ও হরিশের জন্ম ৩৩৫ । পূর্ণের জন্ম ৩৩৩, ৩৪১ ।

রাগিনী আলাপ ও ঠাকুরের ভাবাবস্থায় আনন্দ—১৭৪ ।

নিত্যলীলা স্ফোপ ২০৪ । ঠাকুরের পাঁচ প্রকার সমাধি ২৭৭ ।

ঠাকুরের মুক্ত কণ্ঠ—মহিমাচরণ, মণি প্রভৃতির কাছে ২৭৬ ; কালীঘরে, ২২।২৩ বৎসরের সময়, জগন্মাতার সহিত কথা—‘তুই কি অক্ষর হ’তে চাসু’ ৩২৯ । আন্তরিক ভক্তের জন্ম প্রার্থনা ২২২ । ঠাকুরের বাসনা ২৫০ ; আবার দেহধারণ ২৬০ ;

ঠাকুরের শিষ্টাচার (দ্বিজাদি ভক্তের জন্য) ২৭৬ ; স্বপ্নে ঈশ্বরদর্শন কথা শ্রবণ ও ভাবাবেশ ২৮৩ । গেরো বাঁধা, টাকা স্পর্শ ও সঞ্চয় অসম্ভব ২৯৯, ৩০০ ;

ষড়্ভুজ মহাপ্রভু, রামচন্দ্র প্রভৃতি ঠাকুরদের পট দেখিয়া আনন্দ ৩১৮ ।

রাধাবাজারে ছবি তোলাও ভাবাবেশ—৮ রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের বাটী যাইবার দিন ৮৯ ;

প্রথমাবস্থার ভক্তগণ ।

মথুরাবানু—বিড়ালকে ঈশ্বরী বোধে ঠাকুরের লুটী খাওয়ানো ও খাজাঙ্গীর পত্র ৪২ । ঠাকুরের মধ্যে মথুরের ঈশ্বরদর্শন ৫৩ ; ঠাকুরের

সঙ্গে জানবাজারে এক ঘরে শয়ন ৮৪ ; ঠাকুরকে তালুক লিখে দিতে চাওয়া ১১১ ; শাক্তের নিন্দা শুনে বৈষ্ণবচরণের উপর বিরক্তি ১১৯ । ৩রাধাকান্তের গয়না চুরি হওয়াতে দেবোদ্দেশে তিরস্কার ১৬৩ ; ঠাকুরের আদেশে সাধুসেবার জন্ত আলাদা ভাড়া করেন ১৮৭ ; ব্রাহ্মণী বলতো, 'প্রতাপরুদ্র' ৩৩০ ; পাঁচ-জনের মধ্যে একজন রসদার ৩২৯ ।

হলধারী—হলধারীকে বল্লাম, 'মা বলেছেন তুই ভাবেই থাক' ; ৩ । অধ্যায়, বেদান্ত, পড়তো,—আবার বলে 'ছেলেদের বিয়ে কেমন করে হবে' ৬৪ । অম্মুখের সময় সর্বাধিকারী ডাক্তারকে হাত দেখালে ৯১ । জ্ঞানী পাগলের কথা বললে ও আমার বুক গুরু গুরু করতে লাগলো ১২৩ । কালীঘরে অধ্যায়রামায়ণ পড়া শুনে আমার রাম লক্ষ্মণ দর্শন ২৭০ । যখন মা বললে, 'তুই কি অক্ষর হতে চাস্ ?' তখন 'অক্ষর' মানে হলধারীকে জিজ্ঞাসা করলাম ; তখন ২২।২৩ বছর বয়স, ৩২৯ ।

হৃদয় মৃথোপাধ্যায়—প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে জ্ঞানী পাগলের কথা শুনে হৃদয়কে জড়িয়ে ধরলুম ১২৩ । হৃদকে বল্লাম, আমি কৃষ্ণকিশোরের একাদশী, লুচি ছুকা দিয়ে, করবো ৯৯ । হৃদর বাড়ীতে শিহোড়ে দুর্গাপূজা ১২১ । কেশবকে দেখতে হৃদেকে সঙ্গে করে বেলঘরের বাগানে গেলাম ১২৪ । হৃদের বাড়ীতে মল্লিকরা খেলে না ; ঘোষপাড়ার মত ১৫৪ । আমাকে তালুক লিখে দেবার জন্ত সেজবাবু হৃদের সঙ্গে পরামর্শ করছিল ১৬৩ । লক্ষ্মীনারায়ণ হৃদের কাছে (আমার জন্ত) টাকা দিতে চাইলে ২১৭ । মার (জগন্মাতার) কাছে ব্যামোর কথা হৃদ বলতে বললে ৩০৬ ।

শ্রীশ্রী তোতাপুল্লী—পঞ্চবটীতে আমার গান শুনে শ্রীশ্রীর কান্না ৪৯ । বাঘ আর ছাগলের পালের গল্প বলেছিল ৫৪ । বললে সোণার থালা, সোণার গেলাস, দিয়ে এক ধনী সাধুদের খাওয়ালে ১৬৫ । শ্রীশ্রী আর হলধারী কালীঘরে অধ্যায় পড়ছে, দেখলাম রাম লক্ষ্মণ ২৭০ । শ্রীশ্রী বেদান্তের উপদেশ দিলে তিন দিনই সমাধি ২৮১ । শ্রীশ্রী বোলতো, গভীর রাত্রে অনাহত শব্দ শোনা যায় ২৮৩ । বোলতো, 'মনেই জগৎ' আবার 'মনেতেই লয় হয়' ৩৩৭ ।

ব্রাহ্মণী—'বামনী' বেলতলায় তত্ত্বের সাধনের জোগাড় করতো ১৭১ । বোলতো 'বাবা, বেদান্ত শুনো না,—ভক্তির হানি হবে' ২৮১ । সেজোবাবুকে বোলতো, 'প্রতাপরুদ্র' ৩৩০ ।

বৈষ্ণবচরণ—বোলতো নরলীলায় বিশ্বাস হলে পূর্ণ জ্ঞান হবে ৮৮। বোলতো, যে যাকে ভালবাসে, তাকে ইষ্ট বলে জানলে ভগবানে শীঘ্র মন হয় ৯৩। সেজো বাবুর কাছে শান্তের নিন্দা করেছিল ১১৯। রতির মা, বৈষ্ণবচরণের দলের লোক ১২০।

কৃষ্ণকিশোর—বলেছিল, ঋষিরা দিয়েছিল বলে ‘মরা’ ‘মরা’ শুদ্ধ মন্ত্র ৬৫। কৃষ্ণকিশোরের ছেলে, রামপ্রসন্ন ৯৪। একাদশীতে কৃষ্ণকিশোর লুচি ছকা খেলে ৯৯। ভবনাথের মত ছই ছেলে মারা গেল,—অত বড় জ্ঞানী, কিন্তু প্রথম প্রথম শোক সামলাতে পারেন না ৩৩৫।

পদ্মনোচন—আমার মুখে রামপ্রসাদের গান শুনে কাঁদতে লাগলো ৪৯। বলেছিল, ‘তোমার সঙ্গে কৈবর্তের বাড়ীতে সভায় যাবো তার আর কি—হাড়ীর বাড়ীতে গিয়ে খেতে পারি’ ৬৬। বলেছিল, তোমার অবস্থা সভা করে লোকদের বলবো ৩০১।

জয়নারায়ণ পণ্ডিত—খুব উদার; বল্লেন, কাশী যাবো ৮৭। পণ্ডিত ব’লে অহঙ্কার ছিল না ২৩৫।

গৌরী পণ্ডিত—‘কালী আর গৌরঙ্গ এক বোধ হ’লে তবে ঠিক জ্ঞান হয়’ ৭৩। জীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা কর্তো ৮৭। স্তব কর্তো, ‘হা রে রে নিরালস্য লম্বোদর’!—পণ্ডিতেরা কেঁচো হয়ে যেত ১২৩।

নারায়ণ শাস্ত্রী—সাত বছর গায়শাস্ত্র পড়েছিল; ‘হর হর’ বলতে বলতে ভাব হোতো; বশিষ্ঠাশ্রমে তপস্যা করতে চলে গেল ১২৪। মাইকেলকে বল্লেন,—যে পেটের জন্তু নিজের ধর্ম ছাড়ে, তার সঙ্গে কথা কি কইবো? ১২৫।

মাইকেল অশ্বসুন্দর—মেগেজিনের সাহেবের সঙ্গে মোকদমার জন্তু দারিক বাবুর সঙ্গে এসেছিল; দপ্তরখানার বড় ঘরে দেখা হ’ল; প্রথমে নারায়ণ শাস্ত্রীর সঙ্গে কথা; আমি বল্লাম, ‘আমার মুখ কে যেন চেপে ধরছে’ ১২৫।

শম্ভু অল্লিক—যখন ঘোর বিকার, ডাক্তার সর্কাদিকারী দেখে বলে, ঔষধের গরম ৯১। এক দিন বোলছে—ওহে তুমি তাই থাঙ্টো হয়ে বেড়াও—বেশ আরাম ১০৫। ব্যারামের সময় বোলতো, হুহু পৌটলা বেঁধে বসে আছি ২০৫। শম্ভুর নাকটি টেপা ছিল—তাই অত ভাল থেকেও তত সরল ছিল না ২৩৯। শম্ভুর আফিম কাপড়ে বাঁধিয়া আনিতে ঠাকুর অক্ষম ৩০০। রাত্রি মুখ ক’রে বলেছিল, ‘সরল ভাবে ঈশ্বরকে ডাকলে তিনি শুন্বেনই শুন্বেন’ ৩০৮। শম্ভু একজন রসদ্বার—তাকে আগে থাকতে ভাবে দেখেছিলাম ৩০০।

উলোর বামনদাস—বিশ্বাসদের বাড়ীতে দেখা ; আমায় দেখে বলেছিল, ‘বাবা ! বাঘ যেমন মানুষকে ধরে তেমনি ঈশ্বরী এঁকে ধরে রয়েছেন !’ ২৩৪।

গোবিন্দ পাল ও গোপাল সেন—বরাহনগরের ছেলে। ছেলেবেলা থেকেই ঈশ্বরে মন। গোপালের ভাবসমাধি হ’ত ; পঞ্চবটীতে বিদায় লয়ে গেল ২২০। সেই বোধ হয় নিত্যগোপাল ২৮০।

পঞ্চবটীর সন্ন্যাসী—গুরুপাহুকা ও শালগ্রাম পূজা ২০১।

সন্ন্যাসী—নয় হাত লম্বা চুল বিশিষ্ট, দক্ষিণেশ্বরে তাঁহাকে দর্শন ৩১৯।

লক্ষ্মীনারায়ণ মাডোয়ারী—ঠাকুরের নামে টাকা লিখে দিতে তাঁহাকে নিষেধ ২১৭।

কেশব সেনের তিন জন শিষ্য—ঠাকুরকে পরীক্ষা করিতে আগমন করেন (দক্ষিণেশ্বরে) ১২৪।

সাতোপাঙ্গাদি ভক্তগণ।

নরেন্দ্র—বলরামমন্দিরে নিমন্ত্রণ ও রামের বাড়ী, নরেন্দ্রদৃষ্টে ঠাকুরের তাঁহার গান ১৬-১৭। নরেন্দ্র আপনার আনন্দ ও নারায়ণ ভাবে সেবা ২৫৮। লোক, স্বতঃসিদ্ধ ও নিরাকারে নিষ্ঠা রথযাত্রায় গান ও ভাবাবেশ ২৫৯, ৬০। বিবাহের কথা ৯০। পুরুষসত্তা ২৬২। খুব উঁচু ঘর ২৬৬। কিছু ১১৫। নরেন্দ্র ও আত্মশক্তি ১৪০। বশ নয় ২৬৬। লাল জ্যোতিঃ মধ্যে অধরের বাড়ীতে ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্কী- সমাধিস্থ দর্শন ২৮০। তাঁহার বৃকে র্ত্তনানন্দ ১৪৭। ‘সব্ মিল্ছে’ ১৪৯। পা ও ভাবাবেশ ২৯৩। সব ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে নিমন্ত্রণ ১৫০। মনটা ঠাকুরের উপর ৩১৩। পিতৃবিয়োগ ও কর্ম্মকাজের চেষ্টা ১৬২। শ্রামপুকুরে তীব্র বৈরাগ্য ও তাঁহার বাড়ীর ভাবনা ১৭০। ঠাকুরের প্রতি ঠাকুরের সন্ন্যাসের উপদেশ উপদেশ,—ঈশ্বর বেদবিধির পার ১৭৬। ৩১৪। উপদেশ শুনিয়া নরেন্দ্রের নরেন্দ্রের প্রতি উপদেশ,সত্ত্বের তমঃ ১৭৬। চিন্তা ৩১৮। বৈরাগ্যের গান ৩১৯। আগমনী গান ১৭৮। প্রথম দর্শন, প্রেমের গান ৩২৫। ভক্তের লক্ষণ- দুইটি গান ; তাঁহার জন্ম ঠাকুরের যুক্ত ৩৩২। নরেন্দ্রের প্রতি উপদেশ— কামা ১৮৯। সংসার-চিন্তা ২৩৬। জ্ঞানযোগ ও ভক্তিয়োগের সমন্বয় ৩৩৩। পঞ্চবটীমূলে সাধন ৩৩৪। গোপালের মার সহিত কথা ২৪৯। বোধধর্ম্ম—ঈশ্বরের অস্তিত্বাবচার এখন সব মান্ছে ২৫৭। বল-

৩৩৬। কামিনী সন্ধ্যাক্রে তীর বিরক্তি, শিবরাত্রির উপবাস, মঠে বেলতলায় শিবপূজা ৩৪৩।

রাখাল—দেখিয়া ঠাকুরের যশো-
দার ভাব ৫। বলরামের বাড়ী ১৭।
নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজে ২২। অন্তরঙ্গ
পার্বদ ২৫। পেনেটীর মহোৎসবক্ষেত্রে
২৭, ৩১। Smile's self-help পাঠ ৩৫।
পঞ্চবটীঘরে ভাবাবিষ্ট ৭০, ৭৩। রাখালকে
দেখিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ ৭৫। নিন্দার
ভয় ৮৪, ৮৫। জ্ঞান অজ্ঞান বোধ হয়েছে
১০৭। এলোমেলো ১০৮। স্বভাব,—
আমার জল দিতে হয় ১১৩। বৈরাগ্য
'আমোদ ভাল লাগে না' ১১৪।
পুরুষসত্তা ১১৫। নবীন নিয়োগীর
বাড়ীর গানের কথা ১৩৪। মাষ্টার ও
ঠাকুরের সহিত কথা ১৪৩, ১৬৪। বৃন্দা-
বনে; তাঁর জন্ত ঠাকুরের চিন্তা ১৮২।
প্রথম ভাব দক্ষিণেশ্বরে, দ্বিতীয় ভাব
বলরামের বাড়ীতে ১৮৮। ক্যাম্প
খাট ২৭২, ২৮৩। ব্রহ্মচক্রে ভাবাবস্থা
২৮৩। পঞ্চবটীর 'সেই ছেলে' ৩৩০।
তীর বৈরাগ্য—পিতার সহিত কথা
৩৪২, মঠে শিবরাত্রি উপবাস, গান
ও নৃত্য ৩৪৪ ও বেলতলায় শিব-
পূজা ৩৪৪।

পূর্ণ—অনুরাগ, পুরুষসত্তা, দৈব-
স্বভাব ২৪৭। অংশ শুধু নয়, কলা
২৪৭। বিষ্ণুর অংশ ২৪৮। পূর্ণের
চৈতন্যচরিত পাঠ—ঠাকুরের ব্যাকু-

লতা ২৫৩। বলরামের বাড়ীতে
দেখিয়া ঠাকুরের আহ্লাদ ২৫২।
উঁচু সাকার ঘর ২৬৫। আগে ফল
তার পর ফুল ২৬৯। স্বভাবসিদ্ধ ২৭২।
ঠাকুরকে পত্রপ্রেরণ ও তাঁর বোমাঞ্চ
২৯০। আনন্দ কোয়াসা মধ্যে ৩০৪।

ছোট নরেন্দ্র—পুরুষসত্তা
২৪৭। পুরুষভাব ২৪৯। ঠাকুরের উপ-
দেশ—ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ ২৫৬।
Free Will ২৫৯। বলরামের বাড়ী
রথযাত্রায় ২৬১। বলরামের বাড়ী
ঠাকুরের স্নেহ ২৬৬। বড় ফুটো-
ওয়াল বাঁশ; ও এক ঠাকুরের চিন্তা
২৬৭। সরল ২৭৬। সমাধি ২৮২।
দক্ষিণেশ্বরে জন্মাষ্টমীর দিবসে ২৯৩।
জ্ঞানার্থি দ্বারা সংসার কাঁটা পোড়ান
৩০১। ধ্যানে মগ্ন, অতি শুদ্ধ ৩০৭।
ঠাকুরকে তাড়িত যন্ত্র দেখান ৩১৮।
শ্রামপুকুরে মিশ্রের কুপা দিনে ঠাকুরের
সহিত কথা ৩২২।

বলরাম—ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ
১৬। কলিকাতা যাইবার জন্ত দক্ষিণেশ্বরে
নৌকায় আরোহণ ১৩৮। সুন্দর
স্বভাব ১৮৮। বাড়ীতে রথযাত্রা
২৪৬। বলরামের হিসাব ২৬০।
ঠাকুরের সঙ্গে পূর্ণাদির কথা ২৬৯,
২৭২। চৈতন্যদেবের সঙ্কীর্ণনের
দলে বলরামকে দেখা ২৭৯। ঠাকুরের
সহিত পণ্ডিত শ্রামাপদের কথা
২৮৫। ৩২০। ৩৩০।

বাবুলাল—ভক্তরাই আত্মীয়
৭০। প্রকৃতি ভাব গাড়ীতে আসিতে
আসিতে দেখে ভাব ৮২। দেবীমূর্তি
১১৩। বৈরাগ্য ১৪৩। দরদি, ১৫২,
পান সাজা ১৫৭; ১৯৮, ২২৫,
নীলকণ্ঠের যাত্রা ২৪০, ২৪১, কাশীপুরে
সংকীৰ্ত্তন ৩৩৮।

গিরীশ—২৭১ ঠাকুরের কুণ্ডীদর্শন,
ঠাকুরের সাধন কেন? ২৯৪ জন্মাষ্টমী-
দিবসে দর্শন ও স্তব (পূর্ণব্রহ্ম), বর
প্রার্থনা; ২৯৫ গিরীশ কি পবিত্র;
২৯৬ বিল্লীর ছার স্বভাব; ৩০৫, ৩১১।

ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার—৩০০,
৩০১ অবতারে অবিশ্বাস ৩০৮; ৩১০
অহঙ্কার। ৩১৩ Comparative
Religion; ঠাকুরের সর্বধর্মসমন্বয়
ভাবাবস্থায় ঠাকুরের কৃপা ও ডাক্তারের
কোলে শ্রীচরণ ৩২৪, খুব শুদ্ধ ৩২৪।

সুরেন্দ্র—৫৬, ৫৭ দেবী পুত্র।
১০৪, ১০৫, 'মা কত বাঁধাই বেঁধেছ',
১০৮, ১৫৮, ১৬৪, ৩১৪, ৩১৮; রসদার
৩৩১, প্রতি মালা প্রসাদ ও তাঁহার
সেবা ৩৩৮, ভাবাবেশ ও গান ৩৩৯।

ভবনাথ—১৭, ২৭, ১০৪, ১০৬,
১১১, ১১৫, ২৪৭। প্রকৃতি ভাব, ১৪০।
সংস্কার ১৪৯; ১৫১, ১৫৮, ১৭৩,
১৭৫। ঘটতেও যেমন, তাড়তেও
তেমনি ১৭৬, ১৮৯। অরূপের ঘর,
৩১৯, ৩৩৯।

বেনয়নের তারক—

২৪৯, সমাধি অবস্থায় বুকে পা। ২৬৬
'মৃগেল'।

নিরঞ্জন—১১৪ বিয়ে করবে না,
১৫৮, ১৬০, ১৬৩, ১৬৬, ২০৯, ২৩৬।
কিছুতেই লিপ্ত নয় ২৬৬। ১৪৩, সরল;
লেনা দেনা নেই ২৬৯। তুই আমার
বাপ ৩২৬। মঠে।

মোগীন—৩৬।

শাল্লৎ—৩১১, ঋষিধৃষ্টের দলের
লোক ৩৩০।

শশী—৩১১, ৩২৭, ৩৩১, ৩৩৬;
মঠে।

কালী—৩৩৪; মঠে ৩৪৪।

সুবোধ—২৯১ প্রথম দর্শন।

লাটু—৩৬, ১০১ চড়েই রয়েছে
১১৩, ১৩৮, ১৪০, ১৪৪, ১৬৭, ১৭৮,
২৩০, ভক্ত ধ্যান ৩৩০, ৩৩৮।

তারক—২৪, ১৫৭, ৩১৫, মঠে ৩৪২
সিঁতির গোপাল—১০৮, ৩৩১
কেশব সেন—১৬, ১৮, ৪৫.
৯১, ১১২, ১২৪, ১২৩, ২১২,
২৩৭, ২৮০। ৩১৭, আগে সংসারের
বন্দোবস্ত ইচ্ছা।

লাল—১৪, ২৪, ২৫, ২৬, ৯০,
৯৩, ১৩১, ১৫৮, ৩৪১।

কেদার—৯, ২৩, ২৫, ৬২,
৯৩, ১০৬, ২৬৮, ৩৩১।

মহিমাচরণ—৭৪, ৮২,
৯৬, ১০০, ১৫৯, ২৭৬, ৩১২, ৩১৪, ৩৩৪।

কাদেশ্বর—১০২, ১০৬, ১১৫

১১৬, ১২৪, প্রথম দর্শন, ১৮৪।

চুনি—১৫১, ২৮০, ৩২৭, ৩৩০।

অন্মোহন—৪৮, ১০২, ১২৫, ১৫৮, ১৬৪, ২৪৪ ভাবাবিষ্ট, ৩০৭, কাশীপুরে প্রসাদ নিখালা লাভ ৩৩৬।

দেবেন্দ্র—৩১৫।

হীরানন্দ—২২০, ৩৩৯।

বিজয়গোস্বামী—২৪, ১০৪, ১০৭, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ৩৩০, দর্শন।

নিত্যগোপাল—১৫, ২৪, ১৫০, ২৪৯, প্রকৃতিভাব ২৮০, ৩১৫।

হামলাল—৩৩, ভক্তমাল পাঠ ৩৫, ৭৩, ২১১, ২৩১, ২৮৭, ৩৪১।

মাষ্টার—৩২ নিরাকার ধ্যান, ৩৫ নিষ্কাম কৰ্ম কর, অষ্টসিদ্ধি ভাল নয় ১১৫, বাজীকরই সত্য ১১৬, টাকার সদ্যবহার ১৫৬, 'গ্যাই শালা নাচ' ১৫৯, ক্রমে সব মানতে হবে ১৬৭, ১৮৩, যোগমায়া আকর্ষণ ১৮৫, 'একবার বল দেখি কি বললাম' ১৯৯, পূর্ণকে উপদেশ ২৫৩, ব্রহ্মাণ্ড শালগ্রাম ও তোমার চক্ষু ২৫৭, 'আমি কে' ২৭১, ২৮২; সুবোধ ২৯১, জন্মাষ্টমী ২৯৫, যদৃচ্ছালাভ ও নরেন্দ্র ৩১৭, ১১৮, ৩২১। মেয়েদের লজ্জাই কৃষ্ণ ৩৩৫।

অনি—যোষিৎসঙ্গনিষ্ঠা ৩৩, বেদান্ত

সম্বন্ধে গুহ্য কথা ৪০, সীতার প্রেম ৪৩, ধারণা কর ৪৪, ত্রিগুণাতীত ভক্তি ৪৪, নিরাকার সাধনা কঠিন ৪৬, এক সত্তা ৫৩, বৃন্দাবন-লীলা ৫৬, শিবসংহিতা ৫৮, একাদশী ৬০, বিচার আর কোরো না ৬৬, ভক্তিতেই সব ৬৬, ধ্যান শিক্ষা ৬৭, তোমার কাষ ভাল ১১৪, বৈরাগ্যের অর্থ ১৪২, সঞ্চয় ও যদৃচ্ছা লাভ ১৪১, সরলতা ২৩৬, ঈশ্বরের আকর্ষণ ২৩৭, ঠাকুরকে বাতাস করা ২৫২, ঠাকুর ও যীশু খৃষ্ট ২৮৭, জগন্নাথের আটকে প্রদান ২৮৯, গুহ্য কথা ৩০৩, ঠাকুর মুক্তকণ্ঠ ৩২৯।

শিবরাম—১২১, ১২২।

ক্ষীরোদ—২৯১ প্রথম দর্শন।

হরমোহন—১২৫।

কিশোরী—১৫৭, ১৬৭ গজা, ১৭৭, 'ভাল আছি' ; ১৮৩, ২১৫, ২৮৩, ৩৩৫।

অধর—১০১, ১১৬, ১১৭ ১৪৪, ১৫২, ১৬১ নিবৃত্তিই ভাল, ১৬৪, ১৮১, ১৮৩।

হরিনাবু (তুরীয়ানন্দ)—২৩৩, ২৫৪, ২৬৭।

গঙ্গাধর—১১৬ (কালনাথ), ২৯১, ৩৩৩।

সিঁতির মহেন্দ্র—২১১, ২১৩, একটু শোনো ২২৩।

নিতাই ডাক্তার—২৯১।

ত শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবিধ তত্ত্ব । সান্নোপাঙ্গাদি ভক্তগণ ।

ছোট গোপাল—১৬৯ ।

নারায়ণ—স্বভাব ১৫৬; ১৫৭, ১৮৩

২২৪, ২৩৫ শুণ, ২৩৬ (ত্যাগের উপদেশ),

২৪১, ২৫১ ।

তেজচন্দ্র—২৫০ (সংসার ত্যাগের
প্রস্তাব)

হরিপদ—১৪৩, ১৮৯, ২৬৬, ২৭১ ।

শারদা—২৫৭ (বিবাহের প্রস্তাব)
৩৪৩ (মঠ)

কালীপদ—৩১৫, ৩০৭ চৈতন্য হও ।

দ্বিজ—২৪৬, ২৪৯, ২৭৩ ।

হরি (মুখ্যোদেব) ২২২, ২৩৯ ।

পল্টু—৩১১ ।

হাজরা—৮ছোট দরুগা ; ৫১,
৫৫ শুচিবাই, ১৪০, ১৪৯, ১৬৯, ১৭৭
২০১, ২২৪, ২২৯, ২৪০, ২৬৯ ।

আশু (কামারহাটির) ৫ ।

ভূপতি—৩১১, ৩১৬ ।

নবগোপাল—২৬৭, ২৯৬, ৩১৫.

গিরীন্দ্র—১০৭ ।

নগেন্দ্র—১০৭ ।

অতুল—২৫১, ৩১৮ ।

প্রাণকৃষ্ণ—১, ২, ৩, ৫, ৭ ।

হরীশ—৩৬, ৭০, প্রকৃতিভাব ১১৫,
১৩২, ১৫৭, ১৮৩, ৩৩৫ ।

নবাই চৈতন্য—১৪০, ১৫৮ ।

মহেন্দ্র মুখ্যো—১৫০, ১৭৭, ১৮৩,
১৮৬, ১৯১, ২১৩, ২৩৯, ২৬০,
২৬৬ ।

ঠাকুরদাদা—৯৫ ।

প্রিয়মুখ্যো—১৫০, অধরের বাড়ী

১৮৩, ১৯৫ পায়ের বন্ধন, ১৯৭, ২১৩,

২২২ ('যেন সিদ্ধ হয়')

বিনোদ—২৪৯

তুলসী—২৭২

তুলসীরাম—২৬৬

রামদয়াল—১৮, ১৬৭ ।

কালী (বড়)—১৭৫, ২২৮ ।

অমৃত সরকার—৩০৮ ।

মিশ্র সাহেব—৩ ২, ৩২৩ ।

পণ্ডিত শ্রামাপদ—২৮৫ (প্রতি
রূপা), ২৯৩ (শালিসী করে) ।

নীলকণ্ঠ—২৩৬ (যাত্রাশ্রবণ)

ঈশান মুখ্যো—৩০২

মণিলাল মল্লিক—৪৫, ৮৮, ২০৭

যতুমল্লিক—১০১, ১৭৮, ১৮২ ।

হৃদয়—২০০

দর্শকভক্তগণ ।

সাঁধু—হৃষীকেশ সাধু ও পাঁচ
প্রকার সমাধিদর্শন ২৭৭ ।

পঞ্চবটীর পাঞ্জাবী সাধু (জানীর
ভাব) ২৯৩ ।

পঞ্চবটীর দুটি সাধু ২৩১ ।

বেদান্তবাদী সাধু ৬ ।

পণ্ডিত শশধর—('বাসর সজ্জা')

২৭, ১১৮, বলরামের বাটি ১২৬, ১৩০;
১৪৯, ১৬৯, ৩০৯ (সাইনবোর্ড) ।

ডাক্তার রাজেন্দ্র—৩৩৭ ।

ডাক্তার প্রতাপ—১০১, ১২৬, ১২৯, ১৩১

ডাক্তার দোকড়ী—৩০৮
 ডাক্তার মধুসূদন—৪৩, ৭৮, ৯১, ২৩৭
 চক্রে ধারা, ২৮৫
 ডাক্তার জগবান্ ক্রজ—২৯৯
 ডাক্তার রাখাল—২৯৭, ২৯৮
 কুকসাহেব (Mr Cook) ২৮২
 রাজেন্দ্রমিত্র—৮৯, ৯৯
 জাঙবাহাদুরের ভাইপো—১৮৫
 নটবর গোস্বামী—১৯০
 নবদ্বীপ গোস্বামী ২৭, ২৯
 রাধিকা গোস্বামী—১৯১
 দেবেন্দ্র ঠাকুর—১৬৩
 রবীন্দ্র ঠাকুর—১৯
 মণিসেন—২৯, ১০১
 মণিসেনের সঙ্গী ডাক্তার—১০১
 শিবনাথ—১৭৭, ২৩৮
 প্রতাপ মজুমদার—২৮২
 নন্দলাল—২২৫
 কোয়ারসিং—৮৯, ১৯২
 অন্নদা গুহ—১৭৭
 মহেশ ঞায়রত্নের ছাত্র ২৪০
 বঙ্কিম—৩১৬
 বিড়ালচক্ষু—২৪০
 সরী পাথর—১৫৪
 ভগীতেলী—২১১
 নেপালের মেয়ে—১৮৫
 মাড়োয়ারী ভক্ত—১০, ২১৫
 কাটোয়ার বৈষ্ণব (ট্যারা)—২৯৩
 হরিবল্লভ বসু ১৬৭ (ঠাকুরের
 সহিত কথা) ৩২০

ভূপেন—২৭৬ ; মোহিত—২৫০
 দ্বিজর পিতা—২৭৩
 রাম চাটুয্যে—৪৪, ১৫২, ১৬৭
 ভোলানাথ—১৮৩, ১৮৯, ৩৩১
 জানকী ঘোষাল—২০
 ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায়—১৯, ৩১০
 জ্ঞানবাবু—১৬৮
 চৌধুরী—১৩, ১২৫
 বৈষ্ণবচরণ (কীর্তনীয়া)—৩৫,
 ১২৯, ১৪৫, ২৬১, ২৬৩
 শ্রামদাস (কীর্তনীয়া)—১৫৮
 সহচরী (কীর্তনী) ১০৮, ১০৯
 সামাধ্যায়ী—৩১০
 কোমলগরের সাধক—১৭১, ১৭৫
 বেনোয়ারী (কীর্তনীয়া)—২৬০
 রামপ্রসন্ন—৯৪, ১০০
 রামতারণ—৩০৬
 চিত্রকর (অন্নদা) বাগ্‌চি—৩১৮
 নবীন নিয়োগী—৫৮ (যোগী ও
 ভোগী, দুর্গাপূজায় চামর ব্যঞ্জন)
 ১৩৪, ২৩৬ ।
 মাইকেল মধুসূদন—১২৫
 রাজনারায়ণ—চণ্ডী ১৮৭
 শম্ভু—চণ্ডী ১৮৭
 কুঞ্জবাবু—১৬ ; ব্রাহ্মভক্ত—১৮
 দীননাথ ঞাজাঞ্জি—২৪১
 পাড়ে খোড়া—২৩৪
 ঈশ্বর বিজ্ঞানাগর—১
 বলরামের পিতা—১১৯
 শিবপুর ভক্তগণ—১৩২, ১৩৪, ১৩৭

ভবানীপুর ভক্তগণ—১৩২

বৈরাগী গায়ক—৮

প্রাণকৃষ্ণের জাতি (মুখুষ্য) ৩৬

নধকুমার—৮

নীলকণ্ঠের দেশের বৈষ্ণব—৪৮

কোমলগরের ভক্তগণ—১৭০

কোমলগরের গায়ক—১৭২

কর্তাভজা চন্দ্রবাবু—১২৬, ২৫১

রসিক ব্রাহ্মণ (কৃষ্ণধন)—২৫২

যতুমল্লিকের দ্বারবান্—১৮১

শিবপুরের একটি ব্রাহ্মভক্ত—২০৭

কেশব সেনের মাতা ও ভগিনী—

১১৭, ২১২, ২২৫, ২২৯

ধাত্রী ভুবনমোহিনী—১১৭, ১৩১

বিশ্বম্ভরের বালিকা কন্যা—১২১

বিজয়ের শাশুড়ী—২৩৮

রতির মা—১২০

যতুমল্লিকের মা—৮৬

শ্রীরামকৃষ্ণের উল্লিখিত পৌরাণিক ভক্তগণ ।

হনুমান—৪, ৮৮, ১৩৩, ২৪৫ ;

প্রহ্লাদ—১৪, ১৫, ৩৩, ৮০, ২৩০

ঋব—৬৮, ২৩০

বশিষ্ঠ—৩৭, ১৬৮

শুকদেব—৩৫, ৯৮, ১১৭

বিভীষণ—৯৩, ১১৩

কপিল—৩২০

রুহিদাস—২২৯

শবরী—২২৯

যুধিষ্ঠির—২০৫, ২৩২

ভীম—২৩২ ; হর্ষোদন—২০৫

কেকয়ী—৯৪

দ্রৌপদী—১৯৯, ২০১

রুক্মিণী—৭৯,

অজুর্ন—১৩, ৩০, ৮৭, ৩৩৫

ভীষ্ম—১৩

ভরদ্বাজ—১২

জড়ভরত—২১৪

অভিমন্যু—৩৩৫

নারদ—৩২০

শ্রীরামকৃষ্ণের উল্লিখিত দেব- দেবী ও অবতারাди ।

অন্নপূর্ণা—২৫৭

সরস্বতী—৮৯

কালী—৭১, ১০০

চণ্ডী—১৮৮, ২৪৬

ভগবতী—১১৯, ২৪৭

শিব—৩৬, ২৫৬, ২৬৮

বহুবাহারী—৫৭

রামলালা—৪৫, ২৬৫

রঘুবীর—৫৩, ৬৮, ৯৪

জগন্নাথ—১২৯, ২৬৫

বলরাম—২২৩

বুদ্ধদেব—৩৩৬

শ্রীরাধা—২০, ৭০, ১৪২, ২৪২

শ্রীরামচন্দ্র—৩৬, ৫৬, ৯৩, ১১৩

সীতা—৩৬, ৫৬, ১১৩।

শ্রীকৃষ্ণ—১৩, ৩০, ৭০, ৮৬, ১১৯

যশোদা—৫৬, ৭০, ৮৬, ২৪২

কঙ্কি—১১৭

৩৩২, ৩৩৩।

যিশু (Jesus) ২৮৭, ৩০৪

চৈতন্যদেব—৩, ৫৩, ৬২, ১০৩,

শঙ্করাচার্য—৬৯, ১১৭, ২১৪ ১১১, ১১২, ১৬৪, ১৯২, ২২৩, ২৩৭,

ঠাকুর ও বিবিধ তত্ত্ব। সাধনা ও সিদ্ধি।

‘মা’ ২৬৯

চিদাত্মা ও চিৎশক্তি ৭০

সমস্রস্র মোগ।

The Religion of Love, or ইচ্ছা। ২৩৮ (মণি সন্দেশে) সর্বধর্ম সত্য। ৩১৩, নানা ধর্ম পরীক্ষা (Comparative Religion ও ডাক্তার সরকার)।

জ্ঞানমোগ বা বেদান্ত।

(Vedanta)—ও গৃহস্থ ৩, ১৮, ৪১, ৭৯, ৮৩, ‘নাহং নাহং’ ৮৮ ‘তু সচ্চিদানন্দ’। বাজীকর ১৬৬, ২১৯ (শুদ্ধ আত্মা আমাদের স্বরূপ) ২১৪; ২২২, ২৬৮।

ব্রহ্মজ্ঞান—৬, ৫০, ৬২, ৬৫, ৮০, ১১৭, ১৩৪, ১৩৬ (অধিকারী); ৩৭ ব্রহ্মজ্ঞানের পর রামচন্দ্রের সংসার; ২৫৪ (মরণ ও হনন); ২৫৫ মনের আশ। শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মপূজা ৩১৬। ‘ব্রহ্মজ্ঞান চাই না মা’ ৬৪। The Harmony and Acceptance of all Religions ১৪, ১২০ (বৈষ্ণব ও শাক্তের সাম্প্রদায়িকতা) ১৪১, ১৫৫, ১৯৬, নানা ধর্ম তাঁরই।

ব্রহ্মজ্ঞানীর চরিত্র—৯৬, ব্রহ্ম-

জ্ঞানের পর দয়া—১১৭, ব্রহ্মের স্বরূপ ৫২, ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, কাল ও কালী ৫, ৭১, ১০০, ২১৯; জ্ঞান ও বিজ্ঞান (বশিষ্ঠের পুত্রশোক) ১৬৮, ২৪৩, ২৫৫; শুধু জ্ঞানবিচার শুধু ১৬৯, তত্ত্বজ্ঞান ২২৯; মুক্তি ২২৯; বেদান্তদর্শন ২৩২; জ্ঞানপথ বা বিচারপথ ৬৫; নিরাকার ধ্যান ৩২; নিরাকার সাধনা ৪৬; পূর্ণ জ্ঞানের অবস্থা ৩৫, বিজ্ঞান ৩৩৩, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ৩৮, ৪০, ৪৯, ২৫৫। বিজ্ঞান ১৬৯।

ভক্তিমোগ।

রাগভক্তি ১৪, প্রেমভক্তি ৫৬, ৬৬, ৭৯, ১১৬; এখানকার ভক্ত দুই থাক ১১৫; ভক্তির সত্ত্ব, রজঃ তমঃ ১২, ৭ জলন্ত বিশ্বাস ১২৭, ভক্তিই সার ১৩০, শুদ্ধা ভক্তি ১৩৭, ২২৪, ২৩০, মলিন ও অহৈতুকী ৮০, ২৩০, কুমারী-পূজা ২৩১, ঈশ্বরের আকর্ষণ ২৩৭, ২৪৯; প্রার্থনা (Prayer) প্রয়োজন ২৪৩, শ্রীরামকৃষ্ণ ধ্যান ২৪৯, জগন্নাথের মহাপ্রসাদ ২৮৪, ঈশ্বরপ্রসাদ ভক্ষণ ও শ্রীরামকৃষ্ণ ২৮৯, ভক্তিযোগের গূঢ় রহস্য ২৬৭, ত্রিগুণাতীত ভক্তি ৪৪, প্রকৃতিভাব বা সখী ভাব ৫, ২৪৮,

৩১৬ ; গোপীভাব ও বজ্রহরণ ১৮৬, দাসভাব ১৫, বৈরাগ্য (তীব্র, মন্দা, মর্কট) ২৭, কলিতে নারদীয় ভক্তি ২১৮, ভক্তির অবতার কেন ?—৪, ভক্তিযোগে সব পাওয়া যায় ২৯, কথাটা এই সচ্চিদানন্দে প্রেম ৪৩, ভক্ত কে ? —২৩১

আত্মোক্তারী (বকলমা) ।

৩৯, ৭৭ ।

ব্যাকুলতা ১১, সীতার ত্রায় ৩৬, ৭৬, ২১৮ ।

নামগুণ-গান ও হাজরা ১৬৬ 'অনন্তশ্চিন্তনমুখঃ' ১৬৫ ।

ষড়্ছালাভ ১৪২, ৩১৭ ।

জ্ঞানযোগ ও ভক্তি-

যোগের সমন্বয় ।

জ্ঞানের পর ভক্তি নিয়ে থাকা ১৬৯, কাশীমাহাত্ম্য (শিব দর্শন ও সাকার নিরাকার সাক্ষাৎ) ২১৮, গঙ্গা-মাহাত্ম্য ও মুক্তি ২১৭, অজ্ঞানীর পক্ষে গঙ্গাতীরে মৃত্যু ২১৭ । পূর্ণ জ্ঞান ও প্রেমের লক্ষণ ৩৫, ৪৪, বিচার ও ভক্তির আমি ৭, ৮০, ৩১০ । যে সমন্বয় করেছে, সেই লোক ১২০ ।

অবতার (নরলীলা) ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কে ? ২৮, ৫২, ২৪৫, ২৭৮ ৩২৯ ; কৃষ্ণলীলার ব্যাখ্যা ১৮৫, নর-লীলা ৭৩, ৮৮, ৯৩ ; পার্শ্বদ অন্তরঙ্গ ২৫, ৭০, ১৫৭, ৩২৯ । অবতার একটা রূপ ১১, সাকার রূপ কি ১১ ; 'আর

একবার আসতে হবে' ৫৩, ২৫০ ।

কর্ম-যোগ ।

নিষ্কাম কর্ম ৩৫, ১৩০, ২০২, কর্ম-যোগ কঠিন তাই ভক্তিযোগ ২১৮

চার আশ্রম ২০৮

কর্ম কত দিন ২১৪, ২১৮, (কঠিন) ২১৮,

ধ্যানযোগ—নিরাকার ধ্যান ৩১

মনোযোগ ও পরমহংস অবস্থা

৭৬, ৮২, ২০৮ ।

অভ্যাসযোগ ১০, ১২৫,

হঠযোগ ২০৯, আয়ু বাড়াবার জন্ত ২৮২ ।

যোগতত্ত্ব ৩৮, ৫৮, ৮১, ১৩২,

২০৮ ; যোগ ও ভোগ ৩১, ৫৮, যোগ-

ভ্রষ্ট ৩৭, ৮৬, ষড়্চক্র (Six Wheels)

৫৮, ১৩২, ১৫৩, সপ্তভূমি ১৩৩,

সমাপ্তিতত্ত্ব—সমাধির উপায়

৩৮, স্থিত ও উন্নয়ন ৪৭, ২৬৮, ২৭৭ ;

সমাধি ও জগন্মাতার সহিত কথা ৬৬,

৭১, ৮৩, ১৩৫, ১৯৮ সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ

সহিত কথা ১০৯ ।

সন্ন্যাসযোগ ।

সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম ১৫, ৮০ ৯৮,

১০৯, ১৬৩, ১৮৯, মায়ী—২১৫, ২৭৯

২৮৫ সন্ন্যাস ও গোস্থানী, সন্ন্যাস ও

কেশব সেন ২১৩, সিঁথির মাহেন্দ্রের

পাঁচ টাকা ফেরৎ, ২৮১ । লক্ষ্মীনারায়ণের

টাকা ২১৭, কামিনীকাকন মেঘ ২১৬,

সর্বভোগ ২২২, ৩০৮ ; অনন্তচিন্তা

--১৬৫, ২৩৩, ২৪৯; উচ্চবরেরও
ভয়—সাধু সাবধান ৩০৮।

গুহ্যকথা—বেদান্তের ৪১,
৫২, ১১৬; শক্তির এলাকা ২৫৫,
নররূপের সঙ্গে বিলাস ২৬৫,
(অবতার-তত্ত্ব) ২৮৯।

সাধকদিগকে উপদেশ।

এগিয়ে পড় ২৫, ১৯৫, ২৫২,
২৯৭ (কেশব সেনের প্রতি)।
স্মরণ মনন ৫৮, ২২৬
পূজা, জপ ও ধ্যান ২২৪
জপাৎ সিদ্ধি,—২২৪, ৩১৫
বিশ্বাস ৭১, ৯৪, ১২৭
সাধুসঙ্গ ৩৯, ১৭১, ২১১
সাধু ত্রিবিধ—সত্ত্বগুণী, রজোগুণী, তমো-
গুণী ১৭৫
নাম-মাহাত্ম্য ৭৮, ১৭৬
হরিনাম-মাহাত্ম্য—১৭৬
পরনিন্দা হেয় ২০১, ২৩০
নিভূতে ঈশ্বরচিন্তা ২৪১
দয়া, দান ৬৯
বিবেক—ঈশ্বরই বস্তু, সব অবস্তু ৮৭
উর্দ্ধরেতা, ধৈর্য্যরেতা ৯৮
সন্তোষ ১৬২
লজ্জা ও স্ত্রীলোক ৩৩৫
কোমার বৈরাগ্য—১১৩, ১৯০, ২৮৮
সত্য কথা কলির তপস্যা ৫, ৮৪, ২৯৮
সরলতা (ও ঈশ্বরের কৃপা) ৫, ৮৪,
১৯৪, ২১২, ২৩৬।

পবিত্র কে ? যার বিশ্বাস ভক্তি ২৯৫
মাহত নারায়ণ (Conscience or
the Voice of God) ২৯৮

শুদ্ধ কে ?—৭৮

কাম জয়ের উপায় ৫,

উপায় কি ? ২০

জীবনের উদ্দেশ্য (স্থির করা) ৪৩

পিতামাতার সেবা ১৮৪

ঈশ্বরকে তুষ্ট কর (আগে) ২০১

মানুষজন্ম কেন ? ২৯৩, ২৯৭

সিদ্ধিলাভ বা ঈশ্বর দর্শনের

উপায়—১ম শাস্ত্রপাঠ; তৎপরে

গুরুমুখে শ্রবণ; তৎপরে সাধন

২০২; শেষে প্রত্যক্ষ—২০২

জাতি-বিচার (Caste) ৫০

ব্রাহ্মণ (পূজনীয়) ১৯১

সিদ্ধাই ১১৫, ২৮৮, ৩০৪, ৩০৬

সংস্কার ১৩৬, দ্রোপদীর লজ্জানিবা-

রণ ১৯৯, ২১৯; ও দক্ষিণেশ্বরের

ছোকরা; গোবিন্দ, গোপাল, নিরঞ্জন,

হীরানন্দ ২১৯, ২৭৬।

দেহের লক্ষণ ২৩৯

দর্শন (Hindu Philosophy) ৩১৪

সম্বংশের মহত্ব ১৯২

না জভক্তি (Loyalty) ও ঠাকুর

শ্রীরামকৃষ্ণ ১৯২

আচার্য্য (ত্যাগী) ১১, ও লোকশিক্ষার

অধিকার, ২১০

লোকশিক্ষা ও ডাক্তার সরকার ৩১০

জীবাত্মা ২১৫

ফ

ঠাকুর ও বিবিধতত্ত্ব ।

বজ্জাং আমি—৩১০

মালাজপ ২২৪

কুমারী পূজা—৮৩, ২৩১

মৃত্যুসময় ২৫০

সামান্য রসিকতা ২৫২

পরজন্ম Life after Death ২৯৩

গুরু রূপে শ্রীভগবান্ ৫৪,

কর্ণধার ৬৭, সচ্চিদানন্দই গুরু ১৪ ;

ও কর্তাভজা ১৫৭ ; গুরু দয়াময়

(পাখীর তায় শাবকদের রক্ষা) ১৬৬ ;

মন্ত্র গ্রহণ ২২২, ঈশ্বরই গুরু ২৯৭ ।

Philosophy of Prayer—১৯৮

Origin of language—১৯৮

সংসার ।

জ্ঞান লাভের পর ৩৭, ত্যাগ

৬২, ১০২, কেন সংসার ? ৭৭, ৮১,

১০৫, ১৪২, ২৭৪ ।

বিষয় আশয় ঠিক করে ঈশ্বরকে ডাকা

ও তীব্র বৈরাগ্য ৩১৭

সংসারী ও শাস্ত্রার্থ ১৮, ১৭২, ২৭৮ ।

কামিনী ও কাঞ্চন ১৭, ৪৩, ত্যাগ

৬৩, ৬৮, ১০৬ (আবরণ) ১১৪, ১২৫,

২১৬ (মায়া) ; ২৬৮, ২৯৩,

কামিনী ১০৭, ২৩৬, ২৪৯ (একসঙ্গে

শয়নও খারাপ) ; ছেলেপিলের পর

ভাই ভগ্নীর মত থাকা ৩০৯ ।

ভক্ত ও কামিনী ১৫, ২৩৪ ।

বিবাহ (নেপালী মহিলা) ১৮৫ ।

মুমুক্শু সময়সাপেক্ষ ৭৮, ১৩৮, ১৮৬,

২৬৩ বেদমতে মুক্তি—২১৮ প্রথম

মানুষজন্মে ভোগের প্রয়োজন ১৩৮,

ভোগান্তে ত্যাগ ও ঈশ্বরলাভ । টাকা

১৫৬ খোসামুদের টাকা ৩১৮, ও

কষ্টের ;—ছোবার জো নাই ২১৭

চাকরী ও বিষয়ীর উপাসনা ১৬০

চাকরী ১৬১, ১৬২, ৩১৮

প্রবৃত্তি না নিবৃত্তি (অধরের প্রতি) ১৬৫

ভক্ত ও ষড়্চ্ছালাভ—১৪২

পাপের দায়িত্ব (Responsibility)

১২, স্বাধীন ইচ্ছা (Free Will)

২১, ৬৯, ২৫৯ ।

কলিকাতার লোক—১০,

ইংলিশম্যান ৬৯, ৮৫ ২৫৭ ৩২০

কলিকাতার ডাক্তার—৭৯

শাস্ত্র ।

শাস্ত্র ও পাণ্ডিত্য ১১, ৩০, ৯২

বিচারবুদ্ধি ৬৪, ১৭৪, ১৯৭, ২৫৫,

তর্ক বিচার (ঠাকুরের সঙ্গে) ১৬৬

সাধন বিনা শাস্ত্র দুর্বোধ্য ১৭১

ঈশ্বর শাস্ত্রের পার ১৭৪

শাস্ত্র পাঠ শ্রবণ ৮৩

শাস্ত্রপাঠ ও সাধন ৩৯, ১২৩. ২০৪

শাস্ত্র জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ দর্শন ২০৪

ধর্মসম্প্রদায় ।

বৈষ্ণব ১১৯, ১৫৩ ১৯৩,

শাক্ত ১১৯ ১৯৩ কোল ১৫৩

বৌদ্ধ ধর্ম ৩৩৬

মুসলমান ধর্ম ২২৪, ২৪০

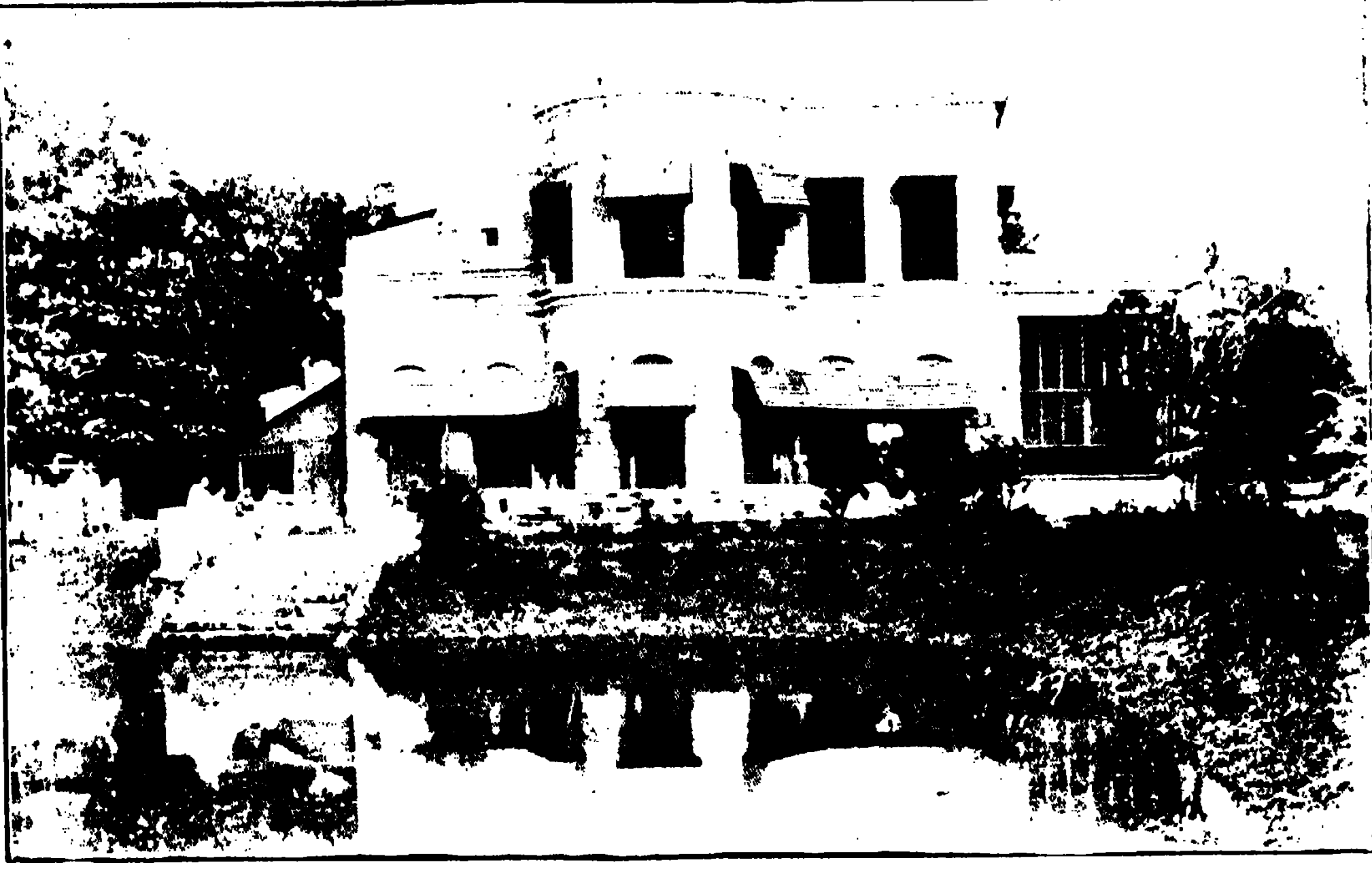
ব্রাহ্ম সমাজ ২১০

কর্তাভজা ও ঘোষপাড়ার মত ৯৩

১৪০, (সহজ), ১৫৩, ১৫৪,

আউল, বাউল, সাঁই ১৫৩

কাশীপুর বাগান ।



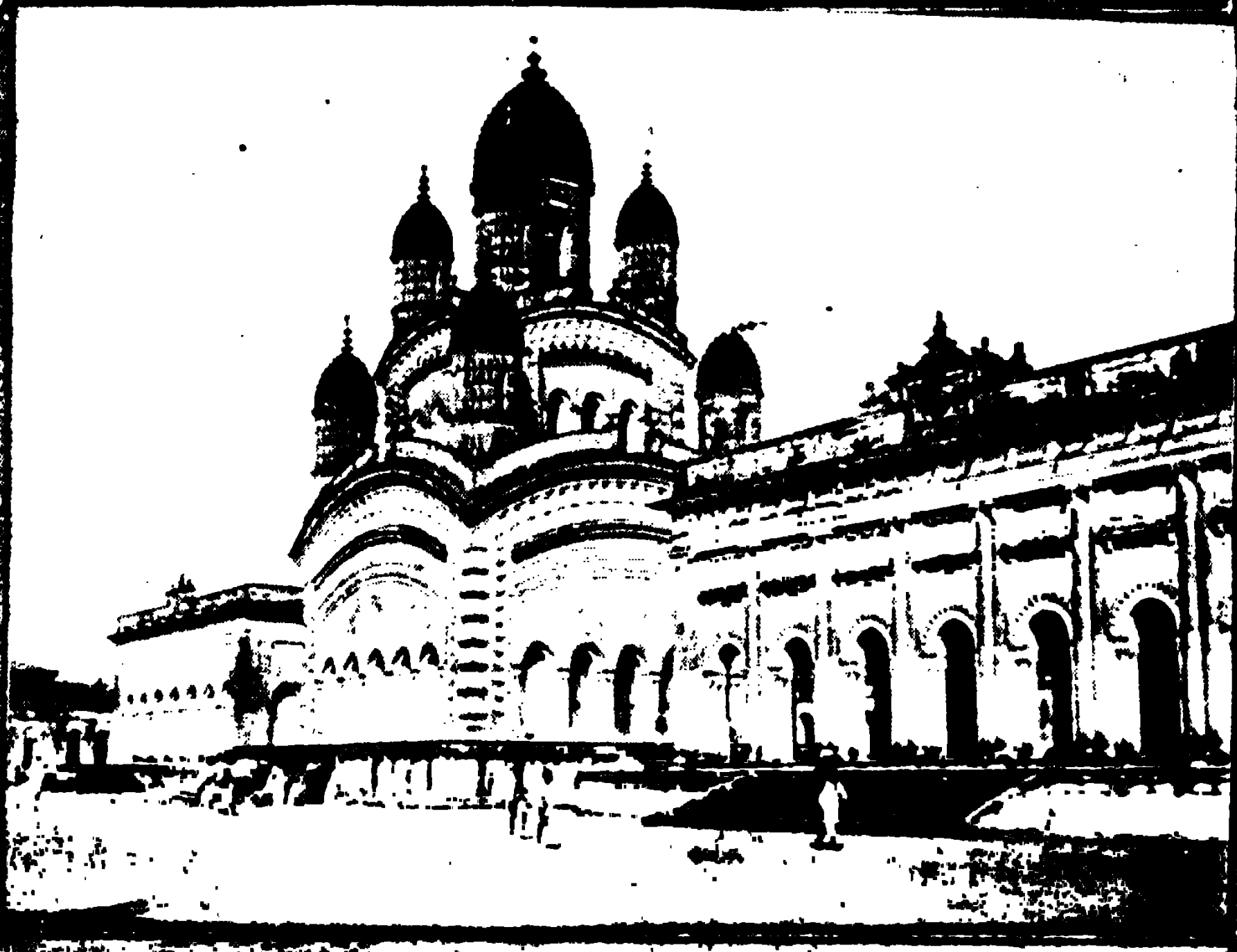
১. উপরের অর্ধ গোলাকার হলঘরে ঠাকুর থাকিতেন। ২. নীচের তলার ঠিক মাঝখানের পথটি প্রবেশ দ্বার। এই দ্বার দিয়া নীচের হলঘরে যাওয়া যায়—ভক্তেরা বসিতেন। ৩. নীচের হলঘরের উত্তর পূর্ব কোণে শ্রীশ্রীমার ঘর, দক্ষিণ পশ্চিম কোণে সেবক ভক্তদিগের থাকিবার ঘর। ৪. উদ্যানবাটিকার পূর্বে ও পশ্চিমে বাঁধাঘাট বিশিষ্ট দুইটি পুষ্করিণী। বাটিকার উত্তরে পথ—তাহার উত্তরে রান্নাঘর। ৫. বাটিকার পশ্চিমদিক দিয়া উত্তর দক্ষিণে পথ;—এই পথেরই দক্ষিণ প্রান্তে ১৮৮৬, ১লা জানুয়ারী দিবসে সমাপিত হইয়া ঠাকুর অনেক ভক্তদের কৃপা করেন।

বলরামের বাটা ।

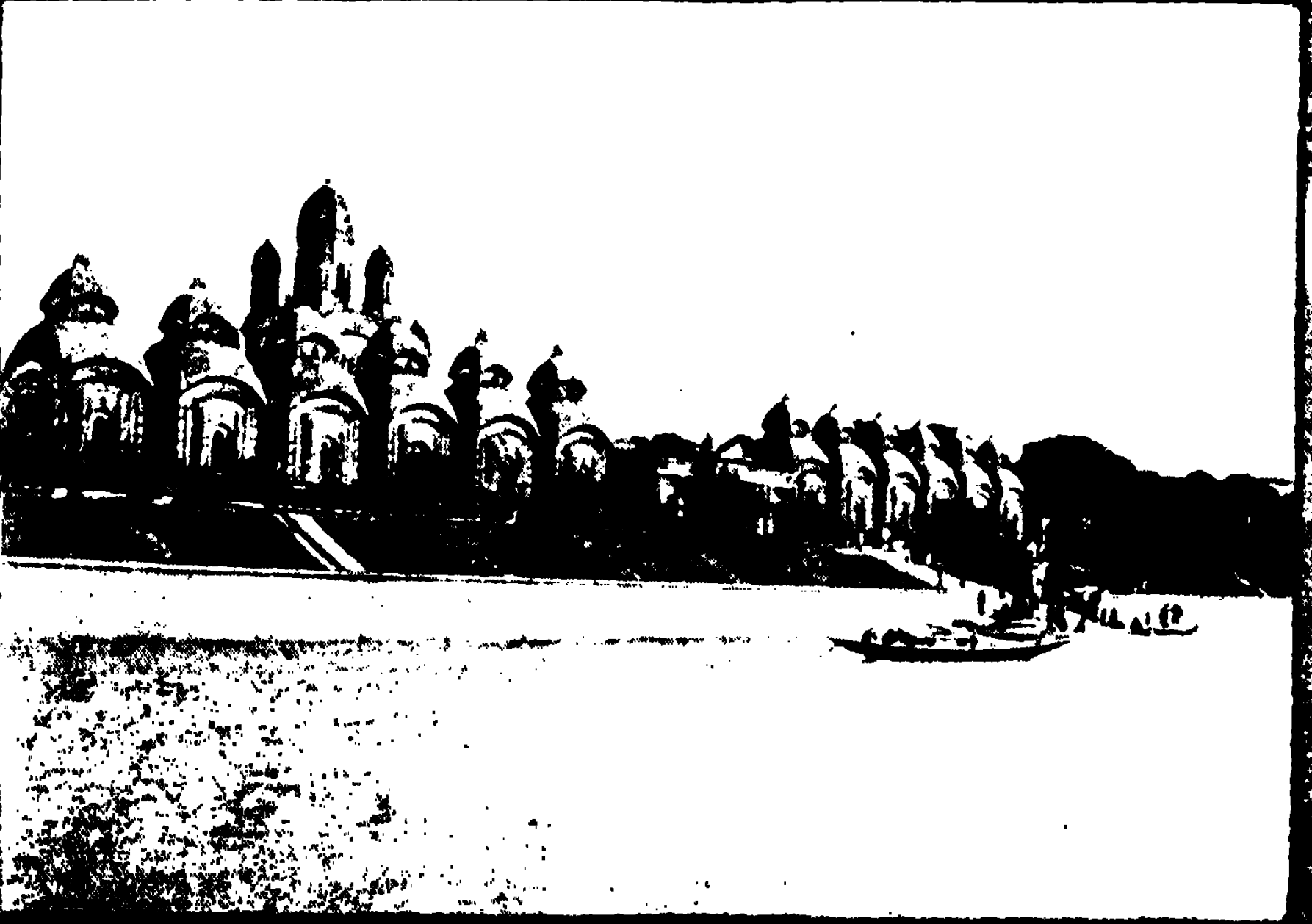


দোতলার বারাণ্ডার নীচে ঠিক মাঝখানে বাটীর প্রবেশদ্বার। এই দ্বারের সম্মুখে ঠাকুরের গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইত। এই দ্বারের ঠিক উপরে বাটীর পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত বৈঠকখানা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়া ভক্তসঙ্গে বসিতেন। এই ঘরের পশ্চিমে ছোট ঘর—এখানেও ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে বসিতেন ও রাতে থাকিলে কখন কখনও শয়ন করিতেন। এই ছোট ঘরের আবার উত্তরে দীর্ঘবারাণ্ডা। রথের সময় ঠাকুর ভক্তসঙ্গে এই বারাণ্ডায় সজীর্জন ও নৃত্য করিয়াছিলেন।

১ম চিত্র—মা কালীর মন্দিরের দক্ষিণে নাটমন্দির, উত্তরে ৩ বাধাকান্তেশ্বৰ মন্দিৰ।



২য় চিত্র—চাঁদগাঁৱ উত্তৰ পাৰ্শ্বে ছয়টি কৰিয়া শিৱমন্দিৰ। উত্তৰেৰ শেষ মন্দিৰেৰ উত্তৰে শ্ৰীশ্ৰীঠাকুৰেৰ ঘৰ। চাঁদগাঁও শিৱমন্দিৰেৰ পশ্চিমে পুষ্পোদ্যান। চাঁদগাঁৱ সম্মুখে বাধাঘাট।



১ম চিত্ৰ—মা কালীৰ মন্দিৰেৰ দক্ষিণে নাটমন্দিৰ, উত্তৰে ৩ বাধাকান্তেশ্বৰ মন্দিৰ।
 ২য় চিত্ৰ—চাঁদগাঁৱ উত্তৰ পাৰ্শ্বে ছয়টি কৰিয়া শিৱমন্দিৰ। উত্তৰেৰ শেষ মন্দিৰেৰ
 উত্তৰে শ্ৰীশ্ৰীঠাকুৰেৰ ঘৰ। চাঁদগাঁও শিৱমন্দিৰেৰ পশ্চিমে পুষ্পোদ্যান।
 চাঁদগাঁৱ সম্মুখে বাধাঘাট।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

চতুর্থ ভাগ—প্রথম খণ্ড ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে শ্রীযুক্ত রাখাল,
প্রাণকৃষ্ণ, কেদার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[প্রাণকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে মাষ্টার প্রভৃতি সঙ্গে ।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কালীবাড়ীর সেই পূর্বপরিচিত ঘরে ভক্তসঙ্গে
বসিয়া আছেন । নিশিদিন হরিপ্রেমে—মার প্রেমে—মাতোয়ারা !

মেজেতে মাদুর পাতা ; তিনি সেই মাদুরে আসিয়া বসিয়াছেন ।
সম্মুখে প্রাণকৃষ্ণ ও মাষ্টার । শ্রীযুক্ত রাখালও ঘরে আছেন । হাজরা
মহাশয় ঘরের বাহিরে দক্ষিণপূর্ব বারাণ্ডায় বসিয়া আছেন ।

শীতকাল—পৌষ মাস ; ঠাকুরের গায়ে মোল্‌স্কিনের র্যাপার । সোম
বার, বেলা ৮টা । অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা অষ্টমী । ১লা জানুয়ারী, ১৮৮৩ ।

এখন অন্তরঙ্গ ভক্তগণ অনেকেই আসিয়া ঠাকুরের সহিত মিলিত
হইয়াছেন । নানাধিক এক বৎসর কাল নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, বলরাম,
মাষ্টার, বাবুরাম, লাটু প্রভৃতি সর্বদা আসা যাওয়া করিতেছেন । তাঁহাদের
সংস্রাধিক পূর্ব হইতে রাম, মনোমোহন, সুরেন্দ্র, কেদার আসিতেছেন ।

প্রায় পাঁচ মাস হইল, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিখ্যাসাগরের বাডুড়বাগানের
গোটে শুভাগমন করিয়াছিলেন । দুই মাস হইল শ্রীযুক্ত কেশবসেনের
সহিত বিজয়াদিব্রাহ্মভক্তসঙ্গে নৌযানে (steamer) আনন্দ করিতে
কলিকাতায় গিয়াছিলেন ।

শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় শ্যামপুকুর পল্লীতে বাস

করেন । তাঁহার আদি নিবাস জনাই গ্রামে । Exchange এর বড় বাবু । নিলামের কাজ তদারক করেন । প্রথম পরিবারের সন্তান না হওয়াতে, তাঁহার মত লইয়া দ্বিতীয়বার দ্বার পরিগ্রহ করিয়াছেন । তাঁহারই একমাত্র পুত্র সন্তান হইয়াছে । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রাণকৃষ্ণ বড় ভক্তি করেন । একটু স্থূলকায়, তাই ঠাকুর মাঝে মাঝে ‘মোটাবামুন’ বলিতেন । অতি সজ্জন ব্যক্তি । প্রায় নয়মাস হইল ঠাকুর তাঁহার বাটীতে ভক্তসঙ্গে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন । প্রাণকৃষ্ণ নানা ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নাদি করিয়া অন্নভোগ দিয়াছিলেন ।

ঠাকুর মেজেতে বসিয়া আছেন । কাছে এক চ্যাঙড়া জিলিপি,—কোন ভক্ত আনিয়াছেন । তিনি একটু জিলিপি ভাঙ্গিয়া খাইলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রাণকৃষ্ণাদির প্রতি, সহাস্তে) । দেখ্‌ছো আমি মায়ের নাম করি বলে—এই সব জিনিষ খেতে পাচ্ছি ! (হাস্য)

“কিন্তু তিনি লাউ কুমড়া ফল দেন না,—তিনি অমৃত ফল দেন—জ্ঞান, প্রেম, বিবেক, বৈরাগ্য !—”

ঘরে একটা ছয় সাত বছরের ছেলে প্রবেশ করিল । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বালকাবস্থা । এক জন ছেলে যেমন আর এক জন ছেলের কাছ থেকে খাবার লুকিয়ে রাখে—পাছে সে খাইয়া ফেলে, ঠাকুরেরও ঠিক সেই অপূর্ব বালকবৎ অবস্থা হইতেছে । তিনি জিলিপীর চ্যাঙড়াটা হাত ঢাকা দিয়া লুকাইতেছেন । ক্রমে তিনি চ্যাঙড়াটা একপাশে সরাইয়া রাখিয়া দিলেন !

প্রাণকৃষ্ণ গৃহস্থ বটেন । কিন্তু তিনি বেদান্ত চর্চা করেন— বলেন, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ; তিনিই আমি—সোহং । ঠাকুর তাঁহাকে বলেন, কলিতে অন্নগত প্রাণ—কলিতে নারদীয় ভক্তি ।

‘সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কে ধর্তে পারে !’—

বালকের ন্যায় হাত ঢাকিয়া মিষ্টান্ন লুকাইতে লুকাইতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন !

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

[ভাবরাজ্য ও রূপ দর্শন ।]

ঠাকুর সমাধিস্থ । অনেকক্ষণ ভাবাবিস্ট হইয়া বসিয়া আছেন । দেহ নড়িতেছে না,—চক্ষু স্পন্দহীন,—নিঃশ্বাস পড়িতেছে কিনা—বুঝা যায় না ।—

অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন,—যেন ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে আবার ফিরিয়া আসিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রাণকৃষ্ণের প্রতি) । তিনি শুধু নিরাকার নন, তিনি আবার সাকার । তাঁর রূপ দর্শন করা যায় । ভাব ভক্তির দ্বারা তাঁর সেই অতুলনীয় রূপ দর্শন করা যায় ! মা নানারূপে দর্শন দেন ।

[গৌরাঙ্গ দর্শন । রতীর মার বেশে মা ।]

“কাল মাকে দেখলাম । গেরুয়া জামা পরা, মুড়ি সেলাই নাট । আমার সঙ্গে কথা কচ্ছেন !

“আর এক দিন মুসলমানের মেয়ে রূপে আমার কাছে এসেছিলেন । মাথায় তিলক কিন্তু দিগম্বরী । ছয় সাত বছরের মেয়ে—আমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াতে লাগল ও ফচকিমি করতে লাগল ।

“সুদের বাড়ীতে যখন ছিলাম—গৌরাঙ্গ দর্শন হয়েছিল—কালো-পেড়ে কাপড় পরা ।

“হলধারী বলত তিনি ভাব অভাবের অতীত । আমি মাকে গিয়ে বললাম—মা, হলধারী এ কথা বলছে, তা হলে রূপ টুপ কি সব মিথ্যা ? মা রতীর মার বেশে আমার কাছে এসে বলে,—‘তুই ভাবেই থাক’ আমিও হলধারীকে তাই বললাম ।

“এক একবার ও কথা ভুলে যাই বলে কষ্ট হয় । ভাবে না থেকে দাঁত ভেঙ্গে গেল । তাই দৈববাণী বা প্রত্যক্ষ না হলে ভাবেই থাকবো—ভক্তি নিয়ে থাকব । কি বল ?

প্রাণকৃষ্ণ । আজ্ঞা ।

[ভক্তির অবতার কেন ? রামের ইচ্ছা ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । আর তোমাকেই বা কেন জিজ্ঞাসা করি । এর ভিতর কে একটা আছে । সেই আমাকে নিয়ে এইরূপ কচ্ছে । মাঝে মাঝে দেবভাব প্রায় হ'ত,—আমি পূজো না করলে শান্ত হতুম না ।

“আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী । তিনি যেমন করান তেমনি করি । যেমন বলান তেমনি বলি ।”

‘প্রসাদ বলে ভব সাগরে, বসে আছি ভাসিয়ে ভেলা ।

জোয়ার এলে উজিয়ে যাবো, ভাঁটিয়ে যাব ভাঁটার বেলা ॥’

“ঝড়ের এঁটো পাতা কখনও উড়ে ভাল যায়গায় গিয়ে পড়ল,—কখনও বা ঝড়ে নর্দমায় গিয়ে পড়ল—ঝড় যে দিকে লয়ে যায় !”

“ভাঁতি বলে,—রামের ইচ্ছায় ডাকাতি হলো, রামের ইচ্ছায় আমাকে পুলিশে ধরলে,—আবার রামের ইচ্ছায় ছেড়ে দিলে ।

“হনুমান বলেছিল,—হে রাম, শরণাগত, শরণাগত ; —এই আশীর্বাদ কর যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয় । আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই !

“কোলা ব্যাঙ মূর্খ অবস্থায় বলে,—রাম, যখন সাপে ধরে তখন ‘রাম রক্ষা কর’ বলে চীৎকার করি । কিন্তু এখন রামের ধনুক বিধে মারে যাচ্ছি, তাই চুপ করে আছি ।

“আগে প্রত্যক্ষ দর্শন হতো—এই চক্ষু দিয়ে !—যেমন তোমায় দেখছি । এখন ভাবাবস্থায় দর্শন হয় ।

“ঈশ্বর লাভ হ'লে বালকের স্ভাব হয় । যে বাক্যে চিন্তা করে তার সঙ্গ পায । ঈশ্বরের স্ভাব বালকের যায় । বালক যেমন খেলা ঘর করে, ভাসে, গড়ে,—তিনিও সেইরূপ সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কচ্ছেন । বালক যেমন কোনও গুণের বশ নয়—তিনিও তেমনি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণের অতীত ।

“তাই পরমহংসেরা দশ পাঁচ জন বালক সঙ্গে রাখে, স্ভাব আরো পের জন্ম !”

দক্ষিণেশ্বর । রাখাল, মাষ্টার, প্রাণকৃষ্ণ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ৫

আগড়পাড়া হইতে একটি বিশ বাইশ বছরের ছোকরা আসিয়াছেন ।
ছেলেটী যখন আসেন ঠাকুরকে ইসারা করিয়া নির্জনে লইয়া যান ও
চুপি চুপি মনের কথা কন । তিনি নূতন যাতায়াত করিতেছেন । আজ
ছেলেটী কাছে আসিয়া মেজেতে বসিয়াছেন ।

[প্রকৃতিভাব ও কামজয় । সরলতা ও ঈশ্বরলাভ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ছেলেটীর প্রতি) । আরোপ করলে ভাব বদলে যায় ।
প্রকৃতি ভাব আরোপ করলে ক্রমে কামাদি রিপু নষ্ট হয়ে যায় । ঠিক
মেয়েদের মতন ব্যবহার হয়ে দাঁড়ায় । যাত্রাতে যারা মেয়ে সাজে তাদের
নাইবার সময় দেখেছি,—মেয়েদের মত দাঁত মাজে, কথা কয় ।

“ভূমি একদিন শনি মঙ্গলবারে এস ।

(প্রাণকৃষ্ণের প্রতি) “ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ । শক্তি না মানলে
জগৎ মিথ্যা হয়ে যায় ; আমি, ভূমি, ঘর, বাড়ী, পরিবার,—সব মিথ্যা ।
ঐ আত্মশক্তি আছেন বলে জগৎ দাঁড়িয়ে আছে । কাটামোর খুঁটি না
থাকলে কাটামই হয় না—সুন্দর দুর্গা ঠাকুর প্রতিমাও হয় না ।

“বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ না করলে চৈতন্যই হয় না—ভগবান লাভ হয়
না । থাকলেই কপটতা হয় । সরল না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না—

‘এইসি ভক্তি কর ঘট ভিতর, ছোড় কপট চতুরাই ।

সেবা বন্দি আউর অধানতা সহজে মিলি রঘুরাই ॥’

“যারা বিষয় কন্ম করে—আফিসের কাজ কি বাবসা—তাদেরও
সত্যোতে থাকা উচিত । সত্য কথা কলির তপস্যা ।

প্রাণকৃষ্ণ । অস্মিন্ ধ্যেয়ে মহেশি স্ম্যৎ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

পরোপকারনিরতো নির্বিবকারঃ সদাশয়ঃ ॥

“মহানির্বাণতন্ত্রে এরূপ আছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, ঐগুলি ধারণা কত্তে হয় ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের যশোদার ভাব ও সমাধি ।]

ঠাকুর ছোট খাটটীর উপর গিয়া নিজের আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন ।
সর্বদাই ভাবে পূর্ণ । ভাব-চক্ষে রাখালকে দর্শন করিতেছেন । রাখালকে
দেখিতে দেখিতে বাৎসল্য রসে আপ্লুত হইলেন ! অঙ্গে পুলক হইতেছে ।
এই চক্ষে কি যশোদা গোপালকে দেখিতেন ?

দেখিতে দেখিতে আবার ঠাকুর সম্মানিত হইলেন । ঘরের
মধ্যস্থ ভক্তেরা অবাক ও নিস্তব্ধ হইয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই অদ্ভুত
ভাবাবস্থা দর্শন করিতেছেন ।

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন—“রাখালকে দেখে উদ্দীপন
কেন হয় ? যত এগিয়ে যাবে ততই ঐশ্বর্যের ভাগ কম পড়ে যাবে ।
সাধকের প্রথম দর্শন হয় দশভূজা, ঈশ্বরী মূর্তি । সে মূর্তিতে ঐশ্বর্যের
বেশী প্রকাশ । তার পর দর্শন দ্বিভূজা ;—তখন দশ হাত নাই অত
অঙ্গ শস্ত্র নাই । তার পর গোপাল মূর্তি দর্শন ;—কোনও ঐশ্বর্য নাই,
কেবল কচি ছেলের মূর্তি । এরও পারে আছে,—কেবল জ্যোতিঃ দর্শন ।

[সমাধির পর ঠিক ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা । বিচার ও আসক্তি ত্যাগ !!]

“তাকে লাভ হলে, তাঁতে সমাধিস্থ হলে—জ্ঞান বিচার আর থাকে না ।

“জ্ঞান, বিচার আর কতক্ষণ ? যতক্ষণ অনেক বলে বোধ হয়,—
যতক্ষণ জীব, জগৎ, আমি, তুমি এসব বোধ থাকে । যখন ঠিক ঠিক
এক জ্ঞান হয় তখন চুপ হয়ে যায় । যেমন ত্রৈলোক্যস্বামী ।

“ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় দেখ নাই ? প্রথমটা খুব হৈ চৈ । পেট যত
ভরে আসছে ততই হৈ চৈ কমে যাচ্ছে । যখন দধি মুণ্ড পড়ল তখন
কেবল সুপ্-সাপ্ ! আর কোনও শব্দ নাই । তার পরই নিদ্রা—
সমাধি । তখন হৈ চৈ আর আদৌ নাই !

(মাফটার ও প্রাণকৃষ্ণের প্রতি) “অনেকে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কয়,
কিন্তু নীচের জিনিস লয়ে থাকে । ঘর বাড়ী, টাকা, মান, ইন্দ্রিয়সুখ ।

দক্ষিণেশ্বর ১- রাখাল, মাষ্টার, প্রাণকৃষ্ণ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ৭

“মনুমেন্ট (monument) এর নোচে যতক্ষণ থাকা ততক্ষণ গাড়ী, ঘোড়া, সাহেব, মেম—এই সব দেখা যায় । উপরে উঠলে কেবল আকাশ, সমুদ্র, ধূ ধূ কচ্ছে !—তখন বাড়ী, ঘোড়া, গাড়ী, মানুষ এ সব আর ভাল লাগে না, এ সব পিপড়ের মত দেখায় !

“ব্রহ্মজ্ঞান হলে সংসারাসক্তি, কামিনীকাঞ্ছনে উৎসাহ,—সব চলে যায় । সব শান্তি হয়ে যায় । কাঠ পোড়বার সময় অনেক পড়্ পড়্ শব্দ আর আগুনের ঝাঁঝ । সব শেষ হয়ে গেল ছাই পড়ল—তখন আর শব্দ থাকে না । আসক্তি গেলেই উৎসাহ যায়—শেষে শান্তি ।

“ঈশ্বরের যত নিকট এগিয়ে যাবে ততই শান্তিঃ । শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ প্রশান্তিঃ । গঙ্গার যত নিকট যাবে ততই শীতল বোধ হবে । স্নান করলে আরও শান্তি ।

“তবে জীব, জগৎ,—চতুর্বিংশতি তত্ত্ব,—এ সব, তিনি আছেন বলে সব আছে । তাঁকে বাদ দিলে কিছুই থাকে না । ১ এর পিঠে অনেক শূন্য দিলে সংখ্যা বেড়ে যায় । ১কে পুঁছে ফেললে শূন্যের কোনও পদার্থ থাকে না ।”

প্রাণকৃষ্ণকে কৃপা করিবার জন্য ঠাকুর কি এইবার নিজের অবস্থা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিতেছেন ?

ঠাকুর বলিতেছেন—

[ঠাকুরের অবস্থা—ব্রহ্মজ্ঞানের পর ভক্তির ‘আমি’ ।]

“ব্রহ্মজ্ঞানের পর—সমাধির পর—কেহ কেহ নেমে এসে বিচার ‘আমি’ ভক্তির ‘আমি’ লয়ে থাকে । বাজার চুকে গেলে কেউ কেউ আপনার খুসি বাজারে থাকে । যেমন নারদাদি । তাঁরা লোকশিক্ষার জন্য ‘ভক্তির আমি’ লয়ে থাকেন । শঙ্করাচার্য্য লোকশিক্ষার জন্য বিচার ‘আমি’ রেখেছিলেন ।

“একটুও আসক্তি থাকলে তাঁকে পাওয়া যায় না । সূতার ভিতর একটু অঁস্ থাকলে সূঁচের ভিতর যাবে না ।”

“যিনি ঈশ্বর লাভ করেছেন, তাঁহার কাম ক্রোধাদি নামমাত্র । যেমন পোড়া দড়ি । দড়ির আকার । কিন্তু ফুঁ দিলে উড়ে যায় !

“মন আসক্তি শূন্য হইলেই তাঁকে দর্শন হয় । শুদ্ধ মনে যা উঠবে সে তাঁরই বাণী । শুদ্ধ মনও যা শুদ্ধবুদ্ধিও ত,—শুদ্ধ আত্মাও তা । কেননা তিনি বই আর কেউ শুদ্ধ নাই ।

“তাঁকে কিন্তু লাভ করলে ধর্ম্মাধর্ম্মের পার হওয়া যায় । এই বলিয়া ঠাকুর সেই দেবদুলভকণ্ঠে রামপ্রসাদের গান ধরিলেন ।

আয় মন বেড়াতে যাবি ।

কালী কল্পতরু মূলেরে, চারি ফল কুড়ায়ে পাবি ॥

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি ।

বিবেক নামে তার বেটারে তত্ত্বকথা তায় স্মধাবি ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীরাধার ভাব ।

ঠাকুর দক্ষিণপূর্ব বারাণ্ডায় আসিয়া বসিয়াছেন । প্রাণকৃষ্ণাদি ভক্ত-গণও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছেন । হাজরা মহাশয় বারান্দায় বসিয়া আছেন । ঠাকুর হাসিতে হাসিতে প্রাণকৃষ্ণকে বলিতেছেন—

“হাজরা একটা কম নয় । যদি এখানে বড় দরগা হয়, তবে হাজরা ছোট দরগা । (সকলের হাস্য) ।

নবকুমার বারাণ্ডার দরজায় আসিয়া দাড়াইয়াছেন । ভক্তদের দেখিয়াই চলিয়া গেলেন । ঠাকুর বলিতেছেন—‘অহঙ্কারের মূর্ত্তি !’

বেলা সাড়ে নটা হইয়াছে । প্রাণকৃষ্ণ প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন,—কলিকাতার বাটীতে ফিরিয়া যাইবেন ।

এক জন বৈরাগী গোপীঘন্ত্রে ঠাকুরের ঘরে গান করিতেছেন—
গান—

নিত্যানন্দের জাহাজ এসেছে ।

তোরা পারে যাবি তো ধর এসে ॥

ছয় মানোয়ারি গোরা, তারা দেয় সদা পারা,

বুক পিঠে তার ঢাল গাঁড়া ঘেরা ।

তারা সদর দুয়ার আলগা করে, রত্নমাণিক বিলাচ্ছে ।

দক্ষিণেশ্বরে । কেদারাদি ভক্তসঙ্গে । শ্রীরাধার ভাব । ৯

গান— এই বেলা নে ঘর ছেয়ে ।

এ বারে বর্ষা ভারি, হও হুঁসারী, লাগো আদা জল খেয়ে ।

যখন আসবে শ্রাবণা, দেখতে দেবেনা ।

বাঁশ বাখারী পচে যাবে, ঘর ছাওয়া হবে না ।

যেমন আসবে ঝটকা, উড়বে মটকা, মটকা যাবে ফাঁক হ'য়ে

(তুমিও যাবে হাঁ হ'য়ে ।)

গান—কার ভাবে নদে এসে, কাঙ্গাল বেশে, হরি হয়ে বল্ছ হরি ।

কার ভাবে ধরেছ ভাব, এমন স্বভাব, তাওত কিছু বুঝতে নারি ।

ঠাকুর গান শুনিতেছেন, এমন সময় শ্রীযুক্ত কেদার চাটুর্ঘ্য আসিয়া প্রণাম করিলেন । তিনি আফিসের বেশ পরিয়া আসিয়াছেন—চাপকান, ঘড়ি, ঘড়ির চেন । কিন্তু ঈশ্বরের কথা হইলেই তিনি চক্ষের জলে ভাসিয়া যান । অতি প্রেমিক লোক । অন্তরে গোপীর ভাব ।

কেদারকে দেখিয়া ঠাকুরের একবারে শ্রীবৃন্দাবন লীলা উদ্দীপন হইয়া গেল । প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন ও কেদারকে সম্বোধন করিয়া গান গাইতেছেন—

সখি, সে বন কতদূর ।

(যথা আমার শ্যামসুন্দর) (আর চলিতে যে নারি) ।

শ্রীরাধার ভাবে গান গাইতে গাইতে ঠাকুর সমাধিস্থ চিত্রার্পিতের আয় দণ্ডায়মান । কেবল চক্ষের দুই কোণ দিয়া আনন্দাশ্রু পড়িতেছে ।

কেদার ভূমিষ্ঠ । ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করিয়া স্তব করিতেছেন ।

হৃদয়কমলমাধ্যো নির্বিবশেষং নিরীহং

হরিহরবিধিবেদ্যং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্ ।

জনমমরণভীতিভ্রংশি সচ্চিৎ স্বরূপম্ ।

সকল ভুবনবীজং ব্রহ্ম চৈতন্যমীড়ে ॥

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিস্থ হইতেছেন । কেদার নিজ বাটী হালিসহর হইতে কলিকাতায় কন্সম্বলে যাইবেন । পথে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া যাইতেছেন । একটু বিশ্রাম করিয়া কেদার বিদায় গ্রহণ করিলেন ।

এইরূপে ভক্তসঙ্গে কথা কহিতে কহিতে বেলা প্রায় দুপ্রহর হইল । শ্রীযুক্ত রামলাল ঠাকুরের জন্ম থালা করিয়া মা কালীর প্রসাদ আনিয়া দিলেন । ঘরের মধ্যে ঠাকুর দক্ষিণাশ্রু হইয়া আসনে বসিলেন ও প্রসাদ পাইলেন । আহার বালকের ন্যায়,—একটু একটু সব মুখে দিলেন ।

আহারান্তে ঠাকুর ছোট খাটটীতে একটু বিশ্রাম করিতেছেন । কিয়ৎক্ষণ পরে মাড়োয়ারী ভক্তেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

অভ্যাসযোগ । দুইপথ—বিচার ও ভক্তি ।

বেলা তটা । মাড়োয়ারী ভক্তেরা মেজেতে বসিয়া ঠাকুরকে প্রশ্ন করিতেছেন । মাফীর, রাখাল ও অন্যান্য ভক্তেরা ঘরে আছেন ।

মাড়োয়ারী ভক্ত । মহারাজ, উপায় কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । দুই রকম আছে । বিচার পথ,—আর অনুরাগ বা ভক্তির পথ ।

“সৎ অসৎ বিচার । একমাত্র সৎ বা নিত্য বস্তু ঈশ্বর, আর সমস্ত অসৎ বা অনিত্য । বাজীকরই সত্য, ভেকী মিথ্যা । এইটি বিচার ।

“বিবেক আর বৈরাগ্য । এই সৎ অসৎ বিচারের নাম বিবেক । বৈরাগ্য অর্থাৎ সংসারের দ্রব্যের উপর বিরক্তি । এটা একবারে হয় ন—রোজ অভ্যাস কর্তে হয় । কামিনীকাঞ্চন আগে মনে ত্যাগ কর্তে হয় ;—তার পর তাঁর ইচ্ছায় মনের ত্যাগও কর্তে হয়, বাহিরের ত্যাগও কর্তে হয় । কল্কাতার লোকদের বলবার যো নাই ‘ঈশ্বরের জন্য সব ত্যাগ কর’—বলতে হয় ‘মনে ত্যাগ কর ।’

“অভ্যাস যোগের দ্বারা কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি ত্যাগ করা যায় । গীতায় এ কথা আছে । অভ্যাস দ্বারা মনে অসাধারণ শক্তি এসে পড়ে । তখন ইন্দ্রিয় সংযম কর্তে—কাম, ক্রোধ বশ কর্তে—কষ্ট হয় না । যেমন কচ্ছপ হাত, পা টেনে নিলে আর বাহির করে না ; কুড়ুল দিয়ে চার খানা করে কাটলেও আর বাহির করে না ।”

মাড়োয়ারী ভক্ত । মহারাজ, দুই পথ বল্লেন ; আর এক পথ কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । অনুরাগের বা ভক্তির পথ । ব্যাকুল হ'য়ে
একবার কাঁদ—নির্জনে, গোপনে—দেখা দাও বোলে ।

“ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্যামা থাকতে পারে !”

মাড়োয়ারী ভক্ত । মহারাজ, সাকার পূজার মানে কি ? আর নিরা-
কার নিগুণ,—এর মানেই বা কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । যেমন বাপের ফটোগ্রাফ দেখলে বাপকে মনে পড়ে,
তেমনি প্রতিমায় পূজা করতে করতে সত্যের রূপ উদ্দীপন হয় ।

“সাকার রূপ কি রকম জান ? যেমন জল রাশির মাঝ থেকে
ভুড়ভুড়ি উঠে সেইরূপ । মহাকাশ চিদাকাশ থেকে এক একটা রূপ
উঠছে দেখা যায় ! অবতারও একটা রূপ । অবতার নীলা সে আত্ম-
শক্তিরই খেলা ।

[পাণ্ডিত্য । আমি কে ? আমিই তুমি ।]

“পাণ্ডিত্যে কি আছে ? ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তাঁকে পাওয়া যায় ।
নানা বিষয় জানবার দরকার নাই ।

“যিনি আচার্য্য তাঁরই পাঁচটা জানা দরকার । অপরকে বধ করবার
জন্ত ঢাল তরোয়াল চাই ; আপনাকে বধ করবার জন্ত একটা ছুঁচ বা
নরুন হলেই হয় ।

“আমি কে এইটা খুঁজতে গেলে তাঁকেই পাওয়া যায় । আমি কি
মাংস, না হাড়, না রক্ত না মজ্জা ;— না মন, না বুদ্ধি ? শেষে বিচারে
দেখা যায় যে আমি এসব কিছুই নয় । ‘নেতি’ ‘নেতি’ । আত্মা
ধরবার ছোঁবার যো নাই । তিনি নিগুণ—নিরুপাধি ।

“কিন্তু ভক্তি মতে তিনি সগুণ । চিগয় শ্যাম, চিগয় ধাম—সব
চিগয় !”

মাড়োয়ারী ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন ।

দক্ষিণেশ্বরে সন্ধ্যা ও আরতি ।

সন্ধ্যা হইল । ঠাকুর গঙ্গাদর্শন করিতেছেন । ঘরে প্রদীপ জ্বালা

হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ জগৎমাতার নাম করিতেছেন ও খাটটীতে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার চিন্তা করিতেছেন।

ঠাকুরবাড়ীতে এইবার আরতি হইতেছে। যাঁহারা এখনও পোস্তার উপর বা পঞ্চবটী মধ্যে পাদচারণ করিতেছেন তাঁহারা দূর হইতে আরতির মধুর ঘণ্টানিনাদ শুনিতেছেন। জোয়ার আসিয়াছে, —ভাগীরথী কুলকুল শব্দ করিয়া উত্তরবাহিনী হইতেছেন। আরতির মধুর শব্দ এই কুলকুল শব্দের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া আরও মধুর হইয়াছে। এই সকলের মধ্যে প্রেমোন্মত্ত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিয়া আছেন। সকলই মধুর! হৃদয় মধুময়! মধু, মধু, মধু!

দ্বিতীয় খণ্ড।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাক্ষিণেশ্বরমন্দিরে রাখাল, রাম, নৃত্যগোপাল
চৌধুরী প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[নির্জ্ঞানে সাধন। Philosophy। ঈশ্বর দর্শন।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পূর্ব পরিচিত ঘরে মধ্যাহ্নে সেবার পর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। আজ ২৫ শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৩।

রাখাল, হরীশ, লাটু, হাজরা আজকাল ঠাকুরের পদছায়ায় সর্বদা বাস করিতেছেন। কলিকাতা হইতে রাম, কেদার, নৃত্যগোপাল, মাফার প্রভৃতি ভক্তেরা আসিয়াছেন। আর চৌধুরী আসিয়াছেন।

চৌধুরীর সম্প্রতি পত্নী-বিয়োগ হইয়াছে। মনের শান্তির জন্য তিনি ঠাকুরকে দর্শন করিতে কয়বার আসিতেছেন। তিনি চারটা পাশ করিয়াছেন—রাজ সরকারে কাজ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাম প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি)। রাখাল, নরেন্দ্র, ৬৩
ভবনাথ এরা নিত্য-সিদ্ধ—জন্ম থেকেই চৈতন্য আছে। লোকশিক্ষার
জন্যই শরীর ধারণ। ১।

“আর এক থাক আছে কৃপাসিদ্ধ। হঠাৎ তাঁর কৃপা হ’ল—অমনি
দর্শন আর জ্ঞানলাভ। যেমন হাজার বছরের অন্ধকার ঘর---আলো
নিয়ে গেলে একক্ষণে আলো হ’য়ে যায়!—একটু একটু করে হয় না।!”

“যারা সংসারে আছে তাদের সাধন করতে হয়। নির্জ্ঞানে গিয়ে
ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হয়।

(চৌধুরীর প্রতি) পাণ্ডিত্য দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না।

“আর তাঁর বিষয় কে বিচার করে বুঝবে—তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি
যাতে হয়, তাই সকলের করা উচিত।

[ভীষ্মদেবের ক্রন্দন। হারজিত। দিব্য চক্ষু ও গীতা।]

“তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য্য—কি বুঝবে? তাঁর কার্য্যই বা কি বুঝ^র
পারবে।

“ভীষ্মদেব যিনি সাক্ষাৎ অষ্টবস্তুর একজন বস্ত্র—তিনিই শরশয্য,
শুয়ে কঁাদতে লাগলেন। বল্লেন—কি আশ্চর্য্য! পাণ্ডবদের সঙ্গে
ভগবান সর্ব্বদাই আছেন তবু তাদের দুঃখ বিপদের শেষ নাই!—
বানের কার্য্য কে বুঝবে!

“কেউ মনে করে আমি একটু সাধন ভজন করেছি, আমি জি
কিন্তু হারজিৎ তাঁর হাতে। এখানে একজন মাগী (বেশ্যা)
সময় সজ্ঞানে গঙ্গা লাভ করলে!

চৌধুরী। তাঁকে কিরূপে দর্শন করা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। এ চক্ষে দেখা যায় না। তিনি দিব্য চক্ষু
তবে দেখা যায়। অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শনের সময় ঠাকুর
দিছিলেন।

“তোমার ফিলজফিতে (philosophy) কেবল হিসাব কিত
কেবল বিচার করে! ওতে তাঁকে পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত । [1883, 25th February.

[অহেতুকী ভক্তি । মূলকথা—রাগানুগা ভক্তি ।]

“যদি রাগ ভক্তি হয়—অনুরাগের সহিত ভক্তি—তা হ’লে তিনি স্থির থাকতে পারেন না ।

“ভক্তি তাঁর কিরূপ প্রিয়—খোল্ দিয়ে জাব যেমন গরুর প্রিয়,—
ব’গব্ করে খায় !

“রাগ-ভক্তি—শুদ্ধাভক্তি—অহেতুকী ভক্তি । যেমন প্রহ্লাদের ।

“তুমি বড়লোকের কাছে কিছু চাও না—কিন্তু রোজ আসো—
তাকে দেখতে ভালবাসো । জিজ্ঞাসা করলে বল—‘আজ্ঞা, দরকার
কিছু নাই—আপনাকে দেখতে এসেছি ।’ এর নাম অহেতুকীভক্তি ।
তুমি ঈশ্বরের কাছে কিছু চাও না—কেবল ভালবাসো ।

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাইতেছেন—

“আমি মুক্তি দিতে কাতর নই

শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই ।

শ্রীকথামৃত, ২য় ভাগ, ৩৪ পৃষ্ঠা ।

“মূলকথা। ঈশ্বরে রাগানুগা ভক্তি ।—আর বিবেক বৈরাগ্য ।”

চৌধুরী । মহাশয়, গুরু না হ’লে কি হ’বে না ?

বু শ্রীরামকৃষ্ণ । সচ্চিদানন্দই গুরু ।

“শব সাধন করে ইচ্ছা দর্শনের সময় গুরু সাম্নে এসে পড়েন,—
বলেন, ঐ দেখ তোর ইচ্ছা ।”—তার পর গুরু ইচ্ছা লীন হ’য়ে
। যিনি গুরু তিনিই ইচ্ছা । গুরু খেই ধরে দেন ।

“অনন্তব্রত করে । কিন্তু পূজা করে -বিষ্ণুকে । তাঁরই মধ্যে
ঈশ্বর অনন্তরূপ ।

[শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্ম সমন্বয় ।]

রামাদি ভক্তদের প্রতি) “যদি বল কোন মূর্তির চিন্তা করবো ; যে

লাগে তারই ধ্যান করবে । কিন্তু জান্বে যে সবই এক ।

তার উপর বিদ্বেষ করতে নাই । শিব, কালী, হরি,—সবই
একই ভিন্ন ভিন্ন রূপ । যে এক করেছে সেই ধন্য ।

দক্ষিণেশ্বর । রাখাল, নিত্যগোপাল, চৌধুরী প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

‘বহিঃশৈব, হৃদে কালী, মুখে হরিবোল !’

“একটু কাম ক্রোধাদি না থাকলে শরীর থাকে না । তাই কেবল কণাবার চেষ্টা করবে ।

ঠাকুর কেদারকে দেখিয়া বলিতেছেন—

“ইনি বেশ । নিত্যও মানেন, লীলাও মানেন । এদিকে আবার দেবলীলা-মানুষলীলা পর্যন্ত ।

কেদার বলেন যে ঠাকুর মানুষদেহ লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন ।

[সন্ন্যাসী ও কামিনী । ভক্তা স্ত্রীলোক]

নিত্যগোপালকে দেখিয়া ঠাকুর ভক্তদের বলিতেছেন—

“এর বেশ অবস্থা ।

(নিত্যগোপালের প্রতি) তুই সেখানে বেশী যাস নি ।—কখনও একবার গেলি । ভক্ত হ’লেই বা—মেয়ে মানুষ কি না । তাই সাবধান !

“সন্ন্যাসীর বড় কটিন নিয়ম । স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যন্ত দেখবে না । এটি সংসারী লোকদের পক্ষে নয় ।

“স্ত্রীলোক যদি খুব ভক্তও হয়,—তবুও মেশামিশি করা উচিত নয় ।

“জিতেন্দ্রিয় হ’লেও—লোক-শিক্ষার জন্য ত্যাগীর এ সব কর্ত্তে হয় ।

“সাপুর যোল আনা ত্যাগ দেখলে অন্য লোকে ত্যাগ করতে শিখবে । তা না হ’লে তারাও পড়ে যাবে । সন্ন্যাসী জগৎগুরু ।”

এইবার ঠাকুর ও ভক্তেরা উঠিয়া বেড়াইতেছেন । মাফটার প্রহ্লাদের ছবির সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছবি দেখিতেছেন । প্রহ্লাদের অহৈতুকী ভক্তি—ঠাকুর বলিয়াছেন ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত । [1883, 7th April.]

তৃতীয় খণ্ড ।

নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে বলরামমন্দিরে ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দে]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের বাড়ীতে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন—
বৈঠকখানার উত্তর পূর্বের ঘরে । বেলা একটা হইবে । নরেন্দ্র,
ভবনাথ, রাখাল, বলরাম, মাষ্টার ঘরে তাঁহার সঙ্গে বসিয়া আছেন ।

আজ অমাবস্যা । শনিবার, ২৫শে চৈত্র । ঠাকুর সকালে
বলরামের বাড়ী আসিয়া মধ্যাহ্নে সেবা করিয়াছেন । নরেন্দ্র, ভবনাথ,
রাখাল ও আরও দু একটা ভক্তকে নিমন্ত্রণ করিতে বলিয়াছিলেন ।
তাঁহারাও এখানে আহাৰ করিয়াছেন । ঠাকুর বলরামকে বলিতেন—
এদের খাইও, তাহ'লে অনেক সাধুদের খাওয়ানো হ'বে ।

কয়েকদিন হইল ঠাকুর শ্রীযুক্ত কেশবের বাটীতে নববৃন্দাবন নাটক
দেখিতে গিয়াছিলেন । সঙ্গে নরেন্দ্র ও রাখাল ছিলেন । নরেন্দ্র
অভিনয়ে যোগ দিয়াছিলেন । কেশব পাওহারী বাবা সাজিয়াছিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদি ভক্তের প্রতি) । কেশব (সেন) সাধু
সেজে শান্তি জল ছড়াতে লাগলো । আমার কিন্তু ভাল লাগল না ।
অভিনয় ক'রে শান্তি জল !

“আর একজন (কু-বাবু) পাপ পুরুষ সেজেছিল । ও রকম
সাজাও ভাল না । নিজে পাপ করাও ভাল না—পাপের অভিনয়
করাও ভাল না ।

নরেন্দ্রের শরীর তত সুস্থ ন'য়,—কিন্তু তাঁহার গান শুনিতে ঠাকুরের
ভারি ইচ্ছা । তিনি বলিতেছেন—‘নরেন্দ্র এরা বলছে, একটু গা না ।’

নরেন্দ্র তানপুরা লইয়া গাইতেছেন—

বলরামমন্দিরে । নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথাদি ভক্তসঙ্গে । ১৭

গান—আমার প্রাণপিঞ্জরের পাখী গাওনা রে ।

ব্রহ্মকল্পতরুরপরে বসে রে পাখী, বিভূ গুণ গাও দেখি,
(গাও, গাও) ; ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, সুপক ফল খাওনা রে ।

বল বল আত্মারাম, পড় প্রাণারাম,
হৃদয়-মাঝে প্রাণ-বিহঙ্গ ডাকো অবিরাম,
ডাকো তৃষিত চাতকের মত, পাখী অলস থেকে না রে ।

গান— বিশ্বভুবন রঞ্জন ব্রহ্ম পরম জ্যোতি ।
অনাদিদেব জগপতি প্রাণের প্রাণ ॥

গান— ওহে রাজ রাজেশ্বর দেখা দাও ।
চরণে উৎসর্গ দান, করিতেছি এই প্রাণ,
সংসার অনলকুণ্ডে বলসি গিয়াছে তাও ।
কলুষ কলঙ্কে তাহে, আবরিত এ হৃদয় ;
মোহে মুগ্ধ মৃত প্রায়, হয়ে আছি দয়াময়,
মৃত সঞ্জীবনী দৃষ্টে, শোধন করিয়ে লও ।

গান— গগনময় খাল রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে (৩য় ভাগ, ১৮৪ পৃষ্ঠা)

গান—চিদাকাশে হলো পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে । (২য় ভাগ, ১৬৭ পৃষ্ঠা]

নরেন্দ্রের গান সমাপ্ত হইল । ঠাকুর ভবনাথকে গান গাহিতে
বলিতেছেন । ভবনাথ গাহিতেছেন—

গান—দয়াঘন তোমা হেন কে হিতকারী !
সুখে দুঃখে সম, বন্ধু এমন কে, পাপ তাপ ভয়হারী ।

নরেন্দ্র (সহাস্তে) । এ (ভবনাথ) পান মাছ ত্যাগ করেছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভবনাথের প্রতি, সহাস্তে) । সে কি রে ! পান মাছে
কি হয়েছে ? ওতে কিছু দোষ হয় না । কামিনীকামন
ত্যাগই ত্যাগ । রাখাল কোথায় ?

এক জন ভক্ত । আজ্ঞা, রাখালযুমুচ্ছেন ।

ঠাকুর (সহাস্তে) । এক জন মাদুর বগলে করে যাত্রা শুন্তে
এসেছিল । যাত্রার দেরী দেখে মাদুরটি পেতে যুমিয়ে পড়লো । যখন
উঠলো তখন সব শেষ হয়ে গেছে ! (সকলের হাস্য) ।

“তখন মাদুর বগলে করে বাড়ী ফিরে গেলো (হাস্ত) ।

রামদয়াল বড় পীড়িত । আর এক ঘরে শয়্যাগত । ঠাকুর সেই ঘরের সম্মুখে গিয়া, কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিলেন ।

[পঞ্চদশী, বেদান্ত শাস্ত্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ । সংসারী ও শাস্ত্রার্থ ।]

বেলা ৪টা হইবে । বৈঠকখানা ঘরে ঠাকুর নরেন্দ্র, রাখাল, মাষ্টার, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন । কয়েক জন ব্রাহ্ম ভক্ত আসিয়াছেন । তাঁহাদের সঙ্গে কথা হইতেছে ।

ব্রাহ্মভক্ত । মহাশয়ের পঞ্চদশী দেখা আছে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । ও সব একবার প্রথম প্রথম শুনতে হয়,—প্রথম প্রথম একবার বিচার করে নিতে হয় । তার পর—

‘যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে,

মন তুই দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে ।’

“সাধনাবস্থায় ও সব শুনতে হয় । তাঁকে লাভের পর জ্ঞানের অভাব থাকে না । মা রাশ ঠেলে দেন !

“প্রথমে বানান করে লিখতে হয়,—তার পর অমনি টেনে যাও ।

“সোণা গলাবার সময় খুব উঠে পড়ে লাগতে হয় । এক হাতে হাপর—এক হাতে পাখা—মুখে চোঙ্গ—যতক্ষণ না সোণা গলে । গলার পর, যাই গড়নেতে ঢালা হলো,—অমনি নিশ্চিন্ত ।

“শাস্ত্র শুধু পড়লে হয় না । কামিনীকাঞ্চনে থাকলে শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝতে দেয় না । সংসারের আসক্তিতে জ্ঞান লোপ হয়ে যায় ।

‘সাধ করে শিখেছিলাম কাব্যরস যত ।

কালার পিরীতে পড়ে সব হইল হত ॥’ (সকলের হাস্ত ।)

ঠাকুর ব্রাহ্মভক্তদের সহিত শ্রীযুক্ত কেশবের কথা বলিতেছেন—

“কেশবের যোগ ভোগ । সংসারে থেকে ঈশ্বরের দিকে মন আছে ।

একজন ভক্ত Convocation (বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের বাৎ-
রিক সভা) সম্বন্ধে বলিতেছেন—দেখলাম লোকে লোকারণ্য !

শ্রীরামকৃষ্ণ । অনেক লোক এক সঙ্গে দেখলে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয় । আমি দেখলে বিহ্বল হয়ে যেতাম । [তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত ।

চতুর্থ খণ্ড ।

নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজে রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[শ্রীমন্দিরদর্শন ও উদ্দীপন । শ্রীরাধার প্রেমোন্মাদ ।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন । ব্রাহ্মভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন । সঙ্গে রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি আছেন । বেলা পাঁচটা হইবে ।

৩/কাশীঘর মিত্রের বাড়ী নন্দনবাগানে । তিনি পূর্বে সদরওয়ালা ছিলেন । আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্রাহ্মজ্ঞানী । তিনি নিজের বাড়ীতেই দ্বিতলায় বৃহৎ প্রকোষ্ঠ-মধ্যে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন, আর ভক্তদের নিমন্ত্রণ করিয়া মাঝে মাঝে উৎসব করিতেন । তাঁহার স্বর্গারোহণের পর শ্রীনাথ, যজ্ঞনাথ প্রভৃতি তাঁহার পুত্রগণ কিছুদিন ঐরূপ উৎসব করিয়া-ছিলেন । তাঁহারাই ঠাকুরকে অতি যত্ন করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন ।

ঠাকুর প্রথমে আসিয়া নীচে একটি বৈঠকখানা ঘরে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন । সে ঘরে ব্রাহ্মভক্তগণ ক্রমে ক্রমে আসিয়া একত্রিত হইয়াছিলেন । শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র (ঠাকুর) প্রভৃতি ঠাকুরবংশের ভক্তগণ এই উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন ।

আহূত হইয়া ঠাকুর ভক্তসঙ্গে দ্বিতলায় উপাসনামন্দিরে গিয়া উপবেশন করিলেন । উপাসনার গৃহের পূর্বধারে বেদী রচনা হইয়াছে । দক্ষিণপশ্চিম কোণে একটী ইংরাজী বাজ্যন্ত্র রহিয়াছে (piano) । ঘরের উত্তরাংশে কয়েকখানি চেয়ার পাতা আছে । তাহারই পূর্ব ধারে দ্বার আছে—অন্তঃপুরে যাওয়া যায় ।

সন্ধ্যার সময় উৎসবের উপাসনা আরম্ভ হইবে । আদি ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায় দু একটি ভক্তসঙ্গে বেদীতে বসিয়া উপাসনা কার্য সম্পন্ন করিবেন ।

গ্রীষ্মকাল—আজ বুধবার, চৈত্র কৃষ্ণা দশমী তিথি । ব্রাহ্মভক্তেরা অনেকে নীচের বৃহৎ প্রাঙ্গণে বা বারান্দায় বেড়াইতেছেন । শ্রীযুক্ত জানকী ঘোষাল প্রভৃতি কেহ কেহ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে উপাসনা গৃহে আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছেন । তাঁহার মুখে ঈশ্বরীয় কথা শুনিবেন । ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র বেদীর সম্মুখে ঠাকুর প্রণাম করিলেন । আসন গ্রহণ করিয়া রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতিকে কহিতেছেন—

“নরেন্দ্র আমায় বলেছিল, ‘সমাজ মন্দির প্রণাম করে কি হয় ?’

“মন্দির দেখলে তাঁকেই মনে পড়ে—উদ্দীপন হয় । যেখানে তাঁর কথা হয় সেইখানে তাঁর আবির্ভাব হয়,—আর সকল তীর্থ উপস্থিত হয় । এ সব জায়গা দেখলে ভগবানকেই মনে পড়ে ।

“এক জন ভক্ত বাবলা গাছ দেখে ভাবাবিস্ট হয়েছিল !—এই মনে করে যে এই কাঠে ঠাকুর রাধাকান্তের বাগানের জন্ত কুড়ুলের বাঁট হয় ।

“এক জন ভক্তের একরূপ গুরুভক্তি যে গুরুর পাড়ার লোককে দেখে ভাবে বিভোর হয়ে গেল !

“মেঘ দেখে—নীলবসন দেখে—চিত্রপট দেখে—শ্রীমতীর কৃষ্ণের উদ্দীপন হ’তো ! তিনি এই সব দেখে উন্মত্তের ন্যায় ‘কোথায় কৃষ্ণ !’ বলে ব্যাকুল হ’তেন ।

ঘোষাল । উন্মাদ ত ভাল নয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । সে কি গো ! একি বিষয়চিন্তা করে উন্মাদ, যে অচৈতন্য হবে ? এ অবস্থা যে ভগবান চিন্তা করে হয় ! প্রেমোন্মাদ—জ্ঞানোন্মাদ—কি শুনো নাই ?

[উপায় । ঈশ্বরকে ভালবাসা ও ছয়রিপু মোড় ফিরানো ।]

একজন ব্রাহ্মভক্ত । কি উপায়ে তাঁকে পাওয়া যায় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাঁর উপর ভালবাসা ।—আর এই সদাসর্বদা বিচার—ঈশ্বরই সত্য জগৎ অনিত্য ।

“অশ্বখই সত্য—ফল দুদিনের জন্ত ।

ব্রাহ্মভক্ত । কাম, ক্রোধ, রিপু, রয়েছে, কি করা যায় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । ছয় রিপুকে ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দাও ।

“আত্মার সহিত রমণ করা, এই কামনা ।

“যারা ঈশ্বরের পথে বাধা দেয় তাদের উপর ক্রোধ । তাঁকে পাবার লোভ । ‘আমার আমার’ যদি করতে হয়—তবে তাঁকে লয়ে । যেমন—আমার কৃষ্ণ, আমার রাম । যদি অহঙ্কার করতে হয় তো বিভীষণের মত !—‘আমি রামকে প্রণাম করেছি—এ মাথা আর কারু কাছে অবনত করবো না ।’

ব্রাহ্মভক্ত । তিনিই যদি সব করাচ্ছেন তা হলে আমি পাপের জন্ম দায়ী নই ?

[Free Will ; Responsibility পাপের দায়িত্ব ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) । দুর্ব্যোধন ঐ কথা বলেছিল—

‘ভ্রূয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোহস্মি তথাকরোমি ।

“যার ঠিক বিশ্বাস—‘ঈশ্বরই কর্তা আর আমি অকর্তা’—তার পাপ কার্য্য হয় না । যে নাচতে ঠিক গিথেছে তার বেতালে পা পড়ে না ।

“অন্তর শুদ্ধ না হলে ঈশ্বর আছেন বলে বিশ্বাসই হয় না !

ঠাকুর উপাসনা-গৃহে সমবেত লোকগুলিকে দেখিতেছেন ও বলিতেছেন,—“মাঝে মাঝে একরূপ এক সঙ্গে ঈশ্বরচিন্তা ও তাঁর নামগুণ কীর্ত্তন করা খুব ভাল ।

“তবে সংসারী লোকদের ঈশ্বরে অনুরাগ ক্ষণিক—যেমন তপ্ত লৌহে জলের ছিটে দিলে, জল তাতে যতক্ষণ থাকে !

[ব্রহ্মোপাসনা ও শ্রীরামকৃষ্ণ ।]

এইবার উপাসনা আরম্ভ হইবে । উপাসনার বৃহৎ প্রকোষ্ঠ ব্রাহ্মভক্তে পরিপূর্ণ হইল । কয়েকটি ব্রাহ্মিকা ঘরের উত্তর দিকে চেয়ারে আসিয়া বসিলেন—হাতে সঙ্গীতপুস্তক ।

পিয়ানো ও হারমোনিয়াম সংযোগে ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইতে লাগিল । সঙ্গীত শুনিয়া ঠাকুরের আনন্দের সীমা রহিল না । ক্রমে উদ্বোধন,—প্রার্থনা,—উপাসনা । বেদীতে উপবিষ্ট আচার্য্যগণ বেদ হইতে মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন—

‘ওঁ পিতা নোহসি পিতা নোবোধি । নমস্তেহস্তু মা মা হিংসীঃ ।

তুমি আমাদের পিতা আমাদের সদ্বুদ্ধি দাও—তোমাকে নমস্কার !
আমাদিগকে বিনাশ করিও না ।’

ব্রাহ্মভক্তেরা সমস্তের আচার্য্যের সহিত বলিতেছেন—

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম । আনন্দরূপমমৃতং
যদ্বিভাতি । শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ । শুদ্ধমপাপবিন্দম্ ।
এইবার আচার্য্যগণ স্তব করিতেছেন—

ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়

নমস্তে চিতে সর্বলোকাশ্রয়ায় । ইত্যাদি ।

স্তোত্র পাঠের পর আচার্য্যেরা প্রার্থনা করিতেছেন—

অসতোমা সদগময় । তমসো মা জ্যোতির্গময় । মৃত্যোর্মাহমৃতং গময় ।
আবিরাবিন্মএধি । রুদ্রযন্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্ ।

স্তোত্রাদি পাঠ শুনিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন । এইবার
আচার্য্য প্রবন্ধ পাঠ করিতেছেন ।

[অক্রোধপরমানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ । অহেতুককৃপাসিন্ধু ।]

উপাসনা হইয়া গেল । ভক্তদের লুচি মিষ্টান্ন আদি খাওয়াইবার
উদ্যোগ হইতেছে । ব্রাহ্মভক্তেরা অধিকাংশই নীচের প্রাঙ্গণে ও বারা-
ণ্ডায় বায়ু সেবন করিতেছেন ।

রাত নয়টা হইল । ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে ফিরিয়া যাইতে
হইবে । গৃহস্থামীরা আহুত সংসারী ভক্তদের লইয়া খাতির করিতে
করিতে এত ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন যে ঠাকুরের আর কোন সংবাদ লইতে
পারিতেছেন না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখাল প্রভৃতির প্রতি) । কিরে কেউ ডাকেনা যে রে !

রাখাল (সক্ৰোধে) । মহাশয়, চলে আসুন—দক্ষিণেশ্বরে যাই ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) । আরে রোস্—গাড়ীভাড়া তিন টাকা দু
আনা কে দেবে !—রোক করলেই হয় না । পয়সা নাই আবার ফাঁকা
রোক ! আর এক রাত্রে খাই কোথা !

অনেকক্ষণ পরে শোনা গেল, পাতা হইয়াছে । সব ভক্তদের এক-
কালে আহ্বান করা হইল । সেই ভিড়ে ঠাকুর রাখাল প্রভৃতির সঙ্গে

দ্বিতীয় জলযোগ করিতে চলিলেন । ভিড়েতে বসিবার জায়গা পাওয়া যাইতেছে না । অনেক কষ্টে ঠাকুরকে একধারে বসানো হইল । স্থানটী অপরিষ্কার । একজন রন্ধনী ব্রাহ্মণী তরকারী পরিবেশন করিল—ঠাকুরের তরকারী খাইতে প্রবৃত্তি হইল না । তিনি মুন টাকনা দিয়া লুচি খাইলেন ও কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন গ্রহণ করিলেন ।

ঠাকুর দয়াসিদ্ধ । গৃহস্থামীদের ছোকরা বয়স । তাহারা তাঁহার পূজা করিতে জানে না বলিয়া তিনি কেন বিরক্ত হইবেন ? তিনি না খাইয়া চলিয়া গেলে যে তাহাদের অমঙ্গল হইবে । আর তাহারা ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করিয়াই এই সমস্ত আয়োজন করিয়াছে ।

আহারান্তে ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন । গাড়ী ভাড়া কে দিবে ? গৃহস্থামীদের দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে না । ঠাকুর গাড়ীভাড়া সম্বন্ধে ভক্তদের কাছে আনন্দ করিতে করিতে গল্প করিয়াছিলেন—

“গাড়ী ভাড়া চাইতে গেল । তা প্রথমে হাঁকিয়ে দিলে !—তার পর অনেক কষ্টে তিন টাকা পাওয়া গেল, দু আনা আর দিলে না ! বলে ঐতেই হবে ।”

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থ ভাগ, চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত ।

পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে । ঠাকুরের শ্রীচরণপূজা ।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আজ সন্ধ্যারতির পর দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে দেবী প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেন, ও চামর লইয়া কিয়ৎক্ষণ ব্যজন করিতেছেন ।

গ্রীষ্মকাল । জ্যৈষ্ঠ শুক্লা তৃতীয়া তিথি । গত মঙ্গলবার অমাবস্তার কথা দ্বিতীয় ভাগ পঞ্চম খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে । আজ কলিকাতা হইতে সন্ধ্যার পর রাম, কেদার (চাটুর্ঘ্যে), তারক, ঠাকুরের জন্য ফুল মিষ্টান্ন লইয়া একখানি গাড়ী করিয়া, আসিয়াছেন ।

শ্রীযুক্ত কেদারের বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশ হইবে । পরম ভক্ত । ঈশ্বরের কথা হইলেই চক্ষু জলে ভাসিয়া যায় । প্রথমে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন ;—তৎপরে কর্ত্তাভজা, নবরসিক প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের সহিত মিলিয়া অবশেষে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পদাশ্রয় লইয়াছেন । রাজসরকারে accountantএর কর্ম্ম করেন । তাঁহার বাটী কাঁচড়াপাড়ার নিকট হালিসহর গ্রামে ।

শ্রীযুক্ত তারকের বয়ঃক্রম ২৪ বৎসর হইবে । বিবাহ করিয়া-ছিলেন—কিছু দিন পরে পত্নীবিয়োগ হইল । তাঁহার বাটী বারাসাত গ্রামে । তাঁহার পিতা এক জন উচ্চদরের সাধক—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে অনেকবার দর্শন করিয়াছিলেন । তারকের মাতৃবিয়োগের পর তাঁহার পিতা দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিয়াছেন ।

তারক রামের বাটীতে সর্বদা যাতায়াত করেন । তাঁহার ও নিত্য-গোপালের সঙ্গে তিনি প্রায় ঠাকুরকে দর্শন করিতে আইসেন । এখনও একটী আফিসে কর্ম্ম করিতেছেন ; কিন্তু সর্বদাই উদাস ভাব ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কালীঘর হইতে বহির্গত হইয়া চাতালে ভূমিষ্ঠ

হইয়া মাকে প্রাণাম করিলেন । দেখিলেন রাম, মাস্টার, কেদার, তারক প্রভৃতি ভক্তেরা সেখানে দাঁড়াইয়া আছেন ।

[শ্রীযুক্ত তারকের প্রতি স্নেহ । কেদার ও কামিনীকাক্ষন ।]

ঠাকুর তারককে চিবুক ধরিয়া আদর করিতেছেন । তাঁহাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন ।

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া নিজের ঘরে মেজেতে বসিয়া আছেন । পা দুখানি বাড়াইয়া দিয়াছেন,—রাম ও কেদার নানা কুসুম ও পুষ্পমালা দিয়া শ্রীপাদপদ্ম বিভূষিত করিয়াছেন । ঠাকুর সমাধিস্থ ।

কেদারের নব রসিকের ভাব । শ্রীচরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিয়া আছেন ! তাহা হইলে শক্তি সঞ্চার হইবে—এই ধারণা । ঠাকুর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন—‘মা, আঙ্গুল ধরে আমার কি করতে পারবে !’ কেদার বিনীত ভাবে হাত জোড় করিয়া আছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেদারের প্রতি, ভাবাবেশে) । কামিনীকাক্ষনে মন টানে (তোমার)—মুখে বলি কি হবে যে আমার ওতে মন নাই !

“এগিহে পড় । চন্দন কাঠের পর আরও আছে—রূপার খনি—সোণার খনি—হীরে মাণিক । একটু উদ্দীপন হয়েছে বলে মনে কোরো না যে সব হয়ে গেছে !

ঠাকুর আবার মার সহিত কথা কহিতেছেন । বলিতেছেন,—“মা একে সরিয়ে দাও !” কেদার শুষ্ককণ্ঠ ।

রামকে সভয়ে বলিতেছেন,—‘ঠাকুর একি বলছেন !’

[অবতার ও পার্শদ]

শ্রীযুক্ত রাখালকে দেখিয়া ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইতেছেন । রাখালকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

“আমি অনেক দিন এখানে এসেছি !—তুই কবে এলি ?

ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন যে তিনি ঈশ্বরের অবতার !—আর রাখাল তাঁহার একজন পার্শদ—অন্তরঙ্গ ?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থ ভাগ, পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত ।

মহা প্রভু।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পেনেটীর মহোৎসব-ক্ষেত্রে রাখাল, রাম,
মাষ্টার, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুর সঙ্কীৰ্ত্তনানন্দে । ঠাকুর কি শ্রীগৌরাঙ্গ ?]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পেনেটীর মহোৎসব-ক্ষেত্রে বহুলোকসমাকীর্ণ রাজ-
পথে সংকীৰ্ত্তনের দলের মধ্যে নৃত্য করিতেছেন । বেলা একটা হইয়াছে ।
আজ সোমবার, জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি ।

সংকীৰ্ত্তনমধ্যে ঠাকুরকে দর্শন করিবার জগৎ চতুর্দিকে লোক কাতার
দিয়া দাঁড়াইতেছে । ঠাকুর প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নাচিতেছেন ! কেহ
কেহ ভাবিতেছে শ্রীগৌরাঙ্গ কি আবার প্রকট হইলেন ! চতুর্দিকে হরি-
ধ্বনি সমুদ্র-কল্লোলের ন্যায় বাড়িতেছে । চতুর্দিক হইতে পুষ্প বৃষ্টি ও
হরির লুট পড়িতেছে ।

নবদ্বীপ গোস্বামী প্রভু সংকীৰ্ত্তন করিতে করিতে রাঘবমন্দিরাভিমুখে
যাইতেছিলেন । এমন সময়ে ঠাকুর কোথা হইতে তীরবেগে আসিয়া
সংকীৰ্ত্তনদলের মধ্যে আসিয়া নৃত্য করিতেছেন ।

এটি রাখাল পণ্ডিতের চিঁড়ার মহোৎসব । শুরূপক্ষের
ত্রয়োদশী তিথিতে প্রতিবর্ষে হইয়া থাকে । দাস বসুনাথ প্রথমে
এই মহোৎসব করেন । রাঘব পণ্ডিত তাহার পরে বর্ষে বর্ষে করিয়া
ছিলেন । দাস বসুনাথকে নিত্যানন্দ বলিয়াছিলেন, ‘ওরে চোরা, তুই
বাড়ী থেকে কেবল পালিয়ে পালিয়ে আসিস্, আর চুরী করে প্রেম
আস্বাদন করিস্—আমরা কেউ জানতে পারি না ! আজ তোকে দণ্ড
দিব, তুই চিঁড়ার মহোৎসব করে ভক্তদের সেবা কর ।’

ঠাকুর প্রতিবৎসরই প্রায় আসেন, আজও এখানে রাম প্রভৃতি ভক্ত-

সঙ্গে আসিবার কথা ছিল । রাম সকালে কলিকাতা হইতে মাষ্টারের সহিত দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন । সেইখানে আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন ও প্রণামান্তর উত্তরের বারান্দায় আসিয়া প্রসাদ পাইলেন । রাম কলিকাতা হইতে যে গাড়ীতে আসিয়াছিলেন সেই গাড়ী করিয়া ঠাকুরকে পেনেটীতে আনা হইল । সেই গাড়ীতে রাখাল, মাষ্টার, রাম, ভবনাথ আরও দু'একটি ভক্ত—তাহার মধ্যে একজন ছাদে বসিয়াছিলেন ।

গাড়ী Magazine Road দিয়া চানকের বড় রাস্তায় (Trunk Road) গিয়া পড়িল । যাইতে যাইতে ঠাকুর ছোকরা ভক্তদের সঙ্গে অনেক ফষ্টি নাষ্টি করিতে লাগিলেন ।

[পেনেটী মহোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাভাব ।]

পেনেটীর মহোৎসব-ক্ষেত্রে গাড়ী পৌঁছিবামাত্র রাম প্রভৃতি ভক্তেরা দেখিয়া অবাক হইলেন—ঠাকুর গাড়ীতে এই আনন্দ করিতে-ছিলেন, হঠাৎ একাকী নামিয়া তীরের গায় ছুটিতেছেন ! তাঁহারা অনেক খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন যে নবদ্বীপ গোস্বামীর সংকীৰ্ত্তনের দলের মধ্যে ঠাকুর নৃত্য করিতেছেন ও মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হইতেছেন । পাছে পড়িয়া যান শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ গোস্বামী সমাধিস্থ দেখিয়া তাঁহাকে অতি যত্নে ধারণ করিতেছেন । আর চতুর্দিকের ভক্তরা হরিশ্রবণ করিয়া তাঁহার চরণে পুষ্প ও বাতাসা নিক্ষেপ করিতেছেন ও একবার দর্শন করিবার জগু ঠেলাঠেলি করিতেছেন !

ঠাকুর অর্দ্ধবাহুদশায় নৃত্য করিতেছেন । বাহু দশায় নাম ধরিলেন—
গান—যাদের হরি বলিতে নয়ন বুঝে, ঐ তারা তারা দুভাই এসেছে রে !

যারা আপনি নেচে জগৎ নাচায়, তারা তারা দুভাই এসেছে বে !

(যারা আপনি কেঁদে জগৎ কাঁদায়) (যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে)

ঠাকুরের সঙ্গে সকলে উন্মত্ত হইয়া নাচিতেছেন, আর বোধ করিতে-ছেন, ‘গৌর নিতাই আমাদের সাক্ষাতে নাচিতেছেন !’

ঠাকুর আবার নাম ধরিলেন—

গান—নদে টলমল টলমল করে—গৌর-প্রেমের হিল্লোলে রে !

সংকীৰ্ত্তনতরঙ্গ রাঘবমন্দিরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে । সেখানে

পরিক্রমণ ও নৃত্য করিয়া ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের সম্মুখে প্রণাম করিয়া, গঙ্গাকুলের বাবুদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের বাড়ীর দিকে এই তরঙ্গায়িত জনসঙ্ঘ অগ্রসর হইতেছে ।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বাড়ীতে সংকীর্ণ দলের কয়দংশ প্রবেশ করিতেছে — অধিকাংশ লোকই প্রবেশ করিতে পারিতেছে না । কেবল দ্বারদেশে ঠেলাঠেলি করিয়া উঁকি মারিতেছে ।

[শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের আগ্নিনা মধ্যে নৃত্য ।]

ঠাকুর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের আগ্নিনায় আবার নৃত্য করিতেছেন । কীর্ত্তনানন্দে গগর মাতোয়ারা ! মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হইতেছেন । আর চতুর্দিক হইতে পুষ্প ও বাতাসা চরণতলে পড়িতেছে । হরিনামের রোল আগ্নিনার ভিতর মুহুমুহু হইতেছে । সেই ধ্বনি রাজ-পথে পৌঁছিয়া সহস্র কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল । ভাগীরথী-বক্ষে যে সকল নৌকা যাতায়াত করিতেছিল তাহাদের আরোহিগণ অবাক হইয়া এই সমুদ্রকল্লোলের গায় হরিশ্রবণ শুনিতে লাগিল ও নিজেরাও ‘হরিবোল’ ‘হরিবোল’ বলিতে লাগিল ।

পেনেটীর মহোৎসবে সমবেত সহস্র সহস্র নরনারীগণ ভাবিতেছে, এই মহাপুরুষের ভিতর নিশ্চই শ্রীগৌরান্দের আবির্ভাব হইয়াছে । দুই এক জন ভাবিতেছে, ইনিই বা সাক্ষাৎ সেই শ্রীগৌরান্দ !

ক্ষুদ্র আগ্নিনায় বহুলোক একত্রিত হইয়াছে । ভক্তেরা অতি সন্তুর্পণে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে বাহিরে আনিলেন ।

[শ্রী মণি সেনের বৈঠকখানায় শ্রীরামকৃষ্ণ ।]

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে শ্রীযুক্ত মণিসেনের বৈঠকখানায় আসিয়া উপবেশন করিলেন । এই সেন পরিবারদেরই পেনেটীতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা । তাহারাই এখন বর্ষে বর্ষে মহোৎসবের আয়োজন করিয়া থাকেন ও ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করেন ।

ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিলে পর মণিসেন ও তাহাদের গুরুদেব নবদ্বীপ-গোস্বামী ঠাকুরকে কক্ষান্তরে লইয়া গিয়া প্রসাদ আনিয়া সেবা করাইলেন । কয়ৎকণ পরে রাম, রাখাল, মাফটার, ভবনাথ, প্রভৃতি

ভক্তদেরও আর এক ঘরে বসান হইল । ঠাকুর ভক্তবৎসল—নিজে দাঁড়াইয়া আনন্দ করিতে করিতে তাঁহাদিগকে খাওয়াইতেছেন ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ গোস্বামীর প্রতি উপদেশ ।

[শ্রীগোরাঙ্গের মহাভাব, প্রেম ও তিন দশা ।]

অপরাহু । রাখাল, রাম প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ঠাকুর মণি সেনের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন । নবদ্বীপ গোস্বামী প্রসাদ পাওয়ার পর ঠাণ্ডা হইয়া বৈঠকখানায় আসিয়া ঠাকুরের কাছে বসিয়াছেন ।

শ্রীযুক্ত মণি সেন ঠাকুরের গাড়ীভাড়া দিতে চাহিলেন । ঠাকুর তখন বৈঠকখানায় একটা কোঁচে বসিয়া আছেন আর বলিতেছেন,— ‘গাড়ীভাড়া ওরা (রাম প্রভৃতির) নেবে কেন ? ওরা রোজগার করে ।’

এইবার ঠাকুর নবদ্বীপ গোস্বামীর সহিত ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নবদ্বীপে প্রতি) । ভক্তি পাকলে ভাব ;—তার পর মহাভাব ;—তার পর প্রেম ;—তারপর বস্তু লাভ (ঈশ্বর লাভ) ।

“গোরাঙ্গের—মহাভাব, প্রেম ।

“এই প্রেম হলে জগৎ ত ভুল হয়ে যাবেই । আবার নিজের দেহ যে এত প্রিয় তাও ভুল হয়ে যায় ! গোরাঙ্গের এই প্রেম হয়েছিল । সমুদ্র দেখে যমুনা ভেবে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো !

“জীবের মহাভাব বা প্রেম হয় না—তাদের ভাব পর্যান্ত । আর গোরাঙ্গের তিনটি অবস্থা হ’ত । কেমন ?

নবদ্বীপ । আশ্চর্য্য হাঁ । অন্তর্দশা, অর্দ্ধবাহুদশা, আর বাহুদশা ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । অন্তর্দশায় তিনি সমাধিস্থ থাকতেন । অর্দ্ধবাহুদশায় কেবল নৃত্য করিতে পারতেন । বাহুদশায় নামসংকীৰ্ত্তন করতেন ।

নবদ্বীপ তাঁহার ছেলেটিকে আনিয়া ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ করিয়া দিলেন । ছেলেটি যুবা পুরুষ— শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন । তিনি ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন ।

নবদ্বীপ । ঘরে শাস্ত্র পড়ে । এদেশে বেদ এক রকম পাওয়াই যেত না । মোক্ষমূলর ছাপালেন তাই তবু লোকে পড়ছে ।

[পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্র । শাস্ত্রের সার যেনে নিতে হয় ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । বেশী শাস্ত্র পড়াতে আরও হানি হয় ।

“শাস্ত্রের সার জেনে নিতে হয় । তার পর আর গ্রন্থের কি দরকার ।

“সার টুকু জেনে ডুব মারতে হয়—ঈশ্বর লাভের জন্য !

“আমায় মা জানিয়ে দিয়েছেন বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা । গীতার সার,—দশবার গীতা বলে যা হয়, অর্থাৎ ‘ত্যাগী’, ‘ত্যাগী’ ।

নবদ্বীপ । ‘ত্যাগী’ ঠিক হয় না, ‘তাগী’ হয় । তা’হলেও সেই মানে । তগ্ ধাতু যঞ্ = তাগ;—তার উত্তর ইন্ প্রত্যয়—তাগী । ‘ত্যাগী’ মানেও যা ‘তাগী’ মানেও তাই ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । গীতার সার মানে—হে জীব, সব ত্যাগ করে ভগবানকে পাবার জন্য সাধন কর ।

নবদ্বীপ । ত্যাগ করবার মন কই হচ্ছে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । তোমরা গোস্বামী, তোমাদের ঠাকুর সেবা আছে ;—তোমাদের সংসার ত্যাগ করলে চলবে না । তা হলে ঠাকুর সেবা কে করবে ? তোমরা মনে ত্যাগ করবে ।

“তিনিই লোকশিক্ষার জন্য তোমাদের সংসারে রেখেছেন—তুমি হাজার মনে করো, ত্যাগ করতে পারবে না—তিনি এমন প্রকৃতি তোমায় দিয়েছেন যে তোমার সংসারের কাজই করতে হবে ।

“কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন—তুমি ‘যুদ্ধ করবো না’ কি বলছো—তুমি ইচ্ছা করলেই যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হতে পারবে না ! তোমার প্রকৃতিতে তোমায় যুদ্ধ করাবে !

[সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ । গোস্বামীর যোগ ও ভোগ ।]

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সহিত কথা কহিতেছেন—এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর আবার সমাধিস্থ হইতেছেন ! দেখিতে দেখিতে সমস্ত স্থির !—চক্ষু পলকশূন্য । নিশ্বাস বহিতেছে কি না বহিতেছে,—বুঝা যায় না !

নবদ্বীপ গোস্বামী, তাঁহার পুত্র ও ভক্তগণ অবাক হইয়া দেখিতেছেন ।

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ঠাকুর নবদ্বীপকে বলিতেছেন—

“যোগ ভোগ । তোমরা গোস্বামীবংশ তোমাদের দুইই আছে ।

“এখন কেবল তাঁকে প্রার্থনা কর, আন্তরিক প্রার্থনা—‘হে ঈশ্বর তোমার এই ভূবনমোহিনী মায়ার ঐশ্বর্য আমি চাই না, —আমি তোমায় চাই !

“তিনি তো সর্ববভূতেই আছেন—তবে ভক্ত কাকে বলে ? যে তাঁতে থাকে—যার মন প্রাণ অন্তরাত্মা সব তাঁতে গত হয়েছে ।

ঠাকুর এইবার সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন । নবদ্বীপকে বলিতেছেন—

“আমার এই যে অবস্থাটা হয় (সমাধি অবস্থা) কেউ কেউ বলে রোগ । আমি বলি, যার চৈতন্যে জগৎ চৈতন্য হয়ে রয়েছে,—তাঁর চিন্তা করে কেউ কি অচৈতন্য হয় ?”

শ্রীযুক্ত মণি সেন অভ্যাগত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের বিদায় করিতেছেন—কাহাকে এক টাকা, কাহাকে দু টাকা—যে যেমন ব্যক্তি ।

ঠাকুরকে পাঁচ টাকা দিতে আসিলেন ! শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন—‘আমার টাকা নিতে নাই’ । মণি সেন তথাপি ছাড়েন না ।

ঠাকুর তখন বলিলেন, যদি দাও তোমার গুরুর দিব্য ! মণি সেন আবার দিতে আসিলেন । তখন ঠাকুর যেন অধৈর্য হইয়া মাষ্টারকে বলিতেছেন,—‘কেমন গো নেবো ?’ মাষ্টার যোরতর আপত্তি করিয়া বলিলেন,—‘আচ্ছা না,—কোন মতেই নেবেন না !!’

শ্রীযুক্ত মণি সেনের লোকেরা তখন আম সন্দেশ কিনিবার নাম করিয়া রাখালের হস্তে টাকা দিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । আমি গুরুর দিব্য দিয়েছি !—আমি এখন খালাস । রাখাল নিয়েছে সে এখন বুঝুগ্গে !

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে গাড়ীতে আরোহণ করিলেন—দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ফিরিয়া যাইবেন ।

[নিরাকার ধ্যান ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ।]

পথে মতিশীলের ঠাকুরবাড়ী । ঠাকুর মাষ্টারকে অনেক দিন হইল

বলিতেছেন—এক সঙ্গে আসিয়া এই ঠাকুর-বাড়ীর ঝিল দর্শন করিবেন
- নিরাকার ধ্যান কিরূপ আরোপ করিতে হয়, শিখাইবার জন্ত ।

ঠাকুরের খুব সর্দি হইয়াছে । তথাপি ভক্ত সঙ্গে ঠাকুরবাড়ী দেখিবার
জন্ত গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন ।

ঠাকুরবাড়ীতে শ্রীগোরাঙ্গের সেবা আছে । সন্ধ্যার এখনও একটু
দেবী আছে । ঠাকুর ভক্তসঙ্গে শ্রীগোরাঙ্গ বিগ্রহের সন্মুখে ভূমিষ্ঠ
হইয়া প্রণাম করিলেন ।

এইবার ঠাকুরবাড়ীর পূর্ববাংশে যে ঝিল আছে তাহার ঘাটে আসিয়া
ঝিল ও মৎস্য দর্শন করিতেছেন । কেহ মাছগুলির হিংসা করে না,
মুড়ি ইত্যাদি খাবার জিনিস কিছু দিলেই বড় বড় মাছ দলে দলে
সন্মুখে আসিয়া ভক্ষণ করে—তার পর নির্ভয়ে আনন্দে লীলা করিতে
করিতে জলমধ্যে বিচরণ করে ।

ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন--“এই ছাখো কেমন মাছগুলি!
এইরূপ চিদানন্দ সাগরে এই মাছের ন্যায় আনন্দে বিচরণ করা !”

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থ ভাগ, ষষ্ঠ খণ্ড, পেনেটী

মহোৎসব-সংবাদ সমাপ্ত ।

—

চতুর্থ ভাগ—সপ্তম খণ্ড।

দক্ষিণেশ্বরে গুরুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তরঙ্গসঙ্গে ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[প্রহ্লাদচরিত্র শ্রবণ ও ভাবাবেশ । যোষিৎসঙ্গ নিন্দা]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে সেই পূর্ব পরিচিত ঘরে মেজেতে বসিয়া প্রহ্লাদচরিত্র শুনিতেন। বেলা ৮টা হইবে। শ্রীযুত রামলাল ভক্তমাল গ্রন্থ হইতে প্রহ্লাদচরিত্র পড়িতেন।

আজ শনিবার, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণ প্রতিপদ ; ১৫ ডিসেম্বর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ। মণি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার পদছায়ায় বাস করিতেছেন ;— তিনি ঠাকুরের কাছে বসিয়া প্রহ্লাদচরিত্র শুনিতেন। ঘরে শ্রীযুক্ত রাখাল, লাটু, হরিশ ; কেহ বসিয়া শুনিতেন, —কেহ যাতায়াত করিতেছেন। হাজরা বারাণ্ডায় আছেন।

ঠাকুর প্রহ্লাদচরিত্র কথা শুনিতেন শুনিতেন ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। যখন হিরণ্যকশিপু বধ হইল, নৃসিংহের রৌদ্রমূর্তি দেখিয়া ও সিংহনাদ শুনিয়া ব্রহ্মাদি দেবতারা প্রলয়শঙ্কায় প্রহ্লাদকেই নৃসিংহের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। প্রহ্লাদ বালকের ন্যায় স্তব করিতেছেন ভক্তবৎসল মেহে প্রহ্লাদের গা চাটিতেছেন। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন, ‘আহা ! আহা ! ভক্তের উপর কি ভালবাসা ! বলিতে বলিতে ঠাকুরের ভাব সমাপ্তি হইল। স্পন্দহীন,—চক্ষের কোণে প্রেমাশ্রু।

ভাব উপশমের পর ঠাকুর ছোট খাট খানিতে গিয়া বসিয়াছেন। মণি মেজের উপর তাঁহার পাদমূলে বসিলেন। ঠাকুর তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। ঈশ্বরের পথে থাকিয়া যাহারা স্ত্রী-সঙ্গ করে তাহাদের ঠাকুর ক্রোধ ও ঘৃণা প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। লজ্জা হয় না।—ছেলে হ'য়ে গেছে আবার স্ত্রী-সঙ্গ ! ঘৃণা করে না।—পশুদের মত ব্যবহার ! নাল, রক্ত, মল, মূত্র এ সব

স্বপ্না করেনা ! যে ভগবানের পাদ-পদ্ম চিন্তা করে, তার পরমা-
সুন্দরী রমণী চিতার ভস্ম বলে বোধ হয় । যে শরীর থাকবে না—যার
ভিতর কৃমি, ক্লেদ, শ্লেষ্মা, যত প্রকার অপবিত্র জিনিস—সেই শরীর
নিয়ে আনন্দ ! লজ্জা হয় না !

[ঠাকুরের প্রেমানন্দ ও মা কালীর পূজা ।]

মণি চুপ্ করিয়া হেঁট মুখ হইয়া আছেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ
আবার বলিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাঁর প্রেমের এক বিন্দু যদি কেউ পায় কামিনী-
কাঞ্চন অতি তুচ্ছ বলে বোধ হয় । মিছিরির পানা পেলে চিটে গুড়ের
পানা তুচ্ছ হ'য়ে যায় । তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা করলে, তাঁর নাম
গুণ সর্বদা কীর্তন করলে,—তাঁর উপর সেই ভালবাসা ক্রমে হয় ।

এই বলিয়া ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া ঘরের মধ্যে নাচিয়া বেড়াইতে
লাগিলেন ও গান গাইতে লাগিলেন ।—

গান—সুৰধনীর তীরে হরি বলে কে, বুঝি প্রেম দাতা নিতাই এসেছে
(নিতাই নৈলে প্রাণ জুড়াবে কিসে !)

প্রায় ১০টা বাজে শ্রীযুত রামলাল কালীঘরে মা কালীর নিত্য পূজা
সাম্প করিয়াছেন । ঠাকুর মাকে দর্শন করিবার জন্য কালীঘরে যাইতে-
ছেন । মণি সঙ্গে আছেন । মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া ঠাকুর আসনে উপবিষ্ট
হইলেন । দুই একটি ফুল মার চরণে দিলেন । নিজের মাথায় ফুল দিয়া
ধ্যান করিতেছেন । এইবার গীতচ্ছলে মার স্তব করিতেছেন ।

গান—ভবদারা ভয়হরা নাম শুনেছি তোমার ।

তাইতে এবার দিয়েছি ভার, তারো তারো না তারো মা ॥

শ্রীকথামৃত, ৩য় ভাগ, ৪০ পৃষ্ঠা ।

ঠাকুর কালীঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁর ঘরের দক্ষিণ পূর্ব
বারাণ্ডায় বসিয়াছেন । বেলা ১০টা হইবে । এখনও ঠাকুরদের ভোগ
ও ভোগারতি হয় নাই । মা কালী ও রাধাকান্তের প্রসাদি মাখন ও ফল
মূল হইতে কিছু লইয়া ঠাকুর জলযোগ করিয়াছেন । রাখাল প্রভৃতি
ভক্তেরাও কিছু কিছু পাইয়াছেন ।

দক্ষিণেশ্বর । রাখাল, মাষ্টার, লাটু প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ৩৫

ঠাকুরের কাছে বসিয়া রাখাল Smiles' Self-Help পড়িতেছেন,
—Lord Erskine এর বিষয় ।

[নিষ্কাম কৰ্ম । পূর্ণজ্ঞানী গ্রন্থ পড়ে না ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । ওতে কি বলছে ?

মাষ্টার । সাহেব ফলাকাঙ্ক্ষা না করে কর্তব্য কৰ্ম করতেন,—এই কথা বলছে । নিষ্কাম কৰ্ম ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তবে ত বেশ ! কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ—এক থানাও পুস্তক সঙ্গে থাকবে না । যেমন শুকদেব—তাঁর সব মুখে ।

“বইয়ে—শাস্ত্রে—বালিতে চিনিতে মিশেল আছে । সাধু চিনিটুকু ল'য়ে বালি ত্যাগ করে । সাধু সার গ্রহণ করে ।

শুকদেবদির নাম করিয়া ঠাকুর কি নিজের অবস্থা ইঙ্গিত করিয়া বুঝাইতেছেন ?

বৈষ্ণবচরণ কীৰ্ত্তনিয়া আসিয়াছেন । তিনি সুবোলমিলন কীৰ্ত্তন শুনাইলেন ।

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীযুত রামলাল থালায় করিয়া ঠাকুরের জন্য প্রসাদ আনিয়া দিলেন । সেবার পর—ঠাকুর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন ।

রাত্রি মণি নবতে শয়ন করিলেন । শ্রীশ্রীমা যখন দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে ঠাকুরের সেবার জন্য আসিতেন তখন এই নবতেই বাস করিতেন । কয়েক মাস হইল তিনি কামারপুকুরে শুভাগমন করিয়াছেন ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

[শ্রীরাখাল, লাটু, জনাইয়ের মুখ্যো প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মণির সঙ্গে পশ্চিমের গোল বারাণ্ডায় বসিয়া আছেন । সম্মুখে দক্ষিণবাহিনী ভাগীরথী । কাছেই করবী, বেল, জুঁই, গোলাপ, কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি নানাকুসুমবিভূষিত পুষ্পবৃক্ষ । বেলা ১০টা হইবে ।

আজ রবিবার, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা দ্বিতীয়া, ১৬ই ডিসেম্বর ১৮৮৩

খৃষ্টাব্দ । ঠাকুর মণিকে দেখিতেছেন ও গান গাহিতেছেন—

তারিতে হবে মা তারা হয়েছি শরণাগত ।

হইয়া রয়েছি যেন পিঞ্জরের পাখির মত ॥

অসংখ্য অপরাধী আমি, জ্ঞানশূন্য মিছে ভ্রমি,

মায়াতে মোহিত হ'য়ে বৎসহারা গাভীর মত ।

[রামচিন্তা । সীতার ন্যায় ব্যাকুলতা ।]

“কেন ? পিঞ্জরের পাখীর মত হ'তে যাব কেন ? হাক্ ! থু !”

কহিতে কহিতে ভাবাবিস্ম—শরীর, মন সব স্থির ও চক্ষু ধারা ।

কিয়ৎক্ষণ পরে বলিতেছেন, ‘ম’, সীতার মত করে দাঁও
—একবারে সব ভুল—দেহভুল, যোনি, হাত, পা, স্তন,—কোনো
দিকেই হুঁস নাই !—কেবল এক চিন্তা—‘কোথায় রাম !’

কিরূপ ব্যাকুল হলে ঈশ্বর লাভ হয়—মণিকে এইটী শিখাইবার
জগুই কি ঠাকুরের সীতার উদ্দীপন হইল ? সীতা রামময়জীবিতা,—
রামচিন্তা করে উন্মাদিনী,—দেহ যে এমন প্রিয় তাহাও ভুলে গেছেন !

বেলা ৪টা বাজিয়াছে । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে সেই ঘরে বসিয়া
আছেন । জনাইয়ের মুখুযো বাবু একজন আসিয়াছেন—তিনি শ্রীযুক্ত
প্রাণকৃষ্ণের জ্ঞাতি । তাঁহার সঙ্গে একটী শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বন্ধু । মণি,
রাখাল, লাটু, হরিষ, যোগীন, প্রভৃতি ভক্তেরাও আছেন ।

যোগীন দক্ষিণেশ্বরের সার্বর্ণ চৌধুরীদের ছেলে । তিনি আজ কাল
প্রায় প্রত্যহ বৈকালে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন ও রাত্রে চলিয়া
যান । যোগীন এখনও বিবাহ করেন নাই ।

মুখুযো (প্রণামানন্তর) । আপনাকে দর্শন করে বড় আনন্দ হোলো ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তিনি সকলের ভিতরই আছেন । সকলের ভিতর সেই
সোণা কোনো খানে বেশী প্রকাশ । সংসারে অনেক মাটী চাপা ।

মুখুযো (সহাস্ত্রে) । মহাশয়, ঐহিক পারত্রিক কি তফাৎ ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । সাধনের সময় ‘নেতি’ ‘নেতি’ করে ত্যাগ করতে হয় ।

তাঁকে লাভের পর বুঝা যায় তিনিই সব হয়েছেন ।

“যখন রামচন্দ্রের বৈরাগ্য হোলো দশরথ বড় ভাবিত হয়ে বশিষ্ঠ-

দক্ষিণেশ্বর । রাখাল, জনাইয়ের মুখ্যে প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ৩৭

দেবের শরণাগত হলেন—যাতে রাম সংসার ত্যাগ না করেন । বশিষ্ঠ রামচন্দ্রের কাছে গিয়ে দেখেন, তিনি বিমনা হয়ে বসে আছেন—অন্তরে তীব্র বৈরাগ্য । বশিষ্ঠ বল্লেন, রাম, তুমি সংসার ত্যাগ করবে কেন ? সংসার কি তিনি ছাড়া ? আমার সঙ্গে বিচার করো । রাম দেখলেন, সংসার সেই পরব্রহ্ম থেকেই হয়েছে,—তাই চুপ করে রহিলেন ।

“যেমন যে জিনিষ থেকে ঘোল, সেই জিনিষ থেকে মাখম । তখন ঘোলেরই মাখম, মাখমেরই ঘোল ! অনেক কষ্টে মাখম তুললে (অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হোলো) ;—তখন দেখছো যে মাখম থাকলেই ঘোলও আছে, —যেখানে মাখম সেই খানেই ঘোল । ব্রহ্ম আছেন বোধ থাকলেই—জীব জগৎ—চতুর্বিংশতি তত্ত্ব—ও আছে ।

[ব্রহ্মজ্ঞানের একমাত্র উপায় ।]

“ব্রহ্ম যে কি বস্তু মুখে বলা যায় না । সব জিনিষ উচ্ছিষ্ট হয়েছে (অর্থাৎ মুখে বলা হয়েছে), —কিন্তু ব্রহ্ম কি,—কেউ মুখে বলতে পারে নাই— তাই উচ্ছিষ্ট হয় নাই ! এ কথাটা বিদ্যাসাগরকে বলেছিলাম—বিদ্যাসাগর শুনে ভারী খুসী !

“বিষয় বুদ্ধির লেশ থাকলে এই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না । কামিনীকাঞ্চন মনে আদৌ থাকবে না, তবে হবে । গিরিরাজকে পার্শ্ববতী বল্লেন, ‘বাবা ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও তা হলে সাধু সঙ্গ কর’ ।

ঠাকুর কি বলছেন, সংসারী লোক বা সন্ন্যাসী যদি কামিনীকাঞ্চন নিয়ে থাকে তা হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না ?

[যোগভ্রষ্ট । ব্রহ্মজ্ঞানের পর সংসার ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার মুখ্যোকে সম্বোধন করে বলছেন—

“তোমাদের ধন ঐশ্বর্য আছে অথচ ঈশ্বরকে ডাকছো, এখুব ভাল । গীতায় আছে যারা যোগভ্রষ্ট তারাই ভক্ত হয়ে ধনীর ঘরে জন্মায় ।

মুখ্যে (বন্ধুর প্রতি, সহাস্ত্রে)—“শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগ-ভ্রষ্টোহভিজায়তে ।”

শ্রীরামকৃষ্ণ । তিনি মনে করিলে জ্ঞানীকে সংসারেও রাখতে পারেন । তাঁর ইচ্ছাতে জীব জগৎ হয়েছে । তিনি ইচ্ছাময়—

মুখ্যো (সহাস্ত্র) । তাঁর আবার ইচ্ছা কি ? তাঁর কি কিছু অভাব আছে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্ত্র) । তাতেই বা দোষ কি ? জল স্থির থাকলেও জল,—তরঙ্গ হলেও জল ।

[জীবজগৎ কি মিথ্যা ?]

“সাপ চূপ করে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকলেও সাপ,—আবার তির্যাক্-গতি হয়ে এঁকে বেঁকে চললেও সাপ ।

“বাবু যখন চূপ করে আছে তখনও যে ব্যক্তি,—যখন কাজ করছে তখনও সেই ব্যক্তি ।

“জীব জগৎকে বাদ দেবে কেমন করে,—তাহলে যে ওজনে কম পড়ে ! বেলের বীচি, খোলা, বাদ দিলে সমস্ত বেলের ওজন পাওয়া যায় না ।

“ব্রহ্ম নির্লিপ্ত । বায়ুতে স্নগন্ধ দুর্গন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত । ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ । সেই আদ্যাশক্তিতেই জীব জগৎ হয়েছে ।

[সমাধিযোগের উপায়—ক্রন্দন । ভক্তিযোগ ও ধ্যানযোগ ।]

মুখ্যো । কেন যোগভ্রষ্ট হয় !

শ্রীরামকৃষ্ণ । “গর্ভে ছিলাম যোগে ছিলাম, ভূমে পড়ে খেলাম মাটি । ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়ী কিসে কাটি ॥”

“কামিনী কাঞ্চনই মায়া । মন থেকে ঐ দুটি গেলেই মোক্ষ আত্মা—পরমাত্মা চুম্বক পাথর, জীবাত্মা যেন একটি ছুঁচ,—তিনি টেনে নিলেই যোগ । কিন্তু ছুঁচে যদি মাটিমাথা থাকে চুম্বকে টানে না,—মাটি সাফ করে দিলে আবার টানে ।

“কামিনীকাঞ্চন মাটি পরিস্কার করতে হয় ।

মুখ্যো । কিরূপে পরিস্কার হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাঁর জন্য ব্যাকুল হয়ে কাঁদো—সেই জল মাটিতে লাগলে ধুয়ে ধুয়ে যাবে । যখন খুব পরিস্কার হবে তখন চুম্বকে টেনে লবে । যোগ তবেই হবে ।

দক্ষিণেশ্বর । জনাইয়ের মুখ্যে, রাখাল, লাটু প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ১৩৯

মুখ্যে । আহা কি কথা !

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাঁর জন্ম কঁদতে পারলে দর্শন হয়—সমাধি হয় । যোগে সিদ্ধ হলেই সমাধি । কঁদলে কুন্তক আপনি হয় ;—তার পর সমাধি ।

“আর এক আছে ধ্যান । সহস্রারে শিব বিশেষরূপে আছেন । তাঁর ধ্যান । শরীর সর, মন বুদ্ধি জল । এই জলে সেই সচ্চিদানন্দ সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ে । সেই প্রতিবিম্ব সূর্য্য ধ্যান করতে করতে সত্য সূর্য্য তাঁর রূপায় দর্শন হয় ।

[‘সাধুসঙ্গ কর ও আশ্রোক্তারি (বকলমা) দাও’ ।]

“কিন্তু সংসারী লোকের সর্বদাই সাধুসঙ্গ দরকার । সকলেরই দরকার । সম্যাসীরও দরকার । তবে সংসারীদের বিশেষতঃ । রোগ লেগেই আছে—কামিনীকান্ধনের মধ্যে সর্বদা থাকতে হয় ।

মুখ্যে । আজ্ঞা, রোগ লেগেই আছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাঁকে আশ্রোক্তারি (বকলমা) দাও—যা হয় তিনি করুন । তুমি বিড়ালছেনার মত কেবল তাঁকে ডাকো—বাকুল হয়ে । তার মা যেখানে তাকে রাখে—সে কিছু জানে না ;—কখনও বিছানার উপর রাখছে, —কখনও হেঁশালে ।

[প্রবর্তক শাস্ত্র পড়ে । সাধনার পর তবে দর্শন ।]

মুখ্যে । গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র পড়া ভাল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । শুধু পড়লে শুনে কি হবে ? কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ খেয়েছে । ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়—আবার তাঁর সঙ্গে আলাপ করা যায় ।

“প্রথমে প্রবর্তক । সে পড়ে, শুনে । তার পর সাধক, —তাঁকে ডাকছে, ধ্যান চিন্তা করছে, নাম গুণ কীর্ত্তন করছে । তার পর সিদ্ধ, —তাঁকে বোধে বোধ করেছে, দর্শন করেছে । তার পর সিদ্ধের সিদ্ধ ; যেমন চৈতন্যদেবের অবস্থা—কখনও বাৎসলা, কখনও মধুর, ভাব ।

মণি, রাখাল, যোগীন, লাটু প্রভৃতি ভক্তেরা এই সকল দেবদুর্লভ তত্ত্বকথা অবাক হইয়া শুনিতেছেন ।

এইবার মুখুয্যেরা বিদায় লইবেন । তাঁহারা প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন । ঠাকুরও যেন তাঁদের সম্মানার্থ উঠিয়া দাঁড়াইলেন ।

মুখুয্যে (সহাস্তে) । আপনার আবার উঠা বস ।—

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । আবার উঠাবসাতেই বা ক্ষতি কি ? জল স্থির হলেও জল,—আর হেললে ঢুললেও জল । ঝড়ের এঁটোপাতা—হাওয়াতে যে দিকে লয়ে যায় । আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন ও বেদান্তসম্বন্ধে গুহ্য ব্যাখ্যা ।

(অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ । জগৎ কি মিথ্যা ?)

Identity of the Undifferentiated and Differentiated.

জনায়েের মুখুয্যেরা চলিয়া গেলেন । মণি ভাবিতেছেন, বেদান্তদর্শন মতে ‘সব স্বপ্নবৎ’ । তবে জীব, জগৎ, আমি, এ সব—কি মিথ্যা ?

মণি একটু একটু বেদান্ত দেখিয়াছেন । আবার বেদান্তের অস্ফুট প্রতিধ্বনি Kant, Hegel প্রভৃতি জার্মান পণ্ডিতদের বিচার একটু পড়েছেন । কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দুর্বল মানুষের ন্যায় বিচার করেন নাই,—জগন্মাতা তাঁহাকে সমস্ত দর্শন* করাইয়াছেন । মণি তাই ভাবছেন ।

কিয়ৎক্ষণ পরেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মণির সহিত একাকী পশ্চিমের গোল বারাণ্ডায় কথা কহিতেছেন । সম্মুখে গঙ্গা—কুল কুল রবে দক্ষিণে প্রবাহিত হইতেছেন । শীতকাল—সূর্য্যদেব এখনও দেখা যাইতেছেন, দক্ষিণপশ্চিম কোণে । যাঁহার জীবন বেদময়—যাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্য বেদান্তবাক্য—যাঁহার শ্রীমুখ দিয়া শ্রীভগবান্ কথা কন—যাঁহার কথামৃত লইয়া বেদ, বেদান্ত, শ্রীভাগবত গ্রন্থাকার ধারণ করে, সেই অহেতুককৃপাসিন্ধু পুরুষ গুরুরূপ ধারণ করিয়া কথা কহিতেছেন ?

দক্ষিণেশ্বর । জনাইয়ের মুখুয্যো, রাখাল, লাটু প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ৪১

মণি । জগৎ কি মিথ্যা ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । মিথ্যা কেন ? ওসব বিচারের কথা ।

“প্রথমটা, ‘নেতি’ নেতি’ বিচার করবার সময়, তিনি জীব নন, জগৎ নন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব নন, হয়ে যায় ;—‘এ সব স্বপ্নবৎ’ হয়ে যায় । তার পর অনুলোম বিলোম । তখন তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন বোধ হয় ।

“তুমি সিঁড়ি ধরে ধরে ছাদে উঠলে । কিন্তু যতক্ষণ ছাদ বোধ ততক্ষণ সিঁড়িও আছে । যার উচুবোধ আছে, তার নীচুবোধও আছে ।

“আবার ছাদে উঠে দেখলে—যে জিনিষে ছাদ তৈয়ের হয়েছে—ইট চূণ সুরকী—সেই জিনিসেই সিঁড়ি তৈয়ের হয়েছে ।

“আর যেমন বেলের কথা বলেছি ।

“যার ‘অটল’ আছে তার টলও আছে

“আমি যাবার নয় । ‘আমি যট’ যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণ জীব জগৎও রয়েছে । তাঁকে লাভ করলে দেখা যায় তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন !—শুধু বিচারে হয় না ।

“শিবের দুই অবস্থা । যখন সমাধিস্থ—মহাযোগে বসে আছেন—তখন আত্মারাম ! আবার যখন সে অবস্থা থেকে নেবে আসেন—একটু ‘আমি’ থাকে—তখন ‘রাম’ ‘রাম’ করে নৃত্য করেন !

ঠাকুর শিবের অবস্থা বর্ণনা করিয়া কি নিজের অবস্থা ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন ?

সন্ধ্যা হইল । ঠাকুর জগন্মাতার নাম ও তাঁহার চিন্তা করিতেছেন । ভক্তেরাও নির্জনে গিয়া যে যার ধ্যানাদি করিতে লাগিলেন । এ দিকে ঠাকুরবাড়িতে মা কালীর মন্দিরে, শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরে, ও দ্বাদশ শিবমন্দিরে আরতি হইতে লাগিল ।

আজ কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া তিথি । সন্ধ্যার কিয়ৎকাল পরে চন্দ্রোদয় হইল । সে আলো মন্দির-শীর্ষ, চতুর্দিকের তরুলতা, ও মন্দিরের পশ্চিমে ভাগীরথী বক্ষে পড়িয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে । এই সময় সেই পূর্বপরিচিত ঘরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিয়া আছেন । মণি মেজেতে বসিয়া আছেন । মণি বৈকালে বেদান্ত সম্বন্ধে যে কথার

অবতারণা করিয়াছিলেন ঠাকুর আবার সেই কথাই कहিতেছেন ।

[সব চিন্ময় দর্শন । খাজাঞ্জির মথুরকে পত্র লেখা ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) । জগৎ মিথ্যা কেন হবে ?
ও সব বিচারের কথা । তাঁকে দর্শন হলে তখন বোঝা যায়
যে তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন ।

“আমায় মা কালীঘরে দেখিয়ে দিলেন যে মা-ই সব হয়েছেন ।
দেখিয়ে দিলেন সব চিন্ময় !—প্রতিমা চিন্ময় !—বেদী চিন্ময় !—কোশা-
কুশী চিন্ময় !—চৌকাট চিন্ময় !—মার্বেরলের পাথর—সব চিন্ময় !

“ঘরের ভিতর দেখি—সব যেন রসে রয়েছে ! সচ্চিদানন্দ রসে ।

“কালীঘরের সম্মুখে একজন দুর্দলোককে দেখলাম ;—কিন্তু তারও
ভিতরে তাঁর শক্তি জ্বল্ জ্বল্ করছে দেখলাম !

“তাইত বিড়ালকে ভোগের লুচি খাইয়েছিলাম । দেখলাম,
মা-ই সব হয়েছেন—বিড়াল পর্যন্ত ! তখন খাজাঞ্জি সেজ
বাবুকে চিঠি লিখলে যে ভট্‌চাজ্জি মহাশয় ভোগের লুচি বিড়ালদের
খাওয়াচ্ছেন । সেজ বাবু আমার অবস্থা বুঝতো । পত্রের উত্তরে লিখলে,
‘উনি যা করেন তাতে কোন কথা বোলো না ।’

“তাঁকে লাভ করলে এইগুলি ঠিক দেখা যায় । তিনিই জীব, জগৎ,
চতুর্বিংশতিতত্ত্ব, হয়েছেন ।

“তবে যদি তিনি ‘আমি’ একবারে পুঁছে দেন তখন যে কি হয় মুখে
বলা যায় না । রামপ্রসাদ যেমন বলেছে —

‘তখন তুমি ভাল কি আমি ভাল সে তুমিই বুঝবে ।’

“সে অবস্থাও আমার এক একবার হয় ।

“বিচার করে একরকম দেখা যায়,—আর তিনি যখন দেখিয়ে দেন
তখন আর একরকম দেখা যায় ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরদর্শন । উপায় প্রেম ।

পরদিন সোমবার, বেলা আটটা হইল । ঠাকুর সেই ঘরে বসিয়া আছেন । রাখাল, লাটু, প্রভৃতি ভক্তেরাও আছেন । মণি মেঝেতে বসিয়া আছেন । শ্রীযুক্ত মধু ডাক্তারও আসিয়াছেন । তিনি ঠাকুরের কাছে সেই ছোট খাটটির উপরেই বসিয়া আছেন । মধু ডাক্তার প্রবীণ— ঠাকুরের অস্থখ হইলে প্রায় তিনি আসিয়া দেখেন । বড় রসিক লোক ।

মণি ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রণামানন্তর উপবেশন করিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কথাটা এই—সচ্চিদানন্দ প্রেম !

[ঠাকুরের সীতামূর্তি দর্শন । গৌরী পণ্ডিতের কথা ।]

“কিরূপ প্রেম ? ঈশ্বরকে কিরূপ ভালবাসতে হবে ? গৌরী বল্ন্তো রামকে জানতে গেলে সীতার মত হতে হয় ; ভগবানকে জানতে ভগবতীর মত হতে হয়,—ভগবতী যেমন শিবের জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন সেইরূপ তপস্যা করতে হয় ; পুরুষকে জানতে গেলে প্রকৃতিভাব আশ্রয় করতে হয়—সখিভাব, দাসীভাব, মাতৃভাব ।

“আমি সীতামূর্তি দর্শন করেছিলাম । দেখলাম সব মনটা রামেতেই রয়েছে । যোনি, হাত, পা, বসন, ভূষণ কিছুতেই দৃষ্টি নাই । যেন জীবনটা রামময়—রাম না থাকলে, রামকে না পেলে, প্রাণে বাঁচবে না !

মণি । আজ্ঞা হাঁ,—যেন পাগলিনী !

শ্রীরামকৃষ্ণ । উন্মাদিনী !—ইয়া ! ঈশ্বরকে লাভ করতে গেলে পাগল হতে হয় ।

“কামিনীকাক্ষনে মন থাকলে হয় না । কামিনীর সঙ্গে রমণ,—তাতে কি সুখ !—ঈশ্বরদর্শন হলে রমণ-সুখের কোটীগুণ আনন্দ হয় । গৌরী বল্ন্ত, মহাভাব হ'লে শরীরের সব ছিদ্র—লোমকূপ পর্য্যন্ত—মহাযোনি হয়ে যায় । এক একটি ছিদ্রে আত্মার সহিত রমণ-সুখ বোধ হয় !

[গুরু পূর্ণ জ্ঞানী হবেন ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হয় । গুরুর মুখে শুনে নিতে হয়,—কি করলে তাঁকে পাওয়া যায় ।

“গুরু নিজে পূর্ণ জ্ঞানী হলে তবে পথ দেখিয়ে দিতে পারে ।

“পূর্ণজ্ঞান হলে বাসনা যায়,—পাঁচ বছরের বালকের স্বভাব হয় । দত্তাত্রেয় আর জড়ভরত,—এদের বালকের স্বভাব হয়েছিল ।

মণি । আচ্ছ, এদের খপর আছে ;—আরও এদের মত কত জ্ঞানী লোক হয়ে গেছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ । জ্ঞানীর সব বাসনা যায়,—যা থাকে তাতে কোন হানি হয় না । পরশমণিকে ছুঁলে তরবার সোণা হয়ে যায়,—তখন আর সে তরবারে হিংসার কাজ হয় না । সেইরূপ জ্ঞানীর কাম ক্রোধের কেবল ভঙ্গীটুকু থাকে । নামমাত্র । তাতে কোন অনিষ্ট হয় না ।

মণি । আপনি যেমন বলেন জ্ঞানী তিন গুণের অতীত হয় । সদ্ধ রজ তমঃ, কোন গুণেরই বশ নন । এরা তিন জনেই ডাকাত ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঐগুলি ধারণা করা চাই ।

মণি । পূর্ণ জ্ঞানী পৃথিবীতে বোধ হয় তিন চার জনার বেশী নাই ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কেন পশ্চিমের মঠে অনেক সাধু সন্ন্যাসী দেখা যায় ।

মণি । আচ্ছ, সে সন্ন্যাসী আমিও হতে পারি !

শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথায় কিয়ৎক্ষণ মণিকে এক দৃষ্টে দেখিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) । কি সব ছেড়ে ?

মণি । মায়া না গেলে কি হবে ? মায়াকে যদি জয় না করতে পারে শুধু সন্ন্যাসী হয়ে কি হবে ?

সকলেই কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া আছেন ।

[ত্রিগুণাতীত ভক্ত যেমন বালক ।]

মণি । আচ্ছ, ত্রিগুণাতীত ভক্তি কাকে বলে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । সে ভক্তি হলে সব চিন্ময় দেখে । চিন্ময় শ্যাম !

চিন্ময় ধাম ! ভক্তও চিন্ময় ! সব চিন্ময় ! এ ভক্তি কম লোকের হয় ।

দক্ষিণেশ্বর । রাখাল, লাটু, শ্রীমধুডাক্তার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ৪৫

ডাক্তার মধু (সহাস্ত্রে) । ত্রিগুণাতীত ভক্তি,—অর্থাৎ ভক্ত কোন গুণের বশীভূত নয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্ত্রে) । ইয়া ! যেমন পাঁচ বছরের বালক—কোন গুণের বশ নয় ।

মধ্যাহ্নে সেবার পর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একটু বিশ্রাম করিতেছেন । শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিক আসিয়া প্রণাম করিলেন ও মেজেতে আসন গ্রহণ করিলেন । মণিও মেজেতে বসিয়া আছেন । ঠাকুর শুইয়া শুইয়া মণি মল্লিকের সঙ্গে মাঝে মাঝে একটা একটা কথা কহিতেছেন ।

মণি মল্লিক । আপনি কেশবসেনকে দেখতে গিছিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ । এখন কেমন আছেন ?

মণি মল্লিক । কিছু সারেন নাই ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । দেখলাম বড় রাজসিক,—অনেকক্ষণ বসিয়েছিল,—তার পর দেখা হল ।

ঠাকুর উঠিয়া বসিলেন । ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন ।

(শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত । ঠাকুর রাম রাম করিয়া পাগল)

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) । আমি রাম রাম করে পাগল হয়ে ছিলাম । সন্ন্যাসীর ঠাকুর রামলালকে লয়ে লয়ে বেড়াতাম । তাকে নাওয়াতাম, খাওয়াতাম, শোয়াতাম । যেখানে যাবো,—সঙ্গে করে লয়ে যেতাম । ‘রামলালা রামলালা’ করে পাগল হয়ে গেলাম ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

বিল্বমূলে ও পঞ্চবটীতলায় শ্রীরামকৃষ্ণ ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিল্ববৃক্ষের নিকট মণির সহিত কথা কহিতেছেন । বেলা প্রায় নয়টা হইবে ।

আজ বুধবার, ১৯শে ডিসেম্বর ১৮৮৩ । কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথি ।

বিল্বতল ঠাকুরের সাধন ভূমি । অতি নির্জন স্থান । উত্তরে বারুদ খানা ও প্রাচীর । পশ্চিমে ঝাউ গাছগুলি সর্বদাই প্রাণ-উদাসকারী

সোঁসোঁ। শব্দ করিতেছে ; পরেই ভাগীরথী । দক্ষিণে পঞ্চবটী দেখা যাইতেছে । চতুর্দিকে এত গাছপালা দেবালয়গুলি দেখা যাইতেছে না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) । কামিনীকান্ধন ত্যাগ না করলে কিন্তু হবে না ।

মণি । কেন ? বশিষ্ঠদেব ত রামচন্দ্রকে বলেছিলেন,—রাম, সংসার যদি ঈশ্বর ছাড়া হয় তা হলে সংসার ত্যাগ করো ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈষৎ হাসিয়া) । সে রাবণবধের জন্য !—তাই রাম সংসারে রইলেন—বিবাহ করলেন ।

মণি নির্বাক হইয়া কাষ্ঠের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন !

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া যাইবার জন্য পঞ্চবটী অভিমুখে গমন করিলেন ।

[‘নিরাকার সাধনা বড় কঠিন ।’]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটী তলায় মণির সহিত কথা কহিতেছেন । বেলা প্রায় ১০টা হইল ।

মণি । আজ্ঞা, নিরাকার সাধন কি হয় না ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । হবে না কেন ? ও পণ বড় কঠিন ।* আগেকার ঋষিরা অনেক তপস্যার দ্বারা বোধে বোধ করত, — ব্রহ্ম কি বস্তু অনুভব কর্তো । ঋষিদের খাটুনি কত ছিল !—নিজেদের কুটীর থেকে সকাল বেলা বেরিয়ে যেত,—সমস্ত দিন তপস্যা করে, সন্ধ্যার পর আবার ফিরতো ! তার পর এসে একটু ফলমূল খেতো ।

“এ সাধনে একবারে বিষয় বুদ্ধির লেশ মাত্র থাকলে হবে না । রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ এ সব বিষয় মনে আদপে থাকবে মা । তবে শুদ্ধ মন । সেই শুদ্ধমন ও যা, শুদ্ধআত্মাও তা । মনেতে কামিনীকান্ধন এক-বারে থাকবে না—

“তখন আর একটা অবস্থা হয় । ‘ঈশ্বরই কর্তা আমি অকর্তা ।’ আমি না হ’লে চলবে না এরূপ জ্ঞান থাকবে না—সুখে দুঃখে ।

* ক্লেশোহধিকতরন্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।

অব্যক্তাঙ্গিগতি দুঃখং দেহবন্তিরবাপ্যতে ॥ গীতা ।

“একটী মঠের সাধুকে দুর্দলোকে মেরেছিল,—সে অজ্ঞান হয়ে গিছিলো । চৈতন্য হলে যখন জিজ্ঞাসা করলেকে তোমায় দুধ খাওয়াচ্ছে ? সে বলেছিল, যিনি আমায় মেরেছেন তিনিই দুধ খাওয়াচ্ছেন ।

মণি । আজ্ঞা হাঁ, জানি ।

[স্থিত সমাধি ও উন্মনা সমাধি ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । না শুধু জানলে হবে না ;— ধারণা করা চাই ।

“বিশয়চিন্তা সময়ে সমাধি হতে দেহ না ।

“একবার বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ হলে স্থিত-সমাধি হয় । আমার স্থিত-সমাধিতে দেহ ত্যাগ হতে পারে, কিন্তু ভক্তি ভক্ত নিয়ে একটু থাকবার বাসনা আছে । তাই একটু দেহের উপরেও মন আছে ।

“আর এক আছে উন্মনা-সমাধি । ছড়ানো মন হঠাৎ কুড়িয়ে আনা । ওটা তুমি বুঝেছ ?

মণি । আজ্ঞা হাঁ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ছড়ানো মন হঠাৎ কুড়িয়ে আনা । বেশীক্ষণ এ সমাধি থাকে না, বিষয়চিন্তা এসে ভঙ্গ হয়—যোগীর যোগ ভঙ্গ হয় ।

“ও দেশে দেয়ালের ভিতর গর্তে নেউল থাকে । গর্তে যখন থাকে বেশ আরামে থাকে । কেউ কেউ ন্যাজে ইট বেঁধে দেয়—তখন ইটের জোরে গর্ত থেকে বেরিয়ে পড়ে । যত বার গর্তের ভিতর গিয়ে আরামে বসবার চেষ্টা করে—ততবারই ইটের জোরে বাহিরে এসে পড়ে । বিষয়-চিন্তা এমনি—যোগীকে যোগভ্রষ্ট করে ।

“বিষয়ী লোকদের এক একবার সমাধির অবস্থা হতে পারে । সূর্য্যোদয়ে পদ্ম ফোটে, কিন্তু সূর্য্য মেঘেতে ঢাকা পড়লে আবার পদ্ম মুদিত হয়ে যায় । বিষয় মেঘ ।

মণি । সাধন করলে জ্ঞান আর ভক্তি দুই কি হয় না ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । ভক্তি নিয়ে থাকলে দুইই হয় । দরকার হয় তিনিই ব্রহ্মজ্ঞান দেন । খুব উচু ঘর হলে একাধারে দুইই হতে পারে ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থ ভাগ, সপ্তম খণ্ড সমাপ্ত ।

চতুর্থ ভাগ—অষ্টম খণ্ড ।

দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে গুরুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

সমাধিমন্দিরে । ঈশ্বর দর্শন ও ঠাকুরের পরমহংস অবস্থা ।)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ঘরের দক্ষিণপূর্বের বারান্দায় রাখাল, লাটু, মণি হরীশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন । বেলা নয়টা হবে । রবিবার, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণানবমী ।

মণির গুরুগৃহে বাসের আজ দশম দিবস ।

শ্রীযুক্ত মনমোহন কোন্সগর হইতে সকাল বেলা আসিয়াছেন । ঠাকুরকে দর্শন করিয়া ও কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আবার কলিকাতায় যাইবেন । হাজরাও ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন । নীলকণ্ঠের দেশের একজন বৈষ্ণব ঠাকুরকে গান শুনাইতেছেন । বৈষ্ণব প্রথমে নীলকণ্ঠের গান গাইলেন,—

শ্রীগৌরঙ্গ সুন্দর নব-নটবর তপতকাঞ্চন কায় ।

করে স্বরূপ বিভিন্ন, লুকাইয়ে চিহ্ন, অবতীর্ণ নদীয়ায় ॥

কলিঘোর অন্ধকার বিনাশিতে, উন্নত উজ্জ্বল রস প্রকাশিতে,

তিন বাজ্ঞা তিন বস্ত্র আশ্বাদিতে এসেছ তিনেরি দায় ;—

সে তিন পরশে, বিরস-হরষে, দরশে জগৎ মাতায় ॥

নীলাঙ্গ হেমাঙ্গে করিয়ে আবৃত, ফ্লাদিনীর পূরাও দেহভেদগত ;

অধিকৃতমহাভাবে বিভাবিত, সাদ্বিকাদি মিলে যায় ;

সে ভাব আশ্বাদনের জন্য, কান্দেন অরণ্যে, প্রেমের বন্যে ভেসে যায় ॥

নবীন সন্ন্যাসী, সুতীর্থ অগ্নেন্দ্রী, কভু নীলাচলে কভু যান কাশী ;

অযাচকে দেন প্রেম রাশি রাশি ; নাহি জাতিভেদ তায় ;

দ্বিজ নীলকণ্ঠ ভণে, এই বাজ্ঞা মনে, কবে বিকাব গৌরের পায় ।

পরের গানটী মানস-পূজা সম্বন্ধে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি) । এ গান (মানস পূজা) কি এক রকম লাগল ।

হাজরা । এ সাধকের নয়,—জ্ঞান দ্বীপ, জ্ঞান প্রতিমা !

[পঞ্চবটীতে তোতাপুরীর ক্রন্দন । পদ্মলোচনের ক্রন্দন] ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমার কেমন কেমন বোধ হলো !

“আগেকার সব গান ঠিক ঠিক । পঞ্চবটীতে, ন্যাঙ্গটার কাছে আমি গান গেয়েছিলাম,—‘জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে ।’ আর একটা গান—‘দোষ কারু নয় গো মা, আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা ।’

ন্যাংটা অতো জ্ঞানী,—মানে না বুঝেই কাঁদতে লাগলো ।

“এ সব গানে কেমন ঠিক ঠিক কথা—

‘ভাব শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে—নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবি !

“পদ্মলোচন আমার মুখে রামপ্রসাদের গান শুনে কাঁদতে লাগলো ।
ছাখো, অত বড় পণ্ডিত !

[God-vision —One and Many; Unity in Diversity.]

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিশিষ্টাবৈতবাদ ।]

আহারের পর ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিয়াছেন । মেজেতে মণি বসিয়া আছেন ! নহবতের রত্নচৌকি বাজনা শুনিতে শুনিতে ঠাকুর আনন্দ করিতেছেন ।

শ্রবণের পর মণিকে বুঝাইতেছেন, ব্রহ্মই জীব জগৎ হয়ে আছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) । কেউ বলে, অমুক স্থানে হরিনাম নাই । বলবামাত্রই দেখলাম তিনিই সব জীব* হয়ে আছেন । যেন অসংখ্য জলের—ভুড়ভুড়ি—জলের বিশ্ব ! আবার দেখছি যেন অসংখ্য বড়ী বড়ী !

“ও দেশ থেকে বর্ধমান আস্তে আস্তে দৌড়ে একবার মাঠের পানে গেলাম,—বলি দেখি, এখানে জীবরা কেমন করে খায়, থাকে !—গিয়ে দেখি মাঠে পীপ্‌ড়ে চলেছে ! সব স্থানই চৈতন্যময় !

হাজরা ঘরে প্রবেশ করিয়া মেঝেতে বসিলেন ।

* সৰ্ব্ভূতস্বমাত্মানং সৰ্ব্ভূতানি চাত্মনি । ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সৰ্ব্বত্র-
সমদর্শনঃ ॥ গীতা ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । নানা ফুল—পাপড়ি থাক্ থাক্ † তাও দেখ্ছি !—
ছোট বিশ্ব, বড় বিশ্ব !

এই সকল ঈশ্বরীয় রূপ-দর্শন-কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ
হইতেছেন । বলিতেছেন আমি হইয়াছি !—আমি এসেছি !

এই কথা বলিয়াই একবারে সমাধিস্থ হইলেন । সমস্ত স্থির !

অনেক ক্ষণ সন্তোষের পর বাহিরের একটু ভাঁস আসিতেছে !

এইবার বালকের গায় হাসিতেছেন । হেসে হেসে ঘরের মধ্যে পাদ-
চারণ করিতেছেন ।

[ক্ষোভ বাসনা গেলেই পরমহংস-অবস্থা ।

সাধনকালে বটতলার পরমহংসদর্শন-কথা ।]

অদ্বৈতদর্শনের পর চক্ষু হইতে যেরূপ আনন্দ-জ্যোতি বাহির হয়,
সেইরূপ ঠাকুরের চক্ষের ভাব হইল । মুখে হাস্য । শূন্য দৃষ্টি ।

ঠাকুর পায়চারী করিতে করিতে বলিতেছেন ।—

“বটতলার পরমহংস দেখ্লাম—এই রকম হেসে চল্ছিল !—
সেই স্বরূপ কি আমার হল !

এইরূপ পাদচারণের পর ঠাকুর ছোট খাটটিতে গিয়া বসিয়াছেন ও
জগন্মাতার সহিত কথা কহিতেছেন ।

ঠাকুর বলিতেছেন,—‘যাক্ আমি জান্তেও চাই না !—মা, তোমার
পাদপদ্মে যেন শুদ্ধা ভক্তি থাকে !’

(মণির প্রতি)—ক্ষোভ বাসনা গেলেই এই অবস্থা !

আবার মাকে বলিতেছেন—‘মা ! পূজা উঠিয়েছ ;—সব বাসনা যেন
যায় না !—মা ! পরমহংস তো বালক—বালকের মা চাই না ! তাই তুমি
মা,—আমি ছেলে ! মার ছেলে মাকে ছেড়ে কেমন ক’রে থাকে !’

ঠাকুর এরূপ স্বরে মার সঙ্গে কথা বলিতেছেন যে পাষণ পর্য্যন্ত বিগ-
লিত হইয়া যায় । আবার মাকে বলিতেছেন,—শুধু অদ্বৈতজ্ঞান !
হ্যাক্ থু !!! যতক্ষণ ‘আমি’ রেখেছ ততক্ষণ তুমি ! পরমহংস তো
বালক, বালকের মা চাই না !

† ‘আত্মান চৈবম্ বিচিত্রাশ্চিহ্নি ।’ বেদান্তসূত্র, ২৮-১-২ ।

দক্ষিণেশ্বর । গুরুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের পরমহংস অবস্থা । ৫১

মণি অবাক হইয়া ঠাকুরের এই দেবদুর্লভ অবস্থা দেখিতেছেন । ভাবিতেছেন, ঠাকুর অহেতুককৃপাসিদ্ধ । তাঁহারই বিশ্বাসের জন্য— তাঁহারই চৈতন্যের জন্য—আর জাবিশিষ্টার জন্য গুরুরূপী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই পরমহংস অবস্থা ।

মণি আরও ভাবিতেছেন—‘ঠাকুর বলেন, অদ্বৈত—চৈতন্য—নিত্যানন্দ । অদ্বৈতজ্ঞান হলে চৈতন্য হয়,—তবেই নিত্যানন্দ হয় । ঠাকুরের শুধু অদ্বৈতজ্ঞান নয়,—নিত্যানন্দের অবস্থা । জগন্মাতার প্রেমানন্দে সর্বদাই বিভোর,—মাতোয়ারা !’

হাজরা ঠাকুরের এই অবস্থা হঠাৎ দেখিয়া হাত জোড় করিয়া মাঝে মাঝে বলিতে লাগিলেন—‘ধন্য ! ধন্য !’

শ্রীরামকৃষ্ণ হাজরাকে বলিতেছেন—‘তোমার বিশ্বাস কই ? তবে তুমি এখানে আছ যেমন জটিলে কুটিলে—লালা পোচ্চাই জন্ম ।’

বৈকাল হইয়াছে । মণি একাকী দেবালয়ে নিঃসঙ্গ বসিয়া বসিয়া আছেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই অদ্ভুত অবস্থা ভাবিতেছেন । আর ভাবিতেছেন, ঠাকুর কেন বলিলেন, ‘ক্ষোভ বাসনা গেলেই এই অবস্থা !’ এই গুরুরূপী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কে ? স্বয়ং ভগবান্ কি আমাদের জন্ম দেহ ধারণ করে এসেছেন ? ঠাকুর বলেন, ঈশ্বরকোটি—অবতারাদি—না হ’লে জড়সমাধি (নির্বিকল্প সমাধি) হ’তে নেমে আসতে পারে না ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

আত্মস্থানমুখ্যঃ সর্বৈব দেবর্ষিনারদস্তথা ।

অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ংঈব ত্রবীষি মে ॥ গীতা ।

[গুহ্য কথা ।]

পর দিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঝাউতলায় মণির সহিত একাকী কথা কহিতেছেন । বেলা আটটা হইবে । সোমবার, কৃষ্ণপক্ষের দশমী তিথি । ২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ । আজ মণির প্রভুসঙ্গে একাদশ দিবস ।

শীতকাল । সূর্য্যদেব পূর্ব্বকোণে সবে উঠিয়াছেন । ঝাউতলার পশ্চিমদিকে গঙ্গা বহিয়া যাইতেছেন । এখন উত্তরবাহিনী—সবে

জোয়ার আসিয়াছে । চতুর্দিকে বৃক্ষলতা । অনতিদূরে সাধনার স্থান সেই
বিন্ধ্যতরুমূল দেখা যাইতেছে । ঠাকুর পূর্বাস্থ হইয়া কথা কহিতেছেন ।
মণি উত্তরাস্থ হইয়া বিনীতভাবে শুনিতেন । ঠাকুরের ডান দিকে
পঞ্চবটী ও হাঁসপুকুর । শীতকাল, সূর্যোদয়ে জগৎ যেন হাসিতেছে ।
ঠাকুর ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলিতেছেন ।

[তোতাপুরীর ঠাকুরের প্রতি ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । নিরাকারও সত্য, সাকারও সত্য ।

“আজ্ঞাটা উপদেশ দিত,—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম কিরূপ । যেমন অনন্ত
সাগর—উর্দ্ধে নীচে, ডাইনে বামে, জলে জল । কারণ—সলিল । জল
স্থির ।—কার্য্য হলে তরঙ্গ । স্থষ্টি স্থিতি প্রলয়—কার্য্য ।

“আবার বলত, বিচার যেখানে গিয়ে থেমে যায় সেই ব্রহ্ম । যেমন
কপূর জালালে পুড়ে যায়, একটু ছাইও থাকে না ।

“ব্রহ্ম বাক্যমনের অতীত । লুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছলো ।
এসে আর খবর দিলে না । সমুদ্রেতেই গলে গেল ।

“ঋষিরা রামকে বলেছিলেন,—‘রাম, ভরদ্বাজাদি তোমাকে অবতার
বলতে পারেন । কিন্তু আমরা তা বলি না । আমরা শব্দব্রহ্মের উপাসনা
করি । আমরা মানুষরূপ চাই না ।’ রাম একটু হেসে, প্রসন্ন হয়ে, তাদের
পূজা গ্রহণ করে চলে গেলেন । [নিত্য লীলা দুইই সত্য ।]

“কিন্তু ঐরাই নিত্য তাঁরাই লীলা । যেমন বলেছি, ছাদ
আর সিঁড়ি ।

“ঈশ্বরলীলা, দেবলীলা, নরলীলা, জগৎলীলা । নরলীলায় অবতার ।
নরলীলা কিরূপ জান ? যেমন বড় ছাদের জল নল দিয়ে ছড় ছড়
করে পড়ছে । সেই সচ্চিদানন্দ, তাঁরাই শক্তি একটা প্রণালী দিয়ে—
নলের ভিতর দিয়ে—আসছে । কেবল ভরদ্বাজাদি বার জন ঋষি রাম-
চন্দ্রকে অবতার বলে চিনেছিলেন । অবতারকে সকলে চিনতে পারে না ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার ? শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত ।

[ক্ষুদিরামের গয়াধামে স্বপ্ন । ঠাকুরকে হৃদয়ের মার পূজা । ঠাকুরের
মধ্যে মথুরের ঈশ্বরী দর্শন । ফুলুই শ্যামবাজারে শ্রীগোরাঙ্গের আবেশ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) । তিনি অবতার হয়ে জ্ঞান ভক্তি শিক্ষা দেন । আচ্ছা, আমাকে তোমার কিরূপ বোধ হয় ?

“আমার বাবা गयाতে গিছিলেন । সেখানে রঘুবীর স্বপন দিলেন, আমি তোদের ছেলে হব । বাবা স্বপন দেখে বল্লেন, ঠাকুর, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কেমন করে তোমার সেবা ক’রবো ! রঘুবীর বল্লেন—তা হয়ে যাবে ।

“দিদি—হৃদের মা—আমার পা পূজা ক’রতো, ফুল চন্দন দিয়ে । এক দিন তার মাথায় পা দিয়ে (মা) বল্লেন, তোর কাশীতেই মৃত্যু হবে ।

“সেজো বাবু বল্লেন, বাবা, তোমার ভিতরে আর কিছু নাই,—সেই ঈশ্বরই আছেন । দেহটা কেবল খোল মাত্র,—যেমন বাহিরে কুমড়োর আকার কিন্তু ভিতরে শাঁস বীচি কিছুই নাই । তোমায় দেখলাম যেন ঘোমটা দিয়ে কেউ চলে যাচ্ছে ।

“আগে থাকতে সব দেখিয়ে দেয় । বটতলায় (পঞ্চবটীতলায়) গৌরাঙ্গের সঙ্কীর্ণনের দল দেখেছিলাম । তার ভিতর যেন বলরামকে দেখেছিলাম ;—আর যেন তোমায় দেখেছিলাম ।

“গৌরাঙ্গের ভাব জানতে চেয়েছিলাম । ও দেশে—শ্যামবাজারে—দেখালে । গাছে পাঁচীলে লোক,—রাতদিন সঙ্গে সঙ্গে লোক ! সাত দিন হাগ্‌বার জো ছিল না । তখন বল্লাম, মা আর কাজ নাই !

“তাই এখন শান্ত । আর একবার আসতে হবে । তাই পার্শ্বদেবের সব জ্ঞান দিচ্ছি না । (সহাস্তে) তোমাদের যদি সব জ্ঞান দিই—তা হলে তোমরা আর সহজে আমার কাছে আসবে কেন ?

“তোমায় চিনিছি—তোমার চৈতন্য-ভাগবত পড়া শুনে । তুমি আপনার জন—এক সত্তা—যেমন পিতা আর পুত্র । এখানে সব আসছে,—যেন কল্মির দল,—এক যায়গায় টান্লে সবটা এসে পড়ে । পরস্পর সব আত্মীয়,—যেমন ভাই ভাই । জগন্নাথে রাখাল হরীশ টরীশ গিয়েছে, আর তুমিও গিয়েছ,—তা কি আলাদা বাসা হবে ?

“যত দিন এখানে আস নাই, তত দিন ভুলে ছিলে ; এখন আপনাকে চিন্তে পারবে । তিনি গুরুরূপে এসে জানিয়ে দেন ।

(তোতাপুরীর উপদেশ—গুরুরূপী শ্রীভগবান্ স্বস্বরূপকে
জানিয়ে দেন ।)

“গাঙ্গটা বাঘ আর ছাগলের পালের গল্প বলেছিল । একটা বাঘিনী
ছাগলের পাল আক্রমণ করেছিল । একটা ব্যাধ দূর থেকে দেখে ওকে
মেরে ফেলে । ওর পেটে ছানা ছিল, সেটা প্রসব হয়ে গেল ।

“সেই ছানাটা ছাগলদের সঙ্গে বড় হতে লাগলো । প্রথমে ছাগলদের
মায়ের দুধ খায়,—তার পর একটু বড় হলে ঘাস খেতে আরম্ভ করলে ।
আবার ছাগলদের মত ভ্যা ভ্যা করে ।

“ক্রমে খুব বড় হোলো,—কিন্তু ঘাস খায় আর ভ্যা ভ্যা করে ।
কোন জানোয়ার আক্রমণ করলে ছাগলদের মত দৌড়ে পালায় !

“এক দিন একটা ভয়ঙ্কর বাঘ ছাগলদের পাল আক্রমণ করলে । সে
অবাক্ হয়ে দেখলে যে, ওদের ভিতর একটা বাঘ ঘাস খাচ্ছিল,—ছাগল-
দের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে পালালো । তখন ছাগলদের কিছু না বলে ঐ
ঘাসথেকে বাঘটাকে ধরলে । সেটা ভ্যা ভ্যা করতে লাগলো ! আর
পালাবার চেষ্টা করতে লাগলো । তখন সে তাকে একটা জলের ধারে
টেনে নিয়ে গেল । আর বলে, ‘এই জলের ভিতর তোর মুখ দেখ ।
দেখ, আমারও যেমন হাঁড়ির মতন মুখ, তোরও তেমনি ।’ তার পর তার
মুখে একটু মাংসগুঁজে দিলে । প্রথমে, সে কোন মতে খেতে চায়
না ;—তার পর একটু আস্বাদ পেয়ে খেতে লাগল । তখন বাঘটা বলে,
তুই ছাগলদের সঙ্গে ছিলি আর তুই ওদের মত ঘাস খাচ্ছিলি ! ধিক্
তোকে ! তখন সে লজ্জিত হলো ।

“ঘাস খাওয়া, কিনা কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে থাকা । ছাগলদের মত ভ্যা
ভ্যা করে ডাকা, আর পলানো,—সামান্য জীবের মত আচরণ করা ।
বাঘের সঙ্গে চলে যাওয়া,—কিনা, গুরু যিনি চৈতন্য করলেন, তাঁর
শরণাগত হওয়া,—তাঁকেই আত্মীয় বলে জানা । নিজের ঠিক মুখ দেখা,
কিনা স্বস্বরূপকে চেনা ।

ঠাকুর দণ্ডায়মান হইলেন । চতুর্দিক নিস্তব্ধ । কেবল ঝাউগাছের
সেঁ। সেঁ। শব্দ ও গঙ্গার কুলু কুলু ধ্বনি । তিনি, রেল পার হইয়া পঞ্চ-

বটীর মধ্য দিয়া নিজের ঘরের দিকে মণির সহিত কথা কইতে কইতে যাইতেছেন । মণি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন ।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বটমূলে প্রণাম ।]

পঞ্চবটীতে আসিয়া, যেখানে ডালটী পড়ে গেছে, সেই-
খানে দাঁড়াইয়া পূর্বাশ্র হইয়া বটমূলে, চাতাল মস্তক দ্বারা স্পর্শ
করিয়া, প্রণাম করিলেন । এই স্থান সাধনের স্থান ;—এখানে কত
ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন—কত ঈশ্বরীয় রূপদর্শন, আর মার সঙ্গে কত কথা
হইয়াছে !—তাই কি ঠাকুর এখানে যখন আসেন, তখন প্রণাম করেন ?

বকুলতলা হইয়া নবতের কাছে আসিয়াছেন । মণি সঙ্গে ।

নবতের কাছে আসিয়া হাজরাকে দেখিলেন । ঠাকুর তাঁহাকে
বলিতেছেন—‘বেশী খেয়োনা । আর শুচিবাই ছেড়ে দাও । যাদের শুচি-
বাই, তাদের জ্ঞান হয় না । আচার যতটুকু দরকার, ততটুকু করবে । বেশী
বাড়াবাড়ী কোরো না ।’ ঠাকুর নিজের ঘরে গিয়া উপবেশন করিলেন ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

[রাখাল, রাম, সুরেন্দ্র, লাটু প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ।]

আহারান্তে ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিতেছেন । আজ ২৪শে ডিসে-
ম্বর । বড়দিনের ছুটি আরম্ভ হইয়াছে । কলিকাতা হইতে সুরেন্দ্র, রাম
প্রভৃতি ভক্তেরা ক্রমে ক্রমে আসিতেছেন ।

বেলা একটা হইবে । মণি একাকী ঝাউতলায় বেড়াইতেছেন ।
এমন সময় রেলের নিকটে দাঁড়াইয়া হরীশ উচ্চৈঃস্বরে মণিকে বলিতে-
ছেন,—প্রভু ডাকছেন,—শিবসংহিতা পড়া হবে ।

শিবসংহিতায় যোগের কথা আছে,—ষট্চক্রের কথা আছে ।

মণি ঠাকুরের ঘরে আসিয়া প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন ।
ঠাকুর খাটের উপর, ভক্তেরা মেঝের উপর, বসিয়া আছেন । শিবসংহিতা
এখন আর পড়া হইল না । ঠাকুর নিজেই কথা কহিতেছেন ।

[প্রেমাভক্তি ও শ্রীবৃন্দাবনলীলা । অবতার ও নরলীলা ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । গোপীদের প্রেমাভক্তি । প্রেমাভক্তিতে দুটী জিনিষ থাকে,—অহংতা আর মমতা । আমি কৃষ্ণকে সেবা না করলে কৃষ্ণের অসুখ হবে,—এর নাম অহংতা । এতে ঈশ্বর-বোধ থাকে না ।

“মমতা,—‘আমার আমার’ করা । পাছে পায়ে কিছু আঘাত লাগে, গোপীদের এত মমতা, তাদের সূক্ষ্ম শরীর শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে থাকত ।

“যশোদা বল্লেন, তাদের চিন্তামণি-কৃষ্ণ জানি না,—আমার গোপাল ! গোপীরাও বল্ছে, ‘কোথায় আমার প্রাণবল্লভ ! আমার হৃদয়বল্লভ !’—ঈশ্বর-বোধ নাই ।

“যেমন ছোট ছেলেরা, দেখেছি, বলে, ‘আমার বাবা’ । যদি কেউ বলে, ‘না তোর বাবা নয়,’—তা হলে বলবে, ‘না আমার বাবা !’

“নরলীলায় অবতারকে ঠিক মানুষের মত আচরণ করতে হয়,—তাই চিন্তে পারা কঠিন । মানুষ হয়েছেন ত ঠিক মানুষ । সেই ক্ষুধা তৃষ্ণা, রোগ শোক, কখন বা ভয়,—ঠিক মানুষের, মত । রামচন্দ্র সীতার শোকে কাতর হয়েছিলেন । গোপাল নন্দের জুতো মাথায় করে নিয়ে গিচ্ছিলেন—পিঁড়ে বয়ে নিয়ে গিচ্ছিলেন ।

“থিয়েটারে সাধু সাজে, সাধুর মতই ব্যবহার করবে,—যে রাজা সেজেছে তার মত ব্যবহার করবে না । যা সেজেছে তাই অভিনয় করবে ।

“এক জন বহুরূপী সেজেছে, ‘ত্যাগী সাধু’ । সাজটী ঠিক হয়েছে দেখে বাবুরা একটি টাকা দিতে গেল । সে নিলে না, উঁহ করে চলে গেল । গা হাত পা ধুয়ে যখন সহজ বেশে এলো, বল্লেন, টাকা দাও । বাবুরা বল্লেন, ‘এই তুমি টাকা নোবো না বলে চলে গেলে, আবার টাকা চাইছ ?’ সে বল্লেন, ‘তখন সাধু সেজেছি, টাকা নিতে নাই ।’

“তেম্নি ঈশ্বর, যখন মানুষ হন, ঠিক মানুষের মত ব্যবহার করেন !

“বৃন্দাবনে গেলে অনেক লীলার স্থান দেখা যায় ।

[স্বরেন্দ্রের প্রতি উপদেশ—ভক্তসেবার্থ দান ও সত্য কথা ।]

স্বরেন্দ্র । আমরা ছুটীতে গিচ্লাম ;—বড় ‘পয়সা দাও’ ‘পয়সা দাও’ করে । ‘দাও’ ‘দাও’ করতে লাগলো—পাণ্ডারা আর সব—তাদের বল্লুম, ‘আমরা কাল কল্কাতা যাবো ।’ ব’লে সেই দিনই পলায়ন !

দক্ষিণেশ্বরে সুরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে গুরুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ । ৫৭

শ্রীরামকৃষ্ণ । ও কি ! ছি ! কাল যাবো বলে আজ পালানো ! ছি !

সুরেন্দ্র (লজ্জিত হইয়া) । বনের মধ্যে মাঝে মাঝে বাবাজীদের দেখেছিলাম, নির্জনে বসে সাধন ভজন করছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । বাবাজীদের কিছু দিলে ?

সুরেন্দ্র । আজ্ঞা, না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ও ভাল কর নাই । সাধুভক্তদের কিছু দিতে হয় ।
যাদের টাকা আছে, তাদের ওরূপ লোক সামনে পড়লে কিছু দিতে হয় ।

[শ্রীমুখ-কণিত চরিতামৃত । মথুরা সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন দর্শন ১৪৬৪ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমি বৃন্দাবনে গিচ্ছিলাম—সেজ বাবুদের সঙ্গে ।

“মথুরার ধ্রুব ঘাট যাই দেখলাম, অমনি দপ্ করে দর্শন হল, বসু-
দেব কৃষ্ণ কোলে যমুনা পার হচ্ছেন ।

“আবার সন্ধ্যার সময় যমুনা পুলিনে বেড়াচ্ছি, বালির উপর ছোট
ছোট খোড়ো ঘর । বড় কুল গাছ । গোধূলির সময় গাভীরা গোষ্ঠ থেকে
ফিরে আসছে । দেখলাম, হেঁটে যমুনা পার হচ্ছে । তার পরেই কতক-
গুলি রাখাল গাভীদের নিয়ে পার হচ্ছে ।

“যেই দেখা অমনি ‘কোণায় কৃষ্ণ !’ বলে—বেহঁস হয়ে গেলাম !

“শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড দর্শন করতে ইচ্ছা হয়েছিল । পাল্কী করে
আমায় পাঠিয়ে দিলে । অনেকটা পথ ; লুচি জিলিপী পাল্কীর ভিতরে
দিলে । মাঠ পার হবার সময় এই ভেবে কাঁদতে লাগলাম, ‘কৃষ্ণরে !
তুই নাই, কিন্তু সেই সব স্থান রয়েছে !—সেই মাঠ, তুমি গোরু চরাতে !’

“হৃদে রাস্তায় সঙ্গে সঙ্গে পেছনে আসছিল । আমি চক্ষের জলে
ভাসতে লাগলাম । বিয়ারাদের দাঁড়াতে বলতে পারলাম না !

“শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডে গিয়ে দেখলাম, সাধুরা একটা একটা যুপ-
ড়ীর মত করেছে ;—তার ভিতরে পিছনে ফিরে সাধন ভজন করছে—
পাছে লোকের উপর দৃষ্টিপাত হয় । দ্বাদশ বন দেখবার উপযুক্ত ।

“বন্ধুবিহারীকে দেখে ভাব হয়েছিল, আমি তাঁকে ধরতে গিচ্ছিলাম ।
গোবিন্দজীকে দুইবার দেখতে চাইলাম না । মথুরায় গিয়ে রাখালকৃষ্ণকে
স্বপন দেখেছিলাম । হৃদে ও সেজ বাবুও দেখেছিল ।

[দেবীভক্ত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রের যোগ ও ভোগ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । তোমাদের যোগও আছে ভোগও আছে ।

“ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি রাজর্ষি । ব্রহ্মর্ষি যেমন শুকদেব,—একখানি বইও কাছে নাই । দেবর্ষি যেমন নারদ । রাজর্ষি জনক,—নিষ্কাম কৰ্ম্ম করে ।

“দেবীভক্ত ধৰ্ম্ম মোক্ষ দুইই পায় । আবার অর্থ কামও ভোগ করে ।

“তোমাকে একদিন দেবী-পুত্র দেখেছিলাম । তোমার দুইই আছে, যোগ আর ভোগ । না হলে তোমার চেহারা শুষ্ক হ'ত ।

[ঘাটে ঠাকুরের দেবীভক্ত দর্শন । নবীন নিয়োগীর যোগ ও ভোগ ।]

“সর্বত্যাগীর চেহারা শুষ্ক । একজন দেবীভক্তকে ঘাটে দেখেছিলাম । নিজে খাচ্ছে আর সেই সঙ্গে দেবীপূজা কচ্ছে । সন্তান-ভাব ।

“তবে বেশী টাকা হওয়া ভাল নয় । যত মল্লিককে এখন দেখলাম, ডুবে গেছে ! বেশী টাকা হয়েছে কিনা !

“নবীন নিয়োগী,—তারও যোগ ও ভোগ দুইই আছে । দুর্গাপূজার সময় দেখি, বাপ ব্যাটা দুজনেই চামর কচ্ছে ।

সুরেন্দ্র । আচ্ছা, ধ্যান হয় না কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । স্মরণ মনন ত আছে ?

সুরেন্দ্র ! আচ্ছা, মা মা বলে ঘুমিয়ে পড়ি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । খুব ভাল । স্মরণ মনন থাকলেই হলো ।

ঠাকুর সুরেন্দ্রের ভার লইয়াছেন, আর তাঁহার ভাবনা কি ?

— — —

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও যোগ শিক্ষা । শিবসংহিতা ।]

সন্ধ্যার পর ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন । মণিও ভক্তদের সহিত মেজেতে বসিয়া আছেন । যোগের বিষয়—ষট্চক্রের বিষয়—কথা কহিতেছেন । শিব-সংহিতায় সেই সকল কথা আছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঈড়া পিঙ্গলা, সুষুম্না ;—সুষুম্নার ভিতর সব পদ্য আছে ;—চিন্ময় । যেমন মোমের গাছ,—ডাল, পালা, ফল,—সব

মোমের । মূলাধার পদ্মে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি আছেন । চতুর্দল পদ্ম ।
যিনি আত্মশক্তি, তিনিই সকলের দেহে কুলকুণ্ডলিনীরূপে আছেন ।
যেন ঘুমন্ত সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে ! ‘প্রসুপ্ত ভুজগাকারা আধার-
পদ্মবাসিনী !’ (মণির প্রতি) ভক্তিয়োগে কুলকুণ্ডলিনী শীঘ্র জাগ্রত
হয় । কিন্তু ইনি জাগ্রত না হলে ভগবান্ দর্শন হয় না । গান করে করে
একাগ্রতার সহিত গাইবে—নির্জ্ঞানে গোপনে—

‘জাগো মা কুলকুণ্ডলিনি ! তুমি নিত্যানন্দ স্বরূপিণী,

প্রসুপ্ত-ভুজগাকারা আধারপদ্মবাসিনী ।’

“গানে রামপ্রসাদ সিদ্ধ । ব্যাকুল হয়ে গান গাইলে ঈশ্বরদর্শন হয় ।

মণি । আচ্ছা, এ সব একবার করলে মনের খেদ মিটে যায় !

শ্রীরামকৃষ্ণ । আহা ! খেদ মেটেই বটে !

“যোগের বিষয় গোটাকতক মোটামুগী তোমায় বলে দিতে হবে ।

[গুরুই সব করেন । সাধনা ও সিদ্ধি । নরেন্দ্র স্বতঃসিদ্ধ ।]

“কি জান, ডিমের ভিতর ছানা বড় না হলে পাখী ঠোকরায় না ।

সময় হ’লেই পাখী ডিম ফুটোয় ।

‘তবে একটু সাধনা করা দরকার । গুরুই সব করেন,—তবে শেষটা
একটু সাধনা করিয়ে লন । বড় গাছ কাটবার সময় প্রায় সবটা
কাটা হলে পর একটু সরে দাঁড়াতে হয় । তার পর গাছটা মড় মড় করে
আপনিই ভেঙ্গে পড়ে ।

‘যখন খাল কেটে জল আনে, আর একটু কাটলেই নদীর
সঙ্গে যোগ হয়ে যাবে, তখন যে কাটে, সে সরে দাঁড়ায় । তখন
মাটিটা ভিজে আপনিই পড়ে যায়, আর নদীর জল ছড় ছড় করে
থালে আসে ।

“অহঙ্কার, উপাধি, এ সব ত্যাগ হলেই ঈশ্বরকে দর্শন করা যায় ।

‘আমি পণ্ডিত’ ‘আমি অমূকের ছেলে’ ‘আমি ধনী’ ‘আমি মানী’—এ
সব উপাধি ত্যাগ হলেই দর্শন ।

‘ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য,—সংসার অনিত্য,—এর নাম বিবেক ।
বিবেক না হলে উপদেশ গ্রাহ্য হয় না ।

‘সাধনা করতে করতে তাঁর কৃপায় সিদ্ধ হয় । একটু খাটা চাই ।
তার পরেই দর্শন ও আনন্দ লাভ ।

“অমুক জায়গায় সোণার কলসি পোতা আছে শুনে লোক ছুটে যায় ।
আর খুঁড়তে আরম্ভ করে । খুঁড়তে খুঁড়তে মাথার ঘাম পড়ে । অনেক
খোঁড়ার পর এক জায়গায় কোদালে ঠন্ করে শব্দ হল ;—কোদাল
ফেলে দেখে, কলসী বেরিয়েছে কিনা । কলসী দেখে নাচতে থাকে !

“কলসী বার করে মোহর ঢেলে, হাতে করে গণে,—আর খুব
আনন্দ ! দর্শন,—স্পর্শন,—সন্তোষ !—কেমন ?

মণি । আজ্ঞা হাঁ ।

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া আছেন । আবার কথা কহিতেছেন ।

[আমার আপনার লোক কে ? একাদশী করার উপদেশ ।]

‘আমার যারা আপনার লোক, তাদের বোঝলেও আবার আসবে ।

‘আহা, নরেন্দ্রের কি স্বভাব ! মা কালীকে আগে যা ইচ্ছা তাই
বল’ত ;—আমি বিরক্ত হয়ে এক দিন বলেছিলাম, ‘শালা, তুই আর
এখানে অসিস্ না ।’ তখন সে আস্তে আস্তে গিয়ে তামাক সাজে । যে
আপনার লোক, তাকে তিরস্কার করলেও রাগ করবে না । কি বল ?

মণি । আজ্ঞা হাঁ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । নরেন্দ্র স্বতঃসিদ্ধ,—নিরাকারে নিষ্ঠা ।

মণি (সহাস্তে) ! যখন আসে, একটা কাণ্ড সঙ্গে করে আনে ।

ঠাকুর আনন্দে হাসিতেছেন ; বলিতেছেন, একটা কাণ্ডই বটে ।

পর দিন মঙ্গলবার, ২৫ ডিসেম্বর, কৃষ্ণপক্ষের একাদশী । বেলা প্রায়
এগারটা হইবে । ঠাকুরের এখনও সেবা হয় নাই । মণি ও রাখালাদি
ভক্তেরা ঠাকুরের ঘরে বসিয়া আছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) । একাদশী করা ভাল । ওতে মন বড়
পবিত্র হয়, আর ঈশ্বরেতে ভক্তি হয় । কেমন ?

মণি । আজ্ঞা হাঁ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । খই দুধ খাবে,—কেমন ?

চতুর্থ ভাগ—নবম খণ্ড ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে রাখাল, রাম, কেদার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ।

বেদান্তবাদী সাধু সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গাড়ীতে উঠিয়াছেন—৩ কালীঘাট দর্শনে যাইবেন । শ্রীযুক্ত অধর সেনের বাটী হইয়া যাইবেন—অধরও সেখান হইতে সঙ্গে যাইবেন । আজ শনিবার, অমাবস্যা । বেলা ১টা হইবে ।

গাড়ী তাঁহার ঘরের উত্তরের বারান্দার কাছে দাঁড়াইয়া আছে ।

মণি গাড়ীর দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন ।

মণি (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) । আচ্ছা, আমি কি যাব ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । কেন ?

মণি । কলকাতার বাসা হয়ে একবার আসতাম ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (চিন্তিত হইয়া) । আবার যাবে ? এখানে বেশ আছ ।

মণি বাড়ী ফিরিবেন—কয়েক ঘণ্টার জন্ত, কিন্তু ঠাকুরের মত নাই ।

রবিবার ৩০শে ডিসেম্বর ; পৌষ শুক্ল প্রতিপদ তিথি । বেলা তিনটা হইয়াছে । মণি গাছতলায় একাকী বেড়াইতেছেন,—একটি ভক্ত আসিয়া বলিলেন, প্রভু ডাকিতেছেন । ঘরে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন । মণি গিয়া প্রণাম করিলেন ও মেজেতে ভক্তদের সঙ্গে বসিলেন ।

কলিকাতা হইতে রাম, কেদার প্রভৃতি ভক্তেরা আসিয়াছেন । তাঁহাদের সঙ্গে একটী বেদান্ত-বাদী সাধু আসিয়াছেন । ঠাকুর যে দিন রামের বাগান দর্শন করিতে যান, সেই দিন এই সাধুটির সহিত দেখা হয় । সাধু পার্শ্বের বাগানের একটী গাছের তলায় একাকী একটি খাটিয়ায় বসিয়াছিলেন । রাম আজ ঠাকুরের আদেশে সেই সাধুটিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন । সাধুও ঠাকুরকে দর্শন করিবেন—ইচ্ছা করিয়াছেন ।

ঠাকুর সাধুর সহিত আনন্দে কথা কহিতেছেন । নিজের কাছে ছোট চক্কাটির উপর সাধুকে বসাইয়াছেন । কথাবার্তা হিন্দীতে হইতেছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । এ সব তোমার কিরূপ বোধ হয় ?

বেদান্তবাদী সাধু । এ সব স্বপ্নবৎ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা ? আচ্ছা জী, ব্রহ্ম কিরূপ ?

সাধু । শব্দই ব্রহ্ম । অনাহত শব্দ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কিন্তু জী শব্দের প্রতিপাত্ত একটী আছেন । কেমন ?

সাধু । বাচ্য * ঐ হায়, বাচক ঐ হায় ।

এই কথা শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন । স্থির,—
চিত্রাৰ্পিতের গায় বসিয়া আছেন । সাধু ও ভক্তেরা অবাক হইয়া ঠাকু-
রের এই সমাধি-অবস্থা দেখিতেছেন । কেদার সাধুকে বলিতেছেন,

‘এই দেখো জী ! ইস্কো সমাধি বোলতা হায় ।’

সাধু গ্রন্থেই সমাধির কথা পড়িয়াছেন, সমাধি কখনও দেখেন নাই ।

ঠাকুর একটু একটু প্রকৃতিস্থ হইতেছেন ও জগন্মাতার সহিত কথা
কহিতেছেন । ‘মা, ভাল হব—বেহুঁস্ করিস্ নে—সাধুর সঙ্গে সচ্চিদা-
নন্দের কথা ক’ব !—মা, সচ্চিদানন্দের কথা নিয়ে বিলাস করবো !’

সাধু অবাক হইয়া দেখিতেছেন ও এই সকল কথা শুনিতেছেন ।
এইবার ঠাকুর সাধুর সহিত কথা কহিতেছেন—বলিতেছেন,—‘আব্
সোহহং উড়ায়ে দেও । আব্ হাম্ তোম ;—বিলাস ! (অর্থাৎ এখন
‘সোহহং—সেই আমি’ উড়িয়ে দাও ;—এখন ‘আমি তুমি’) ।

যতক্ষণ আমি তুমি রয়েছে ততক্ষণ মাও আছেন—এস তাঁকে নিয়ে
আনন্দ করা যাক । এই কথা কি ঠাকুর বলিতেছেন ?

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর ঠাকুর পঞ্চবটী মধ্যে বেড়াইতেছেন,—
সঙ্গে রাম, কেদার, মাষ্টার প্রভৃতি ।

[‘শ্রীরামকৃষ্ণের কেদারের প্রতি উপদেশ । সংসার ত্যাগ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । সাধুটীকে কি রকম দেখলে ?

কেদার । শুষ্ক জ্ঞান ! সবে হাঁড়ি চড়েছে,—এখনও চাল চড়ে নাই !

শ্রীরামকৃষ্ণ । তা বটে, কিন্তু ত্যাগী । সংসার যে ত্যাগ
করেছে, সে অনেকটা এগিয়েছে ।

দক্ষিণেশ্বর। রাম, কেদার, বেদান্তবাদী সাধু প্রভৃতি সঙ্গে। ৬৩

“সাধুটী প্রবর্তকের ঘর। তাঁকে লাভ না করলে কিছুই হলো না।

যখন তাঁর প্রেমে মত্ত হওয়া যায়, আর কিছু ভাল লাগে না।

তখন— যতনে হৃদয়ে রাখো আদরিণী শ্যামা মাকে !

মন, তুই দেখ্ আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে !

কেদার ঠাকুরের ভাবে একটী গান বলিতেছেন—

মনের কথা কইবো কি সই, কইতে মানা—

দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না।

মনের মানুষ হয় যে জনা, ও তার নয়নেতে যায় গো চেনা,

ও সে দুই এক জনা ; ভাবে ভাসে রসে ডোবে,

ও সে উজান পথে করে আনাগোনা। (ভাবের মানুষ)

ঠাকুর নিজের ঘরে ফিরিয়াছেন। ৪টা বাজিয়াছে,—মা কালীর ঘর খোলা হইয়াছে। ঠাকুর সাধুকে সঙ্গে করিয়া মা কালীর ঘরে যাইতেছেন। মণি সঙ্গে আছেন।

কালীঘরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুর ভক্তিভরে মাকে প্রণাম করিতেছেন। সাধুও হাত জোড় করিয়া মাথা নোয়াইয়া মাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেমন জী দর্শন !

সাধু (ভক্তিভরে)। কালী প্রধানা হায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কালী ব্রহ্ম অভেদ। কেমন জী ?

সাধু। যতক্ষণ বহিস্মুখ, ততক্ষণ কালী মান্তে হবে। যতক্ষণ বহিস্মুখ ততক্ষণ ভাল মন্দ ;—ততক্ষণ এটী প্রিয়, এটী তাজ্য।

“এই দেখুন, নামরূপ তো সব মিথ্যা, কিন্তু যতক্ষণ আমি বহিস্মুখ, ততক্ষণ স্ত্রীলোক ত্যজ্য। আর উপদেশের জন্য, এটা ভাল, ওটা মন্দ ;—নচেৎ ভ্রষ্টাচার হবে।”

ঠাকুর সাধুসঙ্গে কথা কহিতে কহিতে ঘরে ফিরিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখলে,—সাধু কালীঘরে প্রণাম করলে !

মণি। আচ্ছা হাঁ।

পরদিন সোমবার ৩১শে ডিসেম্বর। বেলা ৪টা হইবে। ঠাকুর

ভক্তসঙ্গে ঘরে বসিয়া আছেন । বলরাম, মণি, রাখাল, লাটু, হরিশ প্রভৃতি আছেন । ঠাকুর মণিকে ও বলরামকে বলিতেছেন—

[মুখে জ্ঞানের কথা । হলধারীকে ঠাকুরের তিরস্কার কথা ।]

“হলধারীর জ্ঞানীর ভাব ছিল । সে অধ্যাত্ম, উপনিষৎ,—এই সব রাত দিন পড়ত । এদিকে সাকার কথায় মুখ বাঁকাতো । আমি যখন কাঙ্গালীদের পাতে একটু একটু খেলাম, তখন বল্লে, ‘তোরে ছেলেদের বিয়ে কেমন করে হবে!’ আমি বল্লাম, ‘তবে রে শালা, আমার আবার ছেলে পিলে হবে!’ তোরে গীতা বেদান্ত-পড়ার মুখে আগুন! ছাখোনা, এদিকে বল্ছে জগৎ মিথ্যা!—আবার বিষ্ণুঘরে নাক সিঁটকে ধ্যান!

সন্ধ্যা হইল । বলরামাদি ভক্তেরা কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন । ঘরে ঠাকুর মার চিন্তা করিতেছেন । কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরবাড়ীতে আরতির সুমধুর শব্দ শোনা যাইতে লাগিল ।

রাত্রি প্রায় ৮টা হইয়াছে । ঠাকুর ভাবে সুমধুর সুরে সুর করিয়া মার সহিত কথা কহিতেছেন । মণি মেঝেতে বসিয়া আছেন ।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও বেদান্ত ।]

ঠাকুর মধুর নাম উচ্চারণ করিতেছেন—হরি ওঁ ! হরি ওঁ ! ওঁ !

মাকে বলিতেছেন—‘ও মা ! ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে বেহুঁস করে রাখিস্নে ! ব্রহ্মজ্ঞান চাই না মা ! আমি আনন্দ করবো ! বিলাস করবো !

আবার বলিতেছেন,—‘বেদান্ত জানি না মা !—জানতে চাই না মা ! —মা তোকে পেলে বেদ বেদান্ত কত নীচে পড়ে থাকে !’

‘কৃষ্ণ রে ! তোরে বলবো, খা রে—নে রে—বাপ ! কৃষ্ণরে ! বলবো, তুই আমার জগৎ দেহ ধারণ করে এসেছিস্ বাপ !’

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

জ্ঞানপথ ও বিচারপথ । ভক্তিযোগ ও ব্রহ্মজ্ঞান ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে বসিয়া আছেন । রাত্রি প্রায় ৮টা হইবে । আজ পৌষ শুক্লা পঞ্চমী, বুধবার, ২রা জানুয়ারী ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ । ঘরে রাখাল ও মণি আছেন । মণির আজ একবিংশতি দিবস ।

ঠাকুর মণিকে বিচার করিতে বারণ করিয়াছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালের প্রতি) । বেশী বিচার করা ভাল না । আগে ঈশ্বর তার পর জগৎ,—তাকে লাভ করলে তাঁর জগতের বিষয়ও জানা যায় ।

(মণি ও রাখালের প্রতি) “যহু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ করলে তার কত বাড়ী, বাগান, কোম্পানীর কাগজ, সব জানতে পারা যায় ।

“তাই তো ঋষিরা বাল্মীকিকে ‘মরা’ ‘মরা’ জপ করতে বলেন । ওর একটু মানে আছে ; ‘ম’ মানে ঈশ্বর, ‘রা’ মানে জগৎ,— আগে ঈশ্বর, তার পরে জগৎ ।

[কৃষ্ণকিশোরের সহিত ‘মরা’ মন্ত্রকথা ।]

“কৃষ্ণকিশোর বলেছিল, ‘মরা’ ‘মরা’ শুদ্ধ মন্ত্র,— ঋষি দিয়েছেন বলে । ম মানে ঈশ্বর, রা মানে জগৎ ।

“তাই আগে বাল্মীকির মত সব ত্যাগ করে নির্জনে গোপনে বাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে ঈশ্বরকে ডাকতে হয় । আগে দরকার ঈশ্বর দর্শন ! তার পর বিচার—শাস্ত্র, জগৎ ।

[ঠাকুরের রাস্তায় ক্রন্দন—‘মা বিচার-বুদ্ধিতে বজ্রাঘাত দাও’ । 1868.]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) । তাই তোমাকে বলছি,—আর বিচার কোরো না । আমি ঝাউতলা থেকে উঠে যাচ্ছিলাম ঐ কথা বলতে । বেশী বিচার করলে শেষে হানি হয়—শেষে হাজার মত হয়ে যাবে । আমি রাত্রে একলা রাস্তায় কেঁদে কেঁদে বেড়াইতাম আর বলেছিলাম—মা বিচার বুদ্ধিতে বজ্রাঘাত দাও ।

“বল আর (বিচার) ক’রবে না ?

মণি। আজ্ঞা, না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। **ভক্তিতেই সব পাওয়া যায়।** যারা ব্রহ্মজ্ঞান চায়, যদি ভক্তির রাস্তা ধরে থাকে, তারা ব্রহ্মজ্ঞানও পাবে।

“তঁার দয়া থাকলে কি জ্ঞানের অভাব থাকে ? ও দেশে ধান মাপে, যেই রাশ ফুরোয় অমনি একজন রাশ ঠেলে দেয় ! মা জ্ঞানের রাশ ঠেলে দেন।

[পদ্মলোচনের ঠাকুরের প্রতি ভক্তি । পঞ্চবটীতে সাধনকালে প্রার্থনা ।]

“তঁাকে লাভ করলে পণ্ডিতদের খড়্‌ কুটো বোধ হয়। পদ্মলোচন বলেছিল, তোমার সঙ্গে কৈবর্তের বাড়ীতে সভায় যাবো, তার আর কি ?—তোমার সঙ্গে হাড়ীর বাড়ী গিয়ে খেতে পারি !

“ভক্তি দ্বারাই সব পাওয়া যায়। তঁাকে ভাল বাসতে পারলে আর কিছুই অভাব থাকে না। ভগবতীর কাছে কার্তিক আর গণেশ বসে ছিলেন। তঁার গলায় মণিময় রত্নমালা। মা বলেন, ‘যে ব্রহ্মাণ্ড আগে প্রদক্ষিণ ক’রে আসতে পারবে, তঁাকে এই মালা দিব।’ কার্তিক তৎক্ষণাৎ ক্ষণবিলম্ব না ক’রে ময়ূরে চড়ে বেরিয়ে গেলেন। গণেশ আস্তে আস্তে মাকে প্রদক্ষিণ ক’রে প্রণাম করলেন। গণেশ জানে, মার ভিতরেই ব্রহ্মাণ্ড ! মা প্রসন্না হ’য়ে গণেশের গলায় হার পরিয়ে দিলেন। অনেক ক্ষণ পরে কার্তিক এসে দেখে যে, দাদা হার পরে বসে আছে।

“মাকে কেঁদে কেঁদে আমি বলেছিলাম, ‘মা, বেদ বেদান্তে কি আছে, আমায় জানিয়ে দাও,—পুরাণ তন্ত্রে কি আছে, আমায় জানিয়ে দাও। তিনি একে একে আমায় সব জানিয়ে দিয়েছেন।

“তিনি আমাকে সব জানিয়ে দিয়েছেন ;—কত সব দেখিয়ে দিয়েছেন।

[সাধনকালে ঠাকুরের দর্শন । শিবশক্তি, নৃমুণ্ডস্তূপ, গুরুকর্ণধার, সচ্চিদানন্দসাগর ।]

“এক দিন দেখালেন, চতুর্দিকে শিব আর শক্তি। শিব শক্তির রমণ। মানুষ, জীব, জন্তু, তরু, লতা সকলের ভিতরেই সেই শিব আর শক্তি !—পুরুষ আর প্রকৃতি ! এদের রমণ।

“আর একদিন দেখালেন, নৃমুণ্ড—স্তূপাকার !—পর্বতাকার !—আর কিছুই নাই ! আমি তার মধ্যে একলা ব’সে।

“আর একবার দেখালেন মহাসমুদ্র ! আমি লবণ-পুত্তলিকা হয়ে মাপ্তে যাচ্ছি ! মাপ্তে গিয়ে গুরুর কৃপায় পাথর হয়ে গেলুম ! — দেখলাম জাহাজ একথানা ;—অমনি উঠে পড়লাম !—গুরু কর্ণধার ! সচ্চিদানন্দ গুরুকে রোজ ত সকালে ডাকো ? (মণি । আজ্ঞা, হাঁ ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ । গুরু কর্ণধার । তখন দেখছি, আমি একটী, তুমি একটী । আবার লাফ দিয়ে প’ড়ে মীন হলাম । সচ্চিদানন্দসাগরে আনন্দে বেড়াচ্ছি দেখলাম ।

“এ সব অতি গুহ্য কথা ! বিচার করে কি বুঝবে ? তিনি যখন দেখিয়ে দেন, তখন সব পাওয়া যায়,—কিছুরই অভাব থাকে না !

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

সাধনকালে বেলতলায় ধ্যান ১৮৫৭-৬১ । কামিনীকাক্ষন ত্যাগ ।
[শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমিগমন । রঘুবীরের জমি রেজেষ্ট্রী ১৮৭৪; ৪০. ।]

ঠাকুরের মধ্যাহ্নে সেবা হইয়াছে । বেলা প্রায় ১টা ; শনিবার, ৫ই জানুয়ারী । মণির আজ প্রভুসঙ্গে ত্রয়োবিংশতি দিবস ।

মণি আহারান্তে নবতে ছিলেন—হঠাৎ শুনিলেন, কে তাঁহার নাম ধরিয়া তিন চার বার ডাকিলেন । বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, ঠাকুরের ঘরের উত্তরের লম্বা বারান্দা হইতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে ডাকিতেছেন । মণি আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ।

দক্ষিণের বারান্দায় ঠাকুর মণির সহিত বসিয়া কথা কহিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তোমরা কি রকম ধ্যান করো ?—আমি বেলতলায় স্পষ্ট নানাক্রম দর্শন কর্তাম । একদিন দেখলাম, সাম্নে ঢাকা, শাল, এক সরা সন্দেশ, দুজন মেয়েমানুষ ! মনকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘মন ! তুই এসব কিছু চাস ?—সন্দেশ দেখলাম গু ! মেয়েদের মধ্যে এক জনের ফাঁদি নং । তাদের ভিতর বাহির সব দেখতে পাচ্ছি,—নাড়া-ভুঁড়ী, মল মূত্র, হাড় মাংস রক্ত ! মন কিছুই চাইলে না ।

“তাঁর পাদপদ্মেতেই মন রহিল । নিক্তির নীচের কাঁটা আর উপরের

কাঁটা । মন সেই নীচের কাঁটা । পাছে উপরের কাঁটা (ঈশ্বর) থেকে মন বিমুখ হয়, সদাই আতঙ্ক ! এক জন আবার শূল হাতে সদাই কাছে বসে থাক্ত ;—ভয় দেখালে, নীচের কাঁটা উপরের কাঁটা থেকে তফাৎ হলেই এর বাড়ি মারবো !

“কিন্তু কামিনীকাঞ্চনত্যাগ না হলে হবে না । আমি তিন ত্যাগ করেছিলাম—জমিন, জরু, টাকা ।* রঘুবীরের নামের জমি ওদেশে রেজেষ্ট্রী কর্তে গিয়াছিলাম । আমায় সই কর্তে বল্পে, আমি সই করলুম না । ‘আমার জমি’ বলে তো বোধ নাই । কেশব সেনের গুরু বলে খুব আদর করেছিল । আম এনে দিলে,—তা বাড়ী নিয়ে যাবার যো নাই । সন্ন্যাসীর সঞ্চয় কর্তে নাই ।

“ত্যাগ না হলে কেমন করে তাঁকে লাভ করা যাবে ! যদি একটা জিনিষের পর আর একটা জিনিষ থাকে, তা হলে প্রথম জিনিষটাকে না সরালে, কেমন করে আর একটা জিনিষ পাবে ?

“নিষ্কাম হয়ে তাঁকে ডাক্তে হয় । তবে সকাম ভজন কর্তে কর্তে নিষ্কাম হয় । ধ্রুব রাজ্যের জন্ত তপস্যা করেছিলেন, কিন্তু ভগবানকে পেয়েছিলেন । বলেছিলেন, ‘যদি কাঁচ কুড়ুতে এসে কেউ কাঞ্চন পায়, তা ছাড়বে কেন ?’

[দয়া, দানাদি ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ । চৈতন্যদেবের দান ।]

“সত্ত্ব গুণ এলে তবে তাঁকে লাভ করা যায় ।

“দানাদি কর্ম সংসারী লোকের প্রায় সকামই হয়,—সে ভাল না । তবে নিষ্কাম করলে ভাল । কিন্তু নিষ্কাম করা বড় কঠিন ।

“সাক্ষাৎকার হলে ঈশ্বরের কাছে কি প্রার্থনা করবে যে ‘আমি কতকগুলো পুকুর, রাস্তা, ঘাট, ডিস্পেন্সেরি, হাঁসপাতাল, এই সব করবো, ঠাকুর আমায় বর দাও !’ তাঁর সাক্ষাৎকার হলে ওসব বাসনা এক পাশে পড়ে থাকে ।

* ভিক্ষুঃ সৌবর্ণাদীনাং নৈব পরিগ্রহেৎ । (পরমহংসোপনিষৎ ।)

যস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন দৃষ্টং চ স ব্রহ্মহা ভবেৎ । যস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন স্পৃষ্টং চ স পৌকসো ভবেৎ । যস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন গ্রাহং চ স আত্মহা ভবেৎ । তস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন ন দৃষ্টঞ্চ স্পৃষ্টঞ্চ ন গ্রাহঞ্চ ।

“তবে দয়ার কাজ—দানাদি কাজ—কি কিছু করবে না ?

“তা নয় । সামনে দুঃখ কষ্ট দেখলে টাকা থাকলে দেওয়া উচিত । জ্ঞানী বলে, ‘দেরে দেরে, এরে কিছু দে ।’ তা না হলে, ‘আমি কি করতে পারি,—ঈশ্বরই কর্তা আর সব অকর্তা’ এইরূপ বোধ হয় ।

“মহাপুরুষরা জীবের দুঃখে কাতর হয়ে ভগবানের পথ দেখিয়ে দেন । শঙ্করাচার্য্য জীব শিক্ষার জন্য ‘বিচার আমি’ রেখেছিলেন ।

“অন্নদানের চেয়ে জ্ঞানদান, ভক্তিদান, আরও বড় । চৈতন্যদেব তাই আচণ্ডালে ভক্তি বিলিয়েছিলেন । দেহের সুখ দুঃখ তো আছেই । এখানে আম খেতে এসেছো, আম খেয়ে যাও । জ্ঞানভক্তির প্রয়োজন । ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু ।

[স্বাধীন ইচ্ছা [Free Will] কি আছে ? ঠাকুরের সিদ্ধান্ত ।]

“তিনি সব কচ্ছেন । যদি বল তা হলে লোকে পাপ করতে পারে । তা নয়—যার ঠিক বোধ হয়েছে ‘ঈশ্বর কর্তা আমি অকর্তা’ তার আর বেতালে পা পড়ে না ।

“Englishmanরা যাকে স্বাধীন ইচ্ছা (Free Will) বলে, সেই স্বাধীন ইচ্ছা বোধ তিনিই দিয়ে রাখেন ।

“যারা তাঁকে লাভ করে নাই, তাদের ভিতর ঐ স্বাধীনইচ্ছা বোধ না দিলে পাপের বৃদ্ধি হত । নিজের দোষে পাপ কচ্ছি, এ বোধ যদি তিনি না দিতেন, তা হলে পাপের আরও বৃদ্ধি হত ।

“যারা তাঁকে লাভ করেছে, তারা জানে দেখতেই ‘স্বাধীন ইচ্ছা’—বস্তুতঃ তিনিই যন্ত্রা, আমি যন্ত্র ; তিনি ইঞ্জিনিয়ার, আমি গাড়ী ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ । ভক্তজন্য ক্রন্দন ও প্রার্থনা ।

বেলা চারটা বাজিয়াছে । পঞ্চবটীবরে শ্রীযুক্ত রাখাল ও আরও দু, একটা ভক্ত মণির কীর্তন গান শুনিতেছেন—

গান—যরের বাহিরে দণ্ডে শত বার তিলে তিলে এসে যায় ।

রাখাল গান শুনিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন ।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীতে আসিয়াছেন ।
তাহার সঙ্গে বাবুরাম, হরীশ ;—ক্রমে রাখাল ও মণি ।

রাখাল । ইনি আজ বেশ কীর্তন করে আনন্দ দিয়েছেন ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া গান গাইতেছেন,—

গান—বাঁচলাম সখি, শুনি কৃষ্ণ নাম (ভাল কথার মন্দও ভাল) ।

এই সব গান গাইবে—‘সব সখি মিলি বৈঠল, (এইত রাই ভাল ছিল !) (বুঝি হাট ভাঙ্গল !)

আবার বলিতেছেন, “এই আর কি !—ভক্তি, ভক্ত নিয়ে থাকা ।

[শ্রীরাধা ও যশোদা সংবাদ । ঠাকুরের ‘আপনার লোক’]

“কৃষ্ণ মথুরায় গেলে যশোদা শ্রীমতীর কাছে এসেছিলেন । শ্রীমতা ধ্যানস্থ ছিলেন । তার পর যশোদাকে বল্লেন, আমি আত্মশক্তি, তুমি আমার কাছে কিছু বর লও । যশোদা বল্লেন, ‘বর আর কি দিবে !—তবে এই বলো—যেন কায়মনোবাক্যে তারই সেবা করতে পারি,—যেন এই চক্ষে তার ভক্তের দর্শন হয়,—এই মনে তার ধ্যান চিন্তা যেন হয়,—আর বাক্য দ্বারা তার নাম গুণ গান যেন হয় !’

“তবে যাদের খুব পাকা হয়ে গেছে, তাদের ভক্ত না হলেও চলে,—কখন কখন ভক্ত ভাল লাগে না । পঙ্কজের কাজের উপর চুণকাম ফেটে যায় । অর্থাৎ যার তিনি অন্তরে বাহিরে তাদের এইরূপ অবস্থা ।

ঠাকুর ঝাউতলা হইতে ফিরিয়া আসিয়া পঞ্চবটীমূলে মণিকে আবার বলিতেছেন—“তোমার মেয়ে স্মর—এই রকম গান অভ্যাস কর্তে পার ?—‘সখি সে বন কত দূর !—যে বনে আমার শ্যাম সুন্দর !’—

(বাবুরাম দৃষ্টে, মণির প্রতি)—“দেখো, যারা আপনার তারা হল পর,—রামলাল আর সব যেন আর কেউ । যারা পর তারা হল আপনার,—ছাখোনা, বাবুরামকে বলছি—‘বাছো যা, — মুখ ধো !’ এখন ভক্তরাই আত্মীয় ।” (মণি বলিতেছেন,—আচ্ছা হাঁ ।)

[উন্মাদের পূর্ব পঞ্চবটীতে সাধন 1857-58 । চিৎশক্তি ও চিদাত্মা ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (পঞ্চবটী দৃষ্টে) । এই পঞ্চবটীতে বস্তাম !—কালে

উন্মাদ হলাম !—তাও গেল ! **কালই ব্রহ্ম** । যিনি কালের সহিত
রমণ করেন, তিনিই **কালী**—আত্মশক্তি । অটলকে টলিয়ে দেন !

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাইতেছেন—‘ভাব কি ভেবে পরাণ গেল !
যার নামে হরে কাল, পদে **অহা কাল**, তার কালরূপ কেন হল !’

“আজ শনিবার, মা কালীর ঘরে যেও ।

বকুলতলার নিকট আসিয়া ঠাকুর মণিকে বলিতেছেন—

“চিদাত্মা আর চিৎশক্তি । চিদাত্মা পুরুষ, চিৎশক্তি প্রকৃতি ।
চিদাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, চিৎশক্তি শ্রীরাধা । ভক্ত ঐ চিৎশক্তির এক একটী রূপ ।

“অগ্ন্যাগ্ন ভক্তেরা সখী ভাব বা দাসভাবে থাকবে । **এই মূল কথা** ।

সন্ধ্যার পর ঠাকুর কালীঘরে গিয়াছেন । মণি সেখানে মার চিন্তা
করিতেছেন দেখিয়া ঠাকুর প্রসন্ন হইয়াছেন ।

[ভক্তদের জন্য জগন্মাতার কাছে ক্রন্দন । ভক্তদের আশীর্বাদ]

সমস্ত দেবালয়ে আরতি হইয়া গেল । ঠাকুর, ঘরে তক্তার উপর
বসিয়া মার চিন্তা করিতেছেন । মেজেতে কেবল মণি বসিয়া আছেন ।

ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন ।

কিয়ৎক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইতেছে । এখন ভাবের পূর্ণমাত্রা !—
ঠাকুর মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন । ছোট ছেলে যেমন মার কাছে
আদ্যার করে কথা কয় । মাকে করুণস্বরে বলিতেছেন—“ওমা, কেন
সে রূপ দেখালিনি !—সেই ভুবনমোহন রূপ ! এত কোরে তোকে
বললাম !—তা তোকে বল্লোতো তুই শুন্বিনি !—তুই ইচ্ছা ময়ী !”

স্বর করে মাকে এই কথাগুলি বল্লেন, শুনলে পাষণ বিগলিত হয় ।

ঠাকুর আবার মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন—

“মা **বিশ্বাস চাই** ! যাক্ শালার বিচার !—সাত চোনার
বিচার এক চোনায়ে যায় !—বিশ্বাস চাই (গুরুবাক্যে বিশ্বাস)—
বালকের মত বিশ্বাস !—মা বলেছে, ওখানে ভূত আছে,—তা ঠিক জেনে
আছে যে ভূত আছে !—মা বলেছে, ওখানে জুজু !—তা তাই ঠিক
জেনে আছে ! মা বলেছে, ও তোর দাদা হয়,—তা জেনে তাছে পাঁচ
সিকে পাঁচ আনা দাদা ! **বিশ্বাস চাই** !

“কিন্তু মা ! ওদেরই বা দোষ কি !—ওরা কি করবে ! বিচার এক বার তো করে নিতে হয় !—দেখ না, ঐ সেদিন এত করে বললাম, তা কিছু হলো না—আজ কেন একবারে— * * *

ঠাকুর মার কাছে করুণ গদ গদ স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রার্থনা করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য ! ভক্তদের জন্য মার কাছে কাঁদছেন—
‘মা, যারা যারা তোমার কাছে আসছে, তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কোরো।—সব ত্যাগ করিও না মা !—আচ্ছা, শেষে যা হয় কোরো !’

“মা, সংসারে যদি রাখো, তো এক এক বার দেখা দিস্।—না হলে কেমন করে থাকবে। এক এক বার দেখা না দিলে উৎসাহ হবে কেমন করে মা।—তার পর শেষে যা হয় কোরো।

ঠাকুর এখনও ভাবাবিষ্ট। সেই অবস্থায় হঠাৎ মণিকে বলিতেছেন।
“ছাথো, তুমি যা বিচার করেছো, অনেক হয়েছে !—আর না ! বল, আর করবে না ?” মণি করজোড়ে বলিতেছেন, আজ্ঞা না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। অনেক হয়েছে !—তুমি প্রথম আস্তে মাত্র তোমায় ত আমি বলেছিলাম—তোমার ঘর।—আমি তো সব জানি ?

মণি (কৃতাজ্জলি)। আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমার ঘর, তুমি কে, তোমার অন্তর বাহির, তোমার আগেকার কথা, তোমার পরে কি হবে,—এ সব ত আমি জানি ?

মণি (করজোড়ে)। আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ছেলে হয়েছে শুনে বকেছিলাম !—এখন গিয়ে বাড়ীতে থাকো—তাদের জানিও যেন তুমি তাদের আপনার। ভিতরে জান্বে, ‘তুমিও তাদের আপনার নও, তারাও তোমার আপনার নয়’ !

মণি চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর বাপের সঙ্গে প্রীত কোরো—এখন উড়তে শিখে—; তুমি বাপকে অমষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে পারবে না ?

মণি (করজোড়ে)। আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমায় আর কি বলবো, তুমি ত সব জানো ?—সব ত বুঝছো ? (মণি চুপ করিয়া আছেন।)

ঠাকুর । সব ত বুঝ্ছে ? (মণি । আজ্ঞা, একটু একটু বুঝ্ছি ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ । অনেকটা ত বুঝ্ছে । রাখাল যে এখানে আছে, ওর বাপ সন্তুষ্ট আছে । মণি হাত জোড় করিয়া চুপ করিয়া আছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বলিতেছেন —‘তুমি যা ভাব্ছে, তাও হয়ে যাবে ।’

[ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে । মা ও জননী । কেন নরলীলা ?]

ঠাকুর এইবার প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন । ঘরে রাখাল, রামলাল । রামলালকে গান গাহিতে কহিতেছেন । রামলাল গান গাহিতেছেন—

গান—সমর আলো করে কার কামিনী !

গান —কে রণে নাচিছে বামা নীরদবরণী ।

শোণিত সায়রে যেন ভাসিছে নবনলিনী ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ । মা আর জননী । যিনি জগৎরূপে আছেন— সর্বব্যাপী হয়ে তিনিই মা । জননী যিনি জন্মস্থান । আমি মা বলতে বলতে সমাধিস্থ হতুম !—মা বলতে বলতে যেন জগতের ঈশ্বরীকে টেনে আন্তুম ! যেমন জেলেরা জাল ফেলে, তার পর অনেকক্ষণ পরে জাল গুটোতে থাকে । বড় বড় মাছ সব পড়েছে !

[গৌরী পণ্ডিতের কথা । কালী ও শ্রীগৌরাঙ্গ এক ।]

“গৌরী বলেছিল, কালী গৌরাঙ্গ এক বোধ হলে, তবে ঠিক জ্ঞান হয় । যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি (কালী) । তিনিই নররূপে শ্রীগৌরাঙ্গ ।

ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন, যিনি আত্মশক্তি তিনিই নররূপী শ্রীরামকৃষ্ণ হইয়া আসিয়াছেন ! শ্রীযুক্ত রামলাল ঠাকুরের আদেশে আবার গাহিতেছেন,—এবার গৌরাঙ্গলীলা ।

গান—কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটীরে, অপরূপ-জ্যোতি,

শ্রীগৌরাঙ্গমূর্তি, দুনয়নে প্রেম বহে শতধারে !

গান—গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) যাঁরই নিত্য তাঁঁরই লীলা । ভক্তের জন্ম লীলা । তাঁঁকে নররূপে দেখতে পেলে তবে ত ভক্তেরা ভালবাস্তে পারবে, তবেই ভাই ভগিনী বাপ মা সন্তানের মত স্নেহ করতে পারবে ।

“তিনি ভক্তের ভালবাসার জন্ম ছোটটী হয়ে লীলা করতে আসেন ।

চতুর্থ ভাগ—দশম খণ্ড।

দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে রাখাল, লাটু, মাষ্টার, মহিমা প্রভৃতি সঙ্গে ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[শ্রীরামকৃষ্ণের হস্তে আঘাত । সমাধি ও জগন্মাতার সহিত কথা ।]

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে সেই ঘরে অবস্থিতি করিতেছেন । বেলা তিনটা । শনিবার, ২০শে মাঘ, ১২৯০ সাল । মাঘ শুক্লা ষষ্ঠী ।

এক দিন ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া ঝাউতলার দিকে যাইতেছেন ; সঙ্গে কেহ না থাকাতে রেলের কাছে পড়িয়া যান । তাহাতে তাঁহার বাম হাতের হাড় সরিয়া যায় ও খুব আঘাত লাগে । মাষ্টার কলিকাতা হইতে ভক্তদের নিকট হইতে বাড়, প্যাড্, ও ব্যাণ্ডেজ্ আনিয়াছেন ।

শ্রীযুক্ত রাখাল, মহিমাচরণ, হাজরা প্রভৃতি ভক্তেরা ঘরে আছেন । মাষ্টার আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরের চরণ বন্দনা করিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কিগো ! তোমার কি ব্যারাম হয়ে ছিল ? এখন সেরেছে তো ? (মাষ্টার বলিতেছেন, আজ্ঞা হাঁ ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি) । ঠাঙ্গা, ‘আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রা’, তবে এ রকম হলো কেন ?

ঠাকুর তক্তার উপর বসিয়া আছেন । মহিমাচরণ নিজের তীর্থ-দর্শনের গল্প করিতেছেন । ঠাকুর শুনিতেন । দ্বাদশ বৎসর পূর্বের তীর্থদর্শন ।

মহিমাচরণ । কাশী সিক্রোলের একটা বাগানে একটা ব্রহ্মচারী দেখলাম । বলে, এ বাগানে কুড়ি বছর আছি । কিন্তু কার বাগান জানে না । আমায় জিজ্ঞাসা করলে, ‘নৌকরী করো বাবু ?’ আমি বললাম, ‘না ।’ তখন বলে—‘কেয়া, পরিব্রাজক হায় ?’

“নন্দ্যদাতীরে একটা সাধু দেখলাম, অন্তরে গায়ত্রী জপ কচ্ছেন—শরীরে পুলক হচ্ছে ! আবার এমন প্রণব আর গায়ত্রী উচ্চারণ করেন, যে যারা বসে থাকে, তাদের রোমাঞ্চ আর পুলক হয় !

ঠাকুরের বালক-স্বভাব,—ক্ষুধা পাইয়াছে ; মাষ্টারকে বলিতেছেন—
“কৈ, কি এনেছ ?” রাখালকে দেখিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন ।

সমাধি ভঙ্গ হইতেছে । প্রকৃতিস্থ হইবার জন্য ঠাকুর বলিতেছেন,—
‘আমি জিলিপী খাবো’, ‘আমি জল খাবো’ !

ঠাকুর বালক-স্বভাব,—জগন্মাতাকে কেঁদে কেঁদে বলছেন—‘ব্রহ্মময়ী !
আমার এমন কেন করলি ? আমার হাতে বড় লাগছে !— (রাখাল,
মহিমা, হাজরা প্রভৃতি প্রতি) আমার ভাল হবে ?’ ভক্তরা ছোট
ছেলেটিকে যেমন বুঝায়,—সেইরূপ বলছেন, ‘ভাল হবে বৈকি !’

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালের প্রতি) । যদিও শরীর রক্ষার জন্য
তুই আছিস্, তোর দোষ নাই,—কেন না, তুই থাকলেও রেল
পর্যন্ত ত যেতিস্ না ।

[শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানভাব । ‘ব্রহ্মজ্ঞানকে আমার কোটী নমস্কার’ ।]

ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইলেন । ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন—
“ওঁ ওঁ ওঁ—মা আমি কি বল্ছি ! মা আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে বেহুঁস
করো না—মা আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিও না । আমি যে ছেলে !—ভয়-
তরাসে ।—আমার মা চাই ।—ব্রহ্মজ্ঞানকে আমার কোটী নমস্কার ।
ও যাদের দিতে হয়, তাদের দাওগে । আনন্দময়ী !—আনন্দময়ী !

ঠাকুর উচ্চৈঃস্বরে ‘আনন্দময়ী । আনন্দময়ী ।’ বলিয়া কাঁদিতেছেন,
আর বলিতেছেন—‘আমি ঐ খেদে খেদ করি’ (শ্যামা) ।

তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি ॥

ঠাকুর আবার মাকে বলিতেছেন—‘আমি কি অণ্ডায় করেছি মা ?—
আমি কি কিছু করি মা ?—তুই যে সব করিস্ মা । আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী ।
(রাখালের প্রতি, সহাস্ত্রে) দেখিস্, তুই যেন পড়িস্ নে ।—মান করে
যেন ঠকিস্ না ।

ঠাকুর মাকে আবার বলিতেছেন—‘মা, আমি লেগেছে বলে কি
কাঁদছি ? না ।—‘আমি ঐ খেদে খেদ করি’ (শ্যামা) ।

তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

[কি করে ঈশ্বরকে ডাকিতে হয় । ‘ব্যাকুল হও’ ।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বালকের ন্যায় আবার হাসিতেছেন ও কথা কহিতেছেন—বালক যেমন বেশী অস্থির হলেও এক একবার হেসে খেলে বেড়ায় । মহিমা দি ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । সচ্চিদানন্দ লাভ না হলে কিছুই হলো না বাবু !

“বিবেক বৈরাগ্যের ন্যায় আর জিনিষ নাই ।

“সংসারীদের অনুরাগ ক্ষণিক—তপ্ত খোলায় জল যতক্ষণ থাকে ।—
একটা ফুল দেখে হয়ত বলি, আহা ! কি চমৎকার ঈশ্বরের সৃষ্টি !

“ব্যাকুলতা চাই । যখন ছেলে বিষয়ের ভাগের জন্য ব্যতিব্যস্ত করে,
তখন বাপ মা দুজনে পরামর্শ করে,—আর ছেলেকে আগেই হিন্দু ফেলে
দেয় । ব্যাকুল হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন । তিনি
যে কালে জন্ম দিয়েছেন, সে কালে তাঁর ঘরে আমাদের হিন্দু আছে ।
তিনি আপনার বাপ, আপনার মা,—তাঁর উপর জোর খাটে । ‘দাও
পরিচয় । নয় গলায় ছুরি দিব ।’

কিরূপে মাকে ডাকিতে হয়, ঠাকুর শিখাইতেছেন—“আমি মা বলে
এইরূপে ডাক্তাম—‘মা আনন্দময়ী !—দেখা দিতে যে হবে !’

আবার কখন বলতাম,—“ওহে দীননাথ—জগন্নাথ—আমি ত জগৎ-
ছাড়া নই নাথ । আমি জ্ঞানহীন,—সাধনহীন,—ভক্তিহীন—আমি কিছুই
জানি না—দয়া করে দেখা দিতে হবে !”—

ঠাকুর অতি করুণ স্বরে সুর করিয়া, কিরূপে তাঁহাকে ডাকিতে হয়,
শিখাইতেছেন । সেই করুণ স্বর শুনিয়া ভক্তদের হৃদয় দ্রবীভূত
হইতেছে,—মহিমাচরণ চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতেছেন ।

মহিমাচরণকে দেখিয়া ঠাকুর আবার বলিতেছেন—

গান—ডাক দেখি মন ডাকার মতন কেমন শ্যামা থাকতে পারে !

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

[শিবপুর ভক্তগণ ও আশ্মোক্তারী (বকলমা) । শ্রীমধু ডাক্তার ।]

শিবপুর হইতে ভক্তেরা আসিলেন । তাঁহারা অত দূর হইতে কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না । সার সার গুটিকতক কথা তাঁহাদিগকে বলিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শিবপুরের ভক্তদের প্রতি) । ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য । বাবু আর বাগান । ঈশ্বর ও তাঁর ঐশ্বর্য । লোকে বাগানই দেখে, বাবুকে চায় কয়জনে ?

ভক্ত । আজ্ঞা, উপায় কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । সদসৎ বিচার । তিনি সত্য আর সব অনিত্য—এইটী সর্বদা বিচার । ব্যাকুল হয়ে ডাকা ।

ভক্ত । আজ্ঞা, সময় কই ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । যাদের সময় আছে, তারা ধ্যান ভজন করবে ।

‘যারা একান্ত পারবে না, তারা দুবেলা খুব ছোটো করে প্রণাম করবে । তিনি ত অন্তর্যামী,—বুঝছেন যে, এরা কি করে ! অনেক কাজ কর্তে হয় । তোমাদের ডাক্‌বার সময় নাই,—তঁাকে আশ্মোক্তারী (বকলমা) দাও । কিন্তু তঁাকে লাভ না করলে—তঁাকে দর্শন না করলে, কিছুই হলো না ।

একজন ভক্ত । আজ্ঞা, আপনাকে দেখাও যা, ঈশ্বরকে দেখাও তা ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ও কথা আর বোলো না । গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউএর কিছু গঙ্গা নয় । আমি এত বড় লোক, আমি অমুক—এই সব অহঙ্কার না গেলে তঁাকে পাওয়া যায় না । আমি চিপিকে ভক্তির জলে ভিজিয়ে সমভূমি করে ফ্যালো ।

[কেন সংসার ? ভোগান্তে ব্যাকুলতা ও ঈশ্বরলাভ ।]

ভক্ত । সংসারে কেন তিনি রেখেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । সৃষ্টির জন্ত রেখেছেন—তাঁর ইচ্ছা । তাঁর মায়া । কামিনী কাঞ্চন দিয়ে তিনি ভুলিয়ে রেখেছেন ।

ভক্ত । কেন ভুলিয়ে রেখেছেন ? কেন তাঁর ইচ্ছা ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । তিনি যদি ঈশ্বরের আনন্দ একবার দেন, তা হলে আর কেউ সংসার করে না—সৃষ্টিও চলে না ।

“চাঁলের আড়তে বড় বড় ঠেকের ভিতরে চাঁল থাকে । পাছে ইঁদুর-গুলো ঐ চালের সন্ধান পায়, তাই দোকানদার একটা কুলোতে খইমুড়কি রেখে দেয় । ঐ খই মুড়কি মিষ্ট লাগে, তাই ইঁদুরগুলো সমস্ত রাত কড়র্ মড়র্ করে খায় । চালের সন্ধান আর করে না !

“কিন্তু ছাখো, এক সের চালে চৌদ্দগুণ খই হয় । কামিনীকাঞ্চনের আনন্দ অপেক্ষা ঈশ্বরের আনন্দ কত বেশী । তাঁর রূপ চিন্তা করলে রস্তা তিলোত্তমার রূপ চিতার ভস্ম বলে বোধ হয় !

ভক্ত । তাঁকে লাভ করবার জন্য ব্যাকুলতা কেন হয় না ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । ভোগান্ত না হলে ব্যাকুলতা হয় না । কামিনীকাঞ্চনের ভোগ যেটুকু আছে, সেটুকু তৃপ্তি না হলে জগতের মাকে মনে পড়ে না । ছেলে যখন খেলায় মত্ত হয়, তখন মাকে চায় না । খেলা সান্ত হয়ে গেলে তখন বলে, ‘মা যাবো ।’ হৃদের ছেলে পায়রা লয়ে খেলা কচ্ছিল ; পায়রাকে ডাকছে,—‘আয় তি তি !’ করে । পায়রা লয়ে খেলা তৃপ্তি যাই হোক, অমনি কাঁদতে আরম্ভ করলে । তখন এক জন অচেনা লোক এসে বলে, আমি তোকে মার কাছে লয়ে যাচ্ছি, আয় । সে তারই কাঁধে চড়ে অনায়াসে গেল ।

“যারা নিত্যসিদ্ধ, তাদের সংসারে টুকতে হয় না । তাদের ভোগের বাসনা জন্ম থেকেই মিটে গেছে ।

[শ্রীমধুডাক্তারের আগমন । শ্রীমধুসূদন ও নামমাহাত্ম্য ।]

পাঁচটা বাজিয়াছে । মধু ডাক্তার আসিয়াছেন । ঠাকুরের হাতটিতে বাড়্ ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতেছেন । ঠাকুর বালকের ন্যায় হাসিতেছেন আর বলিতেছেন, ঐহিক ও পারত্রিকের মধুসূদন !

মধু (সহাস্তে) । কেবল নামের বোঝা বয়ে মরি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । কেন নাম কি কম ? তিনি আর তাঁর নাম তফাৎ নয় । সত্যভামা যখন তুলাযন্ত্রে স্বর্ণ-মণি-মাণিক্য দিয়ে ঠাকুরকে

‘ওজন কচ্ছিলেন, তখন হলো না ! যখন রুক্ষিণী তুলসী আর কৃষ্ণনাম এক দিকে লিখে দিলেন, তখন ঠিক ওজন হলো !”

এই বার ডাক্তার বাড়ি বাঁধিয়া দিবেন । মেঝেতে বিছানা করা হইল । ঠাকুর হাসিতে হাসিতে মেঝেতে আসিয়া শয়ন করিতেছেন । শূর করিয়া করিয়া বলিতেছেন--“রাইএর দশম দশা ! বৃন্দে বলে, আর কত বা হবে !”

ভক্তেরা চতুর্দিকে বসিয়া আছেন । ঠাকুর আবার গাহিতেছেন—
‘সব সখি মিলি বৈঠল--সরোবর-কূলে !’ ঠাকুরও হাসিতেছেন,
ভক্তেরাও হাসিতেছেন । বাড়ি বাঁধা হইয়া গেলে ঠাকুর বলিতেছেন—

“আমার কল্কাতার ডাক্তারদের তত বিশ্বাস হয় না । শম্ভুর বিকার হয়েছে, ডাক্তার (সর্বাধিকারী) বলে ও কিছু নয়, ও ঔষধের নেশা ! তার পরই শম্ভুর দেহত্যাগ হলো !

[শম্ভুমল্লিকের মৃত্যু ১৮৭৭.]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

[মহিমাচরণের প্রতি উপদেশ ।]

সন্ধ্যার পর ঠাকুরবাড়ীতে আরতি হইয়া গেল । কিয়ৎক্ষণ পরে অধর কলিকাতা হইতে আসিলেন ও ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন । ঘরে মহিমাচরণ, রাখাল, মাষ্টার । হাজরাও এক একবার আসিতেছেন ।

অধর । আপনি কেমন আছেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (স্নেহমাখা স্বরে) । এই ছাখো । হাতে লেগে কি হয়েছে । (সহাস্ত্রে) আছি আর কেমন !

অধর মেঝেতে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন । ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন,—‘তুমি একবার এইটে হাত বুলিয়ে দাও তো’ ।

অধর ছোট খাটটির উত্তর প্রান্তে বসিয়া ঠাকুরের শ্রীচরণ সেবা করিতেছেন । ঠাকুর মহিমাচরণের সহিত আবার কথা কহিতেছেন ।

[‘মূলকথা অহৈতুকী ভক্তি । ‘স্বস্বরূপকে জানো ।’]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি) । অহৈতুকী ভক্তি,—তুমি এইটী যদি সাধতে পার তাহলে বেশ হয় ।

“মুক্তি, মান, টাকা, রোগ ভাল হওয়া, কিছুই চাই না,—কেবল তোমায় চাই!” এর নাম অহৈতুকী ভক্তি । বাবুর কাছে অনেকেই আসে—নানা কামনা করে ; কিন্তু যদি কেউ কিছুই চায় না, কেবল ভালবাসে বোলে বাবুকে দেখতে আসে, তা হলে বাবুরও ভালবাসা তার উপর হয় ।

“প্রহ্লাদের অহৈতুকী ভক্তি—ঈশ্বরের প্রতি শুদ্ধ নিকাম ভালবাসা ।

মহিমাচরণ চুপ করিয়া আছেন । ঠাকুর আবার তাঁহাকে বলিতেছেন—
—“আচ্ছা, তোমার যেমন ভাব সেইরূপ বলি, শোন

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি) । বেদান্তমতে স্বস্বরূপকে চিন্তে হয় । কিন্তু অহং ত্যাগ না করলে হয় না । অহং একটী লাঠীর স্বরূপ—যেন জলকে দুভাগ কচ্ছে । আমি আলাদা তুমি আলাদা ।

“সমাধিস্থ হয়ে এই অহং চলে গেলে ব্রহ্মকে বোধে বোধ হয় ।

ভক্তেরা হয়ত কেহ কেহ ভাবিতেছেন, ঠাকুরের কি ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে ? তা যদি হয়ে থাকে তবে উনি আমি আমি করিতেছেন কেন ?

ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন—“আমি মহিম চক্রবর্তী,—বিদ্বান্,—এই ‘আমি’ ত্যাগ করতে হবে । বিচার আমিতে দোষ নাই । শঙ্করাচার্য্য লোকশিক্ষার জন্য ‘বিচার আমি’ রেখেছিলেন ।

“স্ত্রীলোক সম্বন্ধে খুব সাবধান না থাকলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না । তাই সংসারে কঠিন । যত সিয়ান হও না কেন, কাজলের ঘরে থাকলে গায়ে কালী লাগবে । যুবতীর সঙ্গে নিকামেরও কাম হয় ।

“তবে জ্ঞানীর পক্ষে স্বদারায় কখন কখন গমন দোষের নয় । যেমন মলমূত্র ত্যাগ তেমনিই রেতঃ ত্যাগ—আর পায়খানা মনে নাই ।

“আধা ছানার মণ্ডা কখন বা খেলে । (মহিমার হাস্য) ।

“সংসারীর পক্ষে তত দোষের নয় ।

[সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ।]

“সন্ন্যাসীর পক্ষে খুব দোষের । সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্য্যন্ত

* ভিক্ষু (সন্ন্যাসী) হিরণ্য (কাঁকন) দেখবে না, স্পর্শ করবে না, গ্রহণ করবে না—পাছে আসক্তি হয় । পরমহংস উপনিষৎ । শ্রীকথামৃত, চতুর্থভাগ, ৬৮ পৃষ্ঠা ।

দক্ষিণেশ্বর । অধর মহিমা দি ভক্তসঙ্গে—যোগতত্ত্ব কথা প্রসঙ্গে । ৮১

দেখবে না । সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীলোক,—থুথু ফেলে থুথু খাওয়া ।

“স্ত্রীলোকের সঙ্গে সন্ন্যাসী বসে বসে কথা কবে না—হাজার ভক্ত হলেও । জিতেন্দ্রিয় হলেও আলাপ করবে না ।

“সন্ন্যাসী কামিনীকাঞ্চন দুইই ত্যাগ করবে—যেমন মেয়ের পট পর্য্যন্ত দেখবে না, তেমনি কাঞ্চন—টাকা—স্পর্শ করবে না । টাকা কাছে থাকলেও খারাপ । হিসাব, দুশ্চিন্তা, টাকার অহঙ্কার, লোকের উপর ক্রোধ, কাছে থাকলে এই সব এসে পড়ে । সূর্য্য দেখা যাচ্ছিল মেঘ এসে সব ঢেকে দিলে ।

“তাইতো মাড়োয়ারী যখন হৃদের কাছে টাকা জমা দিতে চাইলে, আমি বললাম ‘তাও হবেনা—কাছে থাকলেই মেঘ উঠবে.’”

“সন্ন্যাসীর এ কঠিন নিয়ম কেন ? তার নিজের মঙ্গলের জন্যও বটে, —আর লোকশিক্ষার জন্য । সন্ন্যাসী যদিও নিজে নির্লিপ্ত হয়—জিতেন্দ্রিয় হয়—তবু লোকশিক্ষার জন্য কামিনীকাঞ্চন এইরূপে ত্যাগ করবে ।

“সন্ন্যাসীর ঘোল আনা ত্যাগ দেখলে তবে ত লোকের সাহস হবে ! তবেই ত তারা কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করতে চেষ্টা করবে !

“এ ত্যাগ শিক্ষা যদি সন্ন্যাসী না দেয়, তবে কে দিবে !

[জনকাদির ঈশ্বরলাভের পর সংসার । ঋষি ও শূকরমাংস ।]

“তাকে লাভ করে তবে সংসারে থাকা যায় । যেমন মাখম তুলে জলে ফেলে রাখা । জনক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে তবে সংসারে ছিলেন ।

“জনক দুখান তরবার ঘোরাতে—জ্ঞানের আবার কন্মের । সন্ন্যাসী কন্মত্যাগ করে । তাই কেবল একখানা তরবার—জ্ঞানের । জনকের মত জ্ঞানী সংসারী গাছের নীচের ফল উপরের ফল দুইই খেতে পারে । সাধুসেবা, অতিথিসৎকার এ সব পারে । মাকে বলেছিলাম, মা, আমি শুটকে সাধু হব না ।

“ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পর খাওয়ারও বিচার থাকে না । ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি ব্রহ্মানন্দের পর সব খেতে পারতো—শূকরমাংস পর্য্যন্ত ।

[চার আশ্রম, যোগতত্ত্ব ও শ্রীরামকৃষ্ণ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি) । মোটামুটি দুই প্রকার যোগ—কন্ম-

যোগ আর মনোযোগ,—কর্মের দ্বারা যোগ আর মনের দ্বারা যোগ ।

“ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ আব সন্ন্যাস—এর মধ্যে প্রথম তিন-
টীতে কর্ম করিতে হয় । সন্ন্যাসীর দণ্ডকমণ্ডলু, ভিক্ষাপাত্র ধারণ করিতে
হয় । সন্ন্যাসী নিত্যকর্ম করে । কিন্তু হয়ত মনের যোগ নাই—জ্ঞান
নাই ঈশ্বরে মন নাই । কোন কোন সন্ন্যাসী নিত্যকর্ম কিছু কিছু রাখে,
—লোকশিক্ষার জন্য । গৃহস্থ বা অন্যান্য আশ্রমী যদি নিষ্কাম কর্ম করিতে
পারে, তা হলে তাদের কর্মের দ্বারা যোগ হয় ।

“পরমহংস অবস্থায়—যেমন শুকদেবাদির—কর্ম সব উঠে যায় ।
পূজা, জপ, তর্পণ, সন্ধ্যা এই সব কর্ম । এ অবস্থায় কেবল মনের যোগ ।
বাহিরের কর্ম কখন কখন সাধ ক’রে করে—লোকশিক্ষার জন্য । কিন্তু
সর্বদা স্মরণ মনন থাকে ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

[মহিমাচরণের শাস্ত্রপাঠ শ্রবণ ও ঠাকুরের সমাধি ।]

কথা কহিতে কহিতে রাত আটটা হইয়াছে । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ
মহিমাচরণকে শাস্ত্র হইতে কিছু স্তবাদি শুনাইতে বলিলেন । মহিমাচরণ
একখানি বই লইয়া উত্তরগীতার প্রথমেই পরব্রহ্মসম্বন্ধীয় যে শ্লোক
তাহা শুনাইতেছেন—‘যদেকং নিষ্কলং ব্রহ্ম ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনম্ ।

অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং বিনাশোৎপত্তিবর্জিতম্ ॥

ক্রমে তৃতীয় অধ্যায়ের ৭ম শ্লোক পড়িতেছেন—‘অগ্নিদেবো
দ্বিজাতীনাং মুনীনাং হৃদি দৈবতম্ । প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং সর্বত্র সমদর্শিনাম্ ॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগের দেবতা অগ্নি, মুনিদিগের দেবতা হৃদয়মধ্যে—
স্বল্পবুদ্ধি মনুষ্যদের প্রতিমাই দেবতা,—আর সমদর্শী মহাযোগীদিগের
দেবতা সর্বত্রই আছেন ।

‘সর্বত্র সমদর্শিনাম্’—এই কথা উচ্চারণ করিবামাত্র
ঠাকুর হঠাৎ আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া সমাধিস্থ হইলেন ।
হাতে সেই বাড়ু ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ! ভক্তেরা সকলেই অবাক—এই
সর্বদর্শী মহাযোগীর অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছেন !

দক্ষিণেশ্বর । মহিমা দি ভক্ত সঙ্গ—শাস্ত্রকথা শ্রবণে । ৮৩

অনেকক্ষণ এইরূপে দাঁড়াইয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন ও আবার আসন গ্রহণ করিলেন । মহিমাচরণকে এইবার সেই হরিভক্তির শ্লোক আবৃত্তি করিতে বলিলেন । মহিমা নারদপঞ্চরাত্র হইতে আবৃত্তি করিতেছেন—
অস্তবর্হির্ষদিহারিস্তপসা ততঃ কিম্ । নাস্তবর্হির্ষদিহারিস্তপসা ততঃ কিম্ ॥

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ । নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ॥
বিরম বিরম ব্রহ্মন্ কিং তপস্তাস্মু বৎস । ব্রহ্ম ব্রজ দ্বিজ শীঘ্রং শঙ্করং জ্ঞানসিন্ধু ॥
লভ লভ হরিভক্তিং বৈষ্ণবোক্তাং সুপকাম্ । ভবনিগড়নিবন্ধচ্ছেদনীং কর্তরীক্ষ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ । আহা ! আহা !

[ভাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড । তুমিই চিদানন্দ । নাহং নাহং ।]

শ্লোকগুলির আবৃত্তি শুনিয়া ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইতেছিলেন ।
কষ্টে ভাব সম্বরণ করিলেন । এইবার যতিপঞ্চক পাঠ হইতেছে—

যশ্চামিদং কল্লিতমিস্রজ্জালং, চরাচরং ভাতি মনোবিলাসম্ ।

সচ্চিৎসুখৈকং জগদাত্মরূপং, সা কাশিকাং নিজবোধরূপম্ ।

‘সা কাশিকাং নিজবোধরূপং’—এই কথা শুনিয়া ঠাকুর সহাস্তে বলিতেছেন,—‘যা আছে ভাণ্ডে তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে ।’

এইবার পাঠ হইতেছে নির্বাক্ষটকং—

‘ও’ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাদি নাহং, ন শ্রোত্রং ন জিহ্বা ন চ ঘ্রাণ-নেত্রম্ ।

ন চ ব্যোম ভূমি ন তেজো ন বায়ুঃ, চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥

যতবার মহিমাচরণ বলিতেছেন—চিদানন্দরূপঃ শিবোহ-
হহং শিবোহহম্, ততবারই ঠাকুর সহাস্তে বলিতেছেন—

‘নাহং ! নাহং !—তুমি তুমি চিদানন্দ ।

মহিমাচরণ জীবমুক্তি গীতা থেকে কিছু পড়িয়া ষট্চক্র বর্ণনা পড়িতেছেন । তিনি নিজে কাশীতে যোগীর বোগাবস্থায় মৃত্যু দেখিয়াছিলেন, বলিলেন ।

এইবার ভূচরী ও খেচরী মুদ্রার বর্ণনা করিতেছেন,—ও সাস্তবী
বিজার । সাস্তবী,—যেখানে সেখানে যায়, কোন উদ্দেশ্য নাই ।

[পূর্বকথা—সাধুদের কাছে ঠাকুরের রামগীতাপাঠ শ্রবণ ।]

মহিমা । রামগীতায় বেশ বেশ কথা আছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । তুমি রামগীতা রামগীতা কচ্ছে,—

তবে তুমি ঘোর বেদান্তী ! সাধুরা কত পড়তো এখানে ।

মহিমাচরণ প্রণব শব্দ কিরূপ তাই পড়িতেছেন—‘তৈলধারাম-
বিচ্ছিন্নম্—দীর্ঘঘণ্টানিনাদবৎ’ ! আবার সমাধির লক্ষণ বলিতেছেন—
‘উর্দ্ধপূর্ণমধঃপূর্ণং মধ্যপূর্ণং যদাত্মকম্ । সর্কপূর্ণং স আত্মোতি সমাধিস্থস্ত লক্ষণম্ ॥’
অধর, মহিমাচরণ ক্রমে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

পরদিন রবিবার, ২১শে মাঘ ১২৯০ সাল । মাঘ শুক্লা সপ্তমী ।

মধ্যাহ্নে সেবার পর ঠাকুর নিজাসনে বসিয়া আছেন । কলিকাতা
হইতে রাম সুরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা তাঁহার অসুখ শুনিয়া চিন্তিত হইয়া
আসিয়াছেন । মাফটারও কাছে বসিয়া আছেন । ঠাকুরের হাতে বাড়-
বাঁধা, ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন । ওরা ফেব্রুয়ারী ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ ।

[পূর্ববকথা—উন্মাদ, জানবাজারে বাস । সরলতা ও সত্য কথা ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) । এমনি অবস্থায় মা রেখেছেন
যে ঢাকা-ঢাকি করবার জো নাই । বালকের অবস্থা ।

“রাখাল আমার অবস্থা বোঝে না । পাছে কেউ দেখতে পায়, নিন্দা
করে, গায়ে কাপড় দিয়ে ভাজা হাত ঢেকে দেয় । মধু ডাক্তারকে
আড়ালে নিয়ে গিয়ে সব কথা বল্ছিলো । তখন চৈঁচিয়ে বল্লাম—
‘কোথা গো মধুসূদন, দেখবে এসো, আমার হাত ভেঙ্গে গেছে !’

“সেজ বাবু আর সেজ গিন্নি যে ঘরে শুতো, সেই ঘরেই আমিও
শুতাম । তারা ঠিক ছেলেটির মতন আমায় যত্ন কর্তো । তখন
আমার উন্মাদ অবস্থা । সেজ বাবু বলতো, বাবা, তুমি আমাদের কোন
কথাবার্তা শুন্তে পাও ? আমি বলতাম, ‘পাই’ ।

“সেজ গিন্নি সেজ বাবুকে সন্দেহ করে বলেছিল, যদি কোথাও
যাও—ভট্‌চাষি মশায় তোমার সঙ্গে যাবেন । এক জায়গায় গেলো—
আমায় নীচে বসালে । তার পর আধ ঘণ্টা পরে এসে বলে, ‘চল বাবা,
চল বাবা, গাড়ীতে উঠবে চল’ । সেজ গিন্নি জিজ্ঞাসা কলে, আমি ঠিক

দক্ষিণেশ্বর । রাম, সুরেন্দ্র, মাষ্টার, রাখাল প্রভৃতি সঙ্গে । ৮৫

এই সব কথা বল্লুম । আমি বল্লাম, ছাখগা একটা বাড়ীতে আমরা গেলুম,
—উনি আমায় নীচে বসালে—উপরে আপনি গেল ;—আধ ঘণ্টা পরে
এসে বল্লে, ‘চল বাবা চল !’ সেজ গিনি যা হয় বুঝে নিলে ।

“মাড়েদের এক সরিক এখানকার গাছের ফল, কপি, গাড়ী করে
বাড়ীতে চালান করে দিত । অন্য সরিকরা জিজ্ঞাসা করাতে আমি ঠিক
তাই বল্লুম । [শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থভাগ, দশমখণ্ড সমাপ্ত ।]

চতুর্থ ভাগ—একাদশ খণ্ড ।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রাখাল, মাষ্টার, মণিলাল প্রভৃতি সঙ্গে ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[ঠাকুর অধৈর্য্য কেন ? মণি মল্লিকের প্রতি উপদেশ ।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ্নের সেবার পর একটু বিশ্রাম করিতেছেন ।
মেঝেতে মণি মল্লিক বসিয়া আছেন । ঠাকুরের হাতে এখনও বাড়্ বাঁধা ।
মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করিয়া মণি মল্লিকের নিকট মেঝেতে বসিলেন ।
আজ রবিবার, ১৩ ফাল্গুন, ১২৯০ সাল, কৃষ্ণ ত্রয়োদশী তিথি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । কিসে করে এলে ?

মাষ্টার । আজ্ঞা, আলমবাজার পর্য্যন্ত গাড়ী করে এসে ওখান
থেকে হেঁটে এসেছি । মণি লাল । উঃ ! খুব ঘেমেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । তাই ভাবি, আমার এ সব বাই নয় !
তা না হলে ইংলিসম্যান্‌রা (Englishman) এত কষ্ট করে আসে !

ঠাকুর কেমন আছেন—হাত ভাঙ্গার কথা হইতেছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমি এইটার জন্য এক এক বার অধৈর্য্য হই—একে
দেখাই—আবার ওকে দেখাই—আর বলি, হ্যাঁগা ভাল হবে কি ?

“রাখাল চটে,—আমার অবস্থা বোঝে না । এক এক বার মনে করি

এখান থেকে যায় যাক—আবার মাকে বলি, মা কোথায় যাবে—কোথায় জ্বলতে পুড়তে যাবে !

“আমার বালকের মত অধৈর্য্য অবস্থা আজ বলে নয় । সেজ বাবুকে হাত দেখাতাম—বলতাম, হ্যাঁগা আমার কি অসুখ করেছে ?

“আচ্ছা, তাহলে ঈশ্বরে নিষ্ঠা কই ?—ওদেশে যাবার সময় গোরুর গাড়ীর কাছে ডাকাতির মত লাঠি হাতে কতকগুলো মানুষ এলো । আমি ঠাকুরদের নাম কর্তে লাগলাম । কিন্তু কখন বলি রাম, কখন দুর্গা, কখন ওঁ তৎসৎ—যেটা খাটে ।

(মাষ্টারের প্রতি) আচ্ছা, কেন এত অধৈর্য্য আমার ?

মাষ্টার । আপনি সর্বদাই সমাধিস্থ,—ভক্তদের জন্য একটু মন শরীরের উপর রেখেছেন, তাই—শরীর রক্ষার জন্য এক এক বার অধৈর্য্য হন । শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, একটু মন আছে কেবল শরীরে,—আর ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকতে ।

[Exhibition দর্শন প্রস্তাব । ঠাকুরের Zoo Garden দর্শন কথা ।]

মণিলাল মল্লিক Exhibitionএর গল্প করিতেছেন ।

যশোদা কৃষ্ণকে কোলে করে আছেন—বড় সুন্দর মূর্তি,—শুনে ঠাকুরের চক্ষে জল আসিয়াছে । সেই বাৎসল্যরসের প্রতিমা যশোদার কথা শুনিয়া ঠাকুরের উদ্দীপন হইয়াছে,—তাই কাঁদিতেছেন ।

মণিলাল । আপনার অসুখ,—তা না হলে আপনি একবার গিয়ে দেখে আসতেন—গড়ের মাঠের প্রদর্শনী ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টার প্রভৃতির প্রতি) । আমি গেলে সব দেখতে পাব না ! একটা কিছু দেখেই বেঁহুস হয়ে যাবো—আর কিছু দেখা হবে না । চিড়িয়াখানা (Zoological Garden) দেখাতে লয়ে গিচ্ছো । সিংহ দর্শন করেই আমি সমাধিস্থ হয়ে গেলাম ।—ঈশ্বরীর বাহনকে দেখে ঈশ্বরীর উদ্দীপন হলো—তখন আর অন্য জানোয়ার কে দেখে !—সিংহ দেখেই ফিরে এলাম । তাই যত্ন মল্লিকের মা একবার বলে, Exhibitionএ এঁকে নিয়ে চল,—আবার বলে, না ।

মণিমল্লিক পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞানী । বয়স প্রায় ৬৫ হইয়াছে । ঠাকুর

দক্ষিণেশ্বর । মণি মল্লিক, রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ৮৭

তঁাহারই ভাবে, কথাচ্ছলে, তঁাহাকে উপদেশ দিতেছেন ।

[পূর্বকথা—জয় নারায়ণ পণ্ডিত দর্শন । গৌরীপণ্ডিত ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । জয় নারায়ণ পণ্ডিত খুব উদার ছিল । গিয়ে দেখলাম বেশ ভাবটী । ছেলেগুলি বুট পরা ;—নিজে বল্লেন, আমি কাশী যাবো । যা বল্লেন তাই শেষে কল্লেন । কাশীতে বাস—আর কাশীতেই দেহত্যাগ হলো । *

“বয়স হলে ঐ রকম চলে গিয়ে ঈশ্বরচিন্তা করা ভাল । কি বল ?

মণিলাল । হাঁ ; সংসারের ঝঞ্ঝাট ভাল লাগে না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । গৌরী স্ত্রীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা কর্তো । সকল স্ত্রীই ভগবতীর এক একটি রূপ ।

(মণিলালের প্রতি) । তোমার সেই কথাটী এঁদের বলতো গা ।

মণিলাল (সহাস্রে) । নৌকা করে কয় জন গঙ্গা পার হচ্ছিলো । একজন পণ্ডিত বিচার পরিচয় খুব দিচ্ছিল । ‘আমি নানা শাস্ত্র পড়িছি, —বেদ বেদান্ত, —ষড়দর্শন ।’ এক জনকে জিজ্ঞাসা কল্লেন—‘বেদান্ত জান ?’ সে বল্লেন, ‘আজ্ঞা না ।’ ‘তুমি সাঙ্খ্য পাতঞ্জল জান ?’—‘আজ্ঞা না ।’ ‘দর্শন টর্শন কিছুই পড় নাই ?’—‘আজ্ঞা না ।’

“পণ্ডিত সগর্ব্ব কথা কহিতেছেন ও লোকটী চুপ করে বসে আছে । এমন সময়ে ভয়ঙ্কর ঝড়—নৌকা ডুবতে লাগলো । সেই লোকটী বল্লেন, ‘পণ্ডিতজী, আপনি সাঁতার জানেন ?’ পণ্ডিত বল্লেন, ‘না ।’ সে বল্লেন, ‘আমি সাঙ্খ্য পাতঞ্জল জানি না, কিন্তু সাঁতার জানি ।’

[ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু । লক্ষ্য বেঁধা ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্রে) । নানা শাস্ত্র জানলে কি হবে ! ভবনদী পার হতে জানাই দরকার । ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু ।

“লক্ষ্য ভেদের সময় দ্রোণাচার্য্য অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কি দেখতে পাচ্ছ ?—এই রাজাদের কি তুমি দেখতে পাচ্ছ ? অর্জুন বল্লেন,—‘না’ । ‘আমাকে দেখতে পাচ্ছ ?’—‘না’ । ‘গাছ দেখতে

* শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৬৯এর পূর্বে পণ্ডিতকে দেখিয়াছিলেন । পণ্ডিত জয়-নারায়ণের ৬কাশীগমন ১৮৬৯ । জন্ম ১৮০৪ ; কাশীপ্রাপ্তি ১৮৭৩ খৃঃ ।

পাচ্ছ ?'—‘না’ । ‘গাছের উপর পাখী দেখতে পাচ্ছ ?’—‘না’ । ‘তবে কি দেখতে পাচ্ছে’ ?—‘শুধু পাখীর চোখ’ ।

“যে শুধু পাখীর চোখটা দেখতে পায়, সেই লক্ষ্য বিধতে পারে ।

“যে কেবল দেখে, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু, সেই চতুর ! অন্য খবরে আমাদের কাজ কি ? হনুমান বলেছিল, আমি তিথি নক্ষত্র অতো জানি না,—কেবল নাম চিন্তা করি ।

(মাষ্টারের প্রতি) খান কতক পাখা এখানকার জন্য কিনে দিও ।

(মণিলালের প্রতি) “ওগো তুমি একবার এঁর (মাষ্টারের) বাবার কাছে যেও । ভক্ত দেখলে উদ্দীপন হবে ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

[শ্রীযুক্ত মণিলাল প্রভৃতির প্রতি উপদেশ । নরলীলা ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ আসনে বসিয়া আছেন । মণিলাল প্রভৃতি ভক্তেরা মেজেতে বসিয়া ঠাকুরের মধুর কথামৃত পান করিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । এই হাত ভাঙ্গার পর একটা ভারি অবস্থা বদলে যাচ্ছে । নরলীলাটি কেবল ভাল লাগছে ।

“নিত্য আর লীলা । নিত্য—সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ।

“লীলা—ঈশ্বরলীলা, দেবলীলা, নরলীলা, জগৎলীলা ।

[তু সচ্চিদানন্দ । বৈষ্ণবচরণের শিক্ষা । ঠাকুরের রামলীলা দর্শন ।]

“বৈষ্ণবচরণ বলতো, নরলীলায় বিশ্বাস হলে তবে পূর্ণ জ্ঞান হবে । তখন শুনতুম না । এখন দেখছি ঠিক । বৈষ্ণবচরণ মানুষের ছবি দেখে কোমল ভাব—প্রেমের ভাব—পছন্দ করতো ।

(মণিলালের প্রতি) ঈশ্বরই মানুষ হয়ে লীলা কচ্ছেন—তিনিই মণিমল্লিক হয়েছেন । শিখরা শিক্ষা দেয়,—তু সচ্চিদানন্দ !

“এক একবার নিজের স্বরূপ (সচ্চিদানন্দ) কে দেখতে পেয়ে মানুষ অবাক হয়, আর আনন্দে ভাসে । হঠাৎ আত্মীয় দর্শন হলে যেমন হয় । (মাষ্টারের প্রতি) সে দিন সেই গাড়ীতে আসতে আসতে

দক্ষিণেশ্বর । ‘ঠাকুরদাদা’, মহিমা, রাম প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ৮৯

বাবুরামকে দেখে যেমন হয়েছিল । শিব যখন স্বস্বরূপকে দেখেন, তখন ‘আমি কি ! আমি কি !’ বলে নৃত্য করেন ।

“অধ্যাত্মে (অধ্যাত্ম রামায়ণে) ঐ কথাই আছে । নারদ বলছেন হে রাম, যত পুরুষ সব তুমি,—সীতাই যত স্ত্রীলোক হয়েছেন ।

“রামলীলায় যারা সেজেছিল, দেখে বোধ হলো নারায়ণই এই সব মানুষের রূপ ধরে রহেছেন ! আসল নকল সমান বোধ হলো ।

“কুমারীপূজা করে কেন ? সব স্ত্রীলোক ভগবতীর এক একটি রূপ । শুদ্ধাত্মা কুমারীতে ভগবতীর বেশী প্রকাশ ।

[কেন অসুখে ঠাকুর অধৈর্য্য । ঠাকুরের বালক ও ভক্তের অবস্থা ।]

(মাষ্টারের প্রতি) কেন আমি অসুখ হলে অধৈর্য্য হই । আমায় বালকের স্বভাবে রেখেছে । বালকের সব নির্ভর মার উপর ।

“দাসীর ছেলে বাবুর ছেলের সঙ্গে কৌদল করতে করতে বলে, আমি মাকে বলে দিব ।

[রাধাবাজারে সুরেন্দ্রকর্তৃক ফটোছবি তুলানো ১৪৪১.]

“রাধাবাজারে আমাকে ছবি তোলাতে নিয়ে গিচ্ছলো । সেদিন রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়ী যাবার কথা ছিল—কেশব সেন আর সব আসবে, শুনেছিলুম । গোটাকতক কথা বলবো বলে ঠিক করেছিলাম । রাধাবাজারে গিয়ে সব ভুলে গেলাম ! তখন বললাম !—‘মা তুই বলবি ! আমি আর কি বলবো !

[পূর্বকথা । কোয়ারসিংহ । রামলালের মা ; কুমারী-পূজা ।]

“আমার জ্ঞানীর স্বভাব নয় । জ্ঞানী আপনাকে দেখে বড়—বলে, আমার আবার রোগ !

“কোয়ার সিং বলে, তোমার এখনও দেহের জন্ম ভাবনা আছে ।

“আমার স্বভাব এই—আমার মা সব জানে । রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়ী তিনি কথা কবেন । সেই কথাই কথা । স্বরস্বতীর জ্ঞানের একটী কিরণে এক হাজার পণ্ডিত থ হয়ে যায় !

“ভক্তের অবস্থায়—বিজ্ঞানীর অবস্থায়—রেখেছে । তাই রাখাল প্রভৃতির সঙ্গে ফছকিমি করি । জ্ঞানীর অবস্থায় রাখলে উটি হত না !

“এ অবস্থায় দেখি মা-ই সব হয়েছেন ! সর্বত্র তাঁকে দেখতে পাই !

“কালীঘরে দেখলাম, মা-ই হয়েছেন—দুর্ঘটলোক পর্য্যন্ত—ভাগবত পণ্ডিতের ভাই পর্য্যন্ত ।

“রামলালের মাকে বকতে গিয়ে আর পারলাম না । দেখলাম তাঁরই একটা রূপ ! মাকে কুমারীর ভিতর দেখতে পাই বলে কুমারীপূজা করি ।

“আমার মাগ (ভক্তদের শ্রীশ্রীমা) পায় হাত বুলায়ে দেয়,—তার পর আমি আবার নমস্কার করি ।

“তোমরা আমার পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করো,—হৃদে থাকলে পায়ে হাত দেয় কে !—কারুকে পা ছুঁতে দিতো না !

“এই অবস্থায় রেখেছে বলে নমস্কার ফিরতে হয় ।

“ছাখো, দুর্ঘট লোককে পর্য্যন্ত বাদ দিবার জো নাই !—তুলসী শুকনো হোক, ছোট হোক,—ঠাকুরসেবায় লাগবে ।

চতুর্থ ভাগ—দ্বাদশ খণ্ড ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে রাখাল, রাম, নিত্য,
অধর, মাষ্টার, মহিমা প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[শ্রীরামকৃষ্ণ অস্থখে অধৈর্য্য কেন ? বিজ্ঞানীর অবস্থা ।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ্নে সেবার পর রাখাল, রাম প্রভৃতি ভক্ত-সঙ্গে বসিয়া আছেন । শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ নহে—এখনও হাতে বাড় বাঁধা ।

নিজের অস্থখ,—কিন্তু ঠাকুর আনন্দের হাট বসাইয়াছেন । দলে দলে ভক্ত আসিতেছেন । সর্বদাই ঈশ্বরকথা প্রসঙ্গে—আনন্দ । কখনও কীর্তনানন্দ, কখনও বা ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতেছেন । ভক্তেরা অবাক হইয়া দেখে । ঠাকুর কথা কহিতেছেন ।

[নরেন্দ্রের বিবাহ-সম্বন্ধ । নরেন্দ্র ‘দলপতি’ ।]

রাম । আর মিত্রের (R. Mitra) কণ্ঠার সঙ্গে নরেন্দ্রের সম্বন্ধ

হচ্ছে । অনেক টাকা দেবে বলেছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্ত্রে) । ঐরকম একটা দলপতি টলপতি হয়ে যেতে পারে । ও যে দিকে যাবে, সেই দিকেই একটা কিছু বড় হয়ে দাঁড়াবে । ঠাকুর নরেন্দ্রের কথা আর বেশী তুলিতে দিলেন না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি) । আচ্ছা, অসুখ হলে আমি এত অধৈর্য্য হই কেন ? একবার একে জিজ্ঞাসা করি কিসে ভাল হবে ! একবার ওকে জিজ্ঞাসা করি !

“কি জান, হয় সকলকেই বিশ্বাস করতে হয়, না হয় কারকে নয় ।

“তিনিই ডাক্তার কবিরাজ হয়েছেন । তাই সকল চিকিৎসককেই বিশ্বাস করতে হয় । মানুষ মনে করলে বিশ্বাস হয় না ।

[পূর্ব কথা—শম্ভুমল্লিক ও হলধারীর অসুখ ।]

“শম্ভুর ঘোর বিকার—সর্ববাধিকারী দেখে বলে, ঔষধের গরম ।

“হলধারী হাত দেখালে । ডাক্তার বলে, ‘চোখ দেখি ;—ও ! পিলে হয়েছে !’ হলধারী বলে, পিলে টীলে কোথাও কিছু নাই ।

“মধুডাক্তারের ঔষধটী বেশ ।

রাম । ঔষধে উপকার হয় না । তবে প্রকৃতিকে অনেকটা সাহায্য করে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঔষধে উপকার না হলে, আফিমে বাহে বন্ধ হয় কেন ?

[কেশব সেনের কথা । সুলভ সমাচারে ঠাকুরের বিষয় ছাপানো ।]

রাম কেশবের শরীর ত্যাগের কথা বলিতেছেন ।

রাম । আপনি ত ঠিক বলেছিলেন,—ভাল গোলাপের—(বসরাই গোলাপের) গাছ হলে মালী গোড়া শুদ্ধ খুলে দেয়,—শিশির পেলে আরও তেজে গাছ হবে । সিদ্ধবচন ত ফলেছে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । কে জানে বাপু, অত হিসাব করি নাই ; তোমরাই বল্ছ ।

রাম । ওরা আপনার বিষয় (সুলভ সমাচারে) ছাপিয়ে দিয়েছিল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ছাপিয়ে দেওয়া ! এ কি ! এখন ছাপানো কেন ?—আমি খাই দাই থাকি, আর কিছু জানি না ।

“কেশব সেনকে আমি বল্লাম, কেন ছাপালে ? তা বলে—তোমার কাছে লোক আসবে বলে ।

[লোকশিক্ষা ঈশ্বরের শক্তিদ্বারা । হনুমানসিংহের কুস্তীদর্শন ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাম প্রভৃতির প্রতি) । মানুষের শক্তি দ্বারা লোক-শিক্ষা হয় না । ঈশ্বরের শক্তি না হলে অবিঘ্নে জয় করা যায় না ।

“দুইজনে কুস্তী লড়ে ছিল—হনুমান সিং আর একজন পাঞ্জাবী মুসলমান । মুসলমানটি খুব হুষ্টি পুষ্ট । কুস্তীর দিনে, আর আগের পনের দিন ধরে, মাংস ঘি খুব করে খেলে । সবাই ভাবলে, এই জিতবে ।

“হনুমান সিং,—গায়ে ময়লা কাপড়,—ক দিন ধরে কম কম খেলে আর মহাবীরের নাম জপতে লাগলো । যে দিন কুস্তী হলো, সে দিন একবারে উপবাস । সকলে ভাবলে, এ নিশ্চয় হারবে !

“কিন্তু সেই জিতলো ! যে পনের দিন ধরে খেলে, সেই হারলো ।

“ছাপাছাপি করলে কি হবে ?—যে লোকশিক্ষা দেবে তার শক্তি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসবে । আর ত্যাগী না হলে লোকশিক্ষা হয় না ।

[বাল্য—কামারপুকুরে লাহাদের বাড়ী সাধুদের পাঠশ্রবণ ।]

“আমি মূর্খোত্তম (সকলের হাস্য) ।

একজন ভক্ত । তা হলে আপনার মুখ থেকে বেদ বেদান্ত—তা ছাড়াও কত কি—বেরোয় কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) । কিন্তু ছেলেবেলায় লাহাদের ওখানে (কামারপুকুরে) সাধুরা যা প’ড়তো, বুঝতে পারতাম । তবে একটু আধটু ফাঁক যায় । কোন পণ্ডিত এসে যদি সংস্কৃতে কথা কয় তো বুঝতে পারি । কিন্তু নিজে সংস্কৃত কথা কইতে পারি না ।

[পাণ্ডিত্য কি জীবনের উদ্দেশ্য ? মূর্খ ও ঈশ্বরের কৃপা ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাঁকে লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য । লক্ষ্য বিধ্বার সময় অর্জুন বল্লেন—আমি আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না—কেবল পাখীর চক্ষু দেখতে পাচ্ছি—রাজাদেরও দেখতে পাচ্ছি না,—গাছ দেখতে পাচ্ছি না,—পাখী পর্য্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না ।

“তাঁকে লাভ হলেই হোলো !—সংস্কৃত নাই জান্লাম !

“তাঁর কৃপা পণ্ডিত মূর্খ সকল ছেলেরই উপর—যে তাঁকে পাবার জগ্য ব্যাকুল হয় । বাপের সকলের উপরে সমান স্নেহ ।

দক্ষিণেশ্বর । রাম, নিত্যগোপাল, মহিমা প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ৯৩

‘বাপের পাঁচটি ছেলে,—তুই এক জন ‘বাবা’ বলে ডাকতে পারে ।
আবার কেউ বা ‘বা’ বলে ডাকে,—কেউ বা ‘পা’ বলে ডাকে,—সবটা
উচ্চারণ করতে পারে না । যে বাবা বলে, তার উপর কি বাপের বেশী
ভালবাসা হবে ?—যে ‘পা’ বলে, তার চেয়ে ? বাবা জানে—এরা কটি
ছেলে, ‘বাবা’ ঠিক বলতে পাচ্ছে না ।*

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নরলীলায় মন ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । এই হাত ভাঙ্গার পর একটা অবস্থা বদলে যাচ্ছে—
নরলীলার দিকে মনটা বড় যাচ্ছে । তিনিই মানুষ হয়ে খেলা কচ্ছেন ।

“মাটির প্রতিমায় তাঁর পূজা হয়—আর মানুষে হয় না ?

“এক জন সদাগর লঙ্কার কাছে জাহাজ ডুবে যাওয়াতে লঙ্কার কূলে
ভেসে এসেছিল । বিভীষণের লোকেরা বিভীষণের আজ্ঞায় লোকটীকে
তাঁর কাছে লয়ে গেল । ‘আহা এটি আমার রামচন্দ্রের ন্যায় মূর্তি ! সেই
নররূপ !’ এই বলে বিভীষণ আনন্দে বিভোর হলেন । আর ঐ
লোকটীকে বসন ভূষণ পরিয়ে পূজা আর আরতি করতে লাগলেন !

“এই কথাটি আমি যখন প্রথম শুনি, তখন আমার যে কি আনন্দ
হয়েছিল, বলা যায় না ।

[পূর্বকথা—বৈষ্ণবচরণ । ফুলুইশ্যামবাজারের কর্তাভজাদের কথা ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । বৈষ্ণবচরণকে জিজ্ঞাসা করাতে বল্লে, যে যাকে ভাল-
বাসে, তাকে ইচ্ছা বলে জান্লে, ভগবানে শীঘ্র মন হয় । ‘তুই কাকে
ভালবাসিস্’ ? ‘অমুক পুরুষকে’ । ‘তবে ওকেই তোর ইচ্ছা বলে জান্’ ।
ও দেশে (কামার পুকুর, শ্যামবাজারে) আমি বল্লাম—‘এরূপ মত
আমার নয় । আমার মাতৃভাব ।’ দেখ্লাম যে লক্ষ্য লক্ষ্য কথা
কহ্লে, আবার ব্যভিচার করে ! মাগীরা জিজ্ঞাসা কর্লে—
আমাদের কি মুক্তি হবে না ? আমি বল্লাম—হবে যদি এক জনেতে
ভগবান বলে নিষ্ঠা থাকে । পাঁচটা পুরুষের সঙ্গে থাক্লে হবে না ।

রাম । কেদার বাবু কর্তাভজাদের ওখানে বুঝি গিচ্ছিলেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । ও পাঁচ ফুলের মধু আহরণ করে ।

[‘হলধারীর বাবা’ । ‘আমার বাবা’ । বৃন্দাবনে ফেরতীগোষ্ঠদর্শনে ভাব ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাম, নিত্য গোপাল প্রভৃতি প্রতি) । ‘ইনিই আমার ইষ্ট’ এইটি ষোল আনা বিশ্বাস হলে—তাঁকে লাভ হয়,—দর্শন হয় ।

“আগেকার লোকের খুব বিশ্বাস ছিল । হলধারীর বাপের কি বিশ্বাস !

“মেয়ের বাড়ী যাচ্ছিল । রাস্তায় বেলফুল আর বেলপাতা চমৎকার হয়ে রয়েছে দেখে, ঠাকুরের সেবার জন্ত সেই সব নিয়ে দুই তিন ক্রোশ পথ ফিরে তার বাড়ী এলো !

“রাম যাত্রা হচ্ছিল । কৈকেয়ী রামকে বনবাস যেতে বল্লেন । হলধারীর বাপ যাত্রা শুন্তে গিছিল—একবারে দাঁড়িয়ে উঠল ।—যে কৈকেয়ী সেজেছে, তার কাছে এসে ‘পামরী’ !—এই কথা বলে দেউটী (প্রদীপ) দিয়ে মুখ পোড়াতে গেল !

“স্নান করবার পর যখন জলে দাঁড়িয়ে—রক্তবর্ণং চতুর্মুখম্—এই সব বলে ধ্যান করত—তখন চক্ষু জলে ভেসে যেত ।

“আমার বাবা যখন খড়ম পরে রাস্তায় চলতেন, গাঁয়ের দোকানীরা দাঁড়িয়ে উঠত । বলতো ঐ তিনি আসছেন ।

“যখন হালদার পুকুরে স্নান করতেন, লোকেরা সাহস করে নাইতে যেত না । খপর নিত—‘উনি কি স্নান করে গেছেন ?’

‘রঘুবীর ! রঘুবীর !’ বলতেন, আর তাঁর বুক রক্তবর্ণ হয়ে যেত ।

“আমারও ঐ রকম হত । বৃন্দাবনে ফিরতি গোষ্ঠ দেখে, ভাবে শরীর ঐরূপ হয়ে গিছলো ।

“তখনকার লোকের খুব বিশ্বাস ছিল । হয়তো কালীরূপে তিনি নাচ্ছেন, সাধক হাততালি দিচ্ছে ! এরূপ কথাও শোনা যায় ।

[পঞ্চবটীর হঠযোগী ।]

পঞ্চবটীর ঘরে একটি হঠযোগী আসিয়াছেন । এঁদের কৃষ্ণকিশোরের পুত্র রামপ্রসন্ন ও আরও কয়েকটি লোক ঐ হঠযোগীকে বড় ভক্তি করেন । কিন্তু তাঁর আফিম আর দুধে মাসে পঁচিশ টাকা খরচা পড়ে । রামপ্রসন্ন ঠাকুরকে বলেছিলেন, ‘আপনার এখানে অনেক ভক্তরা আসে, কিছু বলে কয়ে দিবেন,—হঠযোগীর জন্ত তাহলে কিছু টাকা পাওয়া যায় ।

দক্ষিণেশ্বর । ‘ঠাকুরদাদা’, মহিমারাম প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ৯৫

ঠাকুর কয়েকটা ভক্তকে বলিলেন—পঞ্চবটীতে হঠযোগীকে দেখে এসো, কেমন লোকটা ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

[‘ঠাকুরদাদা’ ও মহিমাচরণের প্রতি উপদেশ ।]

‘ঠাকুর দাদা’ দু একটি বন্ধুসঙ্গে আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন ।
বয়স ২৭।২৮ হইবে । বরাহনগরে বাস । ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে,—
কথকতা অভ্যাস করিতেছেন । সংসার ঘাড়ে পড়িয়াছে,—দিন কতক
বৈরাগ্য হইয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন । এখনও সাধন ভজন করেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তুমি কি হেঁটে আস্‌ছো ? কোথায় বাড়ী ?

ঠাকুরদাদা । আজ্ঞা হাঁ ; বরাহনগরে বাড়ী ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । এখানে কি দরকার ছিল ?

ঠাকুরদাদা । আজ্ঞা, আপনাকে দর্শন করতে আসা । তাঁকে ডাকি,—
মাঝে মাঝে অশান্তি হয় কেন ? দু পাঁচ দিন বেশ আনন্দে যায়,—তার
পর অশান্তি কেন ?

[কারিকর ; মন্ত্রে বিশ্বাস ; হরিভক্তি ; জ্ঞানের দুটী লক্ষণ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । বুঝেছি,—ঠিক পড়্‌ছে না । কারিকর দাঁতে দাঁত
বসিয়ে দেয়—তা হলে হয়—একটু কোথায় আটকে আছে ।

ঠাকুরদাদা । আজ্ঞা, এইরূপ অবস্থাই হয়েছে !

শ্রীরামকৃষ্ণ । মন্ত্র নিয়েছ ? ঠাকুরদাদা । আজ্ঞা, হয়েছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । মন্ত্রে বিশ্বাস আছে ?

ঠাকুরদাদার বন্ধু বলিতেছেন—ইনি বেশ গান গাইতে পারেন ।
ঠাকুর বলিতেছেন—একটা গাও না গো । ঠাকুরদাদা গাইতেছেন—
প্রেম-গিরি-কন্দরে, যোগী হয়ে রহিব । আনন্দনিঝর পাশে যোগধ্যানে থাকিব ॥
তৎফল আহরিয়া জ্ঞান-ক্ষুধা নিবারিয়ে, বৈরাগ্য-কুসুম দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম পূজিব ।
মিটাতে বিরহ-তৃষা কূপ জলে আর যাব না, হৃদয়-করঙ্গ ভরে শান্তি-বারি তুলিব ।
কভু ভাব শূন্য পরে, পদামৃত পান করে, হাসিব কাঁদিব নাচিব গাইব ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আহা ! বেশ গান ! আনন্দ নিব্বার ! তত্ত্বফল ! হাসিব
কাঁদিব নাচিব গাইব !

“তোমার ভিতর থেকে এমন গান ভাল লাগছে,—আবার কি !

“সংসারে থাকতে গেলেই সুখ দুঃখ আছে—একটু আধটু অশান্তি
আছে । কাজলের ঘরে থাকলে গায় একটু কালী লাগেই ।

ঠাকুর । আজ্ঞা, এখন কি করব—বলে দিন্ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাততালি দিয়ে সকালে বিকালে হরিনাম করবে—
‘হরিবোল’—‘হরিবোল’—‘হরিবোল’ বলে ।

“আর একবার এসো,—আমার হাতটা একটু সারুক ।

মহিমাচরণ আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি) । আহা ! ইনি একটি বেশ গান
গেয়েছেন ।—গাও তো গা সেই গানটি আর একবার ।

ঠাকুরদাদা আবার গাইলেন প্রেম গিরি-কন্দরে ইত্যাদি ।

গান সমাপ্ত হইলে ঠাকুর মহিমাচরণকে বলিতেছেন—তুমি সেই
শ্লোকটি একবার বলত—হরিভক্তির কথা ।

মহিমাচরণ নারদপঞ্চরাত্র হইতে সেই শ্লোকটি বলিতেছেন—

‘অন্তর্বহির্য়দি হরিস্তপসাততঃ কিম্ । নান্তর্বহির্য়দি হরিস্তপসাততঃ কিম্ ॥
আরাধিতো যদি হরিস্তপসাততঃ কিম্ । নারাধিতো যদি হরিস্তপসাততঃ
কিম্ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ । ওটাও বল—লভ লভ হরিভক্তিং ।

মহিমাচরণ বলিতেছেন—বিরম বিরম ব্রহ্মন্ কিং তপস্তাস্থ বৎস ।
ব্রজ ব্রজ দ্বিজ শীঘ্রং শঙ্করং জ্ঞানসিদ্ধুম্ ॥ লভ লভ হরিভক্তিং
বৈষ্ণবোক্তাং সুপকাম্ । ভব-নিগড়-নিবন্ধচ্ছেদনীং কর্তরীক্ষ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ—শঙ্কর হরিভক্তি দিবেন । মহিমা—পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, সঙ্কোচ—এ সব পাশ । কি বল ?

মহিমা । আজ্ঞা হাঁ, গোপন করবার ইচ্ছা, প্রশংসায় কুণ্ঠিত হওয়া ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । দুটী জ্ঞানের লক্ষণ । প্রথম কূটস্থ বুদ্ধি । হাজার দুঃখ
কষ্ট বিপদ বিষ হোক—নির্বিকার,—যেমন কামারশালের লোহা, যার
উপর হাতুড়ি দিয়ে পেটে । আর, দ্বিতীয়, পুরুষকার—খুব রোখ্ । কাম

দক্ষিণেশ্বর । ঠাকুরদাদা, মহিমা, রাম প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ৯৭

ক্রোধে আমার অনিষ্ট কচ্ছে তো একবারে ত্যাগ !! কচ্ছপ যদি হাত পা ভিতরে সাঁদ করে, চারখানা করে কাটলেও আর বার করবে না ।

[তীব্র, মন্দা ও মর্কট বৈরাগ্য ।]

(ঠাকুরদাদা প্রভৃতির প্রতি) । বৈরাগ্য দুই প্রকার । তীব্র বৈরাগ্য আর মন্দা বৈরাগ্য । মন্দা বৈরাগ্য—হচ্ছে হবে—টিমে তেতালা । তীব্র বৈরাগ্য—শাগিত খুরের ধার—মায়াপাশ কচ্ কচ্ করে কেটে দেয় ।

“কোনও চাষা কতদিন ধরে খাটছে—পুষ্করিণীর জল ক্ষেতে আর আসছে না ! মনে রোঙ্ নাই ! আবার কেউ দুচার দিন পরেই—‘আজ জল আন্ব ত ছাড়ব’ প্রতিজ্ঞা করে । নাওয়া খাওয়া সব বন্ধ । সমস্ত দিন খেটে সন্ধ্যার সময় যখন জল কুল কুল করে আসতে লাগলো, তখন আনন্দ । তার পর বাড়ীতে গিয়ে পরিবারকে বলে,—‘দে এখন তেল দে—নাইবো ।’ নেয়ে খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা ।

“এক জনের পরিবার বলে, ‘অমুক লোকের ভারি বৈরাগ্য হয়েছে,—তোমার কিছু হলো না ! যার বৈরাগ্য হয়েছে, সে লোকটার ষোল জন স্ত্রী,—এক এক জন করে তাদের ত্যাগ করছে ।’

“সোয়ামী নাইতে যাচ্ছিল, কাঁধে গামছা,—বলে, ‘ক্ষেপি ! সে লোক ত্যাগ করতে পারবেনা,—একটু একটু করে কি ত্যাগ হয় ! আমি ত্যাগ করতে পারবো । এই দেখ,—আমি চল্লুম !’

“সে বাড়ীর গোছ গাছ না করে—সেই অবস্থায়—কাঁধে গামছা—বাড়ী ত্যাগ করে, চলে গেল । এরই নাম তীব্র বৈরাগ্য ।

“আর এক রকম বৈরাগ্য, তাকে বলে মর্কটবৈরাগ্য । সংসারের জ্বালায় জ্বলে গেরুয়াবসন পরে কাশী গেল । অনেক দিন সংবাদ নাই । তার পর এক খানা চিঠি এলো—‘তোমরা ভাবিবে না, আমার এখানে একটা কন্ম্ব হইয়াছে ।’

“সংসারের জ্বালা ত আছেই !—মাগ অবাধ্য, কুড়ি টাকা মাইনে, ছেলের অন্নপ্রাশন দিতে পারছে না, ছেলেকে পড়াতে পাচ্ছে না,—বাড়ী ভাঙ্গা, ছাত দিয়ে জল পড়ছে,—মেরামতের টাকা নাই ।

“তাই ছোকরারা এলে আমি জিজ্ঞাসা করি, তোর কে কে আছে ?

(মহিমার প্রতি) তোমাদের সংসার ত্যাগের কি দরকার ? সাধুদের কত কষ্ট ! এক জনের পরিবার বলে, তুমি সংসার ত্যাগ করবে— কেন ? আট ঘরে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করতে হবে, তার চেয়ে এক ঘরে থাওয়া পাচ্ছ, বেশ ত !

“সদাব্রত খুঁজে খুঁজে সাধু তিন ক্রোশ রাস্তা থেকে দূরে গিয়ে পড়ে। দেখেছি, জগন্নাথ দর্শন ক’রে—সোজা পথ দিয়ে সাধু আসছে ;—সদাব্রতের জন্য তার সোজা পথ ছেড়ে যেতে হয়।

“এতো বেশ,—কেল্লা থেকে যুদ্ধ। মাঠে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করলে অনেক অশুবিধা। বিপদ ! গায়ের উপর গোলাগুলি এসে পড়ে !

“তবে দিন কতক নিৰ্জ্জনে গিয়ে, জ্ঞান লাভ করে, সংসারে এসে থাকতে হয়। জনক জ্ঞানলাভ করে সংসারে ছিল। জ্ঞানের পর যেখানেই থাক, তাতে কি ?

মহিমাচরণ। মহাশয়, মানুষ কেন বিষয়ে মুগ্ধ হয়ে যায় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে লাভ না করে বিষয়ের মধ্যে থাকে বোলে। তাঁকে লাভ করলে আর মুগ্ধ হয় না। বাড়লে পোকা যদি এক বার আলো দেখতে পায়,—তা হলে আর তার অন্ধকার ভাল লাগে না।

[উর্দ্ধরেতা, ধৈর্য্যরেতা ও ঈশ্বরলাভ। সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম।]

“তাঁকে পেতে গেলে বীৰ্য্য ধারণ করতে হয়।

“শুকদেবাদি উর্দ্ধরেতা। এঁদের রেতঃপাত কখন হয় নাই।

“আর এক আছে ধৈর্য্যরেতা। আগে রেতঃপাত হয়েছে, কিন্তু তার পর বীৰ্য্যধারণ। বার বছর ধৈর্য্যরেতা হলে বিশেষ শক্তি জন্মায়। ভিতরে একটা নূতন নাড়ী হয়, তার নাম মেধা নাড়ী। সে নাড়ী হলে সব স্মরণ থাকে,—সব জানতে পারে।

“বীৰ্য্যপাতে বলক্ষয় হয়। স্বপ্নদোষে যা বেরিয়ে যায়, তাতে দোষ নাই। ও তাতে গুণে হয়। ও সব বেরিয়ে গিয়েও যা থাকে, তাতেই কাজ হয়। তবু স্ত্রীসঙ্গ করা উচিত নয়।

“শেষে যা থাকে, তা খুব রিফাইন (refine) হয়ে থাকে। লাহাদের ওখানে গুড়ের নাগরী সব রেখেছিল,—নাগরীর নীচে একটা একটা

দক্ষিণেশ্বর । ‘ঠাকুরদাদা’, মহিমাচরণ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ৯৯

ফুটো করে, তার পর এক বৎসর পরে দেখলে, সব দানা বেঁধে রয়েছে—
মিছরির মত । রস যা বেরিয়ে যাবার, ফুটো দিয়ে তা বেরিয়ে গেছে ।

“স্ত্রীলোক একবারে ত্যাগ সন্ন্যাসীর পক্ষে । তোমাদের হয়ে গেছে,
তাতে দোষ নাই ।

“সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যন্ত দেখবে না । সাধারণ লোকে তা
পারে না । সা রে গা মা পা ধা নী । ‘নী’তে অনেক ক্ষণ থাকা যায় না ।

“সন্ন্যাসীর পক্ষে বীর্যপাত বড়ই খারাপ । তাই তাদের সাবধানে
থাকতে হয় । স্ত্রীরূপ দর্শন যাতে না হয় । ভক্ত স্ত্রীলোক হলেও
সেখান থেকে সরে যাবে । স্ত্রীরূপ দেখাও খারাপ । জাগ্রত অবস্থায়
না হয়, স্বপ্নে বীর্যপাত হয় ।

“সন্ন্যাসী জিতেন্দ্রিয় হলেও লোকশিক্ষার জন্য মেয়েদের সঙ্গে
আলাপ করবে না । ভক্ত স্ত্রীলোক হলেও বেশীক্ষণ আলাপ করবে না ।

“সন্ন্যাসীর হচ্ছে নির্জলা একাদশী । আর দুরকম একাদশী আছে ।
ফল মূল খেয়ে,—আর লুচি ছকা খেয়ে । (সকলের হাস্য ।)

“লুচি ছকার সঙ্গে হলো দুখানা রুটি দুধে ভিজ্ছে । (সকলের
হাস্য) । (সহাস্যে) “তোমরা নির্জলা একাদশী পারবে না ।

[পূর্বকথা—‘কৃষ্ণকিশোরের একাদশী’ রাজেন্দ্র মিত্র ।]

“কৃষ্ণকিশোরকে দেখলাম, একাদশীতে লুচি ছকা খেলে । আমি
হুকুকে বললাম—হুহু, আমার কৃষ্ণকিশোরের একাদশী করতে ইচ্ছা হচ্ছে ।
(সকলের হাস্য) । তাই একদিন করলাম । খুব পেট ভরে খেলাম ।
তার পর দিন আর কিছু খেতে পারলাম না (সকলের হাস্য) ।

যে কয়েকটা ভক্ত পঞ্চবটীতে হঠাযোগীকে দেখিতে গিয়াছিলেন,
তঁাহারা ফিরিলেন । শ্রীরামকৃষ্ণ তঁাহাদের বলিতেছেন,—“কেমন গো—
কিরূপ দেখলে ? তোমাদের গজ দিয়ে তো মাপলে ?” ঠাকুর দেখি-
লেন, ভক্তরা প্রায় কেহই হঠাযোগীকে টাকা দিতে রাজি নয় !

শ্রীরামকৃষ্ণ । সাধুকে টাকা দিতে হলেই তাকে আর ভাল লাগে না ।

“রাজেন্দ্র মিত্র—আটশ টাকা মাইনে—প্রয়াগে কুস্তমেল্লা দেখে
এসেছিল । আমি জিজ্ঞাসা করলাম—‘কেমন গো, মেলায় কেমন সব

সাধু দেখলে ? রাজেন্দ্র বলে—‘কই তেমন সাধু দেখতে পেলেম না । এক জনকে দেখলাম বটে, কিন্তু তিনিও টাকা লন ।’

“আমি ভাবি যে, সাধুদের কেউ টাকা পয়সা দেবে না ত খাবে কি করে ? এখানে প্যালা দিতে হয় না—তাই সকলে আসে । আমি ভাবি, আহা । ওরা টাকা বড় ভালবাসে ! তাই নিয়েই থাকুক !”

ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিতেছেন । একজন ভক্ত ছোট খাটটির উত্তর দিকে বসিয়া তাঁহার পদসেবা করিতেছেন । ঠাকুর ভক্তটীকে আস্তে আস্তে বলিতেছেন—“যিনিই নিরাকার, তিনিই সাকার । সাকার রূপও মানতে হয় । কালীরূপ চিন্তা করতে করতে সাধক কালীরূপেই দর্শন পায় । তার পরে দেখতে পায় যে, সেইরূপ অখণ্ডে লীন হয়ে গেল । যিনিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই কালী ।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

মহিমার পাণ্ডিত্য । মণি সেন । অধর ও মিটিং (meeting)

ঠাকুর পশ্চিমের গোল বারান্দায় মহিমা প্রভৃতির সহিত হঠযোগীর কথা কহিতেছেন । রামপ্রসন্ন ভক্ত কৃষ্ণকিশোরের পুত্র, তাই ঠাকুর তাঁহাকে স্নেহ করেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । রামপ্রসন্ন কেবল ঐ রকম করে হো হো করে বেড়াচ্ছে । সেদিন এখানে এসে বসলো—একটু কথা কবে না—প্রাণায়াম করে নাক টিপে বসে রইলো । খেতে দিলাম, তা খেলে না । আর এক দিন ডেকে বসালুম । তা পায়ের উপর পা দিয়ে বসলো—কাপ্তানের দিকে পা টা দিয়ে । ওর মার দুঃখ দেখে কাঁদি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি) । ঐ হঠযোগীর কথা তোমায় বলতে বলেছে । সাড়ে ছ আনা দিন খরচ । এ দিকে আবার নিজে বলবেন না ।

মহিমা । বল্পে শোনে কে ! (ঠাকুরের ও সকলের হাস্য) ।

ঠাকুর ঘরের মধ্যে আসিয়া নিজের আসনে বসিয়াছেন । শ্রীযুক্ত মণি সেন (যাঁদের পেনেটীতে ঠাকুরবাড়ী) দু একটি বন্ধুসঙ্গে

আসিয়াছেন ও ঠাকুরের হাতভাঙ্গা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা পড়া করিতেছেন । তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে একজন ডাক্তার ।

ঠাকুর ডাক্তার প্রতাপ মজুমদারের ঔষধ সেবন করিতেছেন । মণি বাবুর সঙ্গী ডাক্তার তাঁহার ব্যবস্থার অনুমোদন করিলেন না । ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন—‘সে (প্রতাপ) তো বোকা নয়, তা তুমি অমন কথা বলছ কেন ?’

এমন সময় লাটু উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, শিশি পড়ে ভেঙ্গে গেছে !

মণি (সেন) হঠযোগীর কথা শুনিয়া বলিতেছেন—‘হঠযোগী কাকে বলে ? হট্ hot—মানে ত গরম’ ।

মণি সেনের ডাক্তার সম্বন্ধে ঠাকুর ভক্তদের পরে বলিলেন—‘ওকে জানি । যত্ন মল্লিককে বলেছিলাম, এ ডাক্তার তোমার ওলম্বাকুল,—অমুক ডাক্তারের চেয়েও মোটা বুদ্ধি !’

[শ্রীযুক্ত মার্টারের সহিত একান্তে কথা ।]

এখনও সন্ধ্যা হয় নাই । ঠাকুর নিজের আসনে বসিয়া মার্টারের সহিত কথা কহিতেছেন । তিনি খাটের পাশে পাপোষে পশ্চিমাশ্রু হইয়া বসিয়া আছেন । এদিকে মহিমাচরণ পশ্চিমের গোল বারান্দায় বসিয়া মণি সেনের ডাক্তারের সহিত উচ্চৈঃস্বরে শাস্ত্রালাপ করিতেছেন । ঠাকুর নিজের আসন হইতে শুনিতে পাইতেছেন ও ঈষৎ হাস্য করিয়া মার্টারকে বলিতেছেন—‘ঐ ঝাড়্ছে ! রজোগুণ । রজোগুণে একটু পাণ্ডিত্য দেখাতে, লেক্চার দিতে ইচ্ছা হয় । সত্ত্বগুণে অন্তর্মুখ হয়,—আর গোপন । কিন্তু খুব লোক ! ঈশ্বরকথায় এত উল্লাস !

অধর আসিয়া প্রণাম করিলেন, ও মার্টারের পাশে বসিলেন ।

শ্রীযুক্ত অধর সেন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট । বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর হইবে । অনেক দিন ধরিয়া, সমস্ত দিন আফিসের পরিশ্রমের পর, ঠাকুরের কাছে প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আসেন । তাঁহার বাটী কলিকাতা শোভাবাজার বেনেটোলায় । অধর কয়েক দিন আসেন নাই ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কিগো, এতদিন আস নাই কেন ?

অধর । আজ্ঞা, অনেক গুণো কাজে পড়ে গিছলাম । ইন্স্কুলের দরুণ সভা এবং আর আর মিটিংএ যেতে হয়েছিল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । মিটিং ইন্স্কুল এই সব লয়ে একবারে ভুলে গিছলে !

অধর (বিনীত ভাবে) । আজ্ঞা, সব চাপা পড়ে গিছলো । আপনার হাতটা কেমন আছে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । এই দেখো এখনও সারে নাই । প্রতাপের ঔষধ খাচ্ছিলাম ।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর হঠাৎ অধরকে বলিতেছেন—“দ্যাখো এ সব অনিত্য । মিটিং ইন্স্কুল আফিস এ সব অনিত্য । ঐশ্বর্যই বস্তু আর সব অবস্তু । সব মন দিয়ে তাঁকেই আরাধনা করা উচিত ।” অধর চুপ করিয়া আছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । এ সব অনিত্য । শরীর এই আছে এই নাই । তাড়াতাড়ি তাঁকে ডেকে নিতে হয় * ।

“তোমাদের সব ত্যাগ করবার দরকার নাই । কচ্ছপের মত সংসারে থাক । কচ্ছপ নিজে জলে চরে বেড়ায় ;—কিন্তু ডিম আড়াতে রাখে,—সব মনটা তার ডিম যেখানে, সেই খানে পড়ে থাকে ।

“কাপ্তেনের বেশ স্বভাব হয়েছে । যখন পূজা করতে বসে, ঠিক একটী ঋষির মত !—এ দিকে কর্পূরের আরতি ; সুন্দর স্তব পাঠ করে । পূজা করে যখন উঠে, চক্ষে যেন পিঁপড়ে কামড়েছে ! আর সর্বদা গীতা ভাগবত এ সব পাঠ করে । আমি দু একটা ইংরাজী কথা কয়েছিলাম,—তা রাগ কলে । বলে—ইংরাজী পড়া লোক ভ্রষ্টাচারী ।

কিয়ৎক্ষণ পরে অধর অতি বিনীত ভাবে বলিতেছেন—

“আপনার আমাদের বাড়িতে অনেক দিন যাওয়া হয় নাই ।

“বৈঠকখানা ঘরে গন্ধ হয়েছিল—আর—যেন সব অন্ধকার !

ভক্তের এই কথা শুনিয়া ঠাকুরের স্নেহ-সাগর যেন উথলিয়া উঠিল । তিনি হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া ভাবে অধর ও মাষ্টারের মস্তক

অধর কয়েক মাস পরেই দেহত্যাগ করিলেন ।

দক্ষিণেশ্বর । মহিমাচরণ, অধর, মণিলাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ১০৩

ও হৃদয় স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন । আর সন্মুখে বলিতেছেন—
'আমি তোমাদের নারায়ণ দেখছি !—তোমরাই আমার আপনার লোক !'

এইবার মহিমাচরণ ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি) । ধৈর্য্যরেতার কথা তখন যা বলছিলে,
তা ঠিক । বার্য্য ধারণ না করলে এ সব (উপদেশ) ধারণা হয় না ।

“একজন চৈতন্যদেবকে বলে, এদের (ভক্তদের) এত উপদেশ
দেন, তেমন উন্নতি করতে পাচ্ছে না কেন ? তিনি বলেন—‘এরা
যোষিৎসঙ্গ ক’রে সব অপব্যয় করে !—তাই ধারণা করতে পারে না !’
ফুটো কলসীতে জল রাখলে জল ক্রমে ক্রমে বেরিয়ে যায় ।

মহিমা প্রভৃতি ভক্তেরা চুপ করিয়া আছেন । কিয়ৎক্ষণ পরে
মহিমাচরণ বলিতেছেন—ঈশ্বরের কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা
করুন—যাতে আমাদের সেই শক্তি হয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । এখনও সাবধান হও ! আষাঢ় মাসের
জল, বটে, রোধ করা শক্ত । কিন্তু জল অনেক তো বেরিয়ে গেছে !
—এখন বাঁধ দিলে থাকবে ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত চতুর্থভাগ, দ্বাদশ খণ্ড, রাম, অধর, মাষ্টার,
মহিমা প্রভৃতি ভক্তসমাগম-সংবাদ সমাপ্ত ।

চতুর্থ ভাগ—ত্রয়োদশ খণ্ড ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে, জন্মোৎসবদিবসে,
বিজয়, কেদার, রাখাল, সুরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

পঞ্চবটীমূলে জন্মোৎসবদিবসে বিজয় প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীতলায় পুরাতন বটবৃক্ষের চাতালের
উপর বিজয়, কেদার, সুরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল প্রভৃতি অনেকগুলি
ভক্তসঙ্গে দক্ষিণাশ্রয় হইয়া বসিয়া আছেন । কয়েকটি ভক্ত চাতালের

উপর বসিয়া আছেন । অধিকাংশই চাতালের নীচে, চতুর্দিকে দাঁড়াইয়া আছেন । বেলা ১টা হইবে । রবিবার, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ । শুক্লপ্রতিপদ ।

ঠাকুরের জন্মদিন ফাল্গুনমাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথি । কিন্তু তাঁহার হাতে অসুখ বলিয়া এত দিন জন্মোৎসব হয় নাই । এখন অনেকটা সুস্থ হইয় ছেন । তাই আজ ভক্তেরা আনন্দ করিবেন । সহচরী গান গাইবে । সহচরী প্রবীণা হইয়াছেন, কিন্তু প্রসিদ্ধ কীর্তনী ।

মাষ্টার ঠাকুরের ঘরে ঠাকুরকে দেখিতে না পাইয়া পঞ্চবটীতে আসিয়া দেখেন যে, ভক্তেরা সহস্র বদন—আনন্দে অবস্থান করিতেছেন । ঠাকুর বৃক্ষমূলে চাতালের উপর যে বসিয়া আছেন, তিনি দেখেন নাই । অথচ ঠাকুরের ঠিক সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন । তিনি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তিনি কোথা ? এই কথা শুনিয়া সকলে উচ্চ হাস্য করিলেন । হঠাৎ সম্মুখে ঠাকুরকে দর্শন করিয়া, মাষ্টার অপ্রস্তুত হইয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন । দেখিলেন, ঠাকুরের বামদিকে কেশব (চাটুয্যে) এবং বিজয় (গোস্বামী) চাতালের উপর বসিয়া আছেন । ঠাকুর দক্ষিণাশ্র ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্র, মাষ্টারের প্রতি) । দেখ কেমন দু'জনকে (কেশব ও বিজয়কে) মিলিয়ে দিয়েছি ।

শ্রীবৃন্দাবন হইতে মাধবীলতা আনিয়া ঠাকুর পঞ্চবটীতে ১৮৬৮ খৃঃ অঙ্গে রোপণ করিয়াছিলেন । আজ মাধবী বেশ বড় হইয়াছে । ছোট ছোট ছেলেরা উঠিয়া ছলিতেছে, নাচিতেছে—ঠাকুর আনন্দে দেখিতেছেন ও বলিতেছেন—‘বাঁদুরে ছানার ভাব ! পড়লে ছাড়ে না ।’

সুরেন্দ্র চাতালের নীচে দাঁড়াইয়া আছেন । ঠাকুর সন্মুখে বলিতেছেন, ‘তুমি উপরে এসো না । এমন টা (পা মেলা) বেশ হবে ।’

সুরেন্দ্র উপরে গিয়া বসিলেন । ভবনাথ জামা পরিয়া বসিয়াছেন দেখিয়া সুরেন্দ্র বলিতেছেন—‘কি হে বিলাতে যাবে না কি ?’

ঠাকুর হাসিতেছেন ও বলিতেছেন—আমাদের বিলাত ঈশ্বরের কাছে ! ঠাকুর ভক্তদের সহিত নানা বিষয়ে কথা কহিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমি মাঝে মাঝে কাপড় ফেলে, আনন্দময় হয়ে

দক্ষিণেশ্বর । পঞ্চবটীমূলে বিজয়, সুরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ১০৫

বেড়াতাম । শঙ্কর এক দিন বলছে, ‘ওহে তুমি তাই গ্যাংটো হয়ে
বেড়াও !—বেশ আরাম !—আমি একদিন দেখলাম ।’

সুরেন্দ্র । আপীষ থেকে এসে জামা চাপকান খোলবার সময়
বলি—মা তুমি কত বাঁধাই বেঁধেছ !

[সুরেন্দ্রের আফিস । সংসার, অষ্টপাশ ও তিন গুণ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । অষ্টপাশ দিয়ে বন্ধন । লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি-
অভিমান, সঙ্কোচ, গোপনের ইচ্ছা,—এই সব ।

ঠাকুর গান গাইতেছেন—আমি ঐ খেদে খেদ করি শ্যামা,

তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি (গো মা) ।

গান— শ্যামা মা উড়াচ্ছ ঘুড়ি (ভব সংসার বাজার মাঝে)

ঘুড়ি আশাবায়ু ভরে উড়ে, বাঁধা তাহে মায়া দড়ি ।

শ্রীকথামৃত, ১ম ভাগ ৩৯ পৃষ্ঠা ।

“মায়া দড়ি কিনা মাগ ছেলে । ‘বিষয়ে মেজেছ মাঞ্জা কর্কশা
হয়েছে দড়ি’ । বিষয়—কামিনীকাঞ্চন ।

গান — ভবে আসা খেলতে পাশা, বড় আশা করেছিলাম ।

আশার আশা ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পঞ্জুড়ি পেলাম ।

প’বার আঠার ষোল, যুগে যুগে এলাম ভাল,

(শেষে) কচে বারো পেয়ে মাগো, পঞ্জা ছক্কায় বন্ধ হলাম ।

ছ’ দুই আট, ছ’চার দশ, কেউ নয় মা আমার বশ,

খেলাতে না পেলাম যশ, এবার বাজী ভোর হইল ।

“পঞ্জুড়ী অর্থাৎ পঞ্চভূত । পঞ্জা ছক্কায় বন্দী হওয়া অর্থাৎ
পঞ্চভূত ও ছয় রিপুর বশ হওয়া । ‘ছ তিন নিয়ে ফাঁকি দিব’ ।
ছয়কে ফাঁকি দেওয়া অর্থাৎ ছয় রিপুর বশ না হওয়া ।

“তিনকে ফাঁকি দেওয়া অর্থাৎ তিন গুণের অতীত হওয়া ।

“সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণেতেই মানুষকে বশ করেছে । তিন
ভাই ; সত্ত্ব থাকলে রজঃকে ডাকতে পারে, রজঃ থাকলে তমঃকে ডাকতে
পারে । তিন গুণই চোর । তমোগুণে বিনাশ করে, রজোগুণে বন্ধ করে ;
সত্ত্বগুণে বন্ধন খোলে বটে, কিন্তু ঈশ্বরের কাছ পর্য্যন্ত যেতে পারে না ।”

বিজয় (সহাস্ত্রে) । সত্ত্বও চোর কি না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্ত্রে) । ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারে না,
কিন্তু পথ দেখিয়ে দেয় । ভবনাথ । বাঃ ! কি চমৎকার কথা !

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, এ খুব উচু কথা ।

ভক্তেরা এই সকল কথা শুনিয়া আনন্দ করিতেছেন ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

বিজয় ও কেশব প্রভৃতির প্রতি কামিনীকাক্ষন সম্বন্ধে উপদেশ

শ্রীরামকৃষ্ণ । বন্ধনের কারণ কামিনীকাক্ষন । কামিনীকাক্ষনই
সংসার । কামিনীকাক্ষনই ঈশ্বরকে দেখতে দেয় না ।

এই বলিয়া ঠাকুর নিজের গাম্ছা লইয়া সম্মুখ আবরণ করিলেন ।
আর বলিতেছেন—“আর আমায় তোমরা দেখতে পাচ্চ ?—এই
আবরণ । এই কামিনীকাক্ষন আবরণ গেলেই চিদানন্দ লাভ ।

“ছাখো না,—মো মাগ মুখ ত্যাগ করেছে, সে ত
জগৎ মুখ ত্যাগ করেছে ! ঈশ্বর তার অতি নিকট ।

কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে এই কথা শুনিতেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশব, বিজয় প্রভৃতির প্রতি) । মাগ মুখ যে ত্যাগ
করেছে, সে জগৎমুখ ত্যাগ করেছে ।—এই কামিনীকাক্ষনই আবরণ ।
তোমাদের ত এত বড় বড় গৌর, তবু তোমরা ঐ-তেই রয়েছ ! বল !
মনে মনে বিবেচনা করে দেখ ।— বিজয় । আজ্ঞা, তা সত্য বটে ।

কেশব অবাক হইয়া চুপ করিয়া আছেন । ঠাকুর বলিতেছেন,—

“সকলকেই দেখি, মেয়ে মানুষের বশ । কাপ্তানের বাড়ী গিছলাম ;—
তার বাড়ী হয়ে রামের বাড়ী যাব । তাই কাপ্তানকে বললাম, ‘গাড়ীভাড়া
দাও’ । কাপ্তান তার মাগকে বলে । সে মাগও তেন্নি—‘ক্যা ছ্যা,’ ‘ক্যা
ছ্যা’ করতে লাগল । শেষে কাপ্তান বলে যে, ওরাই (রামেরা) দেবে ।
গীতা ভাগবত বেদান্ত সব ওর ভিতরে ! (সকলের হাস্য ।)

দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটী । সুরেন্দ্র, কেদার, বিজয় প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ১০৭

“টাকা কড়ি সর্বস্ব সব মাগের হাতে ! আবার বলা হয়—‘আমি দু’টো টাকাও আমার কাছে রাখতে পারি না—কেমন আমার স্বভাব !’

“বড়বাবুর হাতে অনেক কস্ম, কিন্তু করে দিচ্ছে না । এক জন বলে ‘গোলাপীকে ধর, তবে কস্ম হবে ।’ গোলাপী বড়বাবুর রাঁড় ।

[পূর্বকথা Fort দর্শন । স্ত্রীলোক ও ‘কলমবাড়া রাস্তা ।’]

“পুরুষগুলো বুঝতে পারে না, কত নেমে গেছে ।

“কেল্লায় যখন গাড়ী করে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন বোধ হলো যেন সাধারণ রাস্তা দিয়ে এলাম । তার পরে দেখি যে, চারতোলা নীচে এসেছি ! কলমবাড়া (sloping) রাস্তা ! যাকে ভূতে পায়, সে জানতে পারে না যে আমায় ভূতে পেয়েছে । সে ভাবে, আমি বেশ আছি ।

বিজয় (সহাস্যে) । রোজা মিলে গেলে রোজা ঝাড়িয়ে দেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কথার বেশী উত্তর দিলেন না । কেবল বলিলেন যে, ‘সে ঈশ্বরের ইচ্ছা ।’ তিনি আবার স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । যাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই বলে, আজে হাঁ, আমার স্ত্রীটি ভাল । এক জনেরও স্ত্রী মন্দ নয় ! (সকলের হাস্য ।)

“যারা কামিনীকাঞ্চন নিয়ে থাকে, তারা নেশায় কিছু বুঝতে পারে না । যারা দাবা বোড়ে খেলে, তারা অনেক সময় জানে না, কি ঠিক চাল । কিন্তু যারা অন্তর থেকে দেখে, তারা অনেকটা বুঝতে পারে ।

“স্ত্রী মায়াকুপিণী । নারদ রামকে স্তব করতে লাগলেন,—‘হে রাম, তোমার অংশে যত পুরুষ ; তোমার মায়াকুপিণী সীতার অংশে যত স্ত্রী । আর কোন বর চাই না—এই কোরো, যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়, আর যেন তোমার জগৎমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই !’

[গিরীন্দ্র নগেন্দ্র প্রভৃতির প্রতি উপদেশ ।]

সুরেন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিরীন্দ্র ও তাঁহার নগেন্দ্র প্রভৃতি ভ্রাতুষ্পুত্রেরা আসিয়াছেন । গিরীন্দ্র আফিসের কন্মে নিযুক্ত হইয়াছেন । নগেন্দ্র ওকালতির জন্ত প্রস্তুত হইতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীন্দ্র প্রভৃতির প্রতি) । তোমাদের বলি—তোমরা সংসারে আসক্ত হইও না । ছাখো, রাখালের জ্ঞান অজ্ঞান বোধ হয়েছে,

—সৎ অসৎ বিচার হয়েছে ।—এখন তাকে বলি, ‘বাড়িতে যা ; কখনও এখানে এলি, দুই দিন থাকলি ।’

“আর তোমরা পরস্পর প্রণয় করে থাকবে—তবেই মঙ্গল হবে । আর আনন্দে থাকবে । যাত্রাওয়ালারা যদি এক সুরে গায়, তবেই যাত্রাটি ভাল হয়,—আর যারা শুনে, তাদেরও আহ্লাদ হয় ।

“ঈশ্বরে বেশী মন রেখে, খানিকটা মন দিয়ে সংসারের কাজ করবে ।

“সাধুর মন ঈশ্বরে বার আনা,—আর কাজে চার আনা । সাধুর ঈশ্বরের কথাতেই বেশী হুঁস্ । সাপের ন্যাজ মাড়ালে আর রক্ষা নাই !—ন্যাজে যেন তার বেশী লাগে ।

[পঞ্চবটীতে সহচরীর কীর্তন । হঠাৎ মেঘ ও ঝড় ।]

ঠাকুর ঝাউতলায় যাইবার সময় সিঁতির গোপালকে ছাতির কথা বলিয়া গেলেন । গোপাল মাফটারকে বলিতেছেন—‘উনি বলে গেলেন, ছাতি ঘরে রেখে আস্তে ।’ পঞ্চবটীতলায় কীর্তনের আয়োজন হইল । ঠাকুর আসিয়া বসিয়াছেন । সহচরী গান গাইতেছেন । ভক্তেরা চতুর্দিকে কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া আছেন ।

গত কল্য শনিবার অমাবস্যা গিয়াছে । জ্যৈষ্ঠ মাস । আজ মধ্য মধ্য মেঘ করিতেছিল । হঠাৎ ঝড় উপস্থিত হইল । ঠাকুর ভক্তসঙ্গে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন । কীর্তন ঘরেই হইবে স্থির হইল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সিঁতির গোপালের প্রতি) । হ্যাঁগা, ছাতিটা এনেছ ?

গোপাল । আজ্ঞা না, গান শুন্তে শুন্তে ভুলে গেছি !

ছাতিটা পঞ্চবটীতে পড়িয়া আছে ; গোপাল তাড়াতাড়ি গেলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমি যে এত এলো মেলো, তবু অত দূর নয় !

“রাখাল এক জায়গায় নিমন্ত্রণের কথায় ১৩ইকে বলে ১১ই ।

“আর গোপাল—গরুর পাল । (সকলের হাস্য) ।

“সেই যে স্মাক্রাদের গল্পে আছে—একজন বলছে, ‘কেশব’, একজন বলছে ‘গোপাল’, এক জন বলছে ‘হরি’, একজন বলছে ‘হর’ !

সে গোপালের মানে গরুর পাল । (সকলের হাস্য) ।

সুরেন্দ্র গোপালের উদ্দেশ্য করিয়া আনন্দে বলিতেছেন—‘কানু কোথায় ?’

দক্ষিণেশ্বর । সুরেন্দ্র, গোপাল, বিজয় প্রভৃতি ভক্তগণ সঙ্গে । ১০৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

বিজয়াদি ভক্তসঙ্গে সংকীৰ্ত্তনানন্দে । সহচরীর গৌরাঙ্গসন্ধ্যাস গান ।

কীর্ত্তনী গৌরসন্ধ্যাস গাইতেছেন ও মাঝে মাঝে আঁখর দিতেছেন—

(নারী হেবুবে না !) (সে যে সন্ধ্যাসীর ধর্ম !) (জীবের দুঃখ ঘুচাইতে,)
(নারী হেরিবে না ।) (নইলে বৃথা গৌর অবতার !)

ঠাকুর গৌরাঙ্গের সন্ধ্যাসকথা শুনিতে শুনিতে দণ্ডায়মান হইয়া সমাধিস্থ হইলেন । অমনি ভক্তেরা গলায় পুষ্পমালা পরাইয়া দিলেন । ভবনাথ, রাখাল ঠাকুরকে ধারণ করিয়া আছেন—পাছে পড়িয়া যান । ঠাকুর উত্তরাশ্রু ; বিজয়, কেশব, রাম, মাফার, মনমোহন, লাটু প্রভৃতি ভক্তেরা মণ্ডলাকার করিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন । সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ কি আসিয়া ভক্তসঙ্গে হরিনাম-মহোৎসব করিতেছেন !

[শ্রীকৃষ্ণই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—আবার জীবজগৎ—সরাট বিরাট ।]

অল্পে অল্পে সমাধি ভঙ্গ হইতেছে । ঠাকুর সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের সহিত কথা কহিতেছেন । ‘কৃষ্ণ’ এই কথা এক এক বার উচ্চারণ করিতেছেন । আবার এক এক বার পারিতেছেন না । বলিতেছেন, কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! সচ্চিদানন্দ !—কই তোমার রূপ আজকাল দেখি না ! এখন তোমায় অন্তরে বাহিরে দেখছি !—জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, সবই তুমি ! মন, বুদ্ধি, সবই তুমি ! গুরুর প্রণামে আছে—“অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ । তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥”

তুমিই অখণ্ড—তুমিই আবার চরাচর ব্যাপ্ত করে রয়েছ ! তুমিই আধার, তুমিই আধেয় ! প্রাণকৃষ্ণ ! মনকৃষ্ণ ! বুদ্ধিকৃষ্ণ ! আত্মাকৃষ্ণ ! প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন !

বিজয়ও আবিষ্ট হইয়াছেন । ঠাকুর বলিতেছেন, বাবু, তুমিও কি বেহুঁস হয়েছ ? বিজয় (বিনীতভাবে) । আচ্ছা না ।

কীর্ত্তনী আবার গাইতেছেন—‘আঁখল প্রেম !’ কীর্ত্তনী যাই আঁখর দিলেন—‘সদাই হিয়ার মাঝে রাখিতাম, ওহে প্রাণবঁধু হে !’ ঠাকুর আবার সমাধিস্থ !—ভবনাথের কাঁধে ভাঙ্গা হাতটী রহিয়াছে !

কিঞ্চিৎ বাহু হইলে, কীৰ্ত্তনী আবার আঁখর দিতেছেন—‘যে তোমার জন্ম সব ত্যাগ করেছে তার কি এতো দুঃখ ?’

ঠাকুর কীৰ্ত্তনীকে নমস্কার করিলেন । বসিয়া গান শুনিতেন—
মাঝে মাঝে ভাবাবিষ্ট । কীৰ্ত্তনী চুপ করিলেন । ঠাকুর কথা কহিতেছেন ।
[প্রেমে দেহ ও জগৎ ভুল । ঠাকুরের ভক্তসঙ্গে নৃত্য ও সমাধি ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয় প্রভৃতি ভক্তের প্রতি) । প্রেমে কাকে বলে ।
ঈশ্বরে যার প্রেম হয়—যেমন চৈতন্যদেবের—তার জগৎ তো ভুল হয়ে যাবে ; আবার দেহ যে এতো প্রিয়, এ পর্য্যন্ত ভুল হয়ে যাবে !

প্রেম হলে কি হয়, ঠাকুর গান গাইয়া বুঝাইতেছেন ।

গান—হরি বলিতে ধারা বেয়ে পড়বে । (সে দিন কবে বা হবে) (অঙ্গে পুলক হবে) (সংসার বাপনা যাবে) (হৃদীন যুচে সুদিন হবে) (কবে হরির দয়া হবে)

ঠাকুর দাঁড়াইয়াছেন ও নৃত্য করিতেছেন । ভক্তেরা সঙ্গে সঙ্গে নাচিতেছেন । ঠাকুর মাষ্টারের বাহু আকর্ষণ করিয়া মণ্ডলের ভিতর তাঁহাকে লইয়াছেন ।

নৃত্য করিতে করিতে আবার সমাপ্তিস্থ ! চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া ! কেদার সমাধি ভঙ্গ করিবার জন্ম স্তব করিতেছেন—

“হৃদয়কমলমধ্যে নির্বিশেষঃ নিরীহম্, হরিহরবিধিবেত্তং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্ ।

জননমরণভীতিভ্রংশি সচ্চিৎস্বরূপম্, সকলভুবনবীজং ব্রহ্মচৈতন্যমীড়ে ॥”

ক্রমে সমাধিভঙ্গ হইল । ঠাকুর আসন গ্রহণ করিলেন ও নাম করিতেছেন—ওঁ সচ্চিদানন্দ ! গোবিন্দ ! গোবিন্দ !
গোবিন্দ !—মোগমাস্ত্রা !—ভাগবতভক্ত ভগবান্ !

কীৰ্ত্তন ও নৃত্য-স্থলের ধূলি ঠাকুর লইতেছেন ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

[সন্ন্যাসীর কঠিন ব্রত । সন্ন্যাসী ও লোকশিক্ষা ।]

ঠাকুর গঙ্গার ধারের গোল বারাণ্ডায় বসিয়াছেন । কাছে বিজয়, ভবনাথ, মাষ্টার, কেদার প্রভৃতি ভক্তগণ । ঠাকুর এক একবার বলিতেছেন—‘হা কৃষ্ণচৈতন্য !’

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয় প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি) । ঘরে নাকি

অনেক হরিণাম হয়েছে—তাই খুব জমে গেল !

ভবনাথ । তাতে আবার সন্ন্যাসের কথা !

শ্রীরামকৃষ্ণ ‘আহা ! কি ভাব !’ এই বলিয়া গান ধরিলেন—

গান— প্রেমধন বিলাস গোরালাস ।

প্রেম কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায় !

চাঁদ নিতাই ডাকে আয় ! আয় !, চাঁদ গৌর ডাকে আয় !

(ঐ) শান্তিপুৰ ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায় !

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয় প্রভৃতির প্রতি) । বেশ বলেছে কীর্তনে,—
‘সন্ন্যাসী নারী হের্বে না’ এই সন্ন্যাসীর ধর্ম ।
কি ভাব !

বিজয় । আজ্ঞা হাঁ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । সন্ন্যাসীকে দেখে তবে সবাই শিখবে—তাই অত
কঠিন নিয়ম ! সন্ন্যাসী নারীর চিত্রপট পর্য্যন্ত দেখবে না !—এমনি
কঠিন নিয়ম ! কালো পাঁটা মার সেবার জন্ত বলি দিতে হয়—কিন্তু
একটু ঘা থাকলে হয় না । রমণীসঙ্গ তো করবে না—মেয়েদের সঙ্গে
আলাপ পর্য্যন্ত করবে না ।

বিজয় । ছোট হরিদাস ভক্ত মেয়ের সঙ্গে আলাপ করেছিল ।
চৈতন্যদেব হরিদাসকে ত্যাগ করলেন ।

[পূর্বকথা—শ্রীরামকৃষ্ণের নামে মাড়ওয়ারীর টাকা ও মথুরের
জমি লিখিয়া দিবার প্রস্তাব ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী আর কাঞ্চন—যেমন সুন্দরীর
পক্ষে তার গায়ের বোটকা গন্ধ ! ও গন্ধ থাকলে বৃথা সৌন্দর্য্য ।

“মাড়ওয়ারী আমার নামে টাকা লিখে দিতে চাইলে ;—মথুর জমি
লিখে দিতে চাইলে ;—তা লতে পারলাম না ।

“সন্ন্যাসীর ভারী কঠিন নিয়ম । যখন সাধু সন্ন্যাসী সেজেছে,—
তখন ঠিক সাধু সন্ন্যাসীর মত কাজ করতে হবে । থিয়েটারে দেখ নাই !
—যে রাজা সাজে সে রাজাই সাজে, যে মন্ত্রী সাজে সে মন্ত্রীই সাজে ।

“এক জন বহুরূপী ত্যাগী সাধু সেজেছিল । বাবুরা তাকে এক
তোড়া টাকা দিতে গেল । সে ‘উঁহঃ’ করে চলে গেল,—টাকা ছুঁলেও

না ! কিন্তু খানিক পরে গা হাত পা ধুয়ে নিজের কাপড় পরে এলো ।
বলে, ‘কি দিচ্ছিলে, এখন দাও’ । যখন সাধু সেজেছিল, তখন টাকা
ছুঁতে পারে নাই । এখন চার আনা দিলেও হয় ।

“কিন্তু পরমহংস অবস্থায় বালক হয়ে যায় । পাঁচ বছরের বালকের
স্ত্রীপুরুষ জ্ঞান নাই । তবু লোকশিক্ষায় জন্ম সাবধান হতে হয় ।

[শ্রীযুক্ত কেশবসেনের দ্বারা লোকশিক্ষা হ’ল না কেন ।]

শ্রীযুক্ত কেশব সেন কামিনীকাঞ্চনের ভিতর ছিলেন ।—তাই লোক-
শিক্ষার ব্যাঘাত হইল । ঠাকুর এই কথা বলিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ইনি (কেশব)—বুঝেচো ?

বিজয় । আজ্ঞা, হাঁ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । এদিক্ ওদিক্ দুই রাখতে গিয়ে তেমন কিছু পারলেন না ।

[শ্রীচৈতন্যদেব কেন সংসার ত্যাগ করিলেন ।]

বিজয় । চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে বল্লেন, ‘নিতাই, আমি যদি
সংসার ত্যাগ না করি, তা হলে লোকের ভাল হবে না । সকলেই আমার
দেখাদেখি সংসার কভে চাইবে ।—কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করে, হরিপাদ-
পদ্মে সমস্ত মন দিতে কেহ চেষ্টা করবে না’ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । চৈতন্যদেব লোকশিক্ষার জন্ম সংসার ত্যাগ করলেন ।

“সাধু সন্ন্যাসী নিজের মঙ্গলের জন্ম কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করবে ।
আবার নিলিপ্ত হলেও লোকশিক্ষার জন্ম কাছে কামিনীকাঞ্চন রাখবে
না । ন্যাসী—সন্ন্যাসী—জগদগুরু !—তাকে দেখে তবে তো লোকের
চৈতন্য হবে !

সন্ধ্যা আগতপ্রায় । ভক্তেরা ক্রমে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ
করিতেছেন । বিজয় কেদারকে বলিতেছেন—‘আজ সকালে (ধ্যানের
সময়) আপনাকে দেখেছিলাম ;—গায়ে হাত দিতে যাই—কেউ নাই !

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থভাগ, ত্রয়োদশ খণ্ড,

জন্মোৎসব-দিবসে ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দ-কথা সমাপ্ত ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

চতুর্থ ভাগ—চতুর্দশ খণ্ড।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে স্বরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল,
লাটু, মাফটার, অধর প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

শ্রীযুক্ত বাবুরাম, রাখাল, লাটু, নিরঞ্জন, নরেন্দ্র প্রভৃতির চরিত্র ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে নিজের ঘরে ভক্তসঙ্গে বসিয়া
আছেন । সন্ধ্যা হইয়াছে, তাই জগন্মাতার নাম ও চিন্তা করিতেছেন ।
ঘরে রাখাল, অধর, মাফটার, আরও দু এক জন ভক্ত আছেন ।

আজ শুক্রবার—জ্যৈষ্ঠকৃষ্ণাদ্বাদশী । পাঁচ দিন পরে রথযাত্রা হইবে ।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরবাড়ীতে আরতি আরম্ভ হইল । অধর আরতি
দেখিতে গেলেন । ঠাকুর মণির সহিত কথা কহিতেছেন ও আনন্দে
মণির শিক্ষার জন্য ভক্তদের গল্প করিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আচ্ছা, বাবুরামের কি পড়বার ইচ্ছা আছে ?

“বাবুরামকে বললাম, তুই লোকশিক্ষার জন্য পড় ! সীতার উদ্ধারের
পর বিভীষণ রাজ্য কর্তে রাজী হ'লো না । রাম বল্লেন, তুমি মূর্খদের
শিক্ষার জন্য রাজ্য করো । না হ'লে তারা বলবে, বিভীষণ রামের সেবা
করেছে তার কি লাভ হ'লো ?—রাজ্যালাভ দেখলে, খুসী হবে ।

“তোমায় বলি, সে দিন দেখলাম—বাবুরাম, ভবনাথ আর হরিশ
এদের প্রকৃতিভাব ।

“বাবুরামকে দেখলাম—দেবীমূর্তি । গলায় হার । সখী সঙ্গে । ও
স্বপ্নে কি পেয়েছে, ওর দেহ শুদ্ধ । একটু কিছু করলেই ওর হ'য়ে যাবে ।

“কি জানো দেহ রক্ষার অসুবিধা হ'চ্ছে । ও এসে থাকলে ভাল
হয় । এদের স্বভাব সব এক রকম হ'য়ে যাচ্ছে । নোটো (লাটু)
চড়েই রয়েছে (সর্বদা ভাবেতে রয়েছে) । ক্রমে লীন হ'বার যো !

“রাখালের এমনি স্বভাব হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে যে, তাকে আমার জল দিতে
হয় ! (আমার) সেবা কর্তে বড় পারে না ।

“বাবুরাম আর নিরঞ্জন—এদের ছাড়া কই ছোকরা ?—যদি আর কেউ আসে, বোধ হয়, ঐ উপদেশ নেবে, চলে যাবে ।

“তবে টানাটানি করে আসতে বলি না, বাড়ীতে হাঙ্গাম হ’তে পারে । (সহাস্তে) “আমি যখন বলি ‘চলে আয় না’, তখন বেশ বলে,—‘আপনি করে নিন্ না !’ রাখালকে দেখে কাঁদে । বলে, ও বেশ আছে !

“রাখাল এখন ঘরের ছেলের মত আছে ; জানি, আর ও আসক্ত হ’বে না । বলে, ‘ও সব আলুনি লাগে !’ ওর পরিবার এখানে এসেছিল । ১৪ বৎসর বয়স । এখান হ’য়ে কোমলগরে গেল । তারা ওকে কোমলগরে যেতে বললে । ও গেল না । বলে,—‘আমোদ আহ্লাদ ভাল লাগে না ।’ নিরঞ্জনকে তোমার কিরূপ বোধ হয় ? মাষ্টার । আজ্ঞা, বেশ চেহারা !

শ্রীরামকৃষ্ণ । না, চেহারা শুধু নয় । সরল । সরল হলে ঈশ্বরকে সহজে পাওয়া যায় । সরল হ’লে উপদেশে শীঘ্র কাজ হয় । পাট করা জমি কাঁকর কিছু নাই, বীজ পড়লেই গাছ হয়, আর শীঘ্র ফল হয় ।

“নিরঞ্জন বিয়ে করবে না । তুমি কি বল,—কামিনীকান্ধনেই বন্ধ করে ? মাষ্টার । আজ্ঞা, হাঁ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । পান তামাক ছাড়লে কি হবে ? কামিনীকান্ধন ত্যাগই ত্যাগ ।

“ভাবে দেখলাম, যদিও চাকরি করছে, ওকে কোন দোষ স্পর্শ করে নাই । মার জন্তু কস্ম্য করে,—ও’তে দোষ নাই ।

“তোমার কস্ম্য যা করো—এতে দোষ নাই । এ ভাল কায ।

“কেরাণী জেলে গেলো—বন্ধ হোলো—বেড়ী পরলে—আবার মুক্ত হোলো । মুক্ত হওয়ার পর সে কি ধেই ধেই করে নাচবে ? সে আবার কেরাণীগিরিই করে । তোমার উপায়ের ইচ্ছা নাই । ও’দের খাওয়ানো পরানো । তারা তা না হ’লে কোথায় যাবে ?

মণি । কেউ গায় তো ছাড়া যায় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তা বই কি । এখন,—এও করো, ওও করো !

মণি । সব ত্যাগ করতে পারা ভাগ্য !

শ্রীরামকৃষ্ণ । তা বই কি ! তবে যেমন সংস্কার । তোমার একটু কস্ম্য

বাকি আছে । সেটুকু হয়ে গেলেই শান্তি—তখন তোমায় ছেড়ে দেবে ।
হাঁসপাতালে নাম লেখালে সহজে ছাড়ে না । সম্পূর্ণ সারলে তবে ছাড়ে !

“ভক্ত এখানে মারা আসে—দুই থাক । এক থাক
বলছে, ‘আমায় উদ্ধার করো ! হে ঈশ্বর !’ আর এক থাক, তারা অন্তরঙ্গ,
তারা ও কথা বলে না । তাদের দুটি জিনিস জানলেই হলো ;—প্রথম,
আমি (শ্রীরামকৃষ্ণ) কে ? তার পর, তারা কে—আমার সঙ্গে সম্বন্ধ কি ?

“তুমি এই শেষ থাকের । তা না হ’লে এতো সব করে * *

[নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জনের পুরুষ-ভাব । বাবুরাম, ভবনাথের প্রকৃতি-ভাব ।]

“ভবনাথ, বাবুরাম এদের প্রকৃতি-ভাব । হরীশ মেয়ের কাপড় পরে
শোয় । বাবুরামও বলেছে, ওই ভাবটা ভাল লাগে । তবেই মিললো ।
ভবনাথেরও ঐ । নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, এদের ব্যাটা ছেলের ভাব ।

[হাত ভাঙ্গার মানে । সিদ্ধাই (Miracles) ও শ্রীরামকৃষ্ণ ।]

“আচ্ছা, হাত ভাঙ্গার মানেটা কি ? আগে এক বার ভাবাবস্থায়
দাঁত ভেঙ্গে গিছিলো ; এবার ভাবাবস্থায় হাত ভাঙ্গলো ।

মণি চুপ করিয়া আছেন দেখিয়া ঠাকুর নিজেই বলিতেছেন—

“হাত ভেঙ্গেছে—সব অহঙ্কার নিশ্চূল করবার জন্য ! এখন
আর ভিতরে আমি খুঁজে পাচ্ছি না । খুঁজতে গিয়ে দেখি,
তিনি রয়েছেন । অহঙ্কার একবারে না গেলে তাঁকে পাবার যো নাই !

“চাতকের ছাখো, মাটীতে বাসা, কিন্তু কত উপরে উঠে !

“আচ্ছা, কাপ্তেন বলে, মাছ খাও বোলে তোমার সিদ্ধাই হয় নাই ।

“এক এক বার গা কাঁপে পাছে ঐ সব শক্তি এসে পড়ে । এখন
যদি সিদ্ধাই হয়, এখানে ডাক্তারখানা হাঁসপাতাল হ’য়ে পড়বে । লোক
এসে বলবে, ‘আমার অসুখ ভাল করে দাও !’ সিদ্ধাই কি ভাল ?

মাফটার । আজ্ঞা, না । আপনি তো বলেছেন, অষ্ট সিদ্ধির মধ্যে
একটি থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঠিক বলেছ ! যারা হীনবুদ্ধি, তারাই সিদ্ধাই চায় ।

“যে লোক বড় মানুষের কাছে কিছু চেয়ে ফেলে, সে আর খাতির
পায় না । সে লোককে এক গাড়ীতে চড়তে দেয় না ;—আর যদি

চড়তে দেয় তো কাছে বসতে দেয় না । তাই নিষ্কাম ভক্তি
অহৈতুকী ভক্তি—সৰ্বাপেক্ষা ভাল ।

[সাকার নিরাকার দুইই সত্য । ভক্তের বাটী ঠাকুরের আড্ডা ।]

“আচ্ছা, সাকার নিরাকার দুইই সত্য । কি বলো ?—নিরাকারে
মন অনেক ক্ষণ রাখা যায় না—তাই ভক্তের জন্য সাকার ।

“কাপ্তেন বেশ বলে । পাখী উপরে খুব উঠে যখন শ্রান্ত হয়, তখন
আবার ডালে এসে বিশ্রাম করে । নিরাকারের পর সাকার ।

“তোমার আড্ডাটায় একবার যেতে হ’বে । ভাবে দেখলাম—
অধরের বাড়ী, সুরেন্দ্রের বাড়ী, বলরামের বাড়ী—এ সব আমার আড্ডা ।

“কিন্তু ওরা এখানে না এলে আমার ইচ্ছাপত্তি নাই ।

[ভক্তসঙ্গে লীলা পর্য্যন্ত বাজীকরের খেলা । চণ্ডী । দয়া ঈশ্বরের ।]

মাফটার । আজ্ঞা, তা কেন হবে ? সুখ বোধ হ’লেই দুঃখ । আপনি
সুখদুঃখের অতীত ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ । আর আমি দেখছি,—বাজীকর আর বাজীকরের
খেলা । বাজীকরই সত্য । তাঁর খেলা সব অনিত্য—স্বপ্নের মত ।

“যখন চণ্ডী শূন্যতাম, তখন ঐটী বোধ হ’য়েছিল । এই শূন্য নিশু-
স্তের জন্ম হ’লো । আবার কিছুক্ষণ পরে শূন্যতাম, বিনাশ হ’য়ে গেল ।

মাফটার । আজ্ঞা, আমি কাল্‌নায় গঙ্গাধরের সঙ্গে জাহাজে করে
যাচ্ছিলাম । জাহাজের ধাক্কা লেগে এক নৌকা লোক, কুড়ি পঁচিশ জন,
ডুবে গেল ! ষ্টীমারের তরঙ্গের ফেনার মত জলে মিশিয়ে গেল !

“আচ্ছা, যে বাজী দেখে, তার কি দয়া থাকে ?—তার কি কর্তৃত্ব
বোধ থাকে ?—কর্তৃত্ব-বোধ থাকলে তবে তো দয়া থাকবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । সে একবারে সবটা দ্বাখে,—ঈশ্বর মায়া জীব জগৎ ।

“সে দ্বাখে যে, মায়া (বিদ্যা মায়া, অবিদ্যা মায়া,) জীব, জগৎ,—আছে
অথচ নাই । যতক্ষণ নিজের ‘আমি’ আছে, ততক্ষণ ওরাও আছে । জ্ঞান
অসির দ্বারা কাটলে পর, আর কিছুই নাই ! তখন নিজের ‘আমি’ পর্য্যন্ত
বাজীকরের বাজী হয়ে পড়ে !

মণি চিন্তা করিতেছেন । শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, “কি রকম

জানো ?—যেমন পঁচিশ থাক পাপড়িওয়ালা ফুল । এক চোপে কাটা !

“কর্তৃত্ব ! রাম ! রাম !—শুকদেব, শঙ্করাচার্য্য এঁরা বিদ্যার আমি রেখেছিলেন । দয়া মানুষের নয়, দয়া ঈশ্বরের । বিদ্যার আমার ভিতরেই দয়া, বিচার আমি তিনিই হয়েছেন ।

[অতি গুহ্য কথা । কালীব্রহ্ম । আত্মশক্তির এলাকা । কলি অবতার ।]

“কিন্তু হাজার বাজী ছাখো, তবু তাঁর underএ (অধীন) । পালাবার জো নাই । তুমি স্বাধীন নও । তিনি যেমন করান, তেমনি করতে হবে । সেই আত্মশক্তি ব্রহ্মজ্ঞান দিলে তবে ব্রহ্ম জ্ঞান হয়—তবে বাজীর খেলা দেখা যায় । নচেৎ নয় ।

“যতক্ষণ একটু আমি থাকে, ততক্ষণ সেই আত্মশক্তির এলাকা । তাঁর অগুরে (under)—তাঁকে ছাড়িয়ে যাবার যো নাই !

“আত্মশক্তির সাহায্যে অবতারলীলা । তাঁর শক্তিতে অবতার । অবতার তবে কায করেন । সমস্তই মার শক্তি ।

“কালীবাড়ীর আগেকার খাজাঞ্চি কেউ কিছু বেশী রকম চাইলে, বলতো “তু তিন দিন পরে এসো ।” মালিককে জিজ্ঞাসা করবে ।

“কলির শেষে কলি অবতার হবে । ব্রাহ্মণের ছেলে—সে কিছু জানে না—হঠাৎ ঘোড়া আর তরবার আসবে—”

[৩ কেশব সেনের মাতা ও ভগিনী । ধাত্রী ভুবনমোহিনী ।]

অধর আরতি দেখিয়া আসিয়া বসিলেন । ধাত্রী ভুবনমোহিনী মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন । ঠাকুর সকলের জিনিষ খাইতে পারেন না—বিশেষতঃ ডাক্তার, কবিরাজের, ধাত্রীর । অনেক যন্ত্রণা দেখেও তাঁহারা টাকা লন, এই জন্ত খাইতে পারেন না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (অধর প্রভৃতি ভক্তের প্রতি) । ভুবন এসেছিল । পঁচিশটা বোম্বাই আম আর সন্দেশ রসগোল্লা এনেছিল । আমায় বল্লে, আপনি একটা আঁব খাবে ? আমি বললাম—আমার পেট ভার । আর সত্যই দেখ না, একটু কচুরি সন্দেশ খেয়েই পেট কি রকম হয়ে গেছে ।

“কেশব সেনের মা বোন্ এরা এসেছিল । তাই আবার খানিকটা নাচলাম । কি করি !—ভারি শোক পেয়েছে ।”

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত । [1884, 3rd July.

চতুর্থভাগ—পঞ্চদশ অঙ্ক ।

বলরামমন্দিরে রথের পুনর্ঘাতায় ভক্তসঙ্গে ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের বৈঠকখানায় ভক্তের মজলিস করিয়া বসিয়া আছেন । আনন্দময় মূর্তি !—ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন ।

আজ পুনর্ঘাতা বৃহস্পতিবার । আষাঢ় শুক্লা দশমী । শ্রীযুক্ত বলরামের বাটীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথের সেবা আছে, একখানি ছোট রথও আছে । তাই তিনি ঠাকুরকে, পুনর্ঘাতা উপলক্ষে, নিমন্ত্রণ করিয়াছেন । এই ছোট রথখানি বারবাটীর দোতলার চকমিলান বারান্দায় টানা হইবে ।

গত ২৫শে জুন বুধবারে শ্রীশ্রীরথযাত্রার দিন, ঠাকুর শ্রীযুক্ত ঈশান মুখোপাধ্যায়ের ঠন্ঠনিয়ার বাটীতে আসিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন * । সেই দিনই বৈকালে কলেজ ষ্ট্রীটে ভূধরের বাটীতে পণ্ডিত শশধরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয় । তিন দিন হইল, গত সোমবারে শশধর তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে দ্বিতীয় বার দর্শন করিতে গিয়াছিলেন † ।

ঠাকুরের আদেশে বলরাম শশধরকে আজ নিমন্ত্রণ করিয়াছেন । পণ্ডিত হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করিয়া লোকশিক্ষা দিতেছেন । তাই কি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ভিতর শক্তিসঞ্চার করিবার জন্য এত উৎসুক হইয়াছেন ?

ঠাকুর ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন । কাছে রাম, মাষ্টার, বলরাম, মনোমোহন, কয়েকটি ছোকরা ভক্ত, বলরামের পিতা প্রভৃতি বসিয়া আছেন । বলরামের পিতা অতি নির্ভাবান্ বৈষ্ণব । তিনি প্রায় শ্রীবৃন্দাবনধামে তাঁহাদেরই প্রতিষ্ঠিত কুঞ্জে একাকী বাস করেন ও

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—প্রথম ভাগ ।

† শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—তৃতীয় ভাগ ।

শ্রী শ্রী.রাগকৃষ্ণ কথামৃত ।



শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ।



শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ।

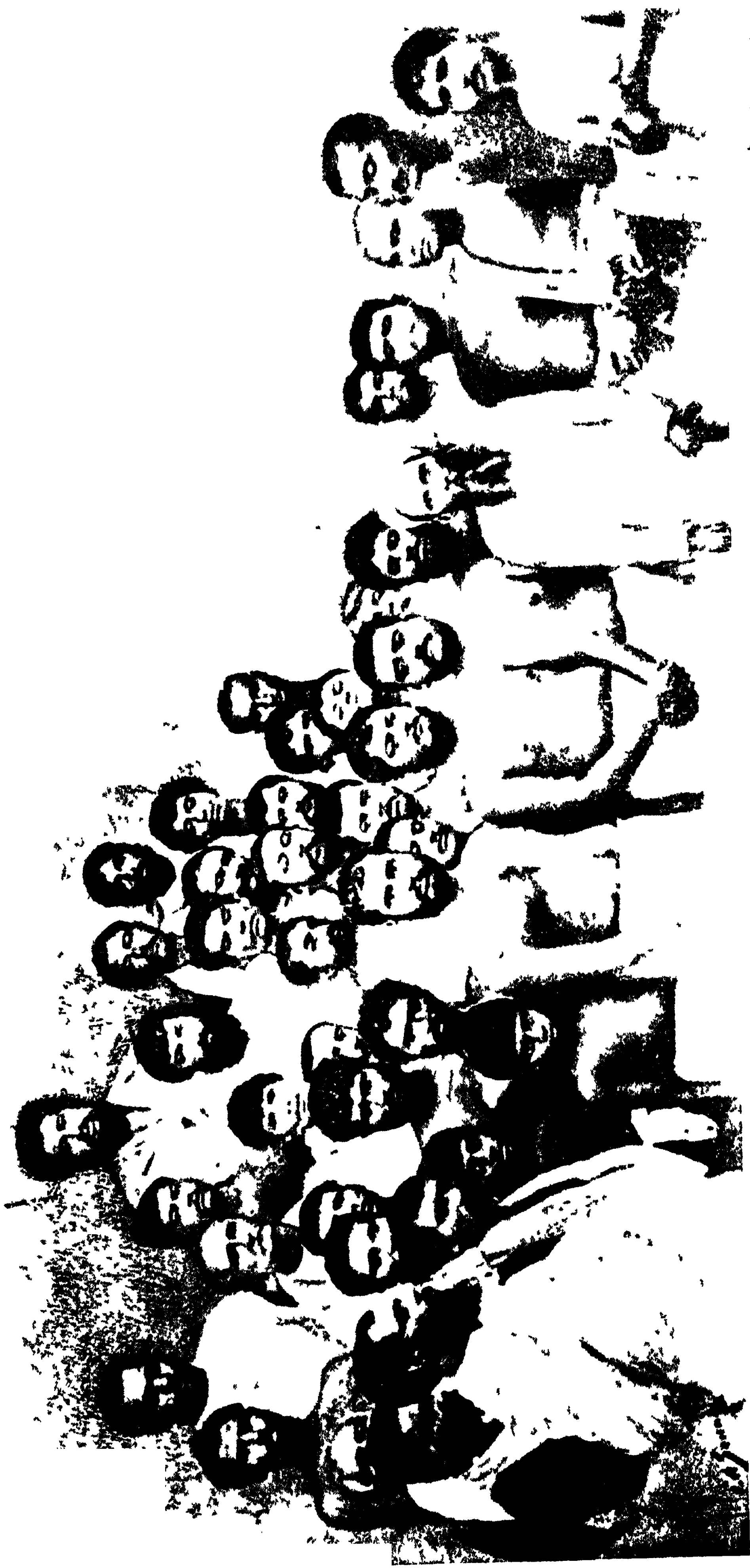


শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ।



ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার ।

অনেকগুলি ভক্তাদেব চেহাৰা,—(ঠাকুৰেৰ সময়ে, ১৮৮২-১৮৮৫)



শিৱীন্দ্র, মহিমাচরণ, গঙ্গাধৰ, হৰিশ, বৃন্দাগোপাল শৰ্মা। বিনোদ নাথ্যৰ বাণী, নৱলোপাল ভট্টাচাৰ্য্য, মণ্ডলক দ'ক'ব স্তাৰ্দ্ধ ততুল, ত'ব ছুটগাপাল বৈদ্য, বাবুবান, নিবন্ধন ৯৪৭ অমৃত পত্ৰ ভবনাথ নৱম্বৰাম বল্লভান্ন নাথ্যান কুণ্ডাল দি' নন্দ পট্ট'ক।

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর বিগ্রহের সেবার তত্ত্বাবধান করেন । শ্রীসুন্দাবনে তিনি সমস্ত দিন ঠাকুরের সেবা লইয়া থাকেন । কখনও শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি ভক্তিগ্রন্থ পড়েন । কখনও কখনও ভক্তিগ্রন্থ লইয়া তাহার প্রতিলিপি করেন । কখনও বসিয়া বসিয়া নিজে ফুলের মালা গাঁথেন । কখনও বৈষ্ণবদের নিমন্ত্রণ করিয়া সেবা করেন । ঠাকুরকে দর্শন করাইবার জন্য, বলরাম তাঁহাকে পত্রের উপর পত্র লিখিয়া কলিকাতায় আনাইয়াছেন । ‘সব ধর্ম্মেই সাম্প্রদায়িক ভাব ; বিশেষতঃ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে ; ভিন্ন মতের লোক পরস্পর বিরোধ করে, সমন্বয় করিতে জানে না’—এই কথা ঠাকুর ভক্তদের বলিতেছেন ।

[বলরামের পিতার প্রতি সর্বিধর্ম্মসমন্বয় উপদেশ । ভক্তমাল ; শ্রীভাগবত । পূর্বকথা—মথুরের কাছে বৈষ্ণবচরণের গোঁড়ামী ও শাক্তদের নিন্দা ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বলরামের পিতা প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি) । বৈষ্ণবদের একটি গ্রন্থ ভক্তমাল । বেশ বই,—ভক্তদের সব কথা আছে । তবে এক-ঘেয়ে । এক জায়গায় ভগবতীকে বিষ্ণুমন্ত্র লইয়ে তবে ছেড়েছে !

‘আমি বৈষ্ণবচরণের অনেক সুখ্যাতি করে সেজো বাবুর কাছে আনা-লুম । সেজো বাবু খুব যত্ন খাতির করলে । রূপার বাসন বা’র করে জল খাওয়ান পর্য্যন্ত । তার পর সেজো বাবুর সামনে বলে কি—‘আমাদের কেশবমন্ত্র না নিলে কিছুই হ’বে না !’ সেজো বাবু শাক্ত, ভগবতীর উপাসক । মুখ রাঙা হ’য়ে উঠলো । আমি আবার বৈষ্ণবচরণের গা টিপি !

‘শ্রীমদ্ভাগবত—তাতেও নাকি ঐরকম কথা আছে, ‘কেশবমন্ত্র না নিয়ে ভবসাগর পার হওয়াও যা, আর কুকুরের ল্যাজ ধ’রে মহাসমুদ্র পার হওয়াও তা !’ সব মতের লোকেরা আপনার মত-টাই বড় ক’রে গেছে !

‘শাক্তেরাও বৈষ্ণবদের খাটো করবার চেষ্টা করে । শ্রীকৃষ্ণ ভব-নদীর কাণ্ডারী, পার ক’রে দেন,—শাক্তেরা বলে, ‘তাঁতো বটেই, মা রাজরাজেশ্বরী—তিনি কি আপনি এসে পার ক’রবেন ?—ঐ কৃষ্ণকে রেখে দিয়েছেন পার করবার জন্য’ (সকলের হাস্য) ।

[পূর্ববকথা—ঠাকুরের জন্মভূমি দর্শন * ১৮৮০—ফুলুই শ্যামবাজারের
তাঁতী বৈষ্ণবদের অহঙ্কার । সমন্বয় উপদেশ ।]

“নিজের নিজের মত ল'য়ে আবার অহঙ্কার কত ! ও দেশে, শ্যাম-
বাজার এই সব জায়গায়, তাঁতীরা আছে । অনেকে বৈষ্ণব, তাদের লম্বা
লম্বা কথা । বলে, ‘ইনি কোন্ বিষ্ণু মানেন ? পাতা বিষ্ণু ! (অর্থাৎ যিনি
পালন করেন ।)—ও আমরা ছুঁই না ! কোন্ শিব ?—আমরা আত্মারাম
শিব, আত্মারামেশ্বর শিব, মানি । কেউ বলছে, ‘তোমরা বুঝিয়ে দেও না,
কোন্ হরি মান ।’ তাতে কেউ বলছে—‘না, আমরা আর কেন, ঐখান
থেকেই হোক ।’ এ দিকে তাঁত বোনে আবার এই সব লম্বা লম্বা কথা !

[লালাবাবুর রাণী কাত্যায়নীর মো-সাহেব রতির মার গোঁড়ামী ।]

“রতির মা রাণী কাত্যায়নীর মো-সাহেব ;—বৈষ্ণবচরণের দলের
লোক, গোঁড়া বৈষ্ণবী । এখানে খুব আসা যাওয়া ক'রতো । ভক্তি ছাথে
কে ! যাই আমায় দেখলে মা কালীর প্রসাদ খেতে, অমনি পালালো !

“যে সমস্ত ক'রেছে, সেই-ই লোক । অনেকেই
একঘেয়ে । আমি কিন্তু দেখি—সব এক । শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত, মত সবই
সেই এককে ল'য়ে । যিনিই নিরাকার, তিনিই সাকার, তাঁরই নানা রূপ ।

‘নিগুণ মেরা বাপ, সগুণ মাহতারি,

কারে নিন্দো কারে বন্দো, দোনো পাল্লা ভারী ।’

“বেদে যাঁর কথা আছে, তন্নে তাঁরই কথা, পুরাণেও তাঁরই কথা ।
সেই এক সচ্চিদানন্দের কথা । যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা ।

“বেদে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দঃ ব্রহ্ম । তন্নে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দঃ
শিবঃ—শিবঃ কেবলঃ,—কেবলঃ শিবঃ । পুরাণে বলেছে, ওঁ সচ্চিদা-
নন্দঃ কৃষ্ণঃ । সেই এক সচ্চিদানন্দের কথাই বেদ পুরাণ তন্নে আছে ।
আর বৈষ্ণবশাস্ত্রেও আছে,—কৃষ্ণই কালী হয়েছিলেন ।

* শ্রীরামকৃষ্ণ শেষবার জন্মভূমি দর্শন-সময়ে ১৮৮০ খৃঃ ফুলুই শ্যামবাজারে
হৃদয়ের সঙ্গে শুভাগমন করিয়া নটবর গোস্বামী, ঈশানমল্লিক প্রভৃতি ভক্ত-
গণের সহিত সঙ্কীৰ্ত্তন করেন ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমহংস অবস্থা । বালকবৎ—উন্মাদবৎ ।]

ঠাকুর বারান্দার দিকে একটু গিয়া আবার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন । বাহিরে যাইবার সময় শ্রীযুক্ত বিশ্বস্তরের কণ্ঠা তাঁহাকে নমস্কার করিয়াছিল, তাহার বয়স ৬৭ বৎসর হইবে । ঠাকুর ঘরে ফিরিয়া আসিলে পর মেয়েটী তাঁহার সহিত কথা কহিতেছে । তাহার সঙ্গে আরও দু একটী সমবয়স্ক ছেলে মেয়ে আছে ।

বিশ্বস্তরের কণ্ঠা (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—আমি তোমায় নমস্কার কর্ণুম, দেখলে না ! শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্ত্রে)—কই, দেখি নাই ।

কণ্ঠা । তবে দাঁড়াও, আবার নমস্কার করি ;—দাঁড়াও এ পা'টা করি ! ঠাকুর হাসিতে হাসিতে উপবেশন করিলেন ও ভূমি পর্য্যন্ত মস্তক নত করিয়া কুমারীকে প্রতি-নমস্কার করিলেন । ঠাকুর মেয়েটীকে গান গাহিতে বলিলেন । মেয়েটি বলিল—‘মাইরি, গান জানি না !’

তাঁহাকে আবার অনুরোধ করাতে, বলিতেছে, ‘মাইরি বল্লে আর বলা হয় ?’ ঠাকুর তাহাদের লইয়া আনন্দ করিতেছেন ও গান শুনাইতেছেন । প্রথমে কেলুয়ার গান, তার পর, ‘আয়লো তোর খোঁপা বেঁধে দি, তোর ভাতার এলে বল্বে কি !’

ছেলেরা ও ভক্তেরা গান শুনিয়া হাসিতেছেন ।

[পূর্বকথা—জন্মভূমি দর্শন * ১৮৬৯-৭০ । বালক শিবরামের চরিত্র । সিহোড়ে হৃদয়ের বাড়ী দুর্গাপূজা । ঠাকুরের উন্মাদকালে লিঙ্গপূজা ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) । পরমহংসের স্বভাব ঠিক পাঁচ বছরের বালকের মত । সব চৈতন্যময় দেখে ।

“যখন আমি ও দেশে (কামারপুকুরে), রামলালের ভাই (শিবরাম) তখন ৪৫ বছর বয়স,—পুকুরের ধারে ফড়িঙ্ ধরতে যাচ্ছে । পাতা নড়্ছে, আর পাতার শব্দ পাছে হয়, তাই পাতাকে বল্ছে, ‘চোপ্ !’

* শ্রীযুক্ত শিবরামের জন্ম—১৮ই চৈত্র ১২৭২, ৬দোলপূর্ণিমার দিনে, ৩০ মার্চ ১৮৬৬ খৃঃ । ঠাকুরের এবার জন্মভূমি দর্শনের সময় তিন চার বছর বয়স অর্থাৎ ১৮৬৯-৭০ খৃঃ ।

আমি ফড়িঙ্ ধরবো !’ ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে, আমার সঙ্গে সে ঘরের ভিতরে আছে ; বিদ্যুৎ চম্কাচ্ছে,—তবুও দ্বার খুলে খুলে বাহিরে যেতে চায় । বকার পর আর বাহিরে গেল না, উঁকি মেরে মেরে এক একবার দেখছে, বিদ্যুৎ,—আর বলছে. ‘খুড়ো ! আবার চক্‌মকি ঠুকছে !’

“পরমহংস বালকের ন্যায়,—আত্মপর নাই, ঐহিক সম্বন্ধের আঁট নাই । রামলালের ভাই এক দিন বলছে, ‘তুমি খুড়ো, না পিসে ।’

“পরমহংসের, বালকের ন্যায় গতিবিধির হিসাব নাই । সব ব্রহ্মময় দেখে,—কোথায় যাচ্ছে,—কোথায় চলছে,—হিসাব নাই । রামলালের ভাই হৃদের বাড়ী দুর্গাপূজা দেখতে গি’ছিল । হৃদের বাড়ী থেকে ছটকে আপনা আপনি কোন্ দিকে চলে গেছে ! চাঁর বছরের ছেলে দেখে পথের লোক জিজ্ঞাসা করেছে, তুই কোথা থেকে এলি ? তা কিছু বলতে পারে না । কেবল বল্লে—‘চালা’ (অর্থাৎ যে আটচালায় পূজা হয়েছে) । যখন জিজ্ঞাসা করলে, ‘কার বাড়ী থেকে এসেছিস্ ?’ তখন কেবল বলে—‘দাদা’ ।

“পরমহংসের আবার উন্মাদের অবস্থা হয় । যখন উন্মাদ হল, শিবলিঙ্গ বোধে নিজের লিঙ্গ পূজা কর্তাম । জীবন্তলিঙ্গপূজা । একটা আবার মুক্তা পরানো হতো ! এখন আর পারি না ।

[প্রতিষ্ঠার পর (প্রতিষ্ঠা ১৮৫৫) পূর্ণজ্ঞানী পাগলের সঙ্গে দেখা !]

“দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে একজন পাগল এসেছিল,—পূর্ণ-জ্ঞানী । ছেঁড়া জুতা, হাতে কঞ্চি—এক হাতে একটা ভাঁড়, আবচারা ; গঙ্গায় ডুব দিয়ে উঠে,কোন সন্ধ্যা আশিক নাই, কোছড়ে কি ছিল তাই খেলে । তার পর কালীঘরে গিয়ে স্তব করতে লাগল । মন্দির কেঁপে গিয়েছিল ! হলধারী তখন কালীঘরে ছিল । অতিথশালায় এরা তাকে ভাত দেয় নাই—তাতে ভ্রঞ্জেপ নাই । পাত কুড়িয়ে খেতে লাগলো—যেখানে কুকুরগুলো খাচ্ছে । মাঝে মাঝে কুকুরগুলিকে সরিয়ে নিজে খেতে লাগলো,—তা কুকুরগুলো কিছু বলে নাই । হলধারী পেছু পেছু গিয়েছিল, আর, জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘তুমি কে ? তুমি কি পূর্ণজ্ঞানী ?’ তখন সে বলেছিল, ‘আমি পূর্ণজ্ঞানী ! চুপ !’

“আমি হলধারীর কাছে যখন এ সব কথা শুন্লাম, আমার বুক গুর্-
গুর্ করতে লাগলো, আর হৃদেকে জড়িয়ে ধরলুম । মাকে বললাম, ‘মা,
তবে আমারও কি এই অবস্থা হবে !’ আমরা দেখতে গেলাম—আমাদের
কাছে খুব জ্ঞানের কথা—অন্য লোক এলে পাগলামি । যখন চলে গেল,
হলধারী অনেকখানি সঙ্গে গিয়েছিল ফটক পার হলে হলধারীকে বলে-
ছিল, ‘তোকে আর কি বলবো ! এই ডোবার জল আর গঙ্গাজলে যখন
কোন ভেদবুদ্ধি থাকবে না, তখন জান্বি পূর্ণ জ্ঞান হয়েছে ।’ তার পর
বেশ হন্ হন্ করে চলে গেল ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

[পাণ্ডিত্য অপেক্ষা তপস্যার প্রয়োজন । সাধ্যসাধনা ।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন । ভক্তেরাও
কাছে বসিয়া আছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । শশধরকে তোমার কেমন বোধ হয় ?

মাষ্টার—আজ্ঞা, বেশ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—খুব বুদ্ধিমান, না ?

মাষ্টার । আজ্ঞা, পাণ্ডিত্য বেশ আছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । গীতার মত—যাকে অনেকে গণে, মানে, তার ভিতর
ঈশ্বরের শক্তি আছে । তবে ওর একটু কাজ বাকি আছে ।

“শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে, কিছু তপস্যার দরকার,—
কিছু সাধ্য সাধনার দরকার ।

[পূর্বকথা—গৌরী পণ্ডিত ও নারায়ণ শাস্ত্রীর সাধনা । বেলঘরের বাগানে
কেশবের সহিত সাক্ষাৎ ১৮৭৫ । কাপ্তেনের আগমন ১৮৭৫-৭৬ ।]

“গৌরী পণ্ডিত সাধন করেছিল । যখন স্তব কর্তো, ‘হা রে রে
নিরালম্ব লম্বোদর !’—তখন পণ্ডিতেরা কেঁচো হয়ে যেত ।

“নারায়ণ শাস্ত্রীও শুধু পণ্ডিত নয়, সাধ্য সাধনা করেছিল ।

“নারায়ণ শাস্ত্রী পঁচিশ বৎসর একটানে পড়েছিল । সাত বৎসর
ন্যায় পড়েছিল,—তবুও ‘হর, হর’ বলতে বলতে ভাব হত । জয়পুরের
রাজা সভাপণ্ডিত করতে চেয়েছিল । তা সে কাজ স্বীকার করলে না

দক্ষিণেশ্বরে প্রায় এসে থাকত । বশিষ্ঠাশ্রমে যাবার ভারি ইচ্ছা,— সেখানে তপস্শা করবে । যাবার কথা আমাকে প্রায় বলত । আমি তাকে সেখানে যেতে বারণ করলাম ।—তখন বলে ‘কোন্ দিন মরে যাব, সাধন কবে করব—ডুব্ কি কব্ ফাট্ যায়গা !’ অনেক জেদাজেদির পর আমি যেতে বললাম ।

“শুন্তে পাই, কেউ কেউ বলে, নারায়ণ শাস্ত্রী নাকি শরীর ত্যাগ করেছে, তপস্শা করবার সময় ভৈরবে নাকি চড়্ মেরেছিল । আবার কেউ কেউ বলে, ‘বেঁচে আছে,—এই আমরা তাকে রেল তুলে দিয়ে এলাম ।’

“কেশব সেনকে দেখবার আগে নারা’ণ শাস্ত্রীকে বল্লুম, তুমি একবার যাও, দেখে এস কেমন লোক । সে দেখে এসে বল্লো, লোকটা জপে সিদ্ধ । সে জ্যোতিষ জানতো—বল্লো, ‘কেশব সেনের ভাগ্য ভাল । আমি সংস্কৃতে, সে ভাষায় (বাঙ্গালায়) কথা কইল ।’

“তখন আমি হৃদেকে সঙ্গ করি বেলঘরের বাগানে গিয়ে দেখলাম । দেখেই বলেছিলাম, ‘এ’রই ন্যাজ খসেছে,—ইনি জলেও থাকতে পারেন, ড্যাঙ্গাতেও থাকতে পারেন ।’

“আমাকে পরোখ্ করবার জন্য তিন জন ব্রহ্মজ্ঞানী ঠাকুরবাড়ীতে পাঠিয়েছিল । তার ভিতর প্রসন্নও ছিল । রাত দিন আমায় দেখ্বে, দেখে কেশবের কাছে খবর দিবে । আমার ঘরের ভিতর রাত্রে ছিল,— কেবল ‘দয়াময়, দয়াময়’ করতে লাগল,—আর আমাকে বলে ‘তুমি কেশব বাবুকে ধর, তা হলে তোমার ভাল হবে ।’ আমি বললাম, ‘আমি সাকার মানি ।’ তবুও ‘দয়াময়’ ‘দয়াময়’ করে ! তখন আমার একটা অবস্থা হল । হয়ে বললাম, ‘এখান থেকে যা !’ ঘরের মধ্যে কোন মতে থাকতে দিলাম না ! তারা বারাণ্ডায় গিয়ে শুয়ে রইল ।

“কাপ্তেনও যে দিন আমায় প্রথম দেখ্লে, সেদিন রাত্রে রয়ে গেল ।

[মাইকেল মধুসূদন * । নারা’ণ শাস্ত্রীর সহিত কথা ।]

“নারায়ণ শাস্ত্রী যখন ছিল, মাইকেল এসেছিল । মথুর বাবুর বড়

* শ্রীমধুসূদন কবি—জন্ম সাগরদাঁড়ী ১৮২৪ ; ইংলণ্ডে অবস্থিতি : ১৮৬২-৬৭ ; দেহত্যাগ, ১৮৭৩ । ঠাকুরকে দর্শন ১৮৬৮র পরে হইবে ।

কলিকাতা—বলরামমন্দিরে । পুনর্বাত্রাদিবসে ভক্তসঙ্গে । ১২৫

ছেলে দ্বারা বাবু সঙ্গে করে এনেছিল । ম্যাগাজিনের সাহেবদের সঙ্গে মোকদ্দমা হবার যোগাড় হয়েছিল । তাই মাইকেলকে এনে বাবুরা পরামর্শ করছিল ।

“দপ্তরখানার সঙ্গে বড়ঘর । সেইখানে মাইকেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল । আমি নারায়ণ শাস্ত্রীকে কথা কইতে বললাম । সংস্কৃতে কথা ভাল বলতে পারলে না । ভুল হতে লাগল । তখন ভাষায় কথা হল ।

“নারায়ণ শাস্ত্রী বলে, ‘তুমি নিজের ধর্ম কেন ছাড়লে ।’ মাইকেল পেট দেখিয়ে বলে, ‘পেটের জন্ম—ছাড়তে হয়েছে !’

“নারায়ণ শাস্ত্রী বলে, ‘যে পেটের জন্ম ধর্ম ছাড়ে, তার সঙ্গে কথা কি কইব !’ তখন মাইকেল আমায় বলে, ‘আপনি কিছু বলুন ।’

“আমি বললাম, ‘কে জানে কেন আমার কিছু বলতে ইচ্ছা কচ্ছে না । আমার মুখ কে যেন চেপে ধরছে !’

[কামিনীকাঞ্চন পণ্ডিতকেও হীনবুদ্ধি করে । বিষয়ীর পূজাদি ।]

চৌধুরী বাবুর ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিবার কথা ছিল ।

মনোমোহন । চৌধুরী আসবেন না । তিনি বলেন, ফরিদপুরের সেই বাঙ্গাল (শশধর) আসবে,—তবে যাব না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কি হীনবুদ্ধি !—বিচার অহঙ্কার, তার উপর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বিবাহ করেছে,—‘ধরাকে সরা মনে করেছে !’

চৌধুরী এম্, এ, পাশ করিয়াছেন । প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর খুব বৈরাগ্য হইয়াছিল । ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে প্রায় যাইতেন । আবার তিনি বিবাহ করিয়াছেন । তিন চার শত টাকা মাহিয়ানা পান ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) । এই কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি মানুষকে হীনবুদ্ধি করেছে । হরমোহন যখন প্রথমে গেল, তখন বেশ লক্ষণ ছিল । দেখবার জন্ম আমি ব্যাকুল হতাম । তখন বয়স ১৭।১৮ হবে । প্রায় ডেকে ডেকে পাঠাই, আর যায় না । এখন মাগকে এনে আলাদা বাসা করেছে ! আমার বাড়ীতে ছিল, বেশ ছিল । সংসারের কোন ঝগড়া ছিল না । এখন আলাদা বাসা করে পরিবারের রোজ বাজার করে (সকলের হাণ্ড) ; সেদিন ওখানে গিয়েছিল । আমি বললাম,

‘যা ! এখান থেকে চলে যা !—তাকে ছুঁতে আমার গা কেমন কচ্ছে !’

কর্ত্তাভজা চন্দ্র (চাটুয্যো) আসিয়াছেন । বয়ঃক্রম ষাট পঁয়ষট্টি । মুখে কেবল কর্ত্তাভজাদের শ্লোক । ঠাকুরের পদসেবা করিতে যাই-তেছেন । ঠাকুর পা স্পর্শ করিতে দিলেন না । হাসিয়া বলিলেন, ‘এখন তো বেশ হিসাবি কথা বলছে !’ ভক্তেরা হাসিতে লাগিলেন ।

এইবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের অন্তঃপুরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে যাইতেছেন । অন্তঃপুরে স্ত্রীলোক ভক্তেরা তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া আছেন ।

ঠাকুর আবার বৈঠকখানায় আসিয়াছেন । সহাস্ত্রবদন । বলিলেন, ‘আমি পায়খানার কাপড় ছেড়ে জগন্নাথকে দর্শন করলাম । আর একটু ফুল টুল দিলাম ।’

“বিষয়ীদের পূজা, জপ, তপ, যখনকার তখন । যারা ভগবান বই জানে না, তারা নিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর নাম করে । কেউ মনে মনে সর্বদাই ‘রাম, ওঁ রাম,’ জপ করে । জ্ঞানপথের লোকেরাও ‘সোহঁং’ জপ করে । কারও কারও সর্বদাই জিহ্বা নড়ে ।

“সর্বদাই স্মরণ মনন থাকা উচিত ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

[বলরামের বাড়ী, শশধর প্রভৃতি ভক্তগণ । ঠাকুরের সমাধি ।]

শ্রীযুক্ত শশধর দু একটা বন্ধুসঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্ত্র) বলিতেছেন,—আমরা সকলে বাসরশয্যা জেগে আছি—কখন বর আসবে । পণ্ডিত হাসিতেছেন । ভক্তের মজলিস্ । বলরামের পিতাঠাকুর উপস্থিত আছেন । ডাক্তার প্রতাপও আসিয়াছেন । ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শশধরের প্রতি) । জ্ঞানের চিহ্ন, প্রথম, শান্ত স্বভাব ; দ্বিতীয়, অভিমানশূন্য স্বভাব । তোমার দুই লক্ষণই আছে ।

কলিকাতা—বলরামমন্দিরে পুনর্ঘাট্রাদিবসে ভক্তসঙ্গে । ১২৭

“জ্ঞানীর আর কতকগুলি লক্ষণ আছে । সাধুর কাছে ত্যাগী, কর্মস্থলে—যেমন লেকচার দিবার সময়—সিংহতুল্য, স্ত্রীর কাছে রসরাজ, রসপণ্ডিত । (পণ্ডিত ও অন্যান্য সকলের হাস্য) ।

“বিজ্ঞানীর স্বভাব আলাদা । যেমন চৈতন্যদেবের অবস্থা । বালকবৎ, উন্মাদবৎ, জড়বৎ ; পিশাচবৎ ।

“বালকের অবস্থার ভিতর আবার, বাল্য, পৌগণ্ড, যৌবন ! পৌগণ্ড অবস্থায় ফছকিমি । উপদেশ দিবার সময় যুবাব ন্যায় ।

পণ্ডিত । কিরূপ ভক্তি দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় ?

[শশধর ও ভক্তিতত্ত্ব-কথা । জ্বলন্ত বিশ্বাস চাই । বৈষ্ণবদের দীনভাব !]

শ্রীরামকৃষ্ণ । প্রকৃতি অনুসারে ভক্তি তিন রকম । ভক্তির সত্ত্ব, ভক্তির রজঃ, ভক্তির তমঃ ।

“ভক্তির সত্ত্ব—ঈশ্বরই টের পান । সেরূপ ভক্ত গোপন ভাল বাসে,—হয় ত মশারির ভিতর ধ্যান করে, কেউ টের পায় না । সত্ত্বের সত্ত্ব—বিশুদ্ধ সত্ত্ব—হলে ঈশ্বর দর্শনের আর দেবী নাই ;—যেমন অরুণোদয় হ’লে বুঝা যায় যে, সূর্যোদয়ের আর দেবী নাই ।

“ভক্তির রজঃ যাদের হয়, তাদের একটু ইচ্ছা হয়—লোকে দেখুক, আমি ভক্ত । সে ষোড়শোপচার দিয়ে পূজা করে, গরদ পরে ঠাকুরঘরে যায়,—গলায় রুদ্রাক্ষের মালা,—মালায় মুক্তা,—মাঝে মাঝে একটা সোণার রুদ্রাক্ষ ।

“ভক্তির তমঃ—যেমন ডাকাতপড়া ভক্তি । ডাকাত টেঁকি নিয়ে ডাকাতি করে, আটটা দারোগার ভয় নাই,—মুখে—‘মারো ! লোটো !’ উন্মাদের ন্যায় বলে—‘হর, হর, হর, বোম, বোম ! জয় কালী !’ মনে খুব জোর, ~~জ্বলন্ত~~ বিশ্বাস ।

“শাক্তদের ঐরূপ বিশ্বাস ।—কি, একবার কালীনাম দুর্গানাম করেছি—একবার রামনাম করেছি, ~~আমার~~ ~~আবার~~ পাপ ।

“বৈষ্ণবদের বড় দীন হীন ভাব । যারা কেবল মালা জপে, (বলরামের পিতাকে লক্ষ্য করিয়া) কেঁদে কোকিয়ে বলে, ‘হে কৃষ্ণ ! দয়া কর,—আমি অধম, আমি পাপী !’

“এমন জ্বলন্ত বিশ্বাস চাই যে, তাঁর নাম করেছি আমার আবার
পাপ !—রাত দিন হরিনাম করে, আবার বলে আমার পাপ !

কথা কহিতে কহিতে ঠাকুর প্রেমে উন্মত্ত হইয়া গান গাইতেছেন ।
গান শুনিয়া শশধর কাঁদিতেছেন ।

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি ।

আথেরে এ দীনে, না তার কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী ॥

নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ব্রহ্ম, সুরাপানাদি বিনাশি নারী ।

এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক, (ও মা) ব্রহ্মপদ নিতে পারি ॥

গান—শির সন্তোষ সদা রন্তোষ আনন্দে মগনা ।

সুধা পানে ঢল ঢল কিন্তু ঢলে পড়ে না মা !

অধরের গায়ক বৈষ্ণবচরণ এইবার গান গাইতেছেন—

দুর্গানাম জপ সদা রসনা আমার, দুর্গমে শ্রীদুর্গা বিনে কে করে নিস্তার ॥

তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত্য তুমি সে পাতাল, তোমা হতে হরি ব্রহ্ম দ্বাদশ গোপাল,

দশমহাবিद्या মাতা দশ অবতার, এবার কোনরূপে আমায় করিতে হবে পার ॥

চল অচল তুমি মা তুমি সূক্ষ্ম স্থূল, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি তুমি বিশ্বমূল ।

ত্রিলোকজননী তুমি ত্রিলোকতারিণী, সকলের শক্তি তুমি (মা গো)

তোমার শক্তি তুমি ॥

এই কয় চরণ গান শুনিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন । গান সমাপ্ত
হইলে ঠাকুর নিজে গান ধরিলেন—

যশোদা নাচাত শ্যামা বলে নীলমণি, সেরূপ লুকালে কোথা করালবদনো !

বৈষ্ণবচরণ এইবার কীর্তন গাইতেছেন । স্বেবোল-মিলন । যখন গায়ক
আঁখর দিতেছেন—‘রা বৈ ধা বেরায় না, রে !’—ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন ।

শশধর প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতেছেন ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

[পুনর্ঘাড়া । ঠাকুরের রথের সম্মুখে ভক্তসঙ্গে নৃত্য ও সঙ্কীৰ্তন ।]

ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল ; গানও সমাপ্ত হইল । শশধর, প্রতাপ,
রামদয়াল, রাম, মনোমোহন, ছোকরা ভক্তেরা প্রভৃতি অনেকেই বসিয়া

কলিকাতা বলরামমন্দিরে—পুনর্থাত্রাদিবসে ভক্তসঙ্গে । ১২৯

আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে বলিতেছেন, ‘তোমরা একটা কেউ খোঁচা দেওনা’—অর্থাৎ শশধরকে কিছু জিজ্ঞাসা কর।

রামদয়াল (শশধরের প্রতি)—“ব্রহ্মের রূপকল্পনা যে শাস্ত্রে আছে, সে কল্পনা কে করেন?” পণ্ডিত—“ব্রহ্ম নিজে করেন,—মানুষের কল্পনা নয়।” প্রতাপ—“কেন রূপ কল্পনা করেন?”

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেন? তিনি কারু সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করেন না। তাঁর খুসি, তিনি ইচ্ছাময়! কেন তিনি করেন, এ খপরে আমাদের কাজ কি? বাগানে আম খেতে এসেছ, আম খাও;—কটা গাছ, ক হাজার ডাল, কত লক্ষ পাতা,—এসব হিসাবে কাজ কি? বৃথা তর্ক বিচার করলে বস্তু লাভ হয় না। প্রতাপ—“তা হ’লে আর বিচার করব না?”

শ্রীরামকৃষ্ণ—“বৃথা তর্ক বিচার করবে না। তবে সদসৎ বিচার করবে,—কোনটা নিত্য, কোনটা অনিত্য। যেমন কামক্রোধাদির বা শোকের সময়।” পণ্ডিত—“ও আলাদা। ওকে বিবেকাত্মক বিচার বলে।”

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, সদসৎ বিচার। (সকলে চুপ করিয়া আছেন।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (পণ্ডিতের প্রতি)। আগে বড় বড় লোক আস্ত।

পণ্ডিত—“কি, বড় মানুষ?” শ্রীরামকৃষ্ণ—“না, বড় বড় পণ্ডিত।”

ইতিমধ্যে ছোট রথখানি বাহিরের ছুতালার বারাণ্ডার উপর আনা হইয়াছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, সুভদ্রা ও বলরাম নানা বর্ণের কুসুম ও পুষ্পমালায় সুশোভিত হইয়াছেন এবং অলঙ্কার ও নববস্ত্র পীতাম্বর পরিধান করিয়াছেন। বলরামের সাত্ত্বিক পূজা, কোন আড়ম্বর নাই। বাহিরের লোকে জানেও না যে, বাড়ীতে রথ হইতেছে।

এইবার ঠাকুর ভক্তসঙ্গে রথের সম্মুখে আসিয়াছেন। ঐ বারাণ্ডাতেই রথ টানা হইবে। ঠাকুর রথের দড়ি ধরিয়াছেন ও কিয়ৎক্ষণ টানিলেন। পরে গান ধরিলেন—‘নদে টল মল টল মল করে, গৌরপ্রেমের হিল্লোলে।’

গান—স্বাদের হরি বলিতে নয়ন ঝরে, তারা তারা দুভাই এসেছে রে!

ঠাকুর নৃত্য করিতেছেন! ভক্তেরাও সেই সঙ্গে নাচিতেছেন ও গাইতেছেন। কীর্তনীয়া বৈষ্ণবচরণ, সম্প্রদায়ের সহিত গানে ও নৃত্যে যোগ দান করিয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে সমস্ত বারাণ্ডা পরিপূর্ণ হইল । মেয়েরাও নিকটস্থ ঘর হইতে এই প্রেমানন্দ দেখিতেছেন । বোধ হইল, যেন শ্রীবাস-মন্দিরে শ্রীগৌরান্ন ভক্তসঙ্গে হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছেন । বন্ধুবর্গসঙ্গে পণ্ডিতও রথের সম্মুখে এই নৃত্যগীত দর্শন করিতেছেন ।

এখনও সন্ধ্যা হয় নাই । ঠাকুর বৈঠকখানা ঘরে আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন ও ভক্তসঙ্গে উপবেশন করিয়াছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (পণ্ডিতের প্রতি) । এর নাম । ভক্তনানন্দ সংসারীরা বিষয়ানন্দ নিয়ে থাকে,—কামিনীকাঞ্চনের আনন্দ । ভজন করতে করতে তাঁর যখন কৃপা হয়, তখন তিনি দর্শন দেন—তখন ব্রহ্মানন্দ ।

শশধর ও ভক্তেরা অবাক হইয়া শুনিতেছেন । পণ্ডিত (বিনীতভাবে)—“আজ্ঞা, কিরূপ ব্যাকুল হ’লে মনের এই সরস অবস্থা হয় ?”

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঈশ্বরকে দর্শন করবার জন্য যখন প্রাণ আটু পাটু হয়, তখন এই ব্যাকুলতা আসে । গুরু শিষ্যকে বল্লে, এসো তোমায় দেখিয়ে দি, কিরূপ ব্যাকুল হ’লে তাঁকে পাওয়া যায় । এই বলে একটী পুকুরের কাছে নিয়ে শিষ্যকে জলে চুবিয়ে ধরলে । তুললে পর শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার প্রাণ কি রকম হচ্ছিল ? সে বল্লে, প্রাণ আটু বাটু কচ্ছিল !

পণ্ডিত । হাঁ হাঁ, তা বটে ; এবার বুঝেছি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঈশ্বরকে ভালবাসা এই সার । ভক্তিই সার । নারদ রামকে বল্লেন, তোমার পাদপদ্মে যেন সদা শুদ্ধা ভক্তি থাকে ; আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই । রামচন্দ্র বল্লেন, আর কিছু বর লও ; নারদ বল্লেন, আর কিছু চাই না,—কেবল যেন পাদপদ্মে ভক্তি থাকে ।

পণ্ডিত বিদায় লইবেন । ঠাকুর বল্লেন, এঁকে গাড়ী আনিয়া দাও ।

পণ্ডিত । আজ্ঞে না, আমরা অম্মনি চলে যাব ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । তা কি হয় !—ব্রহ্মা যাঁরে না পায় ধ্যানে—

পণ্ডিত । যাবার প্রয়োজন ছিল না, তবে সন্ধ্যাদি কর্ত্তে হবে ।

[শ্রীরামকৃষ্ণের পরমহংস-অবস্থা ও কৰ্ম্মত্যাগ । মধুর নাম কীর্ত্তন ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । মা আমার সন্ধ্যাদি কৰ্ম্ম উঠিয়ে দিয়েছেন । সন্ধ্যাদি

স্বারা দেহ মন শুদ্ধ করা । সে অবস্থা এখন আর নাই । এই বলিয়া ঠাকুর গানের ধুয়া ধরিলেন—‘শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি । তাদের দুই সতীনে পিরীত হলে তবে শ্যামা মারে পারি !’

শশধর প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন ।

রাম । আমি কাল শশধরের কাছে গিয়েছিলাম, আপনি বলেছিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কই, আমি ত বলি নাই । তা বেশ ত তুমি গিছিলে ।

রাম—‘একজন খবরের কাগজের (Indian Empire) সম্পাদক আপনার নিন্দা কর্ছিল ।’

শ্রীরামকৃষ্ণ—‘তা করলেই বা ।’

রাম । তার পর শুনুন ! আমার কথা শুনে তখন আর আমায় ছাড়ে না, আপনার কথা আরও শুনতে চায় !

প্রতাপ এখনও বসিয়া । ঠাকুর বলিতেছেন—‘সেখানে (দক্ষিণেশ্বরে) একবার যেও,—ভুবন (ধাত্রী) ভাড়া দেবে বলেছে ।

সন্ধ্যা হইল । ঠাকুর জগন্মাতার নাম করিতেছেন—রামনাম, কৃষ্ণনাম, হরিনাম করিতেছেন । ভক্তেরা নিঃশব্দে শুনিতেছেন । এত সুমিষ্ট নাম কীর্তন, যেন মধু বর্ষণ হইতেছে । আজি বলরামের বাড়ী যেন নবদ্বীপ হইয়াছে । বাহিরে নবদ্বীপ, ভিতরে হৃন্দাবন ।

আজ রাত্রেই ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করিবেন । বলরাম তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইতেছেন—জল খাওয়াইবেন । এই সুযোগে মেয়ে ভক্তেরাও তাঁহাকে আবার দর্শন করিবেন ।

এদিকে ভক্তেরা বাহিরের বৈঠকখানায় তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন । ও একসঙ্গে সংকীর্তন করিতেছেন । ঠাকুর বাহিরে আসিয়াই যোগ দিলেন । কীর্তন চলিতেছে—আমার গৌর নাচে ।

নাচে সঙ্কীর্তনে, শ্রীবাস অঙ্গনে, ভক্তগণসঙ্গে ॥

হরিবোল বলে বদনে গোরা, চায় গদাধর পানে,

গোরার অরুণ নয়নে, বহিছে সঘনে, প্রেমধারা হেম অঙ্গে ॥

ঠাকুর আঁখর দিতেছেন—নাচে সঙ্কীর্তনে (শচীর দুলাল নাচে রে) ।

(আমার গোরা নাচে রে) (প্রাণের গোরা নাচে রে)

শ্রীকথামৃত, চতুর্থভাগ, পঞ্চদশখণ্ডে পুনর্যাত্রাকথা সমাপ্ত ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত । [1884, 3rd August.

চতুর্থ ভাগ—ষোড়শ খণ্ড ।

দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে মাষ্টার, রাখাল, লাটু, বলরাম, অধর,
শিবপুরভক্তগণ প্রভৃতি সঙ্গে ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[শিবপুরভক্তসঙ্গে যোগতত্ত্ব কথা । কুণ্ডলিনী ও ষড়্চক্রভেদ ।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে মধ্যাহ্ন-সেবার পর ভক্তসঙ্গে
বসিয়া আছেন । বেলা দুইটা হইবে । রবিবার, ২০ শে শ্রাবণ ।

শিবপুর হইতে বাউলের দল ও ভবানীপুর হইতে ভক্তেরা আসিয়া-
ছেন । শ্রীযুক্ত রাখাল, লাটু, হরীশ, আজকাল সর্বদাই থাকেন । ঘরে
বলরাম, মাষ্টারও আছেন ।

আজ ৩রা আগষ্ট, ১৮৮৪ ; শ্রাবণ শুক্লাদ্বাদশী ; আজ বুলনযাত্রার
দ্বিতীয় দিন । গত কল্যা ঠাকুর সুরেন্দ্রের বাড়ীতে গিয়াছিলেন,—
সেখানে শশধর প্রভৃতি ভক্তেরা তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন ।

ঠাকুর শিবপুরের ভক্তদের সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) । কামিনীকাঞ্চনে মন থাকলে মোগা
হয় না । সাধারণ জীবের মন লিঙ্গ, গুহ ও নাভিতে । সাধ্য-সাধনার পর
কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হন । ঈড়া, পিঙ্গলা আর সুষুম্না নাড়ী ;—সুষুম্নার
মধ্যে ছ'টি পদম আছে । সর্ব নীচে মূলাধার । তার পর স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর,
অনাহত, বিশুদ্ধ ও আত্মা । এইগুলিকে ষড়্চক্র বলে ।

“কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হ'লে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর এই সব পদম
ক্রমে পার হয়ে হৃদয়মধ্যে অনাহত পদম—সেইখানে এসে অবস্থান করে ।
তখন লিঙ্গ গুহ নাভি থেকে মন সরে গিয়ে, চৈতন্য হয় আর জ্যোতিঃ
দর্শন হয় । সাধক অবাক হ'য়ে জ্যোতিঃ চাখে আর বলে ‘একি !’ ‘একি !’

“ষড়্চক্র ভেদ হলে কুণ্ডলিনী সহস্রার পদমে গিয়ে মিলিত
হন । কুণ্ডলিনী সেখানে গেলে সমাধি হয় ।

দক্ষিণেশ্বর । রাখাল প্রভৃতি ও শিবপুরের ভক্তগণসঙ্গে । ১৩৩

“বেদ মতে এ সব চক্রকে—‘ভূমি’ বলে । সপ্ত ভূমি । হৃদয়—চতুর্থ ভূমি । অনাহতপদ্য দ্বাদশদল ।

“বিশুদ্ধ চক্র পঞ্চম ভূমি । এখানে মন উঠলে কেবল ঈশ্বরকথা বলতে আর শুন্তে প্রাণ ব্যাকুল হয় । এ চক্রের স্থান কণ্ঠ । ষোড়শদল পদ্য । যার এই চক্রে মন এসেছে, তার সামনে বিষয়কথা—কামিনী কাঞ্চনের কথা—হ’লে ভারি কষ্ট হয় ! ওরূপ কথা শুন্লে সে সেখান থেকে উঠে যায় ।

“তার পর ষষ্ঠ ভূমি । আত্মা চক্র—দ্বিদল পদ্য । এখানে কুলকুণ্ডলিনী এলে ঈশ্বরের রূপদর্শন হয় । কিন্তু একটু আড়াল থাকে—যেমন লণ্ঠনের ভিতর আলো,—মনে হয় আলো ছুঁলাম, কিন্তু কাচ ব্যবধান আছে ব’লে ছোঁয়া যায় না ।

“তার পর সপ্তম ভূমি । সহস্রার পদ্য । সেখানে কুণ্ডলিনী গেলে সমাধি হয় । সহস্রারে সচ্চিদানন্দশিব আছেন—তিনি শক্তির সহিত মিলিত হন । শিব-শক্তির মিলন !

“সহস্রারে মন এসে সমাধিস্থ হ’য়ে আর বাহ্য থাকে না । সে আর দেহ রক্ষা করতে পারে না । মুখে দুধ দিলে দুধ গড়িয়ে যায় । এ অবস্থায় থাকলে একুশ দিনে মৃত্যু হয় । কালাপানিতে গেলে জাহাজ আর ফেরে না ।

“ঈশ্বরকোটি—অবতারাди—এই সমাধি অবস্থা থেকে নামতে পারে । তারা ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকে, তাই নামতে পারে । তিনি তাদের ভিতর ‘বিষ্ণুর আমি’—‘ভক্তের আমি’—লোকশিক্ষার জন্ত—রেখে দেন । তাদের অবস্থা—যেমন ষষ্ঠ ভূমি আর সপ্তম ভূমির মাঝখানে বাচ্খেলা ।

“সমাধির পর ‘বিষ্ণুর আমি’ কেউ কেউ ইচ্ছা করে রেখে দেন । সে আমার ঐটি নাই—রেখা মাত্র ।

“হনুমান্ সাকার নিরাকার সাক্ষাৎকারের পর ‘দাস-আমি’ রেখেছিলেন । নারদাদি—সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, এঁরাও ব্রহ্মজ্ঞানের পর ‘দাস-আমি’ ‘ভক্তের আমি’ রেখেছিলেন । এঁরা, জাহাজের

মত, নিজেও পারে যান, আবার অনেক লোককে পার করে নিয়ে যান ।

ঠাকুর এইরূপে কি নিজের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন ? বলিতেছেন—

[পরমহংস—নিরাকারবাদী ও সাকারবাদী । ঠাকুরের
ব্রহ্মজ্ঞানের পর ভক্তি । নিত্যলীলাযোগ ।]

“পরমহংস—নিরাকারবাদী আবার সাকারবাদী । নিরাকারবাদী
যেমন ত্রৈলোক্য স্বামী । এঁরা আপ্তসারা—নিজের হ’লেই হ’ল ।

“ব্রহ্মজ্ঞানের পরও যারা সাকারবাদী, তারা লোকশিক্ষার জন্য ভক্তি
নিয়ে থাকে । যেমন কুন্ত পরিপূর্ণ হ’ল,” অন্য পাত্রে জল ঢালাঢালি ক’রছে ।

“এরা যে সব সাধনা করে ভগবানকে লাভ করেছে, সেই সকল কথা
লোকশিক্ষার জন্য বলে—তাদের হিতের জন্য । জলপানের জন্য অনেক
কষ্টে কূপ খনন করলে—ঝুড়ি কোদাল লয়ে । কূপ হয়ে গেল, কেউ
কেউ কোদাল আর আর যন্ত্র কূপের ভিতরই ফেলে দেয়—আর কি
দরকার ! কিন্তু কেউ কেউ কাঁধে ফেলে রাখে, পরের উপকার হবে বলে ।

“কেউ আম লুকিয়েখেয়ে মুখ পুঁছে । কেউ অন্য লোককে দিয়ে
খায়—লোকশিক্ষার জন্য আর তাঁকে আশ্বাদন করবার জন্য । ‘চিনি
খেতে ভালবাসি’ ।

“গোপীন্দ্রের ও ব্রহ্মজ্ঞান ছিল । কিন্তু তারা ব্রহ্মজ্ঞান
চাইত না । তারা কেউ বাৎসল্যভাবে, কেউ সখ্যভাবে, কেউ মধুরভাবে,
কেউ দাসীভাবে, ঈশ্বরকে সম্ভোগ ক’রতে চাইত ।

[কীর্ত্তনানন্দে । শ্রীগৌরাঙ্গের নাম ও মায়ের নাম ।]

শিবপুরের ভক্তেরা গোপীযন্ত্র লইয়া গান করিতেছেন । প্রথম গানে
বলিতেছিলেন, ‘আমরা পাপী আমাদের উদ্ধার কর’ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) । ভয় দেখিয়ে—ভয় পেয়ে—ভজনা,
প্রবর্তকের ভাব । তাঁকে লাভ করার গান গাও । আনন্দে গান !
(রাখালের প্রতি) নবীন নিয়োগীর বাড়ীতে সে দিন কেমন গান ক’রুছিল,
‘হরিনাম মদিরায় মত্ত হও —’

“কেবল অশান্তির কথা ভাল নয় । তাঁকে লয়ে আনন্দ—তাঁকে
লয়ে মাতোয়ারা হওয়া !

দক্ষিণেশ্বর । রাখাল প্রভৃতি ও শিবপুরের ভক্তগণসঙ্গে । ১৩৫

শিবপুরের ভক্ত । আজ্ঞা, আপনার গান একটি হ'বে না ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমি কি গাইব ? আচ্ছা, যখন হবে গাইব ।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর গান গাইতেছেন । গাইবার সময় উর্দ্ধদৃষ্টি ।

গান—কৌপিন দাও কাঙ্গালবেশে ব্রজে যাই হে ভারতী ।

গান—গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায় ।

গান—দেখসে আয় গৌরবরণ রূপখানি (গো সজনী) ।

আলতাগোলা দুধের ছানা মাখা গোরার গায়,

(দেখে ভাবের উদয় হয়)

কারিগর ভাঙ্গড়, মিস্ত্রী বৃষভানুন্দিনী ।

গান—ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন ।

গৌরাঙ্গের নামের পর ঠাকুর মার নাম করিতেছেন ।

গান—শ্যামা ধন কি সবাই পায় । অবোধ মন বুঝে না একি দায় ॥

গান—মজলো আমার মনভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে ।

গান—শ্যামা মা কি কল করেছে, কালী মা কি কল করেছে ।

চৌদ্দ পোয়া কলের ভিতরি, কত রঙ্গ দেখাতেছে ॥

আপনি থাকি কলের ভিতরি, কল ঘুরায় ধরে কলডুরি ।

কল বলে আপনি ঘুরি, জানে না কে ঘুরাতেছে ॥

যে কলে জেনেছে তারে, কল হ'তে হবে না তারে,

কোনো কলের ভক্তি ডোরে আপনি শ্যামা বাঁধা আছে ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

[ঠাকুরের সমাধি ও জগন্মাতার সহিত কথা । প্রেমতত্ত্ব ।]

এই গান গাহিতে গাহিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন । ভক্তেরা সকলে নিস্তব্ধ হইয়া দর্শন করিতেছেন । কিয়ৎক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া মাত্র সঙ্গে কথা কহিতেছেন ।

“মা উপর থেকে (সহস্রার থেকে ?) এইখানে নেমে এস !— কি জ্বালাও !—চুপ করে বোস !

“মা যার যা (সংস্কার) আছে, তাই ত হবে !—আমি আর এদের
কি বলবো ! বিবেক বৈরাগ্য না হলে কিছু হয় না ।

“বৈরাগ্য অনেক প্রকার । এক রকম আছে মর্কট-বৈরাগ্য—সংসা-
রের জ্বালায় জ্বলে বৈরাগ্য !—সে বৈরাগ্য বেশী দিন থাকে না । আর
ঠিক ঠিক বৈরাগ্য—সব আছে, কিছুর অভাব নাই, অথচ সব মিথ্যা বোধ ।

“বৈরাগ্য একবারে হয় না । সময় না হলে হয় না । তবে একটি
কথা আছে—শুনে রাখা ভাল । সময় যখন হবে, তখন মনে হবে—ও !
সেই শুনেছিলাম !

“আর একটি কথা । এ সব কথা শুনতে শুনতে বিষয়বাসনা একটু
একটু করে কমে । মদের নেশা কমানোর জন্য একটু একটু চালুনি
জল খেতে হয় । তা হলে ক্রমে ক্রমে নেশা ছুটতে থাকে ।

“জ্ঞানলাভের অধিকারী বড়ই কম । গীতায় বলেছে—হাজার হাজার
লোকের ভিতর এক জন তাঁকে জানতে ইচ্ছা করে । আবার যারা জানতে
ইচ্ছা করে, সেইরূপ হাজার হাজার লোকের ভিতর একজন জানতে পারে ।

তান্ত্রিক ভক্ত । ‘মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে’ ইত্যাদি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । সংসারে আসক্তি যত কমবে, ততই জ্ঞান বাড়বে ।
কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি ।

[সাধুসঙ্গ, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, ভক্তি, ভাব, মহাভাব, প্রেম ।]

“প্রেম সকলের হয় না । গৌরান্দের হয়েছিল । জীবের ভাব
হতে পারে—এই পর্য্যন্ত । ঈশ্বর-কোটির—যেমন অবতার আদির—
প্রেম হয় । প্রেম হলে জগৎ মিথ্যা তো বোধ হইবেই, আবার শরীর
যে এত ভালবাসার জিনিষ, তা ভুল হয়ে যায় !

“পাশী বইয়ে (হাফেজ) আছে, চামড়ার ভিতর মাংস,—মাংসের
ভিতর হাড়, হাড়ের ভিতর মজ্জা, তার পর আরো কত কি ! সকলের
ভিতর প্রেম !

“প্রেমে কোমল, নরম, হয়ে যায় । প্রেমে, কৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ হয়েছেন ।

“প্রেম হলে সচ্চিদানন্দকে বাঁধবার দড়ি পাওয়া যায় । যাই দেখতে
চাইবে, দড়ি ধরে টানলেই হয় । যখন ডাকবে তখন পাবে ।

“ভক্তি পাক্লে ভাব । ভাব হলে সচ্চিদানন্দকে ভেবে অবাক হয়ে যায় । জীবের এই পর্য্যন্ত । আবার ভাব পাক্লে মহাভাব,—প্রেম । যেমন কাঁচা আম আর পাকা আম ।

“শুদ্ধা ভক্তিই সার আর সব মিথ্যা ।

“নারদ স্তব করাতে রাম বল্লেন, তুমি বর লও । নারদ চাইলেন, শুদ্ধাভক্তি । আর বল্লেন—রাম, যেন তোমার জগৎমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই ! রাম বল্লেন, ও তো হলো, আর কিছু বর লও !

“নারদ বল্লেন—আর কিছু চাই না,—কেবল ভক্তি ।

“এই ভক্তি কিরূপে হয় ? প্রথমে সাধুসঙ্গ করতে হয় । সংসঙ্গ করলে ঈশ্বরীয় বিষয়ে শ্রদ্ধা হয় । শ্রদ্ধার পর নিষ্ঠা, ঈশ্বরকথা বই আর কিছু শুনতে ইচ্ছা করে না ;—তাঁরই কাজ করতে ইচ্ছা করে ।

“নিষ্ঠার পর ভক্তি । তার পর ভাব,—মহাভাব,—প্রেম,—বস্তুলাভ ।

“মহাভাব, প্রেম,—অবতার আদির হয় । সংসারী জীবের জ্ঞান, ভক্তের জ্ঞান, আর অবতারের জ্ঞান সমান নয় । সংসারী জীবের জ্ঞান যেন প্রদীপের আলো,—শুধু ঘরের ভিতরটা দেখা যায় । সে জ্ঞানে খাওয়া দাওয়া, ঘর করা, শরীর রক্ষা, সন্তান পালন, এই সব হয় ।

“ভক্তের জ্ঞান যেন চাঁদের আলো । ভিতর বার দেখা যায়, কিন্তু অনেক দূরের জিনিষ, কি খুব ছোট জিনিষ, দেখা যায় না । অবতার আদির জ্ঞান যেন সূর্যের আলো । ভিতর বার, ছোট বড়—তাঁরা সব দেখতে পান ।

“তবে সংসারী জীবের মন ঘোলা জল হয়ে আছে বটে, কিন্তু নিষ্মলি ফেলে আবার পরিষ্কার হতে পারে । বিবেক বৈরাগ্য নিষ্মলি ।

এইবারে ঠাকুর শিবপুরের ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন ।

[ঈশ্বরকথা শ্রবণের প্রয়োজন । ‘সময়-সাপেক্ষ’ । ঠাকুরের সহজাবস্থা ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । আপনাদের কিছু জিজ্ঞাসা থাকে, বলো ।

ভক্ত । আজ্ঞা, সব তো শুনলাম ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । শুনে রাখা ভাল, কিন্তু সময় না হলে হয় না ।

“যখন খুব জ্বর, তখন কুইনাইন্ দিচ্ছি কি হবে ? ফিবার মিক্‌চার দিয়ে বাহে টাছে হ’য়ে একটু কম পড়লে, তখন কুইনাইন্ দিতে হয় ।

আবার কারু কারু অমনি সেরে যায়, কুইনাইন্ না দিলেও হয় ।

“ছেলে ঘুমবার সময় বলেছিল—‘মা, আমার যখন হাগা পাবে, তখন তুলো ।’ মা বলে, ‘বাবা, আমায় তুলতে হবে না, হাগায় তোমায় তুলবে !’

“কেউ কেউ এখানে আসে দেখি, কোন ভক্তসঙ্গে নৌকা করে এসেছে । ঈশ্বরীয় কথা তাদের ভাল লাগে না । কেবল বন্ধুর গা টিপছে—‘কখন যাবে, কখন যাবে ।’ যখন বন্ধু কোন রকমে উঠলো না, তখন বলে, ‘তবে ততক্ষণ আমি নৌকায় গিয়ে বসে থাকি ।’

“মাদের প্রথম মানুষ জন্ম, তাদের ভোগের দরকার । কতকগুলো কাজ করা না থাকলে চৈতন্য হয় না ।

ঠাকুর ঝাউতলায় যাইবেন । গোলবারাণ্ডায় মাষ্টারকে বলিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । আচ্ছা, আমার কি রকম অবস্থা ?

মাষ্টার (সহাস্তে) । আজ্ঞা, আপনার উপরে সহজাবস্থা—ভিতর গভীর ।—আপনার অবস্থা বোঝা ভারী কঠিন !

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । হাঁ ; যেমন floor করা মেজে, লোকে উপরটাই দেখে, মেজের নীচে কত কি আছে, জানে না ।

চাঁদনীর ঘাটে বলরাম প্রভৃতি কয়েকটি ভক্ত কলিকাতা খাইবার জন্য নৌকা আরোহণ করিতেছেন । বেলা চারিটা বাজিয়াছে । ভাঁটা পড়িয়াছে, তাহাতে দক্ষিণে হাওয়া । গঙ্গাবক্ষ তরঙ্গমালায় বিভূষিত হইয়াছে ।

বলরামের নৌকা বাগবাজার অভিমুখে চলিয়া যাইতেছে, মাষ্টার অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতেছেন ।

নৌকা অদৃশ্য হইলে তিনি আবার ঠাকুরের কাছে আসিলেন ।

ঠাকুর পশ্চিম বারাণ্ডা হইতে নামিতেছেন—ঝাউতলা যাইবেন । উত্তর-পশ্চিমে সুন্দর মেঘ হইয়াছে । ঠাকুর বলিতেছেন, বৃষ্টি হবে কি—ছাতাটা আনো দেখি । মাষ্টার ছাতা আনিলেন । লাটুও সঙ্গে আছেন ।

ঠাকুর পঞ্চবটীতে আসিয়াছেন । লাটুকে বলিতেছেন—‘তুই রোগা হয়ে যাচ্ছিচ্ছ কেন ?’ লাটু—“কিছু খেতে পারি না ।”

শ্রীরামকৃষ্ণ । কেবল কি এ—সময় খারাপ পড়েছে—আর বেশী ধ্যান করিস্ বুঝি ? (ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন) ।

দক্ষিণেশ্বর । পঞ্চবটীমূলে লাটু, মাফটার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ১৩৯

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাফটারের প্রতি) । তোমার ঐটে ভার রইল ।
বাবুরামকে বলবে, রাখাল গেলে দুই এক দিন মাঝে মাঝে এসে থাকবে ।
তা না হলে আমার মন ভারী খারাপ হবে ।

মাফটার । যে আজ্ঞা, আমি বোলবো ।

সরল হইলে, ঈশ্বরকে পাওয়া যায় । ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিতেছেন,
বাবুরাম সরল কি না ।

[ঝাউতলা ও পঞ্চবটীতে শ্রীরামকৃষ্ণের সুন্দর রূপ দর্শন ।]

ঠাকুর ঝাউতলা হইতে দক্ষিণাশ্র হইয়া আসিতেছেন । মাফটার ও
লাটু পঞ্চবটীতলায় দাঁড়াইয়া উত্তরাশ্র হইয়া দেখিতেছেন ।

ঠাকুরের পশ্চাতে নবান মেঘ গগনমণ্ডল সুশোভিত করিয়া জাহ্নবী-
জলে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে—তাহাতে গঙ্গাজল কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতেছে ।

ঠাকুর আসিতেছেন—যেন সাক্ষাৎ ভগবান্ দেহ ধারণ
করিয়া মর্ত্যালোকে ভক্তের জন্য কলুষবিনাশিনী হরিপাদাম্বুজসম্ভূতা
সুরধুনীর তীরে বিচরণ করিতেছেন ! সাক্ষাৎ তিনি উপস্থিত !—তাই কি
বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, উদ্যানপথ, দেবালয়, ঠাকুরপ্রতিমা, সেবকগণ,
দৌবারিকগণ, প্রত্যেক ধূলিকণা, এত মধুর হইতেছে !

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

[নবাই চৈতন্য, নরেন্দ্র, বাবুরাম, লাটু, মণি, রাখাল,
নিরঞ্জন, অধর ।]

ঠাকুর নিজের ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন । বলরাম আত্ম আনিয়া-
ছিলেন । ঠাকুর শ্রীযুক্ত রাম ! চাটুষ্যেকে বলিতেছেন—তোমার
ছেলের জন্য আমগুলি নিয়ে যেও । ঘরে শ্রীযুক্ত নবাই চৈতন্য
বসিয়াছেন । তিনি লাল কাপড় পরিয়া আসিয়াছেন ।

উত্তরের লম্বা বারাণ্ডায় ঠাকুর হাজরার সহিত কথা কহিতেছেন ।
ব্রহ্মচারী হরিতাল-ভস্ম ঠাকুরের জন্য দিয়াছেন ।—সেই কথা হইতেছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ব্রহ্মচারীর ঔষধ আমার বেশ খাটে—লোকটা ঠিক ।

হাজরা । কিন্তু বেচারী সংসারে পড়েছে—কি করে ! কোলগর থেকে নবাই চৈতন্য এসেছেন । কিন্তু সংসারী হয়ে লাল কাপড় পরা !

শ্রীরামকৃষ্ণ । কি বোলুব ! আর আমি দেখি, ঈশ্বর নিজেই এই সব মানুষরূপ ধারণ করে রয়েছেন । তখন কারুকে কিছু বলতে পারি না ।

ঠাকুর আবার ঘরের মধ্যে আসিয়াছেন । হাজরার সহিত নরেন্দ্রের কথা কহিতেছেন । হাজরা—“নরেন্দ্র আবার মোকদ্দমায় পড়েছে ।”

শ্রীরামকৃষ্ণ । শক্তি মানে না । দেহ ধারণ করলে শক্তি মানতে হয় ।

হাজরা । বলে, আমি মানলে সকলেই মানবে,—তা কেমন করে মানি ।

“অত দূর ভাল নয় । এখন শক্তিরই এলাকায় এসেছ । জজ সাহেব পর্য্যন্ত যখন সাক্ষী দেয়, তখন তাকে সাক্ষীর বাঞ্ছা নেমে এসে দাঁড়াতে হয় ।

ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন—“তোমার সঙ্গে নরেন্দ্রের দেখা হয় নাই ?”
মাষ্টার—“আজ্ঞা, আজ কাল হয় নাই ।”

শ্রীরামকৃষ্ণ । একবার দেখা করো না—আর গাড়ী করে আনবে ।

(হাজরার প্রতি) । আচ্ছা, এখানকার সঙ্গে কি তার সম্বন্ধ ?

হাজরা । আপনার সাহায্য পাবে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ভবনাথ ? সংস্কার না থাকলে এখানে এত আসে ?

“আচ্ছা, হরীশ, লাটু—কেবল ধ্যান করে ;—উত্তনো কি ?

হাজরা । হাঁ, কেবল ধ্যান করা কি ?—আপনাকে সেবা করে, সে এক ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । হবে !—ওরা উঠে গিয়ে আবার কেউ আসবে ।

[মণির প্রতি নানা উপদেশ । শ্রীরামকৃষ্ণের সহজাবস্থা ।]

হাজরা ঘর হইতে চলিয়া গেলেন । এখনও সন্ধ্যার দেৱী আছে ।

ঠাকুর ঘরে বসিয়া একান্তে মণির সহিত কথা কহিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) । আচ্ছা, আমি যা ভাবাবস্থায় বলি, তাতে লোকের আকর্ষণ হয় ?
মণি । আজ্ঞা, খুব হয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । লোকে কি ভাবে ? ভাবাবস্থা দেখলে কিছু বোধ হয় ?

মণি । বোধ হয়, একাধারে জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য,—তার উপর সহজাবস্থা । ভিতর দিয়ে কত জাহাজ চলে গেছে, তবু সহজ ! ও অবস্থা অনেকে বুঝতে পারে না,—দু চার জন কিন্তু ঐতেই আকৃষ্ট হয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঘোষপাড়ার মতে ঈশ্বরকে ‘সহজ’ বলে । আর বলে, সহজ না হলে সহজকে না মাস্ত্র চেনা ।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও অভিমান অহঙ্কার । ‘আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী ।’]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) । আচ্ছা, আমার অভিমান আছে ?

মণি । আজ্ঞা, একটু আছে । শরীর রক্ষা আর ভক্তি ভক্তের জন্ম,—জ্ঞান উপদেশের জন্ম । তাও আপনি প্রার্থনা করে রেখেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমি রাখি নাই ;—তিনিই রেখে দিচ্ছেছেন ! আচ্ছা, ভাবাবেশের সময় কি হয় ?

মণি । আপনি তখন বলেন ষষ্ঠভূমিতে মন উঠে ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয় । তার পর কথা যখন ক’ন, তখন পঞ্চম ভূমিতে মন নামে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তিনিই সব কচ্ছেন । আমি কিছুই জানি না ।

মণি । আজ্ঞা, তাই জন্যই ত এত আকর্ষণ !

[Why all Scriptures—all Religions—are true.]

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিরুদ্ধ শাস্ত্রের সমন্বয় ।

মণি । আজ্ঞা, শাস্ত্রে দু রকম বলেছে । এক পুরাণের মতে কৃষ্ণকে চিদাত্মা, রাধাকে চিৎশক্তি বলেছে । আর এক পুরাণে কৃষ্ণই কালী—আত্মাশক্তি বলেছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । দেবীপুরাণের মত ।—এ মতে কালীই কৃষ্ণ হয়েছেন ।

“তা হলেই বা !—তিনি অনন্ত, পথও অনন্ত !

এই কথা শুনিয়া মণি অবাক হইয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন ।

মণি । ও বুঝেছি । আপনি যেমন বলেন, ছাদে উঠা নিয়ে কথা ! যে কোন উপায়ে উঠতে পারলেই হলো—দড়ি বাঁশ—যে কোন উপায়ে !

শ্রীরামকৃষ্ণ । এইটী যে বুঝেছ, এটুকু ঈশ্বরের দয়া । ঈশ্বরের কৃপা না হলে সংশয় আর মায় না ।

“কথাটা এই—কোন রকমে তাঁর উপর যাতে ভক্তি হয়—ভালবাসা হয় । নানা খবরে কাজ কি ? একটা পথ দিয়ে যেতে যেতে যদি তাঁর উপর ভালবাসা হয়, তা হলেই হলো । ভালবাসা হলেই তাঁকে লাভ করা যাবে । তার পর যদি দরকার হয়, তিনি সব

বুঝিয়ে দিবেন—সব পথের খবর বলে দিবেন । ঈশ্বরের উপর ভালবাসা এলেই হোলো—নানা বিচারের দরকার নাই । আম খেতে এয়েছ, আম খাও ; কত ডাল, কত পাতা, এ সবের হিসাবের দরকার নাই । হনু-মানের ভাব—‘আমি বার তিথি নক্ষত্র জানি না,—এক রাম চিন্তা করি !’

[সংসারত্যাগ ও ঈশ্বরলাভ । ভক্তের সঞ্চয় না যদৃচ্ছালাভ ?]

মণি । এখন এরূপ ইচ্ছা হয় যে, কর্ম খুব কমে যায়,—আর ঈশ্বরের দিকে খুব মন দিই । শ্রীরামকৃষ্ণ । আহা ! তা হবে বৈ কি !

শ্রীরামকৃষ্ণ । কিন্তু জ্ঞানী নির্লিপ্ত হয়ে সংসারে থাকতে পারে !

মণি । আজ্ঞা, কিন্তু নির্লিপ্ত হতে গেলে বিশেষ শক্তি চাই ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, তা বটে । কিন্তু হয় তো তুমি (সংসার) চেয়েছিলে ।

“কৃষ্ণ শ্রীমতীর হৃদয়েই ছিলেন, কিন্তু ইচ্ছা হলো, তাই মানুষ-রূপে লীলা । এখন প্রার্থনা করো, যাতে এ সব কমে যায় ।

“আর মন থেকে ত্যাগ হলেই হলো ।

মণি । সে যারা বাহিরে ত্যাগ করতে পারে না । উঁচু থাকের জন্য একেবারেই ত্যাগ—মনের ত্যাগ ও বাহিরে ত্যাগ ।

ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন ।—আবার কথা কহিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । বৈরাগ্যের কথা তখন কেমন শুনলে ?

মণি । আজ্ঞা, হাঁ । শ্রীরামকৃষ্ণ । বৈরাগ্য মানে কি বল দেখি ?

মণি । বৈরাগ্য মানে শুধু সংসারে বিরাগ নয় । ঈশ্বরে অনুরাগ আর সংসারে বিরাগ । শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, ঠিক বলেছ ।

“সংসারে টাকার দরকার বটে, কিন্তু উত্তমের জন্য অতো ভেবো না । যদৃচ্ছা লাভ—এই ভালো । সঞ্চয়ের জন্য অতো ভেবো না । যারা তাঁকে মনপ্রাণ সমর্পণ করে—যারা তাঁর ভক্ত, শরণাগত,—তারা ও সব অতো ভাবে না । যত্র আয়—তত্র ব্যয় । এক দিক্ থেকে টাকা আসে, আর এক দিক্ থেকে খরচ হয়ে যায় । এর নাম যদৃচ্ছালাভ । গীতায় আছে ।

[শ্রীযুক্ত হরিপদ, রাখাল, বাবুরাম, অধর প্রভৃতির কথা ।]

ঠাকুর হরিপদের কথা কহিতেছেন ।—“হরিপদ সেদিন এসেছিল ।

মণি (সহাস্তে) । হরিপদ কথকতা জানে । প্রহ্লাদচরিত্র,
শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা—এ সব বেশ স্মর করে বলে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । বটে ! সে দিন তার চক্ষু দেখলাম, যেন চড়ে রয়েছে ।
বললাম,—‘তুই কি খুব ধ্যান করিস্ ?’—তা মাথা হেঁট করে থাকে । আমি
তখন বললাম,—অতো নয় রে !

সন্ধ্যা হইল । ঠাকুর মার নাম করিতেছেন ও চিন্তা করিতেছেন ।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরবাড়ীতে আরতি আরম্ভ হইল । শ্রাবণ
শুক্লা দ্বাদশী । ঝুলন-উৎসবের দ্বিতীয় দিন । চাঁদ উঠিয়াছে । মন্দির,
মন্দির-প্রাঙ্গণ, উদ্যান,—আনন্দময় হইয়াছে । রাত আটট। হইল । ঘরে
ঠাকুর বসিয়া আছেন । রাখাল ও মাষ্টারও আছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । বাবুরাম বলে, ‘সংসার!—ওরে বাবা !’

মাষ্টার । ও শোনা কথা । বাবুরাম সংসারের কি জানে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, তা বটে । নিরঞ্জন দেখেছ,—খুব সরল !

মাষ্টার । আজ্ঞা, হাঁ । তার চেহারাতেই আকর্ষণ করে । চোখের
ভাবটী কেমন !

শ্রীরামকৃষ্ণ । শুধু চোখের ভাব নয়—সমস্ত । তার বিয়ে দেবে
বলেছিল,—তা সে বলেছে, আমায় ডুবুবে কেন ? (সহাস্তে) হ্যাঁগা,
লোকে বলে, খেটে খুটে গিয়ে পরিবারের কাছে গিয়ে বসলে নাকি
খুব আনন্দ হয় ।

মাষ্টার । আজ্ঞা, যারা ঐ ভাবে আছে, তাদের হয় বৈকি ।
(রাখালের প্রতি, সহাস্তে) । একজামিন হচ্ছে—leading question.

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । মায়ে বলে, ছেলের একটা গাছতলা
করে দিলে বাঁচি ! রোদে ঝলসা পোড়া হয়ে গাছতলায় বসবে ।

মাষ্টার । আজ্ঞা, রুকমারী বাপ মা আছে । মুক্ত বাপ ছেলেদের
বিয়ে দেয় না । যদি দেয় সে খুব মুক্ত ! (ঠাকুরের হাস্য ।)

[অধর ও মাষ্টারের কালীদর্শন । অধরের চন্দ্রনাথতীর্থ ও সীতাকুণ্ডের গল্প]

শ্রীযুক্ত অধর সেন কলিকাতা হইতে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম
করিলেন । একটু বসিয়া কালীদর্শন জগু কালীঘরে গেলেন ।

মাফটারও কালী দর্শন করিলেন । তৎপরে চাঁদনীর ঘাটে আসিয়া গঙ্গার কূলে বসিলেন । গঙ্গার জল জ্যোৎস্নায় ঝক্ ঝক্ করিতেছে । সবে জোয়ার আসিল । মাফটার নির্জনে বসিয়া ঠাকুরের অদ্ভুত চরিত্র চিন্তা করিতেছেন—তঁাহার অদ্ভুত সমাধি অবস্থা,—মূহুমূহুঃ ভাব,—প্রেমানন্দ,—অবিশ্রান্ত ঈশ্বরকথা প্রসঙ্গ,—ভক্তের উপর অকৃত্রিম স্নেহ,—বালকের চরিত্র—এই সব স্মরণ করিতেছেন । আর ভাবিতেছেন—ইনি কে—ঈশ্বর কি ভক্তের জন্য দেহ ধারণ করে এসেছেন ?

অধর, মাফটার, ঠাকুরের ঘরে ফিরিয়া গিয়াছেন । অধর চট্টগ্রামে কৰ্ম্ম উপলক্ষে ছিলেন । তিনি চন্দ্রনাথ তীর্থের ও সীতাকুণ্ডের গল্প করিতেছেন ।

অধর । সীতাকুণ্ডের জলে আগুনের শিখা জিহ্বার ন্যায় লক্ লক্ করে !

শ্রীরামকৃষ্ণ । এ কেমন করে হয় ?

অধর । জলে ফস্ফরস্ (phosphorus) আছে ।

শ্রীযুক্ত রাম চাটুর্ঘ্যে ঘরে আসিয়াছেন । ঠাকুর অধরের কাছে তঁাহার স্মৃতি করিতেছেন । আর বলিতেছেন ;—‘রাম আছে, তাই আমাদের অতো ভাবতে হয় না । হরীশ, লাটু, এদের ডেকে ডুকে খাওয়ায় । ওরা হয়তো একলা কোথায় ধ্যান কচ্ছে । সেখান থেকে রাম ডেকে ডুকে আনে ।’

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থভাগ, ষোড়শখণ্ডে শিবপুরভক্তসঙ্গে

ষট্চক্র ও যোগতত্ত্বকথা, এবং অধর, রাখাল, মাফটার প্রভৃতি

ভক্তসঙ্গে নানা উপদেশকথা সমাপ্ত ।

—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

চতুর্থ ভাগ—সপ্তদশ অঙ্ক ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত অধরের বাড়ীতে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দে । সমাধিমন্দিরে ।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অধরের বাটীর বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন । বৈঠকখানা দ্বিতলের উপর । শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র, মুখুর্ষো ভ্রাতৃদ্বয়, ভবনাথ, মাষ্টার, চুনিলাল, হাজরা প্রভৃতি ভক্তেরা তাঁহাব কাছে বসিয়া আছেন । বেলা ৩টা হইবে । আজ শনিবার, ২২এ ভাদ্র, ১২৯১ ; ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ । কৃষ্ণপ্রতিপদ তিথি !

ভক্তেরা প্রণাম করিতেছেন । মাষ্টার প্রণাম করিলে পর, ঠাকুর অধরকে বলিতেছেন—নিতাই ডাক্তার আসবে না ?

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র গান গাইবেন, তাহার আয়োজন হইতেছে । তানপুরা বাঁধিতে গিয়া তার ছিঁড়িয়া গেল । ঠাকুর বলিতেছেন, ওরে কি করলি ! নরেন্দ্র বাঁয়া তবলা বাঁধিতেছেন । ঠাকুর বলিতেছেন,—তোরা বাঁয়া যেন গালে চড় মারছে !

কীর্তনাস্তরের গান সম্বন্ধে কথা হইতেছে । নরেন্দ্র বলিতেছেন—‘কীর্তনে তাল সম্ এ সব নাই—তাই অত popular—লোকে ভালবাসে ।’

শ্রীরামকৃষ্ণ । সে কি বললি ! করুণ বলে তাই অত—লোকে ভালবাসে !

নরেন্দ্র গান গাইতেছেন—

গান—সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে ।

গান—যাবে কিহে দিন আমার বিষলে চলিলে ।

আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি, সহাস্তে) । প্রথম এই গান করে !

নরেন্দ্র আরও দুই একটি গান করবার পর বৈষ্ণবচরণ গান গাইতেছেন—চিনিব কেমনে হে তোমায় (হরি),ওহে বন্ধুরায় ভুলে আছি মথুরায় ।

হাতীচড়া জোড়াপরা, ভুলেছ কি ধেনুচরা,

ব্রজের মাখন চুরি করা, মনে কিছু হয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ‘হরি হরি বলরে বীণে’ ঐটে একবার—হোক না ।
বৈষ্ণবচরণ গাইতেছেন—হরি হরি বলরে বীণে !

শ্রীহরির চরণ বিনে পরম তত্ত্ব আর পাবিনে ॥
হরিনামে তাপ হরে, মুখে বল হরে কৃষ্ণ হরে,
হরি যদি কৃপা করে তবে ভবে আর ভাবিনে ।
বীণে একবার হরি বল, হরি নাম বিনে নাহি সম্বল,
দাস গোবিন্দ কয় দিন গেল, অকূলে যেন ভাসিনে ॥

[ঠাকুরের মুহুমূহঃ সমাধি ও নৃত্য ।]

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন
—আহা ! আহা ! হরি হরি বল ।

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন । ভক্তেরা
চতুর্দিকে বসিয়া আছেন ও দর্শন করিতেছেন । ঘর লোকে পরিপূর্ণ
হইয়াছে ।

কীর্তনীয়া ঐ গান সমাপ্ত করিয়া নূতন গান ধরিলেন ।

গান—শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর নব নটবর, তপত কাঞ্চন কায় ! ৪৫পৃষ্ঠা ।

কীর্তনীয়া যখন আঁখর দিচ্ছেন, ‘হরিপ্রেমের বন্তে ভেসে যায়,’
ঠাকুর দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন । আবার বসিয়া বাহু
প্রসারিত করিয়া আঁখর দিতেছেন ।—(একবার হরি বল রে)

ঠাকুর আঁখর দিতে দিতে ভাবাবিষ্ট হইলেন ও হেঁট মস্তক হইয়া
সমাধিস্থ হইলেন । তাকিয়াটী সন্মুখে । তাহার উপর শিরোদেশ
ঢলিয়া পড়িয়াছে । কীর্তনীয়া আবার গাইতেছেন—

‘হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে, বল মাধাই মধুর স্বরে’ ।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হবে ॥

গান—হরি বলে আমার গৌর নাচে ।

নাচে রে গৌরাঙ্গ আমার হেমগিরির মাঝে ।

রাঙ্গাপায়ে সোণার নূপুর রুণু বুণু বাজে ॥

থেকো রে বাপ নরহরি থেকো গৌরের পাশে ।

কলিকাতা অধরের বাটী । নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দে । ১৪৭

রাধার প্রেমে গড়া তনু, ধূলায় পড়ে পাছে ॥

বামেতে অদ্বৈত আর দক্ষিণে নিতাই ।

তার মাঝে নাচে আমার চৈতন্য গোঁসাই ॥

ঠাকুর আবার উঠিয়াছেন ও আঁখর দিয়া নাচিতেছেন ।

(প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে রে)

সেই অপূর্ব নৃত্য দেখিয়া নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, সকলেই ঠাকুরের সঙ্গে নাচিতে লাগিলেন ।

নাচিতে নাচিতে ঠাকুর একবারে সমাধিস্থ হইতেছেন । তখন অন্তর্দর্শা । মুখে একটী কথা নাই । শরীর সমস্ত স্থির । ভক্তেরা তখন তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতেছেন ।

কিয়ৎক্ষণ পরেই অর্দ্ধবাহ দশা—চৈতন্যদেবের যেরূপ হইত,— অমনি ঠাকুর সিংহবিক্রমে নৃত্য করিতেছেন । তখনও মুখে কথা নাই—প্রেমে উন্মত্তপ্রায় !

যখন একটু প্রকৃতিস্থ হইতেছেন—অমনি একবার আঁখর দিতেছেন ।

আজ অধরের বৈঠকখানা ঘর শ্রীবাসের আগ্নিমা হইয়াছে । হরিনামের রোল শুনিতে পাইয়া রাজপথে অসংখ্য লোক জমিয়া গিয়াছে ।

ভক্তসঙ্গে অনেকক্ষণ নৃত্যের পর ঠাকুর আবার আসন গ্রহণ করিয়াছেন । এখনও ভাবাবেশ । সেই অবস্থায় নরেন্দ্রকে বলিতেছেন—সেই গানটী—‘আমায় দেমা পাগল করে ।’

ঠাকুরের আজ্ঞা পাইয়া নরেন্দ্র গান গাইতেছেন—

গান—আমায় দেমা পাগল করে । দ্বিতীয় ভাগ, ১৫২ পৃষ্ঠা ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আর ঐটী—‘চিদানন্দ সিন্ধুনীরে ।’

নরেন্দ্র গাইতেছেন—চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী ।

মহাভাব রসলীলা কি মাধুরী মরি মরি ॥

মহাযোগে সমুদায় একাকার হইল, দেশকাল ব্যবধান ভেদাভেদ ঘুচিল, এখন আনন্দে মাতিয়া, দুবালু তুলিয়া, বলরে মন হরি হরি ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) আর ‘চিদাকাশে’ ?—না, ওটা বড় লম্বা, না ?
আচ্ছা, একটু আস্তে আস্তে ।

নরেন্দ্র গাইতেছেন—চিদাকাশে হল পূর্ণ প্রেম চন্দ্রোদয় হে ।
উথলিল প্রেম সিন্ধু কি আনন্দময় হে ॥ দ্বিতীয় ভাগ, ৬২ পৃষ্ঠা ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আর ঐটে—‘হরিরস মদিরা ?’

নরেন্দ্র । হরিরস মদিরা পিয়ে মম মানস মাত রে ।

লুটায়ে অবনীতল, হরি হরি বলি কাঁদ রে ॥

ঠাকুর আঁখর দিতেছেন—প্রেমে মত্ত হয়ে, হরি হরি বলি কাঁদ রে ।

ভাবে মত্ত হয়ে,—হরি হরি বলি কাঁদ রে ।

ঠাকুর ও ভক্তেরা একটু বিশ্রাম করিতেছেন । নরেন্দ্র আন্তে
আন্তে ঠাকুরকে বলিতেছেন—‘আপনি সেই গানটী একবার গাইবেন ?—

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন—‘আমার গলাটা একটু ধরে গেছে—’

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর আবার নরেন্দ্রকে বলিতেছেন—‘কোনটী ?’

নরেন্দ্র । ভুবনরঞ্জনরূপ ।

ঠাকুর আন্তে আন্তে গাইতেছেন—গান

ভুবনরঞ্জনরূপ নদে গৌর কে আনিল রে (অলকা আবৃত মুখ)

(মেঘের গায়ে বিজলী) (আন হেরিতে শ্যাম হেরি)

ঠাকুর আর একটী গান গাইতেছেন—

গান—শ্যামের নাগাল পেলুম না লো সই ।

আমি কি সুখে আর ঘরে রই ॥

শ্যাম যদি মোর হ’তো মাথার চুল ।

যতন ক’রে বাঁধতুম্ বেণী সই, দিয়ে বকুল ফুল

(কেশব-কেশ যতনে বাঁধতুম্ সই) (কেউ নকতে পারত না সই)

(শ্যাম কাল আর কেশ কাল) (কালোয় কালোয় মিশে যেতো গো) ।

শ্যাম যদি মোর বেশর হইত, নাসা মাঝে সতত রহিত,—

(অধর চাঁদ অধরে র’ত সই ।) (যা হবার নয়, তা মনে হয় গো)

(শ্যাম কেন বেসর হবে সই ?) ।

শ্যাম যদি মোর কঙ্কণ হ’তো, বাহুমাঝে সতত রহিত

(কঙ্কণ নাড়া দিয়ে চ’লে যেতুম্ সই) (বাহু নাড়া দিয়ে)

(শ্যাম কঙ্কণ হাতে দিয়ে, চলে যেতুম্ সই) (রাজপথে) ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

[ভাবাবস্থায় অন্তর্দৃষ্টি । নরেন্দ্রাদির নিমন্ত্রণ ।]

গান সমাপ্ত হইল । নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে ঠাকুর কথা কহিতেছেন । সহাস্তে বলছেন, হাজরা নেচেছিল ।

নরেন্দ্র (সহাস্তে) । আজ্ঞা, একটু একটু ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । একটু একটু ?

নরেন্দ্র (সহাস্তে) । ভুঁড়ি আর একটা জিনিষ নেচেছিল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । সে আপনি হেলে দোলে—না দোলাতে আপনি দোলে । (সকলের হাস্য)

শশধর যে বাড়ীতে আছেন, সেই বাড়ীতে ঠাকুরের নিমন্ত্রণ হইবার কথা হইতেছে । নরেন্দ্র । বাড়ীওয়ালা খাওয়াবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । তার শুনেছি স্বভাব ভাল না—লোচা ।

নরেন্দ্র । আপনি তাই—যে দিন শশধরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়—তাদের ছোঁয়া জলের গেলাস থেকে জল খেলেন না । আপনি কেমন করে জানলেন যে, লোকটার স্বভাব ভাল না !

[পূর্বকথা—সিহোড়ে হৃদয়ের বাটীতে হাজরা ও বৈষ্ণব সঙ্গে ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । হাজরা আর একটা জানে,—ও দেশে—সিহোড়ে—হৃদের বাড়ীতে ।

হাজরা । সে একজন বৈষ্ণব—আমার সঙ্গে দর্শন করতে গিছলো যাই সে গিয়ে বসলো, ইনি তার দিকে পেছন ফিরে বসলেন !

শ্রীরামকৃষ্ণ । মাসীর সঙ্গে নাকি নষ্ট ছিল—তার পর শোনা গেল । (নরেন্দ্রের প্রতি) আগে বল্‌তিস্ আমার অবস্থা সব মনের গতিক (hallucination).

নরেন্দ্র । কে জানে ! এখন ত অনেক দেখলাম—সব মিলছে !

নরেন্দ্র বলিতেছেন, ঠাকুর ভাবাবস্থায় লোকের অন্তর বাহির সমস্ত দেখিতে পান—এটা তিনি অনেকবার মিলাইয়া দেখিলেন ।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তের জাতিবিচার Caste.]

ঠাকুর ও ভক্তদের সেবার জন্য অধর অনেক আয়োজন করিয়াছেন। তিনি এইবার তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেছেন।

মহেন্দ্র ও প্রিয়নাথ—মুখ্যে ভ্রাতৃদ্বয়কে—ঠাকুর বলিতেছেন, ‘কি গো, তোমরা খেতে যাবে না?’

তাঁহারা বিনীত ভাবে বলিতেছেন—‘আজ্ঞা, আমাদের থাক।’

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্ত্রে)। এঁরা সবই কচ্ছেন, শুধু ঐটেতেই সঙ্কোচ।

‘এক জনের শ্বশুর ভাস্করের নাম হরি, কৃষ্ণ, এই সব। এখন হরি নাম ত করতে হবে?—কিন্তু ‘হরে কৃষ্ণ’ বলবার যো নাই। তাই সে জপ কচ্ছে—‘ফরে ফৃট, ফরে ফৃট, ফৃট ফৃট ফরে ফরে!’

ফরে রাম, ফরে রাম, রাম রাম ফরে ফরে!’

অধর জাতিতে সূবর্ণবণিক। তাই ব্রাহ্মণ ভক্তেরা কেহ কেহ প্রথম প্রথম তাঁহার বাটীতে আহাৰ করিতে ইতস্ততঃ করিতেন। কিছু দিন পরে যখন তাঁহারা দেখিলেন, স্বয়ং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ওখানে খান, তখন তাঁহাদের চটকা ভাঙ্গিল।

রাত্রি প্রায় ন’টা হইল। নরেন্দ্র ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ঠাকুর আনন্দে সেবা করিলেন।

এইবার বৈঠকখানায় আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন—দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করিবার উদ্যোগ হইতেছে।

আগামী কল্য রবিবার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের আনন্দের জন্য মুখ্যে ভ্রাতৃদ্বয় কীর্তনের আয়োজন করিয়াছেন। শ্যামদাস কীর্তনীয়া গান গাইবেন। শ্যামদাসের কাছে রাম নিজের বাটীতে কীর্তন শিখেন।

ঠাকুর নরেন্দ্রকে কাল দক্ষিণেশ্বরে যাইতে বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। কাল যাবি—কেমন?

নরেন্দ্র। আচ্ছা, চেষ্টা করবো। শ্রীরামকৃষ্ণ। “সেখানে নাইবি, খাবি।

ইনিও না হয় গিয়ে থাকেন। (মাষ্টারের প্রতি) তোমার অসুখ এখন সেরেছে?—এখন পত্তি (পথ্য) ত নয়?”

মাষ্টার। আজ্ঞা না—আমিও যাব।

নিত্যগোপাল বৃন্দাবনে আছেন। চুনীলাল কয়েক দিন হইল বৃন্দা-

কলিকাতা—অধরের বাটী । নরেন্দ্র, ভবনাথাদি ভক্তসঙ্গে ! ১৫১

বন হইতে ফিরিয়াছেন । ঠাকুর তাঁহার কাছে নিত্যগোপালের সংবাদ লইতেছেন । ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করিবেন । মাষ্টার ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম মস্তকের দ্বারা স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন ।

ঠাকুর সন্মুখে তাঁহাকে বলিতেছেন,—‘তবে যেও’ ।

(নরেন্দ্রাদির প্রতি, সন্মুখে) ‘নরেন্দ্র, ভবনাথ যেও ।’

নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তেরা তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন । তাঁহার অপূর্ব কীর্তনানন্দ ও কীর্তনমধ্যে ভক্তসঙ্গে অপূর্ব নৃত্য স্মরণ করিতে করিতে সকলে নিজ নিজ গৃহে ফিরিতেছেন ।

আজ ভাদ্র কৃষ্ণপ্রতিপদ । রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী—যেন হাসিতেছে । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—ভবনাথ, হাজরা প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে—গাড়ী করিয়া দক্ষিণেশ্বরভিমুখে যাইতেছেন ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থভাগ, সপ্তদশখণ্ড—অধরের বাটীতে নরেন্দ্রাদি ভক্ত সঙ্গে কীর্তনানন্দ কথা সমাপ্ত ।

চতুর্থ ভাগ—অষ্টাদশ খণ্ড ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে রাম, বাবুরাম, মাষ্টার, চুনী, অধর, ভবনাথ, নিরঞ্জন প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত । ঘোষপাড়া ও কর্ত্তাভজাদের মত ।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে সেই ঘরে নিজের আসনে ছোট খাটটীতে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন । বেলা এগারটা হইবে, এখনও তাঁহার সেবা হয় নাই ।

গত কল্যা শনিবার ঠাকুর শ্রীযুক্ত অধর সেনের বাটীতে ভক্তসঙ্গে শুভাগমন করিয়াছিলেন । হরিনাম-কীর্তন মহোৎসব করিয়া সকলকে ধন্য করিয়াছিলেন । আজ এখানে শ্যামদাসের কীর্তন হইবে । ঠাকুরের কীর্তনানন্দ দেখিবার জন্য অনেক ভক্তের সমাগম হইতেছে ।

প্রথমে বাবুরাম, মাষ্টার, শ্রীরামপুরের ব্রাহ্মণ, মনমোহন, ভবনাথ, কিশোরী ; তৎপরে চুনীলাল, হরিপদ প্রভৃতি ; ক্রমে মুখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয়, রাম, সুরেন্দ্র, তারক, অধর, নিরঞ্জন । লাটু, হরীশ ও হাজরা আজ কাল দক্ষিণেশ্বরেই থাকেন । শ্রীযুক্ত রামলাল মা কালীর সেবা করেন ও ঠাকুরের তত্ত্বাবধান করেন । শ্রীযুক্ত রাম চক্রবর্তী বিষ্ণুঘরে সেবা করেন । তিনিও মাঝে মাঝে আসিয়া ঠাকুরের তত্ত্বাবধান করেন । লাটু হরীশ ঠাকুরের সেবা করেন । আজ রবিবার ভাদ্রকৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথি । ২৩এ ভাদ্র, ১২৯১ । ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ ।

মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করিলে পর ঠাকুর বলিতেছেন - “কই, নরেন্দ্র এলো না ?”

নরেন্দ্র সে দিন আসিতে পারেন নাই । শ্রীরামপুরের ব্রাহ্মণটী রাম-প্রসাদের গানের বই আনিয়াছেন ও সেই পুস্তক হইতে মাঝে মাঝে গান পড়িয়া ঠাকুরকে শুনাইতেছেন । শ্রীরামকৃষ্ণ—‘কই, পড় না ?’

ব্রাহ্মণ । গান—বসন পরো, মা বসন পর, মা বসন পরো !

শ্রীরামকৃষ্ণ । ও সব রাখো, আকাট বিকাট ! এমন পড় যাতে ভক্তি হয় । ব্রাহ্মণ—‘কে জানে কালী কেমন, ষড়্ দর্শনে না পায় দর্শন ।

[ঠাকুরের ‘দরদী’ । পরমহংস, বাউল ও সাঁই ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । কাল অধর সেনের বাড়ী ভাবাব-বস্থায় এক পাশে থেকে পায়ে ব্যথা হয়েছিল । তাইত বাবুরামকে নিয়ে যাই । **দরদি !** এই বলিয়া ঠাকুর গান গাইতেছেন—
মনের কথা কইবো কি সই কহিতে মানা । দরদি নইলে প্রাণ বাঁচে না ॥

মনের মানুষ হয় যে জনা, নয়নে তার যায় গো চেনা,

সে দু এক জনা ; সে যে রসে ভাসে প্রেমে ডোবে,

কচ্ছে রসের বেচা কেনা । (ভাবের মানুষ)

মনের মানুষ মিলবে কোথা, বগলে তার ছেঁড়া কাঁথা,

ও সে কয়না গো কথা ; ভাবের মানুষ উজান পথে,

করে আনা গোনা । (মনের মানুষ, উজান পথে করে আনা গোনা) ।

“বাউলদের এই সব গান । আবার আছে—

দক্ষিণেশ্বর । রাম, সুরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ১৫৩

‘দরবেশ দাঁড়ারে, সাধের করোয়া ধারী, দাঁড়ারে তোর রূপ নেহারি !’

“শাক্তমতের সিদ্ধকে বলে কোল । বেদান্তমতে বলে পরমহংস ।
বাউল বৈষ্ণবদের মতে বলে সাঁই । ‘সাঁইয়ের পর আর নাই’ ।

“বাউল সিদ্ধ হলে সাঁই হয় । তখন সব অভেদ । অর্দ্ধেক মালা
গোহাড়, অর্দ্ধেক মালা তুলসীর । ‘হিঁদুর নীর—মুসলমানের পীর ।’

[আলেখ । হাওয়ার খপর । পৈঠে । রসের কাজ । খোলা নামা ।]

“সাঁইয়েরা বলে—আলেখ ! আলেখ ! বেদমতে বলে ব্রহ্ম ; ওরা
বলে আলেখ ! জীবদের বলে—‘আলেখ আসে আলেখ যায়’ ; অর্থাৎ
জীবাত্মা অব্যক্ত থেকে এসে তাইতে লয় হয় ।

“তারা বলে, হাওয়ার খবর জান ?

“অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনী জাগরণ হলে ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্না—এদের
ভিতর দিয়ে যে মহাবায়ু উঠে, তাহার খবর ।

“জিজ্ঞাসা করে, কোন পৈঠেতে আছ ?—ছটা পইঠে—ষড়চক্র ।

“যদি বলে পঞ্চমে আছে, তার মানে যে, বিশুদ্ধ চক্রে মন উঠেছে ।

(মাষ্টারের প্রতি) । তখন নিরাকার দর্শন । যেমন গানে আছে ।

এই বলিয়া ঠাকুর একটু সুর করিয়া বলিতেছেন—‘তদুচ্ছ্বাসে আছে
মাগো অম্বুজে আকাশ । সে আকাশ রুদ্ধ হলে সকলি আকাশ ।’

[পূর্বকথা—বাউল ও ঘোষপাড়ার কর্ত্তাভজাদের আগমন ।]

“এক জন বাউল এসেছিল । তা আমি বললাম, ‘তোমার রসের কাজ
সব হয়ে গেছে ?—খোলা নেমেছে ?’ যত রস জ্বাল দেবে, তত রেফাইন
refine হবে । প্রথম, আকের রস—তার পর গুড়—তার পর দোলো
—তার পর চিনি—তার পর মিছরি, ওলা, এই সব । ক্রমে ক্রমে
আরও রেফাইন হচ্ছে ।

“খোলা নামবে কখন ? অর্থাৎ সাধন শেষ হবে কবে ?—যখন
ইন্দ্রিয় জয় হবে—যেমন জোঁকের উপর চূণ দিলে জোঁক আপনি খুলে
পড়ে যাবে,—ইন্দ্রিয় তেন্নি শিথিল হয়ে যাবে । রামণীর সঙ্গে
থাকবে, না করে রামণ ।

“ওরা অনেকে রাধাতন্ত্রের মতে চলে ! পঞ্চতন্ত্র নিয়ে সাধন করে ।

পৃথিবীতত্ত্ব, জলতত্ত্ব, অগ্নিতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব, আকাশতত্ত্ব,—মল মূত্র রজ বীজ এই সব তত্ত্ব ! এ সব সাধন বড় নোংরা সাধন ; যেমন পায়খানার ভিতর দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢোকা !

“এক দিন আমি দালানে খাচ্ছি। এক জন ঘোষপাড়ার মতের লোক এলো। এসে বলছে,—‘তুমি খাচ্ছে, না কারুক খাওয়াচ্ছ?’ অর্থাৎ যে সিদ্ধ হয়, সে দেখে যে, অন্তরে ভগবান্ আছেন।

“যারা এ মতে সিদ্ধ হয়, তারা অন্য মতের লোকদের বলে ‘জীব’ বিজাতীয় লোক থাকলে কথা কবে না। বলে,—এখানে ‘জীব’ আছে।

[পূর্বকথা—জন্মভূমি দর্শন। সরোপাথরের বাড়ী হৃদুসঙ্গে ।]

“ও দেশে এই মতের লোক এক জন দেখেছি। সরী (সরস্বতী) পাথর—মেয়ে মানুষ। এ মতের লোকে পরস্পরের বাড়ীতে খায়, কিন্তু অন্য মতের লোকের বাড়ী খাবে না। মল্লিকরা সরী পাথরের বাড়ীতে গিয়ে খেলে, তবু হৃদের বাড়ীতে খেলে না। বলে ওরা ‘জীব’। (হাস্য)

“আমি এক দিন তার বাড়ীতে হৃদের সঙ্গে বেড়াতে গিছলাম। বেশ তুলসী বন করেছে। কড়াই মুড়ি দিলে, দুটী খেলুম। হৃদে অনেক খেয়ে ফেলে,—তার পর অসুখ !

“ওরা সিদ্ধাবস্থাকে বলে **সহজ** অবস্থা। এক থাকের লোক আছে, তারা ‘সহজ’ ‘সহজ’ করে চ্যাঁচায়। সহজাবস্থার দুটী লক্ষণ বলে। প্রথম—কৃষ্ণগন্ধ গায়ে থাকবে না। দ্বিতীয়—পদ্মের উপর অলি বসবে, কিন্তু মধু পান করবে না। ‘কৃষ্ণগন্ধ’ নাই—এর মানে ঈশ্বরের ভাব সমস্ত অন্তরে,—বাহিরে কোন চিহ্ন নাই,—হরিনাম পর্য্যন্ত মুখে নাই। আর একটীর মানে, কামিনীতে আসক্তি নাই—জিতেন্দ্রিয়।

“ওরা ঠাকুরপূজা, প্রতিমাপূজা, এ সব লাইক্ করে না,—জীবন্ত মানুষ চায়। তাইত ওদের এক থাকের লোককে বলে কর্ত্তাভজা, অর্থাৎ যারা কর্ত্তাকে—গুরুকে—ঈশ্বর বোধে ভজনা করে—পূজা করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও সর্বধর্মসমন্বয় ।

Why all Scriptures—all Religions—are true.

শ্রীরামকৃষ্ণ । দেখছো কত রকম মত ! মত, পথ । অনন্ত
মত, অনন্ত পথ ! ভবনাথ । এখন উপায় !

শ্রীরামকৃষ্ণ । একটা জোর করে ধরতে হয় । ছাদে গেলে পাকা
সিঁড়িতে উঠা যায়, এক খানা মইয়ে উঠা যায়, দড়ির সিঁড়িতে উঠা
যায়, এক গাছা দড়ি দিয়ে, এক গাছা বাঁশ দিয়ে, উঠা যায় । কিন্তু এতে
খানিকটা পা, ওতে খানিকটা পা দিলে হয় না । একটা দৃঢ় করে ধরতে
হয় । ঈশ্বর লাভ করতে হলে, একটা পথ জোর করে ধরে যেতে হয় ।

“আর সব মতকে এক একটী পথ বলে জানবে । আমার ঠিক পথ,
আর সকলের মিথ্যা, একরূপ বোধ না হয় । বিদ্বেষভাব না হয় ।

[‘আমি কোন্ পথের ?’ কেশব, শশধর ও বিজয়ের মত ।]

“আচ্ছা আমি কোন পথের ? কেশব সেন বলতো, আপনি
আমাদেরই মতের,—নিরাকারে আসছেন । শশধর বলে, ইনি আমাদের ।
বিজয়ও (গোস্বামী) বলে, ইনি আমাদের মতের লোক ।

ঠাকুর কি বলিতেছেন যে, আমি সব পথ দিয়াই ভগবানের নিকট
পৌঁছিয়াছি—তাই সব পথের খবর জানি ? আর সকল ধর্মের লোক
আমার কাছে এসে শান্তি পাবে ?

ঠাকুর পঞ্চবটীর দিকে মাফটার প্রভৃতি দুএকটী ভক্তের সঙ্গে
যাইতেছেন—মুখ ধুইবেন । বেলা বারটা, এইবার বান আসিবে ।
তাই শুনিয়া ঠাকুর পঞ্চবটীর পথে একটু অপেক্ষা করিতেছেন ।

[ভাব মহাভাবের গূঢ় তত্ত্ব । গঙ্গার জোয়ার ভাটা দর্শন ।]

ভক্তদের বলিতেছেন—‘জোয়ার ভাটা কি আশ্চর্য্য !’

“কিন্তু একটী দ্যাখো,—সমুদ্রের কাছে নদীর ভিতর জোয়ার ভাটা
খেলে । সমুদ্র থেকে অনেক দূর হলে এক টানা হয়ে যায় ! এর
মানে কি ?—ঐ ভাবটা আরোপ কর । যারা ঈশ্বরের খুব কাছে,

তাদের ভিতরই ভক্তি, ভাব, এই সব হয় ; আবার দু এক জনের (ঈশ্বরকোটির) মহাভাব, প্রেম—এ সব হয় ।

(মাষ্টারের প্রতি) আচ্ছা, জোয়ার ভাঁটা কেন হয় ?

মাষ্টার । ইংরাজী জ্যোতিষ শাস্ত্রে বলে যে, সূর্য ও চন্দ্রের আকর্ষণে ঐরূপ হয় । এই বলিয়া মাষ্টার মাটিতে অঙ্ক পাতিয়া পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্যের গতি দেখাইতেছেন । ঠাকুর একটু দেখিয়াই বলিতেছেন—‘থাক্, ওতে আমার মাথা ঝন্ ঝন্ করে !’

কথা কহিতে কহিতে বান ডাকিতে লাগিল । দেখিতে দেখিতে জলোচ্ছ্বাস-শব্দ হইতে লাগিল । ঠাকুরবাড়ীর তীরভূমি আঘাত করিতে করিতে উত্তর দিকে বান চলিয়া গেল ।

ঠাকুর একদৃষ্টে দেখিতেছেন । দূরের নৌকা দেখিয়া বালকের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন—দ্যাখো, দ্যাখো, ঐ নৌকাখানি বা কি হয় !

ঠাকুর পঞ্চবটীমূলে মাষ্টারের সহিত কথা কহিতে কহিতে আসিয়া পড়িয়াছেন । একটা ছাতা সঙ্গে, সেটা পঞ্চবটীর চাতালে রাখিয়া দিলেন । নারাণকে সাক্ষাৎ নারায়ণের মত দেখেন, তাই বড় ভাল বাসেন । নারাণ ইক্ষুলে পড়ে । এবার তাহারই কথা কহিতেছেন ।

[মাষ্টারকে শিক্ষা, টাকার সদ্যবহার । নারাণের জন্ম চিন্তা ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । নারাণের কেমন স্বভাব দেখেছ ? সকলের সঙ্গে মিশতে পারে—ছেলে বুড়ো সকলের সঙ্গে ! এটা বিশেষ শক্তি না হলে হয় না । আর সববাই তাকে ভালবাসে । আচ্ছা, সে ঠিক সরল কি ?

মাষ্টার । আজ্ঞা, খুব সরল বলে বোধ হয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তোমার ওখানে নাকি যায় ?

মাষ্টার । আজ্ঞা, দু এক বার গিছলো ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । একটা টাকা তুমি তাকে দেবে ? না কালীকে বলবো ?

মাষ্টার । আজ্ঞা, বেশ তো, আমি দিব ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । বেশতো—ঈশ্বরে যাদের অনুরাগ আছে, তাদের দেওয়া ভাল । টাকার সদ্যবহার হয় । সব সংসারে দিলে কি হবে ?

দক্ষিণেশ্বর । বাবুরাম, হরিশ, নিরঞ্জন প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ১৫৭

কিশোরীর ছেলে পুলে হয়েছে । কম মাহিনা—চলে না । ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন—‘নারাণ বলেছিল, কিশোরীর একটা কৰ্ম্ম করে দেবে । নারাণকে এক বার মনে করে দিও না ।’

মাষ্টার পঞ্চবটীতে দাঁড়াইয়া । ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ পরে ঝাউতলা হইতে ফিরিলেন । মাষ্টারকে বলিতেছেন—‘বাহিরে একটা মাদুর পাতে বোলোতো । আমি একটু পরে যাচ্ছি—একটু শোবো ।’

ঠাকুর ঘরে পৌঁছিয়া বলিতেছেন—“তোমাদের কারুরই ছাতাটা আন্তে মনে নাই । (সকলের হাশ্ব) । ব্যস্তবাগীশ লোক কাছের জিনিষও দেখতে পায় না । একজন আর একটা লোকের বাড়ীতে টিকে ধরাতে গিছলো, কিন্তু হাতে লঠন জ্বলছে !

“একজন গামছা খুঁজে খুঁজে তার পর দেখে, কাঁধেতেই রয়েছে !

[ঠাকুরের মধ্যাহ্ন-সেবা ও বাবুরামাদি সান্ধোপাঙ্গ ।]

ঠাকুরের জন্ম মা কালীর অন্নপ্রসাদ আনা হইল । ঠাকুর সেবা করিবেন । বেলা প্রায় একটা । আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিবেন । ভক্তরা তবুও ঘরে সব বসিয়া আছেন । বুঝাইয়া বলার পর বাহিরে গিয়া বসিলেন । হরীশ, নিরঞ্জন, হরিপদ, রান্না-বাড়ী গিয়া প্রসাদ পাইবেন । ঠাকুর হরীশকে বলিতেছেন, তোদের জন্ম আমসত্ত্ব নিয়ে যাস্ ।

ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিতেছেন । বাবুরামকে বলিতেছেন, বাবুরাম, কাছে একটু আয় না ? বাবুরাম বলিলেন, আমি পান সাজছি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন—রেখে দে পান সাজা ।

ঠাকুর বিশ্রাম করিতেছেন । এ দিকে বকুলতলায় ও পঞ্চবটী তলায় কয়েকটা ভক্ত বসিয়া আছেন,—মুখুয্যেরা, চুনীলাল, হরিপদ, ভবনাথ, তারক । তারক শ্রীবৃন্দাবন হইতে সবে ফিরিয়াছেন । ভক্তরা তাঁর কাছে বৃন্দাবনের গল্প শুনিতেছেন । তারক নিত্যগোপালের সহিত বৃন্দাবনে এতদিন ছিলেন ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

[ভক্তসঙ্গে সংকীৰ্ত্তনানন্দে । ভঙ্গসঙ্গে নৃত্য ।]

ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিয়াছেন । সম্প্রদায় লইয়া শ্যামদাস মাথুর কীর্ত্তন গাইতেছেন । গান—নাথ দরশসুখে ইত্যাদি ।

‘সুখময় সায়র, মরুভূমি ভেল । জলদ নেহারই, চাতকী মরি গেল।’

শ্রীমতীর এই বিরহদশা বর্ণনা শুনিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন । তিনি ছোট খাটটীর উপর নিজের আসনে ; বাবুরাম, নিরঞ্জন, রাম, মনমোহন, মাষ্টার, সুরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তেরা মেজেতে বসিয়া আছেন ! কিন্তু গান ভাল জমিতেছে না ।

কোল্লগরের নবাই চৈতন্যকে ঠাকুর কীর্ত্তন করিতে বলিলেন । নবাই মনমোহনের পিতৃব্য । পেনশন লইয়া কোল্লগরে গঙ্গাতীরে ভজন সাধন করেন । ঠাকুরকে প্রায় দর্শন করিতে আসেন ।

নবাই উচ্চ সঙ্কীৰ্ত্তন করিতেছেন । ঠাকুর আসন ত্যাগ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন । অমনি নবাই ও ভক্তেরা তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন । কীর্ত্তন বেশ জমিয়া গেল । মহিমাচরণ পর্য্যন্ত ঠাকুরের সঙ্গে নৃত্য করিতেছেন ।

কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর নিজের আসনে উপবেশন করিলেন । হরিনামের পর এবার আনন্দময়ী মায়ের নাম করিতেছেন । ঠাকুর ভাবে মত্ত হইয়া মার নাম করিতেছেন । নাম করিবার সময় উৰ্দ্ধদৃষ্টি ।

গান—গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ কোরো না ।

গান—ভাবিলে ভাবের উদয় হয় । যেমন ভাব, তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয় । যে জন কালীর ভক্ত জীবমুক্ত নিত্যানন্দময় ॥

কালীপদসুধাহ্রদে চিত্ত যদি রয় । পূজা হোম জপ বলি কিছুই কিছু নয় ॥

গান—তোদের খ্যাপার হাট বাজার মা (তারা) । কবো গুণের কথা কার মা তোদের ॥ গজ বিনে গো আরোহণে ফিরিস্ কদাচার । মণি মুক্তা ফেলে পরিস্ গলে নরশির হার ॥ শ্মশানে মশানে ফিরিস্ কার বা ধারিস্ ধার । রামপ্রসাদকে ভবঘোরে কর্ত্তে হবে পার ॥

দক্ষিণেশ্বর । নিরঞ্জন,মহিমা, রাম প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দে । ১৫৯

গান—গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায় ।

কালো কালী বলে আমার অঙ্গপা যদি ফুরায় ॥

গান—আপনাতে আপনি থেকে। মন, যেয়ো না কো কারু ঘরে ।

যা চাবি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে ॥

গান—মজলো আমার মনভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে ।

গান—যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে ।

মন তুই ছাখ, আর আমি দেখি,আর যেন কেউ নাহি দেখে ॥

ঠাকুর এই গানটী গাইতে গাইতে দণ্ডায়মান হইলেন । মার প্রেমে উন্মত্তপ্রায় ! ‘আদরিণী শ্যামা মাকে হৃদয়ে রেখো’ এ কথাটী যেন ভক্ত-দের বার বার বলিতেছেন ।

ঠাকুর এইবার যেন সুরাপানে মত্ত হইয়াছেন । নাচিতে নাচিতে আবার গান গাইতেছেন—

মা কি আমার কালো রে !

কালোরূপ দিগম্বরী, হৃদিপদ্ম করে আলো রে !

ঠাকুর গাইতে গাইতে বড় টলিতেছেন দেখিয়া নিরঞ্জন তাঁহাকে ধারণ করিতে গেলেন । ঠাকুর মৃদুস্বরে ‘য়্যাই ! শালা ছুঁস্নে’ বলিয়া বারণ করিতেছেন । ঠাকুর নাচিতেছেন দেখিয়া ভক্তেরা দাঁড়াইলেন । ঠাকুর মাফটারের হস্ত ধারণ করিয়া বলিতেছেন—‘য়্যাই শালা নাচ !’

[বেদান্তবাদী মহিমার প্রভুসঙ্গে সঙ্কীর্ণনে নৃত্য ও ঠাকুরের আনন্দ ।]

ঠাকুর নিজের আসনে বসিয়া আছেন । ভাবে গর্গর মাতোয়ারা !

ভাব কিঞ্চিৎ উপশম হইলে বলিতেছেন—ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ...

ওঁ কালী ! আবার বলিতেছেন, তামাক খাব । ভক্তেরা অনেকে দাঁড়াইয়া আছেন । মহিমাচরণ দাঁড়াইয়া ঠাকুরকে পাখা করিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি) । আপনারা বোসো ।

“আপনি বেদ থেকে একটু কিছু শুনাও । মহিমাচরণ আবৃত্তি করিতেছেন—‘জয় জজ্ঞমান’ ইত্যাদি ।

আবার মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতে স্তব আবৃত্তি করিতেছেন—

ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়, নমস্তে চিতে সর্বলোকাশ্রয়ায় ।
নমোহদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়, নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাস্ত্রতায় ॥ হ্রমেকং

শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং, ত্বমেকং জগৎপালকং স্বপ্রকাশম্ । ত্বমেকং
জগৎকর্তৃপাতৃপ্রহর্তু, ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্বিবকল্পম্ ॥ ভয়ানাং ভয়ং
ভীষণং ভীষণানাং, গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং । মহোচ্চৈঃ পদানাং
নিয়ন্তু ত্বমেকং, পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাম্ ॥ বয়স্ত্বাং স্মরামো
বয়স্ত্বান্তজামো, বয়স্ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ । সদেকং নিধানং নিরা-
লম্বমীশং, ভবাস্তোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥

ঠাকুর হাত জোড় করিয়া স্তব শুনিলেন । পাঠান্তে ভক্তিতরে নম-
স্কার করিলেন । ভক্তেরাও নমস্কার করিলেন ।

অধর কলিকাতা হইতে আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । আজ খুব আনন্দ হোলো ! মহিম
চক্রবর্তী এদিকে আসছে । হরিনামে আনন্দ কেমন দেখলে ! না ?
মাষ্টার । আজ্ঞা, হাঁ ।

মহিমাচরণ গানচর্চা করেন । তিনি আজ হরিনাম করেছেন, আর
কীর্তনসময়ে নৃত্য করিয়াছেন—তাই ঠাকুর আহ্লাদ করিতেছেন ।

সন্ধ্যা আগতপ্রায় । ভক্তেরা অনেকেই ক্রমে ক্রমে ঠাকুরকে প্রণাম
করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

[প্রবৃত্তি না নিবৃত্তি । অধরের কৰ্ম্ম । বিষয়ীর উপাসনা ও চাকরী]

সন্ধ্যা হইল । ফরাস দক্ষিণের লম্বা বারাণ্ডায় ও পশ্চিমের গোল
বারাণ্ডায় আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল । ঠাকুরের ঘরে প্রদীপ জ্বালা হইল
ও ধূনা দেওয়া হইল । কিয়ৎক্ষণ পরে চাঁদ উঠিলেন । মন্দিরপ্রাঙ্গণ,
উদ্যানপথ গঙ্গাতীর পঞ্চবটী, বৃক্ষশীর্ষ, জ্যোৎস্নায় হাসিতে লাগিল ।

ঠাকুর নিজাসনে বসিয়া আবিষ্ট হইয়া মার নাম ও চিন্তা
করিতেছেন

অধর আসিয়া বসিয়াছেন । ঘরে মাষ্টার ও নিরঞ্জনও আছেন ।
ঠাকুর অধরের সহিত কথা কহিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কি গো তুমি এখন এলে ! কত কীর্তন নাচ হয়ে গেল । শ্যামদাসের কীর্তন—রামের ওস্তাদ । কিন্তু আমার তত ভাল লাগলো না, উঠতে ইচ্ছা হলো না । ও লোকটার কথা তার পর শুনলাম । গোপীদাসের বদলো বলেছে—আমার মাথায় যত চুল, তত উপপত্নী করেছে ! (সকলের হাস্য) । তোমার কন্ম হলো না ?

অধর ডেপুটী—তিন শত টাকা বেতন পান । কলিকাতা মিউনিসিপালিটির Vice-chairmanএর কন্ম জন্ম দরখাস্ত করিয়াছিলেন—মাহিনা হাজার টাকা । কন্মের জন্ম অধর কলিকাতার অনেক বড় বড় লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন ।

[নিরুত্তিই ভাল । চাকরী জন্ম হীনবুদ্ধি বিষয়ীর উপাসনা ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টার ও নিরঞ্জনের প্রতি) । হাজার বলেছিল—অধরের কন্ম হবে, তুমি একটু মাকে বল । অধরও বলেছিল । আমি মাকে একটু বলেছিলাম—‘মা, এ তোমার কাছে আনাগোনা কচ্ছে, যদি হয় তো হোক না ।’ কিন্তু সেই সঙ্গে মাকে বলেছিলাম—‘মা, কি হীনবুদ্ধি ! জ্ঞান ভক্তি না চেয়ে তোমার কাছে এই সব চাচ্ছে !’

(অধরের প্রতি) কেন হীনবুদ্ধি লোকগুণোর কাছে অত আনাগোনা করলে ? এত দেখলে শুনলে !—সাতকাণ্ড রামায়ণ সীতা কার ভার্য্যে ! অমুক মল্লিক হীনবুদ্ধি । আমার মাহেশে যাবার কথায় চলতি নৌকা বন্দোবস্ত করেছিল,—আর বাড়ীতে গেলেই হুতুকে বলতো—হুতু, গাড়ী রেখেছো ?

অধর । সংসার করতে গেলে এ সব না করলে চলে না । আপনি ত বারণ করেন নাই ?

[উন্মাদের পর মাহিনা সই করণার্থ খাজাঞ্জীর আহ্বান-কথা ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । নিরুত্তিই ভাল—প্রহুত্তি ভাল নয় । এই অবস্থার পর আমার মাইনে সই করাতে ডেকেছিল—যেমন সবাই খাজাঞ্জির কাছে সই করে । আমি বললাম—তা আমি পারবো না । আমি ত চাচ্ছি না । তোমাদের ইচ্ছা হয় আর কারকে দাও ।

“এক ঈশ্বরের দাস !—আবার কার দাস হবে ?

“—মল্লিক, আমার খেতে বেলা হয় বলে, রাঁধবার বামুন ঠিক করে দিছলো । এক মাস এক টাকা দিছলো । তখন লজ্জা হলো । ডেকে পাঠালেই ছুটেতে হতো !—আপনি যাই, সে এক ।

“হীনবুদ্ধি লোকের উপাসনা । সংসারে এই সব—আরও কত কি !
[পূর্বকথা—উন্মাদের পর ঠাকুরের প্রার্থনা । সন্তোষ Contentment.]

“এই অবস্থা যাই হোলো, রকম সকম দেখে অমনি মাকে বললাম—মা, ঐ খানেই মোড় ফিরিয়ে দাও !—সুধামুখীর রান্না—আর না আর না—খেয়ে পায় রান্না ! (সকলের হাস্য)

[বাল্য—কামারপুকুরে ঈশ্বর ঘোষাল ডিপুটি দর্শন কথা ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । যার কর্ম কচ্ছ, তারই করো । লোকে পঞ্চাশ টাকা একশ টাকা মাইনের জন্য লালায়িত ! তুমি তিন শ টাকা পাচ্ছ । ওদেশে ডিপুটী আমি দেখেছিলাম । ঈশ্বর ঘোষাল । মাথায় তাজ—সব হাড়ে কাঁপে ! ছেলেবেলায় দেখেছিলাম । ডিপুটী কি কম গা !

“যার কর্ম কচ্ছ, তারই করো । এক জনের চাকরী কল্লেই মন খারাপ হয়ে যায়, আবার পাঁচ জনের !

[চাকরীর নিন্দা । শম্ভু ও মথুরের ধনের আদর । নরেন্দ্র Headmaster.]

“একজন স্ত্রীলোক একজন মুছলমানের উপর আসক্ত হয়ে, তার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য ডেকেছিল । মুছলমানটী সাধুলোক ছিল, সে বল্লে—আমি প্রস্তাব করবো, আমার বদনা আনতে যাই । স্ত্রীলোকটী বল্লে—তা এই খানেই হবে, আমি বদনা দিব এখন । সে বল্লে—তা হবে না । আমি যে বদনার কাছে একবার লজ্জা ত্যাগ করেছি, সেই বদনাই ব্যবহার করবো,—আবার নূতন বদনার কাছে নিলজ্জ হবো না । এই বলে সে চলে গেল । মাগীটারও আক্কেল হলো । সে বদনার মানে বুঝলে উপপত্তি ।

নরেন্দ্র পিতৃবিয়োগের পর বড়ই কষ্টে পড়িয়াছেন । মা ও ভাই-দের ভরণপোষণের জন্য তিনি কর্মকাজ খুঁজিতেছেন । বিদ্যাসাগরের বৌবাজার ইন্সকুলে দিন কতক হেড মাস্টারের কর্ম করিয়াছিলেন ।

অধর । আচ্ছা, নরেন্দ্র কর্ম করবে কি না ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ—সে করবে । মা ও ভাইরা আছে ।

অধর । আচ্ছা, নরেন্দ্রের পঞ্চাশ টাকাও চলে, এক শ টাকাও চলে । নরেন্দ্র এক শ টাকার জন্য চেষ্টা করবে কি না ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । বিষয়ীরা ধনের আদর করে,—মনে করে, এমন জিনিষ আর হবে না ! শম্ভু বলে—‘এই সমস্ত বিষয় তাঁর পাদপদ্মে দিয়ে যাব, এইটী ইচ্ছা ।’ তিনি কি বিষয় চান ? তিনি চান—জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য ।

“গয়না চুরির সময় সেজ বাবু বলে—‘ও ঠাকুর ! তুমি গয়না রক্ষা করতে পাল্লে না ? হংসেশ্বরী কেমন রক্ষা করেছিল !’

[সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম । মথুরের তালুক লিখে দিবার পরামর্শ ।]

“একখানা তালুক আমার নামে লিখে দেবে (সেজ বাবু) বলেছিল । আমি কালীঘর থেকে শুনলাম । সেজ বাবু আর হৃদে একসঙ্গে পরামর্শ করছিল । আমি এসে সেজ বাবুকে বললাম—‘গাথো, অমন বুদ্ধি কোরো না !—ওতে আমার ভারী হানি হবে ।’

অধর । যা বলছেন, সৃষ্টির পর থেকে ছটী সাতটী হৃদ ওরূপ হয়েছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কেন, ত্যাগী আছে বই কি ? ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করলেই লোকে জানতে পারে । এমনি আছে—লোকে জানে না । পশ্চিমে নাই ?

অধর । কলকাতার মধ্যে একটা জানি—**দেবেন্দ্র ঠাকুর** ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কি বলো !—ও যা ভোগ করেছে, অমন কে করেছে !—যখন সেজ বাবুর সঙ্গে ওর বাড়ীতে গেলাম, দেখলাম, ছোট ছোট ছেলে অনেক—ডাক্তার এসেছে, ঔষধ লিখে দিচ্ছে । যার আট ছেলে আবার মেয়ে, সে ঈশ্বরচিন্তা করবে না তো কে করবে ? এত ঐশ্বর্য্য ভোগ করার পর যদি ঈশ্বরচিন্তা না করতো, লোকে বলত, ধিক্ !

নিরঞ্জন । দ্বারকানাথ ঠাকুরের ধার উনি সব শোধ করেছিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । রেখে দে ও সব কথা ! আর জ্বালাস নে ! ক্ষমতা থেকেও যে বাপের ধার শোধ করে না, সে কি আর মানুষ ?

“তবে সংসারীরা একবারে ডুবে থাকে, তাদের তুলনায় খুব ভাল—তাদের শিক্ষা হবে ।

“ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত আর সংসারী ভক্ত অনেক তফাৎ । ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী—ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত—মৌমাছির মত । মৌমাছি ফুল বই আর কিছুতে বসবে না । মধুপান বই আর কিছু পান করবে না । সংসারী ভক্ত অন্য মাছির মত, সন্দেশেও বসছে, আর পচা ঘায়েও বসছে ! বেশ ঈশ্বরের ভাবেতে রয়েছে, আবার কামিনীকাঞ্চন লয়ে মত্ত হয় ।

“ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত চাতকের মত । চাতক স্বাতী নক্ষত্রের মেঘের জল বই আর কিছু খাবে না !—সাত সমুদ্র নদী ভরপুর ! সে অণু জল খাবে না ! কামিনীকাঞ্চন স্পর্শ করবে না । কামিনী-কাঞ্চন কাছে রাখবে না, পাছে আসক্তি হয় ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

[চৈতন্যদেব, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও লোকমান্য ।]

অধর । চৈতন্যও ভোগ করেছিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (চমৎকৃত হইয়া) । কি ভোগ করেছিলেন ?

অধর । অত পণ্ডিত ! কত মান !

শ্রীরামকৃষ্ণ । অন্তের পক্ষে মান । তাঁর পক্ষে কিছু নয় ।

“তুমিই আমায় মানো আর নিরঞ্জন মানে, আমার পক্ষে এক—সত্য করে বলছি । একজন টাকাওয়ালা লোক হাতে থাকবে, এ মনে হয় না । মনমোহন বলে—‘সুরেন্দ্র বলেছে, রাখাল এঁর কাছে থাকে—নালিশ চলে ।’ আমি বললাম, কেরে সুরেন্দ্র ? তার সতরঞ্চ আর বালিস এখানে আছে ! আর সে টাকা দেয় ?

অধর । দশ টাকা করে গাসে বুঝি দেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । দশ টাকায় দুমাস হয় । ভক্তেরা এখানে থাকে—সে ভক্তসেবার জন্ত দেয় । সে তার পুণ্য, আমার কি ? আমি যে রাখাল নরেন্দ্র এদের ভালবাসি, সে কি কোন নিজের লাভের জন্ত ?

মার্টার । মার ভালবাসার মত ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । মা তবু চাকরী করে খাওয়াবে বলে অনেকটা করে ।

আমি এদের যে ভালবাসি, সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখি !—কথায় নয় ।

[ঠিক ঠিক ত্যাগীর ভার ঈশ্বর লন । ‘অনন্তাশ্চিন্তয়ন্তঃ’ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (অধরের প্রতি) । শোনো ! আলো জ্বালে বাতুলে পোকার অভাব হয় না ! তাঁকে লাভ করলে তিনি সব জোগাড় করে দেন—কোন অভাব রাখেন না । তিনি হৃদয়মধ্যে এলে সেবা করবার লোক অনেক এসে জোটে !

“একটি ছোকরা সন্ন্যাসী গৃহস্থ বাড়ী ভিক্ষা করতে গিছিল । সে আজন্ম সন্ন্যাসী । সংসারের বিষয় কিছু জানে না । গৃহস্থের একটি যুবতী মেয়ে এসে ভিক্ষা দিলে । সন্ন্যাসী বললে, মা এর বুকে কি ফোড়া হয়েছে ? মেয়েটির মা বললে, না বাবা ! ওর পেটে ছেলে হবে বলে ঈশ্বর স্তন করে দিয়েছেন—ঐ স্তনের দুধ ছেলে খাবে । সন্ন্যাসী তখন বললে, তবে আর ভাবনা কি ! আমি আর কেন ভিক্ষা করবো ? যিনি আমায় সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমায় খেতে দেবেন ।

“শোনো ! যে উপপতির জন্ম সব ত্যাগ করে এলো, সে বলবে না, শালা, তোর বুকে বসবো আর খাব !

[তোতাপুরীর গল্প—রাজার সাধুসেবা । কাশীর দুর্গাবাড়ীর নিকট নানকপন্থীর মঠে ঠাকুরের মোহন্তদর্শন ১৮৬৮ খৃঃ ।]

“গাঙটা বললে, কোন্ রাজা সোণার থালা, সোণার গেলাস দিয়ে সাধুদের খাওয়ালে । কাশীতে মঠে দেখলাম, মোহন্তর কত মান—বড় বড় খোট্টারা হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে, আর বলছে, কি আচ্ছা !

“ঠিক ঠিক সাধু—ঠিক ঠিক ত্যাগী—সোণার থালও চায় না, মানও চায় না । তবে ঈশ্বর তাদের কোন অভাব রাখেন না । তাঁকে পেতে গেলে যা যা দরকার, সব যোগাড় করে দেন । (সকলে নিঃশব্দ) ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আপনি হাকিম—কি বোলবো !—যা ভাল বোঝ তাই কোরো । আমি মূর্খ । অধর (সহাস্তে, ভক্তদিগকে) উনি আমাকে একজামিন কচ্ছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । নিরুত্তিই ভাল ! জাখো না, আমি সই কল্লাম না । ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু ।

হাজরা আসিয়া ভক্তদের কাছে মেজেতে বসিলেন । হাজরা কখন কখন ‘সোহং সোহং’ করেন । লাটু প্রভৃতি ভক্তদের বলেন, ‘তঁাকে পূজা করে কি হয় !—তঁারই জিনিষ তঁাকে দেওয়া !’ এক দিন নরেন্দ্রকেও তিনি ঐ কথা বলিয়াছিলেন । ঠাকুর হাজরাকে বলিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । লাটুকে বলেছিলাম, কে করে ভক্তি করে ।

হাজরা । ভক্ত আপনি আপনাকেই ডাকে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । এ তো খুব উচু কথা । বলি রাজাকে বৃন্দাবলী বলে-
ছিলেন, তুমি ব্রহ্মণ্যদেবকে কি ধন দেবে ?

“তুমি যা বলছ, ঐ টুকুর জন্মই সাধন ভজন—তঁার নামগুণগান ।

“আপনার ভিতর আপনাকে দেখতে পেলে ত সব হয়ে গেল ! ঐটী দেখতে পাবার জন্মই সাধনা । আর ঐ সাধনার জন্মই শরীর । যতক্ষণ না স্বর্ণপ্রতিমা ঢালাই হয়, ততক্ষণ মাটির ছাঁচের দরকার হয়ে গেলে মাটির ছাঁচটা ফেলে দেওয়া যায় । ঈশ্বরদর্শন হলে শরীর ত্যাগ করা যায় ।

“তিনি শুধু অন্তরে নয় । অন্তরে বাহিরে ! কালীঘরে মা আমাকে দেখালেন সবই চিন্ময় !—মা-ই সব হয়েছেন !—প্রতিমা, আমি, কোশা, কুশী, চুমকী, চৌকাট, মার্বেল পাথর,—সব চিন্ময় !

“এইটী সাক্ষাৎকার করবার জন্মই তঁাকে ডাকা—সাধন ভজন—
তঁার নামগুণ কীর্তন ! এইটীর জন্মই তঁাকে ভক্তি করা । ওরা (লাটু
প্রভৃতি) এমনি আছে—এখনও অতো উচ্চ অবস্থা হয় নাই । ওরা ভক্তি
নিয়ে আছে । আর ওদের (সোহং ইত্যাদি) কিছু বোলো না ।

পাখী যেমন শাবকদের পক্ষাচ্ছাদন করিয়া রক্ষা করে, দয়াময়
গুরুদেব ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেইরূপে ভক্তদের রক্ষা করিতেছেন !

অধর ও নিরঞ্জন জলযোগ করিতে বারান্দায় গেলেন । জল খাইয়া
ঘরে ফিরিলেন । মাষ্টার ঠাকুরের কাছে মেজেতে বসিয়া আছেন ।

[চারটে পাস ব্রাহ্ম ছোকরার কথা—‘এঁর সঙ্গে আবার তর্ক বিচার’ ।]

অধর (সহাস্তে) । আমাদের এত কথা হলো, ইনি (মাষ্টার)
একটীও কথা কন নাই ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কেশবের দলের একটী চারটে-পাশ করা ছোকরা

(বরদা ?) সববাই আমার সঙ্গে তর্ক করছে, দেখে—কেবল হাঁসে ।
আর বলে এঁর সঙ্গে আবার তর্ক ! কেশব সেনের ওখানে আর একবার
তাকে দেখলাম—কিন্তু তেমন চেহারা নাই ।

রাম চক্রবর্তী—বিষ্ণুঘরের পূজারী—ঠাকুরের ঘরে আসিলেন ।
ঠাকুর বলিতেছেন—‘ছাখো রাম ! তুমি কি দয়ালকে বলেছ মিছরির
কথা ? না-না ও আর বলে কাজ নাই । অনেক কথা হয়ে গেছে ।’

[ঠাকুরের রাত্রে আহাৰ । ‘সকলের জিনিস খেতে পারি না’ ।]

রাত্রে ঠাকুরের আহাৰ একখানি দুগানি মা কালীর প্রসাদী লুচি ও
একটু স্নজির পায়েস । ঠাকুর মেজেতে আসনে সেবা করিতে বসিয়াছেন ।
কাছে মাষ্টার বসিয়া আছেন, লাটু ও ঘরে আছেন । ভক্তেরা সন্দেশাদি
মিষ্টান্ন আনিয়াছিলেন । সন্দেশ একটা স্পর্শ করিয়া ঠাকুর লাটুকে
বলিতেছেন—‘এ কোন্ শালার সন্দেশ ?’—বলিয়াই স্নজির পায়েসের
বাটী হইতে নীচে ফেলিয়া দিলেন । (মাষ্টার ও লাটুর প্রতি) ‘ও আমি
সব জানি । ঐ আনন্দ চাটুয্যাদের ছোকরা এনেছে—যে ঘোষপাড়ার
মাগীর কাছে যায় ।’ লাটু বলিতেছেন, এ গজা দিব ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । কিশোরী এনেছে । লাটু । এ আপনার চলবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । হাঁ ।

মাষ্টার ইংরাজী পড়া লোক । ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । সকলের খেতে পারি না । তুমি এ সব মানো ?

মাষ্টার—‘আজ্ঞা, ক্রমে সব মানতে হবে ।’ শ্রীরামকৃষ্ণ—‘হাঁ ।’

ঠাকুর পশ্চিমের দিকের গোল বারান্দাটিতে হাত ধুইতে গেলেন ।
মাষ্টার হাতে জল ঢালিয়া দিতেছেন ।

শরৎকাল । চন্দ্র উদয় হওয়াতে নিম্নল আকাশ ও ভাগীরথীবক্ষ
ঝকমক করিতেছে । ভাঁটা পড়িয়াছে—ভাগীরথী দক্ষিণবাহিনী । মুখ
ধুইতে ধুইতে মাষ্টারকে বলিতেছেন—‘তবে নারায়ণকে টাকাটা দেবে
মাষ্টার বলিতেছেন—‘যে আজ্ঞা—দেবো বইকি ।’

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থভাগ, অষ্টাদশখণ্ড সমাপ্ত ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত । [1884, 14th September

চতুর্থ ভাগ—উনবিংশ অঙ্ক ।

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও । শশধরের গুরু জ্ঞান ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ্ন-সেবার পর দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে ভক্তসঙ্গে ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন । আজ নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তেরা কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন । মুখুর্যো ভ্রাতৃদ্বয়, জ্ঞান বাবু, ছোট গোপাল, বড় কালী প্রভৃতি এরাও আসিয়াছেন । কোন্নগর হইতে তিন চারিটি ভক্ত আসিয়াছেন । রাখাল শ্রীবৃন্দাবনে বলরামের সহিত আছেন । তাঁহার জ্বর হইয়াছিল—সংবাদ আসিয়াছে । আজ রবিবার ৩০ ভাদ্র ১২৯১, কৃষ্ণা দশমী তিথি, ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ ।

নরেন্দ্র পিতৃবিয়োগের পর মা ও ভাইদের লইয়া বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন । তিনি আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবেন ।

জ্ঞানবাবু চারটে পাশ করিয়াছেন ও সরকারে কর্ম করেন । তিনি ১০টা ১১টার সময় আসিয়াছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (জ্ঞানবাবু দৃষ্টে) । কিগো, হঠাৎ যে জ্ঞানোদয় !

জ্ঞান (সহাস্তে) । আজ্ঞা অনেক ভাগ্যে জ্ঞানোদয় হয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । তুমি জ্ঞান হয়ে অজ্ঞান কেন ? ও, বুঝেছি, যেখানে জ্ঞান, সেইখানেই অজ্ঞান ! বশিষ্ঠদেব অতো জ্ঞানী,—পুত্র-শোকে কেঁদেছিলেন ! তাই তুমি জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও । অজ্ঞান কাঁটা পায় ফুটেছে—তুলবার জন্য জ্ঞান কাঁটার দরকার । তার পর তোলা হলে দুই কাঁটাই ফেলে দেয় ।

[নির্লিপ্ত গৃহস্থ । ঠাকুরের জন্মভূমিতে ছুতোরদের মেয়েদের কাযদর্শন ।]

‘এই সংসার ধোঁকার টাটী—জ্ঞানী বলছে । যিনি জ্ঞান অজ্ঞানের পার, তিনি বলেছেন ‘মজার কুঠি’ । সে ছাথে, ঈশ্বরই জীব জগৎ, এই চতুবিংশতি তত্ত্ব সব হয়েছেন !

দক্ষিণেশ্বর । নরেন্দ্র, ভবনাথ, ছোটগোপাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ১৬৯

“তাকে লাভ করার পর সংসার করা যেতে পারে । তখন নির্লিপ্ত হতে পারে । ও দেশে ছুতোরদের মেয়েদের দেখেছি—ঢেকি নিয়ে চিড়ে কোটে । এক হাতে ধান নাড়ে, এক হাতে ছেলেকে মাই দায়—আবার খরিদদারের সঙ্গে কথাও কছে,—‘তোমার কাছে দু আনা পাওনা আছে—দাম দিয়ে যেও ।’ কিন্তু তার বার আনা মন হাতের উপর—পাছে হাতে ঢেকি পড়ে যায় !

“বার আনা মন ঈশ্বরেতে রেখে চার আনা লয়ে কাজ কর্ম করা ।

শ্রীযুত পণ্ডিত শশধরের কথা ভক্তদের বলিতেছেন, দেখলাম—একঘেয়ে, কেবল শুষ্ক জ্ঞান-বিচার নিয়ে আছে ।

“যে নিত্যতে পৌঁছে লীলা নিয়ে থাকে, আবার লীলা থেকে নিত্যে যতে পারে, তারই পাকা জ্ঞান, পাকা ভক্তি ।

‘নারদাদি ব্রহ্মজ্ঞানের পর ভক্তি নিয়েছিলেন । এরি নাম বিজ্ঞান ।

“শুধু শুষ্ক জ্ঞান !—ও যেন ভস্ করে ওঠা তুবড়ী—খানিকটা ফুল কেটে ভস্ করে ভেঙ্গে যায় । নারদ শুকদেবাদের জ্ঞান যেন ভাল তুবড়ী । খানিকটা ফুল কেটে বন্ধ হয়, আবার নূতন ফুল কাটছে—আবার বন্ধ হয়—আবার নূতন ফুল কাটে ! নারদ শুকদেবাদের তাঁর উপর প্রেম হয়েছিল । প্রেম সচ্চিদানন্দকে ধরবার দড়ি ।”

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বকুলতলায় । ঝাউতলা হতে ভাবাবিষ্ট ।]

মধ্যাহ্নের সেবার পর ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিয়াছেন ।

বকুলতলায় বেঞ্চের মত যে বসিবার স্থান আছে, সেখানে দুই চারিজন ভক্ত উপবিষ্ট আছেন ও গল্প করিতেছেন—ভবনাথ, মুখুষ্যে ভ্রাতৃদ্বয়, মাফটার, ছোট গোপাল, হাজরা প্রভৃতি । ঠাকুর ঝাউতলায় যাইতেছেন—ওখানে আসিয়া একবার বসিলেন ।

হাজরা (ছোটগোপালকে) । এঁকে একটু তামাক খাওয়াও ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । তুমি খাবে তাই বল ! (সকলের হাস্য) ।

মুখুষ্যে (হাজরাকে) । আপনি এঁর কাছে থেকে অনেক শিখেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) না, এঁর বাল্যকাল থেকেই এই অবস্থা (সকলের হাস্য) ।

ঠাকুর ঝাউতলা হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন—ভক্তেরা দেখিলেন ।
ভাবাবিষ্ট । মাতালের ন্যায় চলিতেছেন । যখন ঘরে পৌঁছিলেন,
তখন আবার প্রকৃতিস্থ হইলেন ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

নারা'নের জন্ম ঠাকুরের ভাবনা । কোন্নগরের ভক্তগণ ।

শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি ও নরেন্দ্রের গান ।]

ঠাকুরের ঘরে অনেক ভক্ত সমাগত হইয়াছেন ।

কোন্নগরের ভক্তদের মধ্যে একজন সাধক নূতন আসিয়াছেন—
বয়ঃক্রম পঞ্চাশের উপর । দেখিলে বোধ হয়, ভিতরে খুব পাণ্ডিত্য-
ভিমান আছে । কথা কহিতে কহিতে তিনি বলিতেছেন—‘সমুদ্র
মন্ত্রনের আগে কি চন্দ্র ছিল না ? এ সব মীমাংসা কে করবে ।’

(মাষ্টার, সহাস্তে) । ‘ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন মুণ্ডমালা কোথায়
পেলি !’ সাধক (বিরক্ত হইয়া) । ও আলাদা কথা ।

ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া ঠাকুর মাষ্টারকে হঠাৎ বলিতেছেন, ‘সে
এসেছিল—নারাণ ।’

নরেন্দ্র বারাণ্ডায় হাজরা প্রভৃতির সহিত কথা কহিতেছিলেন—
বিচারের শব্দ ঠাকুরের ঘর হইতে শুনা যাইতেছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । খুব বক্তে পারে ! এখন বাড়ীর ভাবনায় বড়
পড়েছে । মাষ্টার । আজ্ঞা, হাঁ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । বিপদকে সম্পদ জ্ঞান করবে বলেছিল কি না । কি ?

মাষ্টার । আজ্ঞা, মনের বলটা খুব আছে ।

বড়কালী । কোন্টা কম ? [ঠাকুর নিজের আসনে বসিয়াছেন ।

কোন্নগরের একটি ভক্ত ঠাকুরকে বলিতেছেন—মহাশয়, ইনি
(সাধক) আপনাকে দেখতে এসেছেন—এঁর কি কি জিজ্ঞাস্য আছে ।

সাধক দেহ ও মস্তক উন্নত করিয়া বসিয়া আছেন ।

সাধক । মহাশয়, উপায় কি ?

দক্ষিণেশ্বর । নরেন্দ্র ভবনাথ প্রভৃতি ও কোন্নগরের ভক্তসঙ্গে । ১৭১

[ঈশ্বর দর্শনের উপায়, গুরুবাক্যে বিশ্বাস । শাস্ত্রের ধারণা কখন]

শ্রীরামকৃষ্ণ । গুরুবাক্যে বিশ্বাস । তাঁর বাক্য ধরে ধরে গেলে ভগবান্কে লাভ করা যায় । যেমন সূতোর খি ধরে ধরে গেলে বস্ত্রলাভ হয় । সাধক । তাঁকে কি দর্শন করা যায় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । তিনি বিষয়বুদ্ধির অগোচর । কামিনীকাঞ্চনে আসক্তির লেশ থাকলে তাঁকে পাওয়া যায় না । কিন্তু শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধির, গোচর—যে মনে, যে বুদ্ধিতে, আসক্তির লেশমাত্র নাই । শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি, আর শুদ্ধ আত্মা,—একই জিনিষ ।

সাধক । কিন্তু শাস্ত্রে বলছে,—‘যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ’,—তিনি বাক্য মনের অগোচর ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ও থাক্ থাক্ ! সাধন না করলে শাস্ত্রের মানে বোঝা যায় না । সিদ্ধি সিদ্ধি বলে কি হবে ? পণ্ডিতেরা শ্লোক সব ফড়্ ফড়্ করে বলে—কিন্তু তাতে কি হবে ? সিদ্ধি গায় মাথলেও নেশা হয় না—খেতে হয় !

‘শুধু বলে কি হবে ‘দুধে আছে মাখন’, ‘দুধে আছে মাখন’ ? দুধকে দই পেতে মন্থন কর, —তবে ত হবে !

সাধক । মাখন তোলা,—ও সব ত শাস্ত্রের কথা ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । শাস্ত্রের কথা বলে বা শুনলে কি হবে ? —ধারণা করা চাই । পাঁজিতে লিখেছে বিশ আড়া জল, পাঁজি টিপ্লে একটুও পড়ে না ।

সাধক । মাখন তোলা—আপনি তুলেছেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমি কি—করেছি আর না করেছি—সে কথা থাক । আর এ সব কথা বোঝান বড় শক্ত । কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে—ঘি কি রকম খেতে । তার উত্তর—কেমন ঘি, না যেমন ঘি ।

“এসব জান্তে গেলে সাধুসঙ্গ দরকার । কোন্টা কফের নাড়ী, কোন্টা পিত্তের নাড়ী, কোন্টা বায়ুর নাড়ী—এটা জান্তে গেলে বৈদ্যের সঙ্গে থাকা দরকার ।

সাধক । কেউ কেউ অন্তের সঙ্গে থাকতে বিরক্ত হয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । সে জ্ঞানের পর—ভগবান লাভের পর । আগে সাধু-

সঙ্গ চাই না ?

সাধক চুপ করিয়া আছেন ।

সাধক (কিয়ৎক্ষণ পরে, গরম হইয়া) । আপনি তাঁকে জানতে পেরেছেন বলুন—প্রত্যক্ষেই হোক আর অনুভবেই হোক । ইচ্ছা হয় পারেন বলুন, না হয় না বলুন

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈষৎ হাসিতে হাসিতে) । কি বোলবো ! কেবল আভাস বলা যায় । সাধক । তাই বলুন !

নরেন্দ্র গান গাহিবেন । নরেন্দ্র বলিতেছেন, পাখোয়াজটা আন্লে না ।

ছোট গোপাল । মহিম (মহিমাচরণ) বাবুর আছে—

শ্রীরামকৃষ্ণ । না ওর জিনিষ এনে কাজ নাই ।

আগে কোন্নগরের একটি ভক্ত কালোরাতি গান গাইতেছেন ।

গানের সময় ঠাকুর সাধকের অবস্থা এক একবার দেখিতেছেন । গায়ক নরেন্দ্রের সহিত গান বাজনা সম্বন্ধে ঘোরতর তর্ক করিতেছে ।

সাধক গায়ককে বলছেন, তুমিও ত বাপু কম নও ! এ সব তর্কে কি দরকার ! আর একজন তর্কে যোগ দিয়াছিলেন ।—ঠাকুর সাধককে বলিতেছেন, “আপনি এঁকে কিছু বোকলেন না ?”

শ্রীরামকৃষ্ণ কোন্নগরের ভক্তদের বলছেন, “কই, আপনাদের সঙ্গে ও এঁর ভাল বনে না দেখছি ।” নরেন্দ্র গান গাইতেছেন ।

গান—যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে,

আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে ।

সাধক গান শুনিতে শুনিতে ধ্যানস্থ হইয়াছেন । ঠাকুরের তত্ত্বা-পোষের উত্তরে দক্ষিণাশ্র হইয়া বসিয়া আছেন । বেলা ৩টা—৪টা হইবে—পশ্চিমের রৌদ্র আসিয়া তাঁহার গায়ে পড়িয়াছে । ঠাকুর তাড়াতাড়ি একটি ছাতি লইয়া তাঁহার পশ্চিম দিকে রাখিলেন । যাহাতে রৌদ্র সাধকের গায়ে না লাগে । নরেন্দ্র গান গাইতেছেন—

মলিন পঙ্কিল মনে কেমন ডাকিব তোমায় ।

পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত অনল যথায় ॥ তুমি পুণ্যের আধার,
জ্বলন্ত-অনলসম । আমি পাপী তৃণসম, কেমনে পূজিব তোমায় ॥
শুনি তব নামের গুণে, তরে মহাপাপী জনে । লইতে পবিত্র নাম,

কাঁপে হে মম হৃদয় ॥ অভ্যস্ত পাপের সেবায়, জীবন চলিয়া যায় ।
কেমনে করিব আমি পবিত্র পথ আশ্রয় ॥ এ পাতকী নরাধমে, তার
যদি দয়াল নামে । বল করে কেশে ধরে, দাও চরণে আশ্রয় ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

[নরেন্দ্রাদির শিক্ষা । ‘বেদবেদান্তে কেবল আভাস’ ।]

গান—সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে ।

বহিছে অমৃতধার জুড়ায় শ্রবণ, ও প্রাণ রমণ হে ॥

গভীর বিষাদরাশি, নিমেষে বিনাশে, যখনি তব নামসুধা শ্রবণে পরষে ;
হৃদয় মধুময় তব নাম গানে, হয় হে হৃদয়নাথ চিদয়নাথ চিদানন্দ ঘন হে ॥

নরেন্দ্র যাই গাইলেন—‘হৃদয় মধুময় তব নাম গানে’, ঠাকুর অমনি
সমাধিস্থ । সমাধির প্রারম্ভে হস্তের অঙ্গুলি, বিশেষতঃ বৃদ্ধাঙ্গুলি,
স্পন্দিত হইতেছে । কোন্নগরের ভক্তেরা ঠাকুরের সমাধি কখন দেখেন
নাই । ঠাকুর চুপ করিলেন দেখিয়া তাঁহারা গাত্রোত্তান করিতেছেন ।

ভবনাথ । আপনারা বহুন না । এঁর সমাধি অবস্থা ।

কোন্নগরের ভক্তেরা আবার আসন গ্রহণ করিলেন । নরেন্দ্র
গাইতেছেন—দিবানিশি করিয়া যতন হৃদয়েতে র’চেছি আসন,

জগতপতি হে কৃপা করি, সেথা কি করিবে আগমন ।

ঠাকুর ভাবাবেশে নীচে নামিয়া মেজেতে নরেন্দ্রের কাছে বসিলেন ।

গান—চিদাকাশে হ’লো পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে ।

উথলিল প্রেমসিঙ্ঘু কি আনন্দময় হে ॥

জয় দয়াময় ! জয় দয়াময় ! জয় দয়াময় !

‘জয় দয়াময়’ এই নাম শুনিয়া ঠাকুর দণ্ডায়মান, আবার সমাধিস্থ ।

অনেকক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার মেজেতে মাদুরের
উপর বসিলেন । নরেন্দ্র গান সমাপ্ত করিয়াছেন—তানপুরা যথাস্থানে রাখা
হইয়াছে । ঠাকুরের এখনও ভাবাবেশ রহিয়াছে । ভাবাবস্থাতেই
বলিতেছেন, “এ কি বল দেখি মা, মাখন তুলে মুখের কাছে ধরো !

নরেন্দ্র (সহাস্যে) । কি, হাতী নারায়ণ ?—সবই নারায়ণ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) । তিনিই বিদ্যা অবিদ্যা রূপে লীলা কচ্ছেন ।
দুইই আমি প্রণাম করি । চণ্ডীতে আছে, ‘তিনি লক্ষ্মী আবার হতভাগার
ঘরে অলক্ষ্মী ।’ (ভবনাথের প্রতি) এটা কি বিষ্ণুপুরাণে আছে ?

ভবনাথ (সহাস্যে) । আজ্ঞা, তা জানি না । কোন্নগরের ভক্তরা
আপনার সমাধি অবস্থা আসছে বুঝতে না পেরে উঠে যাচ্ছিল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কে আবার বলছিলো—তোমরা বোসো ।

ভবনাথ (সহাস্যে) । সে আমি !

শ্রীরামকৃষ্ণ । তুমি বাছা ঘটতেও যেমন, আবার তাড়াতেও তেমনি !

গায়কের সঙ্গে নরেন্দ্রের তর্ক হইয়াছিল,—সেই কথা হইতেছে ।

[Doctrine of Non-resistance and Sri Ramakrishna.

নরেন্দ্রের প্রতি উপদেশ—সত্ত্বের তমঃ । হরিনাম মাহাত্ম্য ।]

মুখ্যো । নরেন্দ্র ছাড়েন নাই ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । না, এরূপ রোখ চাই ! একে বলে সত্ত্বের তমঃ ।
লোকে যা বলবে তাই কি শুনতে হবে ? বেশ্যাকে কি বলবে, আচ্ছা যা
হয় তুমি করো । তা হলে বেশ্যার কথা শুনতে হবে ? মান করাতে এক
জন সখি বলেছিল, ‘শ্রীমতীর অহঙ্কার হয়েছে’ । বৃন্দে বল্লে, এ ‘অহং’
কা’র ?—এ তাঁরই অহং । কৃষ্ণের গরবে গরবিনী ।

এইবার হরিনাম মাহাত্ম্যের কথা হইতেছে ।

ভবনাথ । হরিনামে আমার গা যেন খালি হয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । যিনি পাপ হরণ করেন তিনিই হরি । হরি ত্রিতাপ হরণ
করেন ।

“আর চৈতন্যদেব হরিনাম প্রচার করেছিলেন—অতএব ভাল । দেখো
চৈতন্যদেব কত বড় পণ্ডিত—আর তিনি অবতার—তিনি যে কালে এই
নাম প্রচার করেছিলেন এ অবশ্য ভাল । (সহাস্যে) চাষারা নিমন্ত্রণ
খাচ্ছে—তাদের জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমরা আমড়ার অম্বল খাবে !
তারা বল্লে, বাবুরা যদি খেয়ে থাকেন তা হলে আমাদের দেবেন । তাঁরা
যেকালে খেয়ে গেছেন সেকালে ভালই হয়েছে । (সকলের হাস্য) ।

দক্ষিণেশ্বর । নরেন্দ্র, ভবনাথ, হাজরা প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ১৭৭

[শিবনাথকে দেখিবার ইচ্ছা । মহেন্দ্রের তীর্থযাত্রা প্রস্তাব ।]

ঠাকুর শিবনাথ (শাপ্তী) কে দেখিতে যাইবেন ইচ্ছা হইয়াছে—
তাই মুখ্যোদের বলিতেছেন, ‘একবার শিবনাথকে দেখতে যাবো—
তোমাদের গাড়ীতে গেলে আর ভাড়া লাগবে না ।’

মুখ্যো । যে আজ্ঞা, তাই এক দিন ঠিক করা যাবে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) । আচ্ছা, আমাদের কি লাইক্ like
করবে ? অতো ওরা (ব্রাহ্মভক্তেরা) সাকার বাদাদের নিন্দা করে ।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মুখ্যো তীর্থ যাত্রা করিবেন—ঠাকুরকে জানাইতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) । সে কি গো ! প্রেমের অঙ্কুর না হতে হতে
যাচ্ছে ? অঙ্কুর হবে তার পর গাছ হবে, তার পর ফল হবে । তোমার
সঙ্গে বেশ কথাবার্তা চলছিল ।

মহেন্দ্র । আজ্ঞা, একটু ইচ্ছা হয়েছে ঘুরে আসি । আবার শীঘ্র ফিরে
আসবো ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

নরেন্দ্রের ভক্তি । যদুমল্লিকের বাগানে ভক্তসঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব ।

অপরাক্ষ হইয়াছে । বেলা ৫টা হইবে । ঠাকুর গাত্রোথান করিলেন ।
ভক্তেরা বাগানে বেড়াইতেছেন । অনেকে শীঘ্র বিদায় লইবেন ।

ঠাকুর উত্তরের বারাণ্ডায় হাজরার সহিত কথা কহিতেছেন । নরেন্দ্র
আজকাল, গুহদের বড় ছেলে অনন্দের কাছে, প্রায় যান ।

হাজরা । গুহদের ছেলে অনন্দা শুনলাম বেশ কঠোর করছে । সামান্য
সামান্য কিছু খেয়ে থাকে । চার দিন অন্তর অন্ন খায় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । বল কি ! ‘কে জানে কোন ভেক্সে নারায়ণ মিল্ যায় !’

হাজরা । নরেন্দ্র আগমনী গাইলে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্যস্ত হইয়া) । কি রকম ?

কিশোরী কাছে দাঁড়াইয়া । ঠাকুর বলছেন—তুই ভাল আছিস ?

ঠাকুর পশ্চিমের গোল বারাণ্ডায় । শরৎকাল । গেরুয়া রঙে ছোপান

একটী ফ্লানেলের জামা পরিতেছেন ও নরেন্দ্রকে বলছেন, তুই আগমনী গেয়েছিস্ ? গোল বারান্দা হইতে নামিয়া নরেন্দ্রের সঙ্গে গঙ্গার পোস্তার উপর আসিলেন । সঙ্গে মাফ্টার । নরেন্দ্র গান গাইতেছেন ।

গান । কেমন করে পরের ঘরে, ছিলি উমা বল মা তাই । কত লোকে কত বলে শুনে প্রাণে মরে যাই ॥ চিত্তাভঙ্গ্য মেখে অঙ্গে, জামাই বেড়ায় মহারঙ্গে । তুই নাকি মা তারই সঙ্গে,—সোনার অঙ্গে মাখিস ছাই ॥ কেমনে মা ধৈর্য্য ধরে, জামাই নাকি ভিক্ষা করে । এবার নিতে এলে পরে, বলব উমা ঘরে নাই ॥

ঠাকুর দাঁড়াইয়া শুনিতেছেন । শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট ।

এখনও একটু বেলা আছে । সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে দেখা যাইতেছেন । ঠাকুর ভাবাবিষ্ট । তাঁহার এক দিকে উত্তরবাহিনী গঙ্গা—কিয়ৎক্ষণ হইল জোয়ার আসিয়াছে । পশ্চাতে পুষ্পোদ্ভান । ডানদিকে নবৎ ও পঞ্চবটী দেখা যাইতেছে । কাছে নরেন্দ্র দাঁড়াইয়া—গান গাইতেছেন । সন্ধ্যা হইল ।

নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন । ঠাকুর ঘরে আসিয়াছেন ও জগন্মাতার নাম ও চিন্তা করিতেছেন ।

শ্রীযুক্ত যদু মল্লিক পার্শ্বের বাগানে আজ আসিয়াছেন । বাগানে আসিলে প্রায় ঠাকুরকে লোক পাঠাইয়া লইয়া যান । আজ লোক পাঠাইয়াছেন—ঠাকুরের যাইতে হইবে । শ্রীযুক্ত অধর সেন কলিকাতা হইতে আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন ।

[ভক্তসঙ্গে শ্রীযুক্ত যদুমল্লিকের বাগানে । শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব ।]

ঠাকুর শ্রীযুক্ত যদুমল্লিকের বাগানে যাইবেন । লাটুকে বলিতেছেন—লণ্ঠনটা জাল্,—একবার চল্ ।

ঠাকুর লাটুর সঙ্গে একাকী যাইতেছেন । মাফ্টার সঙ্গে আছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাফ্টারের প্রতি) । তুমি নারানকে আনলে না কেন ? মাফ্টার বলিতেছেন—আমি কি সঙ্গে যাবো ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । যাবে ? অধর টধর সব রয়েছে,—আচ্ছা, এসো ।

মুখুযোরা পথে দাঁড়াইয়াছিলেন । ঠাকুর মাফ্টারকে বলিতেছেন—



শম্ভুচন্দ্র মল্লিক ।

ইটার বাগানবাটী কালীবাড়ীর অতি নিকটবর্তী । এইখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদাই বাতায়িত করিতেন ।

শম্ভু মল্লিক সম্বন্ধে ঠাকুরের উক্তি :—

১ম ভাগ—পৃষ্ঠা—৪৬, ১২৭, ২৫২ । ২য় ভাগ—পৃষ্ঠা—১৮৮ । ৩য় ভাগ—পৃষ্ঠা—৭৪, ২৩৭ । ৪র্থ ভাগ—পৃষ্ঠা—৮৫, ৯৯, ১৯৪, ২২৬, ২৮২, ২৮৯, ৩১১ ।

মথুর বাবু বা }
সেজো বাবু } রাণীরামসিংহের জামাতা ও প্রথম সেবক ও 'রসদার'।

মথুরসম্বন্ধে ঠাকুরের উক্তি—

প্রথমভাগ—পৃষ্ঠা ৩, ৪ ; ৮রাধাকান্তের গয়না চুরী ৬০ ; দেবেন্দ্র ঠাকুরের সঙ্গে দেখা ১৭৭ ; চল
হালদারের কথা ২৩৯ ; সঙ্গেগমন ও পণ্ডিতদের সহিত ঠাকুরের বিচার ২৪৭ ; 'তুমি মানো
আর নাই মানো' ২৪৮—৯ ।



দ্বিতীয়ভাগ—মথুর সঙ্গে কাশীতীর্থ ও রাজা বাবুদের বাড়ীতে ঠাকুরের ক্রন্দন ৪ ; গড়ের মাঠে
বেলুন দর্শনকালে ঠাকুরের সমাধি ৫৭ ; দিন মুখুয়ার বাড়ী ৬৩, ৬৪ ; নানকপন্থী সাধুর গীতা-
পাঠ ৭৫, ৮৬ ; 'মা একজন বড়মানুষ পেছনে দাও' ৯৪ ; সঙ্গে নবদ্বীপ যাত্রা ও ভগবান
দাসের সঙ্গে দেখা ১২৯ ; আদি সমাজে শ্রীযুক্ত কেশব সেনের সঙ্গে দেখা ১৭৬ ।

তৃতীয়ভাগ—ঠাকুরকে মথুরের সাঁচা জরীর পোষাক প্রভৃতি প্রদান ২১, ২২ ; সঙ্গে কাশীধাম ও
শ্রীলঙ্কাবন দর্শন ৩১ ; ঠাকুরের অর্ঘ্য প্রদান ১৫৯ ; সেজোবাবুর ভাবাবস্থা ১৭৮ ।

চতুর্থভাগ—বিড়ালকে লুচি খাওয়ানো ও খাজাঞ্জীর পত্র ৩৯ ; ঠাকুরের মধ্যে ঈশ্বরী দর্শন ৪৯ ;
জানবাজারে একঘরে শয়ন ৭৯ ; তালুক লিখে দিতে চাওয়া ১০৬ ; শাক্তনিন্দার বৈষ্ণবচরণের
উপর বিরক্তি ১১৩, ১৫৪ ; ঠাকুরের আদেশে আলাদা ভাঁড়ার করেন ১৭৮ ; 'ব্রাহ্মণী খতাতো

ওঁরা কেউ যাবেন ? (মুখুয্যেদের প্রতি) আচ্ছা, বেশ চলো । তা হলে শীঘ্র উঠে আসতে পারবো ।

[চৈতন্যলীলা ও অধরের কন্মের কথা যদুমল্লিকের সঙ্গে ।]

ঠাকুর যদুমল্লিকের বৈঠকখানায় আসিয়াছেন । সুসজ্জিত বৈঠকখানা । ঘর বারান্দায় ছালগিরি জ্বলিতেছে । শ্রীযুক্ত যদুলাল ছোট ছোট ছেলেদের লইয়া আনন্দে দু একটা বন্ধু সঙ্গে বসিয়া আছেন । খানসামারা কেহ অপেক্ষা করিতেছে, কেহ হাতপাখা লইয়া পাখা করিতেছে । যদু হাসিতে হাসিতে বসিয়া বসিয়া ঠাকুরকে সম্ভাষণ করিলেন ও অনেকদিনের পরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন ।

যদু গৌরাঙ্গভক্ত । তিনি মটার থিয়েটারে চৈতন্যলীলা দেখিয়া আসিয়াছেন । ঠাকুরের কাছে গল্প করিতেছেন । বলিলেন, চৈতন্যলীলা নূতন অভিনয় হইতেছে—বড় চমৎকার হইয়াছে ।

ঠাকুর আনন্দের সহিত চৈতন্যলীলা কথা শুনিতেছেন—মাঝে মাঝে যদুর একটা ছোট ছেলের হাত লইয়া খেলা করিতেছেন । মাষ্টার ও মুখুয্যে ভাতারা তাঁহার কাছে বসিয়া আছেন ।

শ্রীযুক্ত অধর সেন কলিকাতা মিউনিসিপালিটির Vice-Chairman এর কন্মের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন । সে কন্মের মাহিয়ানা হাজার টাকা । অধর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট । তিনশ টাকা মাইনে পান । অধরের বয়স ত্রিশ বৎসর ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (যদুর প্রতি) । কৈ অধরের কন্ম হলো না ?

যদু ও তাঁহার বন্ধুরা । অধরের কন্মের বয়স যায় নাই ।

কিয়ৎক্ষণ পরে যদু বলিতেছেন—‘তুমি একটু তাঁর নাম করো ।’
ঠাকুর গৌরাঙ্গের ভাব গানের ছলে বলিতেছেন ।

গান—আমার গৌর নাচে । নাচে সংকীর্ণনে, শ্রীবাস অঙ্গনে,
ভক্তগণ সঙ্গে ॥

গান—আমার গৌর রতন ।

গান—গৌর চাহে বৃন্দাবন পানে আর ধারা বহে দুনয়নে !

(ভাব হবে বৈকি রে) (ভাব নিধি শ্রীগৌরাঙ্গের)

(ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায় ।) (বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে)

(সমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবে) (গৌর আপনার পায় আপনি ধরে)

(যার অন্তঃ কৃষ্ণ বহি গৌর)

গান—আমার অঙ্গ কেন গৌর ! (ও গৌর হ'ল রে !)

কি করলে রে ধনী, অকালে সকাল কৈলে, অকালেতে বরণ
ধরালে ॥ এখনত, গৌর হতে দিন, বাকি আছে !

এখনত, দ্বাপর লীলা, শেষ হয় নাই !

একি হ'লরে ! কোকিল ময়ূর, সকলই গৌর !

যে দিকে ফিরাই আঁখি (একি হ'ল রে) !

একি একি, গৌরময় সকল দেখি ॥

রাই বুঝি মথুরায় এলো, তাইতে অঙ্গ বুঝি গৌর হ'ল !

ধনী কুমুরিয়ে পোকা ছিল, তাইতে আপনার বরণ ধরাইল !

এখনি যে অঙ্গ কাল ছিল, দেখতে দেখতে গৌর হ'ল !

রাই ভেবে কি রাই হলাম ! (একিরে)

যে রাধামন্ত্র জপ না করে, রাই ধনী কি আপনার বরণ ধরায় তারে !

মথুরায় আমি কি নবদ্বীপে আমি কিছু ঠাওরাতে নারি রে !

এখনও ত, মহাদেব অদ্বৈত হয় নাই (আমার অঙ্গ কেন গৌর) !

এখন ত, বলাই দাদা নিতাই হয় নাই, বিশাখা রামানন্দ হয় নাই !

এখনও ত, ব্রহ্মা হরিদাস হয় নাই, এখনও ত, নারদ শ্রীবাস হয় নাই !

এখনও ত, মা যশোদা শচী হয় নাই !

একাই কেন আমি গৌর (যখন বলাই দাদা নিতাই হয় নাই তখন)

তবে রাই বুঝি মথুরায় এলো, তাইতে কি অঙ্গ আবার গৌর হল !

(অতএব বুঝি আমি গৌর) এখনও ত, পিতা নন্দ জগন্নাথ হয় নাই !

এখনও ত, শ্রীরাধিকা গদাধর হয় নাই ! আমার অঙ্গ কেন গৌর হ'ল ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

[শ্রীযুক্ত রাখালের জন্য চিন্তা । যদু মল্লিক ।

ভোলানাথের এজাহার ।]

গান সমাপ্ত হইলে মুখ্যোরা গাত্রোত্থান করিলেন । ঠাকুরও সঙ্গে সঙ্গে উঠিলেন । কিন্তু ভাবাবিষ্ট । ঘরের বারান্দায় আসিয়া একবারে সমাধিস্থ হইয়া দণ্ডায়মান ! বারান্দায় অনেকগুলি আলো জ্বলিতেছিল । বাগানের দ্বারবান ভক্ত লোক । ঠাকুরকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিয়া সেবা করান । ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন । দ্বারবানটী আসিয়া ঠাকুরকে পাথার হাওয়া করিতেছেন । বড় হাত পাখা ।

বাগানের সরকার শ্রীযুক্ত রতন আসিয়া প্রণাম করিলেন ।

ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন । নান্নাস্ত্রণ ! নান্নাস্ত্রণ !—
এই নাম উচ্চারণ করিয়া তাহাদের সম্ভাষণ করিলেন ।

ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ীর সদরফটকের কাছে আসিয়াছেন ।
ইতি মধ্যে মুখ্যোরা ফটকের কাছে অপেক্ষা করিতেছেন ।

অধর ঠাকুরকে খুঁজিতেছিলেন ।

মুখ্যো (সহাস্ত্রে) । মহেন্দ্র বাবু পালিয়ে এসেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্ত্রে, মুখ্যোর প্রতি) । এঁর সঙ্গে তোমরা
সর্বদা দেখা কোরো, আর কথা বার্তা কোয়ো ।

প্রিয় মুখ্যো (সহাস্ত্রে) । ইনি এখন আমাদের মাফটারী করবেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । গাঁজা খোরের স্বভাব গাঁজা খোর দেখলে আনন্দ
করে ! আমীর এলে কথা কয় না । কিন্তু যদি এক জন লক্ষ্মী ছাড়া
গাঁজা খোর আসে, তবে হয়ত কোলাকুলি করবে ! (সকলের হাস্য)

ঠাকুর উত্তান পথ দিয়া পশ্চিমাশ্র হইয়া নিজের ঘরের অভিমুখে
আসিতেছেন । পথে বলিতেছেন—‘যদু খুব হাঁটু । ভাগবত থেকে
অনেক কথা বলে ।’

মণি কালীমন্দিরে আসিয়া প্রণামাদি করিয়া চরণামৃত পান করিতে-
ছেন । ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত—মাকে দর্শন করিবেন ।

রাত প্রায় নয়টা হইল । মুখ্যোরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন । অধর ও মাষ্টার মেঝেতে বসিয়া আছেন । ঠাকুর অধরের সহিত শ্রীযুক্ত রাখালের কথা কহিতেছেন ।

রাখাল বৃন্দাবনে আছেন—বলরামের সঙ্গে । পত্রে সংবাদ আসিয়াছিল তাঁহার অসুখ হইয়াছে । দুই তিন দিন হইল ঠাকুর রাখালের অসুখ শুনিয়া এত চিন্তিত হইয়াছিলেন যে মধ্যাহ্নের সেবার সময় ‘কি হবে !’ বলিয়া হাজার কাছ বালকের ন্যায় কেঁদেছিলেন । অধর রাখালকে রেজিষ্টারী করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার পান নাই ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । নারাণ চিঠি পেলে আর তুমি চিঠির জবাব পেলে না ?

অধর । আজ্ঞা, এখনও পাই নাই ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আর মাষ্টারকে লিখেছে ।

ঠাকুরের চৈতন্য লীলা দেখিতে যাইবার কথা হইতেছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে, ভক্তদের প্রতি) । যদু বলছিল এক টাকার জায়গা হতে বেশ দেখা যায় । সস্তা ।

“একবার আমাদের পেনেটী নিয়ে যাবার কথা হয়েছিল—যদু আমাদের চলিত নৌকায় চড়তে বলেছিল ! (সকলের হাস্য)

“আগে ঈশ্বরের কথা একটু একটু শুনতো । একটী ভক্ত ওর কাছে যাতায়াত করতো—এখন আর তাকে দেখতে পাই না । কতকগুলো মোসাহেব ওর কাছে সর্বদা থাকে—তারাই আরো গোল করেছে ।

“ভারী হিসাবী ! যেতে মাত্রই বলে কত ভাড়া । আমি বলি, তোমার আর শুনে কাজ নেই, তুমি আড়াই টাকা দিয়ে । তাইতে চুপ করে থাকে আর আড়াই টাকাই দেয় ! (সকলের হাস্য)

ঠাকুরবাড়ীর দক্ষিণপ্রান্তে পাইখানা প্রস্তুত হইয়াছে । তাই লইয়া শ্রীযুক্ত যদু মল্লিকের সহিত বিবাদ চলিতেছে । পাইখানার পাশে যদুর বাগান ।

বাগানের মুহুরী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বিচারপতির কাছে এজাহার দিয়াছেন । এজাহার দেওয়ার পর হইতে তাঁহার বড় ভয় হইয়াছে ।

তিনি ঠাকুরকে জানাইয়াছিলেন । ঠাকুর বলিয়াছিলেন—অধর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, সে আসিলে তাঁকে জিজ্ঞাসা কোরো । শ্রীযুক্ত রামচক্রবর্তী ভোলানাথকে সঙ্গে করিয়া ঠাকুরের কাছে আনিয়াছেন ও সমস্ত বলিতেছেন—‘এঁর এজাহার দিয়ে ভয় হয়েছে ইত্যাদি ।

ঠাকুর চিন্তিতপ্রায় হইয়া উঠিয়া বসিলেন ও অধরকে সব কথা বলিতে বলিলেন । অধর সমস্ত শুনিয়া বলিতেছেন,—ও কিছুই না, একটু কষ্ট হবে । ঠাকুরের যেন গুরুতর চিন্তা দূর হইল ।

রাত হইয়াছে । অধর বিদায় গ্রহণ করিবেন, প্রণাম করিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । নারা'ণকে এনো ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থভাগ, উনবিংশ খণ্ড সমাপ্ত ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

চতুর্থ ভাগ—বিংশ খণ্ড ।

দক্ষিণেশ্বরে মহেন্দ্র, রাখাল, রাধিকাগোস্বামী প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[মহেন্দ্রাদির প্রতি উপদেশ । কাণ্ডেনের ভক্তি ও
পিতামাতার সেবা ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে সেই পূর্বপরিচিত ঘরে ভক্ত-সঙ্গে বসিয়া আছেন । শরৎকাল । শুক্রবার ৪ঠা আশ্বিন, ১২৯১, বেলা দুইটা । আজ ভাদ্র অমাবস্যা । মহালয়া । শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মুখো-পাধ্যায় ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রিয় মুখোপাধ্যায়, মাষ্টার, বাবুরাম, হরিষ, কিশোরী, লাটু, মেজেতে কেহ বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া আছেন,—কেহ বা ঘরে যাতায়াত করিতেছেন । শ্রীযুক্ত হাজরা বারাণ্ডায় বসিয়া আছেন । রাখাল বলরামের সহিত বৃন্দাবনে আছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহেন্দ্রাদি ভক্তদের প্রতি) । কলিকাতায় কাপ্তেনের বাড়ীতে গিছলাম । ফিরে আসতে অনেক রাত হয়েছিল ।

“কাপ্তেনের কি স্বভাব ! কি ভক্তি ! ছোট কাপড়খানি পরে আরতি করে । একবার তিন বাতিওলা প্রদীপে আরতি করে,—তার পর আবার এক বাতিওলা প্রদীপে । আবার কর্পূরের আরতি ।

“সে সময়ে কথা কয় না । আশায় ইসারা করে আসনে বসতে বসে ।

“পূজা করবার সময় চোখের ভাব—ঠিক যেন বোলতা কামড়েছে !

“এদিকে গান গাইতে পারে না । কিন্তু সুন্দর স্তব পাঠ করে ।

“তার মা’র কাছে নীচে বসে । মা—আসনের উপর বসবে ।

“বাপ ইংরেজের হাওয়ালাদার । যুদ্ধক্ষেত্রে এক হাতে বন্দুক আর এক হাতে শিবপূজা করে । খানসামা শিব গড়ে গড়ে দিচ্ছে । শিবপূজা না করে জল খাবে না । ছয় হাজার টাকা মাহিনা বছরে ।

“মাকে কানীতে মাঝে মাঝে পাঠায় । সেখানে বারো তের জন মার সেবায় থাকে । অনেক খরচা । বেদান্ত গীতা,ভাগবত,—কাপ্তেনের কণ্ঠস্থ ।

“সে বলে, কলিকাতার বাবুরা য়েচ্ছাচার ।

“আগে হঠযোগ করেছিল—তাই আমার সমাধি কি ভাবাবস্থা হলে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় ।

“কাপ্তেনের পরিবার,—তার আবার আলাদা ঠাকুর, গোপাল । এবার তত কৃপণ দেখলাম না । সেও গীতা টীতা জানে । ওদের কি ভক্তি ! —আমি যেখানে খাব সেইখানেই আঁচাব । খড়কে কাটীটি পর্য্যন্ত !

“পাঁঠার চচ্চড়ি করে ;—কাপ্তেন বলে পনের দিন থাকে,—কিন্তু কাপ্তেনের পরিবার বলে—‘নাহি নাহি, সাত রোজ’ । কিন্তু বেশ লাগল । ব্যঞ্জন সব একটু একটু । আমি বেশী খাই বলে, আজ কাল আমায় বেশী দেয় ।

“তার পর খাবার পর, হয় কাপ্তেন,নয় তার পরিবার বাতাস করবে ।

[Jung Bahadur এর ছেলেদের কাপ্তেনের সঙ্গে আগমন ১৮৭৫-৬ ।

নেপালী ব্রহ্মচারিণীর গীতগোবিন্দ গান । ‘আমি ঈশ্বরের দাসী ।’]

“ওদের কিন্তু ঠারি ভক্তি,—সাধুদের বড় সম্মান । পশ্চিমে

লোকেদের সাধুভক্তি বেশী । জাঙ বাহাদুর এর ছেলেরা আর ভাইপো কর্ণেল এখানে এসেছিল । যখন এলো পেন্টুলন খুলে, যেন কত ভয়ে ।

“কাপ্তেনের সঙ্গে একটি ওদের দেশের মেয়ে এসেছিল । ভারি ভক্ত,—বিবাহ হয় নাই । গীতগোবিন্দ গান কণ্ঠস্থ । তার গান শুনতে দ্বারিক বাবুরা এমে বসেছিল । আমি বল্লাম, এরা শুনতে চাচ্ছে, লোক ভাল । যখন গীতগোবিন্দ গান গাইলে তখন দ্বারিক বাবু রুমালে চক্ষের জল পুছতে লাগল । বিয়ে কর নাই কেন, জিজ্ঞাসা করাতে বলে, ‘ঈশ্বরের দাসী, আবার কার দাসী হ’ব ?’ আর, সব্বাই তাকে দেবী বলে খুব মানে—যেমন পুঁথিতে (শাস্ত্রে) আছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহেন্দ্রাদির প্রতি) । আপনারা যে আসছো, তাতে কিছু কি উপকার হচ্ছে শুনলে, মনটা বড় ভাল থাকে । (মাষ্টারের প্রতি) এখানে লোক আসে কেন ? তেমন লেখাপড়া জানি না—

মাষ্টার । আজ্ঞা কৃষ্ণ যখন নিজে সব রাখাল গরু টরু হলেন (ব্রহ্মা হরণকরবার পর) তখন রাখালদের মা’রা, নূতন রাখালদের পেয়ে যশোদার বাড়ীতে আর আসেন না । গাভীরাও হান্সা রবে ঐ নূতন বাছুরদের পিছে পিছে গিয়ে পড়তে লাগল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাতে কি হলো ? মাষ্টার । ঈশ্বর নিজেই সব হয়েছেন কি না, তাই এত আকর্ষণ । ঈশ্বর বস্তু থাকলেই মন টানে ।

[কৃষ্ণলীলার ব্যাখ্যা । গোপীপ্রেম । বস্ত্রহরণের মানে ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । এ যোগমায়ার আকর্ষণ—ভেল্কী লাগিয়ে দেয় ! রাধিকা সুবোল বেশে—বাছুর কোলে—জটিলার ভয়ে যাচ্ছে ; যখন যোগমায়ার শরণাগত হলো তখন জটীলা আবার আশীর্ব্বাদ করে !

“হরিলীলা সব যোগমায়ার সাহায্যে ।

“গোপীদের ভালবাসা—পরকীয়া রতি । কৃষ্ণের জন্ম গোপীদের প্রেমোন্মাদ হয়েছিল । নিজের সোয়ামীর জন্ম অত হয় না । যদি কেউ

* দ্বারিক বাবু মথুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র । ১৮৭৭ খৃঃ প্রায় ৪০ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয় পৌষ ১২৮৪ । কাপ্তেন প্রথম আসেন ১৮৭৫-৭৬ খৃঃ । অতএব এই গীত-গোবিন্দ গান ১৮৭৫ ও ১ ৭৭ খৃঃ মধ্যে হইবে ।

বলে, ওরে তোর সোয়ামী এসেছে !” তা বলে, ‘এসেছে, তা আশুক্কে ; —ঐ খাবে এখন !’ কিন্তু যদি পর পুরুষের কথা শুনে,—রসিক, সুন্দর, রসপণ্ডিত,—ছুটে দেখতে যাবে,—আর আড়াল থেকে উকি মেরে—দেখবে ।

“যদি খোঁচ ধর যে, তাঁকে দেখি নাই, তাঁর উপর কেমন ক’রে গোপীদের মত টান হবে ? তা শুনলেও সে টান হয়—

“না জেনে নাম শুনে কাণে মন গিয়ে তায় লিপ্ত হ’লো ।”

একজন ভক্ত । আজ্ঞা, বস্ত্রহরণের মানেন কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । অষ্টপাশ,—গোপীদের সব পাশই গিয়েছিল, কেবল লজ্জা বাকি ছিল । তাই তিনি ও পাশটাও যুচিয়ে দিলেন । ঈশ্বর লাভ হলে সব পাশ চলে যায় ।

[যোগভ্রষ্টের ভোগান্তে ঈশ্বর লাভ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহেন্দ্র মুখুয্যে প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি) । ঈশ্বরের উপর টান সকলের হয় না, আধার বিশেষে হয় । সংস্কার থাকলে হয় । তা না হলে বাগবাজারে এত লোক ছিল কেবল তোমরাই এখানে এলে কেন ? আদাড়ে গুলোর হয় না । মলয় পর্বতের হাওয়া লাগলে সব গাছ চন্দন হয় ; কেবল শিমুল, অশ্বথ, বট আর কয়েকটা গাছ,—চন্দন হয় না ।

“তোমাদের টাকা কড়ির অভাব নাই । যোগভ্রষ্ট হ’লে ভাগ্যবানের ঘরে জন্ম হয়,—তার পর আবার ঈশ্বরের জন্ম সাধনা করে ।

মহেন্দ্র মুখো । কেন যোগভ্রষ্ট হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । পূর্বজন্মে ঈশ্বরচিন্তা ক’রতে ক’রতে হয়ত হঠাৎ ভোগ করবার লালসা হ’য়েছে । এরূপ হ’লে যোগভ্রষ্ট হয় । আর পরজন্মে ঐরূপ জন্ম হয় । ,

মঃ মুখো । তার পর, উপায় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । কামনা থাকতে—ভোগ লালসা থাকতে—মুক্তি নাই । তাই খাওয়া পরা রমণ ফমন সব ক’রে নেবে । (সহাস্তে) তুমি কি বল ?—সদারায় না পরদারায় ? [মাফটার, মুখুয্যে, এঁরা হাসিতেছেন ।]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত । ঠাকুরের নানা সাধ ।

[পূর্বকথা—প্রথম কলিকাতায় নাথের বাগানে । গঙ্গাস্নান ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । ভোগ লালসা থাকা ভাল নয় । আমি তাই জন্ম যা যা মনে উঠতো অমনি ক’রে নিতাম ।

বড়বাজারের রংকরা সন্দেশ দেখে খেতে ইচ্ছা হ’লো । এরা আনিয়ে দিলে । খুব খেলুম,—তার পর অসুখ !

“ছেলেবেলা গঙ্গা নাইবার সময়, তখন নাথের বাগানে, একটি ছেলের কোমরে সোণার গোট দেখেছিলাম । এই অবস্থার পর সেই গোট পরতে সাধ হ’লো । তা বেশীক্ষণ রাখবার জো নাই,—গোট পরে ভিতর দিয়ে শিড়্ শিড়্ করে উপরে বায়ু উঠতে লাগলো—সোণা গায়ে ঠেকেছে কি না ? একটু রেখেই খুলে ফেলতে হ’লো । তা না হ’লে ছিঁড়ে ফেলতে হবে !

“ধনে খালির খইচুর, খানাকুল কৃষ্ণনগরের সরভাজা, তাও খেতে সাধ হয়েছিল (সকলের হাস্য) ।

[পূর্বকথা শম্ভুর ও রাজ নারায়নের চণ্ডী শ্রবণ । ঠাকুরের সাধু সেবা]

“শম্ভুর’ চণ্ডীর গান শুন্তে ইচ্ছা হ’য়েছিল ! সে গানশোনার পর আবার রাজনারায়ণের চণ্ডী শুন্তে ইচ্ছা হয়েছিল । তাও শোনা হ’লো ।

“অনেক সাধুরা সে সময় আসতো । তা সাধ হ’লো, তাদের সেবার জন্য আলাদা একটি ভাঁড়ার হয় । সেজো বাবু তাই ক’রে দিলে । সেই ভাঁড়ার থেকে সাধুদের সিঁদে, কাঠ, এ সব দেওয়া হতো ।

“একবার মনে উঠলো যে খুব ভাল জরীর সাজ প’রবো । আর রূপার গুড়গুড়িতে তামাক খাবো । সেজো বাবু নূতন সাজ, গুড়গুড়ি, সব পাঠিয়ে দিলে । সাজ পরা হলো । গুড়গুড়ি নানারকম করে টানতে লাগলুম । একবার এপাস থেকে, একবার ওপাশ থেকে—উচু থেকে নীচু থেকে । তখন বল্লাগ, মন এর নাম রূপার গুড়গুড়িতে তামাক খাওয়া ! এই বলে গুড়গুড়ি ত্যাগ হয়ে গেল । সাজগুলো খানিক পরে

খুলে ফেললাম,—পা দিয়ে মাড়াতে লাগলাম—আর তার উপর
থু থু করতে লাগলাম—বললাম, এর নাম সাজ ! এই সাজে
রজোগুণ হয় !

[বৃন্দাবনে রাখাল ও বলরাম । পূর্বকথা-রাখালের প্রথম ভাব ১৮৮১ ।]

বলরামের সহিত রাখাল বৃন্দাবনে আছেন । প্রথম প্রথম বৃন্দাবনের
খুব সুখ্যাতি করিয়া আর বর্ণনা করিয়া পত্রাদি লিখিতেন । মাষ্টারকে
পত্র লিখিয়াছিলেন, ‘এ বড় উত্তম স্থান আপনি আসবেন,—ময়ূর ময়ূরী
সব নৃত্য করছে—আর নৃত্য গীত, সর্বদাই আনন্দ !’ তার পর
রাখালের অসুখ হইয়াছে—বৃন্দাবনের জ্বর । ঠাকুর শুনিয়া বড়ই চিন্তিত
আছেন । তাঁর জন্ম চণ্ডীর কাছে মানসিক ক’রেছেন । ঠাকুর রাখালের
কথা কহিতেছেন—“এইখানে বসে পা টীপ্তে টীপ্তে রাখালের
প্রথম ভাব হ’য়েছিল । একজন ভাগবতের পণ্ডিত এই ঘরে বসে
ভাগবতের কথা বল্ছিল । সেই সকল কথা শুনতে শুনতে রাখাল মাঝে
মাঝে শিউরে উঠতে লাগলো ; তার পর একবারে স্থির !

“দ্বিতীয় বার ভাব বলরামের বাটীতে—ভাবেতে শুয়ে পড়েছিল ।

“রাখালের সাকারের ঘর—নিরাকারের কথা শুনলে উঠে যাবে ।

“তার জন্ম চণ্ডীকে মান্‌লুম । সে যে আমার উপর সব নির্ভর ক’রে-
ছিল—বাড়ী ঘর সব ছেড়ে ! তার পরিবারের কাছে তাকে আমিই
পাঠিয়ে দিতাম—একটু ভোগের বাকি ছিল ।

“বৃন্দাবন থেকে এঁকে লিখেছে, এ বেশ জায়গা—ময়ূর ময়ূরী নৃত্য
করছে ;—এখন ময়ূর ময়ূরী—বড়ই মুন্সিলে ফেলেছে !

“সেখানে বলরামের সঙ্গে আছে । আহ ! বলরামের কি স্বভাব !
আমার জন্ম ওদেশে (উড়িষ্যায় কোঠারে) যায় না । ভাই মুসোহারা বন্ধ
ক’রেছিল । আর বলে পাঠিয়েছিল, ‘তুমি এখানে এসে থাকো, মিছামিছি
কেন অত টাকা খরচ কর ।’—তা সে শুনে নাই—আমাকে দেখবে বলে।

“কি স্বভাব !—রাত দিন কেবল ঠাকুর লয়ে ;—মালীরা ফুলের
মালাই গাঁথছে ! টাকা বাঁচবে ব’লে, বৃন্দাবনে চার মাস থাকবে । দু’শ
টাকা মুসোহারা পায় ।

দক্ষিণেশ্বর । মুখ্যে ভ্রাতৃত্ব, রাধিকা গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ১৮৯

[পূর্ববক্তা—নরেন্দ্রের জন্য ক্রন্দন । নরেন্দ্রের প্রথম দর্শন ১৮৮১ ।]

‘ছোকরাদের ভালবাসি কেন ?—ওদের ভিতর কামিনীকাঞ্চন এখনও ঢুকে নাই । আমি ওদের নিত্যসিদ্ধ দেখি !

‘নরেন্দ্র যখন প্রথম এলো—ময়লা একখানা চাদর গায়ে,—কিন্তু চোখ মুখ দেখে বোধ হলো, ভিতরে কিছু আছে । তখন বেশী গান জানতো না । দুই একটা গান গাইলে,—

‘মন চল নিজ নিকেতনে,’ আর ‘স্বাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিলে ।’

‘যখন আসতো,—এক ঘর লোক—তবু ওর দিক্ পানে চেয়েই কথা কহিতাম । ও বোলতো, ‘এঁদের সঙ্গে কথা কন,’—তবে কহিতাম ।

‘যছু মল্লিকের বাগানে কাঁদতুম,—ওকে দেখবার জন্য পাগল হ’য়েছিলাম ! এখানে ভোলানাথের হাত ধরে কান্না !—ভোলানাথ বলে, ‘একটা কায়েতের ছেলের জন্য ম’শায় আপনার এরূপ করা উচিত নয়’ । মোটা বামুন এক দিন হাত জোড় করে বলে, ম’শায়, ওর সামান্য পড়াশুনো, ওর জন্য আপনি এত অধীর কেন হন ?’

‘ভবনাথ নরেন্দ্রের জুড়ী—দুজনে যেন স্ত্রী পুরুষ । তাই ভবনাথকে নরেন্দ্রের কাছে বাসা করতে বললুম । ওরা দু’জনেই অরূপের ঘর ।

[সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম-লোকশিক্ষার্থ ত্যাগ । ঘোষপাড়ার সাধনের কথা ।]

‘আমি ছোকরাদের মেয়েদের কাছে বেশী থাকতে বা আনাগেনা ক’রতে বারণ ক’রে দিই ।

‘হরিপদ এক ঘোষপাড়ার মাগীর পাল্লায় পড়েছে । সে বাৎসল্য ভাব করে । হরিপদ ছেলে মানুষ, কিছু বোঝে না । ওরা ছোকরা দেখলে ঐ রকম করে । শুনলাম, হরিপদ নাকি ওর কোলে শোয় । আর সে হাতে করে তাকে খাবার খাইয়ে দেয় । আমি ওকে বলে দিব—ও সব ভাল নয় । ঐ বাৎসল্য ভাব থেকেই আবার তাচ্ছল্য ভাব হয় ।

‘ওদের বর্তমানের সাধন—মানুষ নিয়ে সাধন । মানুষকে মনে করে শ্রীকৃষ্ণ । ওরা বলে ‘রাগকৃষ্ণ’ । গুরু জিজ্ঞাসা করে, ‘রাগকৃষ্ণ পেয়েছিস ?’ সে বলে ‘হাঁ, পেয়েছি ।’

“সে দিন সে মাগী এসেছিল । তার চাহনির রকম দেখলাম বড় ভাল নয় । তারি ভাবে বললাম, ‘হরিপদকে নিয়ে যেমন কচ্চো কর—কিন্তু অন্ডায় ভাব এনো না ।’

“ছোকরাদের সাধনার অবস্থা । এখন কেবল ত্যাগ । সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্য্যন্ত দেখবে না । আমি ওদের বলি, মেয়ে মানুষ ভক্ত হলেও তাদের সঙ্গে বসে কথা কবে না ;—দাঁড়িয়ে একটু কথা কবে । সিদ্ধ হলেও এইরূপ করতে হয়—নিজের সাবধানের জন্ত,—আর লোকশিক্ষার জন্ত । আমিও মেয়েরা এলে একটু পরে বলি, তোমরা ঠাকুর দেখগে । তাতে যদি না উঠে, নিজে উঠে পড়ি । আমার দেখে আবার সবাই শিখবে ।

[পূর্বকথা—ফুলুই শ্যামবাজার দর্শন ১৮৮০ । অবতারের আকর্ষণ ।]

“আচ্ছা এই যে সব ছেলেরা আসছে, আর তোমরা সব আসছো, এর মানে কি ? এর (অর্থাৎ আমার) ভিতর অবশ্য কিছু আছে, তা না হলে টান হয় কেমন করে—কেন আকর্ষণ হয় ?

“ওদেশে যখন হৃদের বাড়ীতে (কামারপুকুরের নিকট, সিওড়ে) ছিলাম, তখন শ্যামবাজারে নিয়ে গেল । বুঝলাম গৌরাঙ্গভক্ত । গাঁয়ে ঢোকবার আগে দেখিয়ে দিলে । দেখলাম গৌরাঙ্গ ! এমনি আকর্ষণ—সাত দিন সাত রাত লোকের ভিড় ! কেবল কীর্ত্তন আর নৃত্য । পাঁচিলে লোক ! গাছে লোক !

“নটবর গোস্বামীর বাড়ীতে ছিলাম । সেখানে রাত দিন ভিড় । আমি আবার পালিয়ে গিয়ে এক তাঁতীর ঘরে সকালে গিয়ে বসতাম । সেখানে আবার দেখি, খানিক পরে সব গিয়েছে ! সব খোল করতাল নিয়ে গেছে !—আবার ‘তাকুটী ! তাকুটী !’ করছে । খাওয়া দাওয়া বেলা তিনটার সময় হতো !

“রব উঠে গেল—সাতবার মরে, সাতবার বাঁচে, এমন এক লোক, এসেছে ! পাছে আমার সরদিগরমি হয়, হৃদে মাঠে টেনে নিয়ে যেতো ;—সেখানে আবার পিঁপড়ের সার ! আবার খোল করতাল ।—তাকুটী ! তাকুটী ! হৃদে বক্লে, আর বল্লে, ‘আমরা কি কখনও কীর্ত্তন শুনি নাই ?’

“সেখানকার গৌসাইরা ঝগড়া করতে এসেছিল । মনে করেছিল, আমরা বুঝি তাদের পাওনা গণ্ডা নিতে এসেছি । দেখলে, আমি একখানা কাপড় কি এক গাছা সূতাও লই নাই ! কে বলেছিল ‘ব্রহ্মজ্ঞানী’ । তাই গৌসাইরা বিড়তে এসেছিল । এক জন জিজ্ঞাসা করলে, ‘এঁর মালা, তিলক, নাই কেন ?’ তারাই এক জন বলে, ‘নারকেলের বেল্লো আপনা আপনি খসে গেছে’ । ‘নারকেলের বেল্লো’ ও কথাটী ঐখানে শিখেছি । জ্ঞান হলে উপাধি আপনি খসে পড়ে যায় ।

“দূর গাঁ থেকে লোক এসে জমা হোতো । তারা রাত্রে থাকতো । যে বাড়ীতে ছিলাম, তার উঠানে রাত্রে মাগীরা অনেক সব শুয়ে আছে । হৃদে প্রচ্ছাপ করতে রাত্রে বাহিরে যাচ্ছিল, তা বলে, ‘এইখানেই(উঠানে) করো ।’

“আকর্ষণ কাকে বলে, ঐ খানেই (শ্যামবাজারে) বুঝলাম । হরিলীলায় যোগমায়ার সাহায্যে আকর্ষণ হয়, যেন ভেলকী লেগে যায় !

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীযুক্ত রাধিকা গোস্বামী] ।

মুখ্যো ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত কথা কইতে কইতে বেলা প্রায় তিনটা বাজিয়াছে । শ্রীযুক্ত রাধিকা গোস্বামী আসিয়া প্রণাম করিলেন । তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে এই প্রথম দর্শন করিলেন । বয়স আন্দাজ ত্রিশের মধ্যে । গোস্বামী আসন গ্রহণ করিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—‘আপনারা কি অদ্বৈতবংশ ?’ গোস্বামী—‘আজ্ঞা হাঁ ।’

ঠাকুর অদ্বৈতবংশ শুনিয়া গোস্বামীকে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিতেছেন ।

[গোস্বামীবংশ ও ব্রাহ্মণ পূজনীয় । মহাপুরুষের বংশে জন্ম ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । অদ্বৈতগোস্বামী বংশ,—আকরের গুণ আছেই !

“নেকো আমের গাছে নেকো আমই হয় (ভক্তদের হাশ্ব) ।
খারাপ আম হয় না । তবে মাটির গুণে একটু ছোট বড় হয় ।
আপনি কি বল ?

গোস্বামী (বিনীত ভাবে) । আজ্ঞা, আমি কি জানি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তুমি যাই বল ;—অন্য লোকে ছাড়বে কেন ?

“ব্রাহ্মণ, হাজার দোষ থাকুক—তবু ভরদ্বাজ গোত্র, শাণ্ডিল্য গোত্র, বোলে সকলের পূজনীয় । (মাফটারের প্রতি) শঙ্খচিলের কথাটি বলত !

মাফটার চুপ করিয়া আছেন দেখিয়া ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ । বংশে মহাপুরুষ যদি জন্মে থাকেন তিনিই টেনে নেবেন—হাজার দোষ থাকুক । যখন গন্ধর্ব্ব কৌরবদের বন্দী করলে যুধিষ্ঠির গিয়ে তাদের মুক্ত করলেন । যে দুর্ঘ্যোধন এত শত্রুতা করেছে, যার জন্ম যুধিষ্ঠিরের বনবাস হয়েছে তাকেই গিয়ে মুক্ত করলেন ।

“তা ছাড়া ভেকের আদর করতে হয় । ভেক দেখলে সত্য বস্তুর উদ্দীপন হয় । চৈতন্যদেব গাধাকে ভেক পরিয়ে সাফটাঙ্গ হয়েছিলেন ।

“শঙ্খচিলকে দেখলে প্রণাম করে কেন ? কংশ মারতে যাওয়াতে ভগবতী শঙ্খচিল হয়ে উড়ে গিছিলেন । তা এখনও শঙ্খচিল দেখলে সকলে প্রণাম করে ।

[পূর্ববকথা—চাণকে কোয়ার সিং কর্তৃক ঠাকুরের পূজা ।

ঠাকুরের রাজভক্তি Loyalty ।]

“চানকের পন্টনের ভিতর ইংরেজকে আসতে দেখে সেপাইরা সেলাম করলে । কোয়ার সিং আমায় বুঝিয়ে দিলে, ‘ইংরাজের রাজ্য, তাই ইংরাজকে সেলাম করতে হয়’ ।

[গোস্বামীর কাছে সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা । শাক্ত ও বৈষ্ণব ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । শাক্তের তন্ত্রমত । বৈষ্ণবের পুরাণ মত । বৈষ্ণব যা সাধন করে তা প্রকাশে দোষ নাই । তান্ত্রিকের সব গোপন । তাই তান্ত্রিককে সব বোঝা যায় না ।

(গোস্বামীর প্রতি) আপনারা বেশ—কত জপ করেন, কত হরিনাম করেন । গোস্বামী (বিনীত ভাবে)—আজ্ঞা, আমরা আর কি করছি ! আমি অতি অধম ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) । দীনতা ; আচ্ছা ও ত আছে । আর এক

আছে, ‘আমি হরি নাম কচ্ছি, আমার আবার পাপ ।’ যে রাতদিন ‘আমি পাপী’ ‘আমি পাপী’ ‘আমি অধম’ ‘আমি অধম’ করে সে তাই হয়ে যায় । কি অবিশ্বাস ! তাঁর নাম এত করেছে আবার বলে ‘পাপ, পাপ’ !

গোস্বামী এই কথা অবাক হইয়া শুনিতেছেন ।

[পূর্বকথা—বৃন্দাবনে বৈষ্ণবের ভেক গ্রহণ ১৮৬৮ খঃ]

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমিও বৃন্দাবনে ভেক নিয়ে ছিলাম ;—পনর দিন রেখেছিলাম । (ভক্তদের প্রতি) সব ভাবই কিছু দিন কিছু দিন করতাম, তবে শান্তি হ’তো ।

(সহাস্যে) আমি সব রকম করেছি—সব পথই মানি । শাক্তদেরও মানি, বৈষ্ণবদেরও মানি, আবার বেদান্তবাদীদেরও মানি । এখানে তাই সব মতের লোক আসে । আর সকলেই মনে করে ‘ইনি আমাদেরই মতের লোক । আজকালকার ব্রহ্মজ্ঞানীদেরও মানি ।

“এক জনের একটি রংএর গামলা ছিল । গামলার আশ্চর্য্য গুণ যে যে যে রংএ কাপড় ছোপাতে চাইত তার কাপড় সেই রংএই ছুপে যেত ।

“কিন্তু এক জন চালাক লোক বলেছিল, ‘তুমি যে রংএ রংয়েছ, আমার সেই রংটি দিতে হবে ।’ (ঠাকুরের ও সকলের হাস্য) ।

“কেন একত্রেই হবে ? ‘অমুক মতের লোক তা হলে আসবে না’ এ ভয় আমার নাই । কেউ আসুক আর না আসুক তাতে আমার বয়ে গেছে ;—লোক কিসে হাতে থাকবে, এমন কিছু আমার মনে নাই । অধর সেন বড় কন্মের জন্ত্য মাকে বলতে বলছিল—তা ওর সে কন্ম হলো না । ও তাতে যদি কিছু মনে করে, আমার বয়ে গেছে !

[পূর্বকথা—কেশব সেনের বাটীতে নিরাকারের ভাব । বিজয় গোস্বামীর সঙ্গে এঁড়েদয় গদাধরের পাঠবাড়ী দর্শন । বিজয়ের চরিত্র ।]

“আবার কেশব সেনের বাড়ী গিয়ে আর এক ভাব হ’লো । ওরা নিরাকার নিরাকার করে ;—তাই ভাবে বল্লুম, ‘মা এখানে আসিস নি, এরা তোর রূপ টুপ মানে না’ ।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এই সকল কথা শুনিয়া গোস্বামী চুপ করিয়া আছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । বিজয় এখন বেশ হয়েছে ।

“হরি হরি বলতে বলতে মাটিতে পড়ে যায় !

“চারটে রাত পর্য্যন্ত কীর্ত্তন ধ্যান এই সব নিয়ে থাকে । এখন গেরুয়া পরে আছে । ঠাকুর বিগ্রহ দেখলে একবারে সাক্ষাৎ !

“গদাধরের পাটবাড়ীতে আমার সঙ্গে গিছলো—আমি বললাম, এখানে তিনি ধ্যান কবতেন—সেই জায়গায় অমনি সাক্ষাৎ !

“চৈতন্যদেবের পটের সম্মুখে আবার সাক্ষাৎ ।

গোস্বামী । রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তির সম্মুখে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । সাক্ষাৎ ! আর আচারী খুব ।

গোস্বামী । এখন সমাজে নিতে পারা যায় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । সে লোকে কি বলবে, তা অত চায় না ।

গোস্বামী । না, সমাজ তা হ'লে কৃতার্থ হয় অমন লোককে পেলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমায় খুব মানে ।

“তাকে পাওয়াই ভার । আজ ঢাকায় ডাক, কাল আর এক জায়গায় ডাক । সর্বদাই ব্যস্ত ।

“তাদের সমাজে (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে) বড় গোল উঠেছে ।

গোস্বামী । আজ্ঞা, কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাকে বলছে, ‘তুমি সাকারবাদীদের সঙ্গে মেশো !—তুমি পৌত্তলিক ।’

“আর অতি উদার সরল । সরল না হ'লে ঈশ্বরের কৃপা হয় না ।

[মুখ্যোদ্যোগকেশিকা । গৃহস্থ, ‘এগিয়ে পড়’ । অভ্যাসযোগ]

এইবার ঠাকুর মুখ্যোদ্যোগের সঙ্গে কথা কহিতেছেন । জ্যেষ্ঠ মহেন্দ্র ব্যবসা করেন, কাহারও চাকরী করেন না । কনিষ্ঠ প্রিয়নাথ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন । এখন কিছু সংস্থান করিয়াছেন । আর চাকরি করেন না । জ্যেষ্ঠের বয়স ৩৫।৩৬ হইবে । তাঁহাদের বাড়ী কেদেটী গ্রামে ।

দক্ষিণেশ্বর । মুখ্যে ভ্রাতৃদ্বয়, রাধিকাগোস্বামী প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ১৯১
কলিকাতা বাগবাজারেও তাঁহাদের বসতবাটী আছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্ত্রে) । একটু উদ্দীপন হচ্ছে ব'লে চুপ ক'রে
থেকোনা । এগিয়ে পড় । চন্দন কাঠের পর আরও আছে—
রূপার খনি, সোণার খনি !

প্রিয় (সহাস্ত্রে) । আজ্ঞা, পায়ে বন্ধন—এগুতে দেয় না !

শ্রীরামকৃষ্ণ । পায়ে বন্ধন থাকলে কি হবে ?—মন নিয়ে কথা ।

“মনেই বদ্ধ মুক্ত । দুই বন্ধু—একজন বেশ্যালয়ে গেল, এক
জন ভাগবত শুনছে । প্রথমটী ভাবছে, ধিক্ আমাকে—বন্ধু হরিকথা
শুনছে, আর আমি কোথা পড়ে রয়েছি ! আর এক জন ভাবছে—
ধিক্ আমাকে, বন্ধু কেমন আমোদ আহ্লাদ করছে, আর আমি শালা
কি বোকা ! ছাখো, প্রথমটিকে বিষ্ণুদূতে নিয়ে গেল—বৈকুণ্ঠে ।
আর দ্বিতীয়টিকে যমদূতে নিয়ে গেল !

প্রিয় ! মন যে আমার বশ নয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । সে কি ! অভ্যাস ষোণ । অভ্যাস কর,
দেখবে মনকে যে দিকে নিয়ে যাবে, সেই দিকেই যাবে ।

“মন ধোপাঘরের কাপড় । তার পর লালে ছোপাও লাল—নীলে
ছোপাও নীল । যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যাবে ।

(গোস্বামীর প্রতি) আপনাদের কিছু কথা আছে ?

গোস্বামী (অতি বিনীতভাবে) । আজ্ঞা না,—দর্শন হ'লো ।
আর কথা ত সব শুন্ছি । শ্রীরামকৃষ্ণ । ঠাকুরদের দর্শন করুন ।

গোস্বামী (অতি বিনীতভাবে) । একটু মহাপ্রভুর গুণানুকীৰ্ত্তন—
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গোস্বামীকে গান শুনাইতেছেন—

গান । আমার অঙ্গ কেন গৌর হলো !

গান । গোরা চাহে বৃন্দাবনপানে, আর ধারা বহে দু'নয়নে ॥

(ভাব হবে বই কি রে !) (ভাবিনিধি শ্রীগৌরান্বের)

(যার অন্তঃ কৃষ্ণ বহিঃ গৌর) (ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়)

(বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে) (সমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবে)

(গোরা আপনার পা আপনি ধরে)

[শ্রীযুক্ত রাধিকা গোস্বামীকে সর্ববর্ধন্য সমন্বয় উপদেশ ।]

গান সমাপ্ত হইল—ঠাকুর কথা কহিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গোস্বামীর প্রতি) । এ তো আপনাদের (বৈষ্ণব-দের) হ'লো । আর যদি কেউ শাক্ত কি ঘোষপাড়ার মত আসে, তখন কি বল'বো !

“তাই এখানে সব ভাবই আছে—এখানে সব রকম লোক আসবে বলে ; বৈষ্ণব, শাক্ত, কর্ত্তাভজা, বেদান্তবাদী, আবার ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী ।

“তাঁরি ইচ্ছায় নানা ধর্ম, নানা মত হসেছে ।

“তবে তিনি যার যা পেটে সয় তাকে সেইটী দিয়েছেন । মা' সকলকে মা'ছের পোলোওয়া দেয় না । সকলের পেটে সয় না । তাই কাউকে মা'ছের ঝোল করে দেন ।

“যার যা প্রকৃতি, যার যা ভাব, সে সেই ভাবটি নিয়ে থাকে ।

“বারোয়ারীতে নানা মূর্ত্তি করে,—আর নানা মতের লোক যায় । রাধাকৃষ্ণ, হর-পার্বতী, সীতারাম, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি রয়েছে, আর প্রত্যেক মূর্ত্তির কাছে লোকের ভিড় হয়েছে । যারা বৈষ্ণব তারা বেশী রাধাকৃষ্ণের কাছে দাঁড়িয়ে দেখছে । যারা শাক্ত তারা হরপার্বতীর কাছে । যারা রাম ভক্ত তারা সীতারাম মূর্ত্তির কাছে ।

“তবে যাদের কোন ঠাকুরের দিকে মন নাই তাদের আলাদা কথা । বেশ্যা উপপতিকে ঝাঁটা মারছে,—বারোয়ারীতে এমন মূর্ত্তিও করে । ও সব লোক সেই খানে দাঁড়িয়ে হাঁ ক'রে দেখে আর চীৎকার করে বন্ধুদের বলে, ‘আরে ও সব কি দেখছি, এদিকে আয় ! এদিকে আয়’ !

সকলে হাসিতেছেন । গোস্বামী প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

ছোকরা ভক্তদের সঙ্গে আনন্দ । মা কালীর আরতি দর্শন ও চামর ব্যাজন । মায়ে পোয়ে কথা । ‘কেন বিচার করাও’ ।

বেলা পাঁচটা । ঠাকুর পশ্চিমের গোল বারাণ্ডায় । বাবুরাম, লাটু, মুখ্যো ভ্রাতৃদ্বয়, মাষ্টার প্রভৃতি সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টার প্রভৃতির প্রতি) । কেন এক ঘেঁষে হব । ওরা বৈষ্ণব আর গোঁড়া, মনে করে আমাদের মতই ঠিক, আর সব ভুল । যে কথা বলিছি, খুব লেগেছে । (সহাস্যে) হাতির মাথায় অঙ্কুশ মারতে হয় । মাথায় নাকি ওদের কোষ থাকে । (সকলের হাস্য)

ঠাকুর এইবার ছোকরাদের সঙ্গে ফষ্টি নাষ্টি করতে লাগলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি ।) আমি এদের (ছোকরাদের) কেবল নিরামিশ দিই না । মাঝে মাঝে অঁস ধোয়া জল একটু একটু দিই । তা না হলে আসবে কেন ।

মুখ্যোরা বারাণ্ডা হইতে চলিয়া গেলেন । বাগানে একটু বেড়াইবেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । আমি জপ * * করতাম্ । সমাধি হ’য়ে যেত । কেমন এর ভাব ?

মাষ্টার (গম্ভীর ভাবে) । আজ্ঞা, বেশ !

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) সাধু ! সাধু !—কিন্তু ওরা (মুখ্যোরা) কি মনে করবে ?

মাষ্টার । কেন কাপ্তেন ত বলেছিলেন, আপনার বালকের অবস্থা । ঈশ্বর দর্শন করলে বালকের অবস্থা হয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আর—বাল্য, পৌগণ্ড, যুবা । পৌগণ্ড অবস্থায় ফচ্‌কিমি ক’রে, হয়ত খেউড় মুখ দে বেরোয় । আর যুবা অবস্থায় সিংহের ন্যায় লোক শিক্ষা দেয় ।

“তুমি না হয় ওদের (মুখ্যোদের) বুঝিয়ে দিও ।

মাষ্টার । আজ্ঞা, আমার বোঝাতে হবে না । ওরা কি আর জানে না ?

শ্রীরামকৃষ্ণ ছোকরাদের সঙ্গে একটু আমোদ আহ্লাদ করিয়া এক জন ভক্তকে বলিতেছেন, ‘আজ অম্মাবস্যা, মার ঘরে যেও !

সন্ধ্যার পর আরতির শব্দ শুনা যাইতেছে। ঠাকুর বাবুরামকে বলিতেছেন—“চল্‌রে চল। কালীঘরে !” ঠাকুর বাবুরামের সঙ্গে যাইতেছেন। মাষ্টারও সঙ্গে আছেন। হরিশ বারাণ্ডায় বসিয়া আছেন দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন, ‘এর আবার বুঝি ভাব লাগলো !’

উঠান দিয়া চলিতে চলিতে শ্রীশ্রীরাধাকান্তের আরতি একটু দেখিলেন। তৎপরেই মা কালীর মন্দিরের অভিমুখে যাইতেছেন। যাইতে যাইতে হাত তুলিয়া জগন্মাতাকে ডাকিতেছেন, “ওমা ! ওমা ! ব্রহ্মমহা !” মন্দিরের সম্মুখের চাতালে উপস্থিত হইয়া মাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন। মার আরতি হইতেছে। ঠাকুর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন ও চামর লইয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন।

আরতি সমাপ্ত হইল। যাঁহারা আরতি দেখিতেছিলেন এক কালে সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও মন্দিরের বাহিরে আসিয়া প্রণাম করিলেন। মহেন্দ্র মুখ্যো প্রভৃতি ভক্তেরাও প্রণাম করিলেন।

আজ অম্মাবস্যা। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। গর্গর মাতোয়ারা ! বাবুরামের হাত ধরিয়া মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে নিজের ঘরে ফিরিলেন।

ঘরের পশ্চিমের গোল বারাণ্ডায় ফরাস একটি আলো জালিয়া দিয়া গিয়াছে। ঠাকুর সেই বারাণ্ডায় আসিয়া একটু বসিলেন। মুখে ‘হরিন ৩’ ! ‘হরিন ৩’ ! ‘হরিন ৩’ ! ও তন্ত্ৰোক্ত নানাবিধ বীজমন্ত্র।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর ঘরের মধ্যে নিজের আসনে পূর্ববাস্থ্য হইয়া বসিয়াছেন। এখনও ভাবের পূর্ণ মাত্রা।

মুখ্যো ভ্রাতৃদ্বয়, বাবুরাম, প্রভৃতি ভক্তেরা মেজেতে বসিয়া আছেন।

[Origin of Language. The Philosophy of Prayer]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া মার সহিত কথা কহিতেছেন—
বলিতেছেন—“মা, আমি ব’লবো তবে তুমি করবে—এ কথাই নয়।

দাক্ষিণেশ্বর । বাবুরাম, মুখ্যে আত্মীয় প্রতিভা ভক্ত

“কথা কওয়া কি ?—কেবল ইসারা বইত নয় !—কেউ বলছে, ‘আমি খাবো’ ;—আবার কেউ বলছে, ‘যা আমি শুনবো না’ ।

“আচ্ছা, মা ! যদি না বলতাম ‘আমি খাবো’ তা হলে কি যেমন খিদে তেমনি খিদে থাকতো না ? তোমাকে বললেই তুমি শুনবে, আর ভিতরটা শুধু ব্যাকুল হ’লে তুমি শুনবে না,—তা কখন হ’তে পারে !

“তুমি যা আছ তাই আছ—তবে বলি কেন—প্রার্থনা করি কেন ?

“ও ! যেমন করাও তেমনি করি !

“মা ! সব গোল হস্বে গেল !—কেন বিচার করাও !

ঠাকুর ঈশ্বরের সঙ্গে কথা কহিতেছেন ।—ভক্তেরা অবাক হইয়া শুনিতেছেন ।

[সংস্কার ও তপস্যার প্রয়োজন । ভক্তদিগকে শিক্ষা—সাধুসেবা ।]

এইবার ভক্তদের উপর ঠাকুরের দৃষ্টি পড়িয়াছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) । তাঁকে লাভ ক’রতে হ’লে সংস্কার দরকার । একটু কিছু ক’রে থাকা চাই । তপস্যা । তা এ জন্মেই হোক আর পূর্ব জন্মেই হোক ।

“দ্রৌপদীর যখন বস্ত্রহরণ ক’রছিল, তার ব্যাকুল হ’য়ে ক্রন্দন শুনে ঠাকুর দেখা দিলেন । আর বললেন—‘তুমি যদি কারুকে কখনও বস্ত্র দান করে থাক, ত মনে করে দেখ—তবে লজ্জা নিবারণ হবে ।’ দ্রৌপদী বললেন, ‘হাঁ মনে পড়ছে । এক জন ঋষি স্নান কচ্ছিলেন,—তাঁর কপ্‌নী ভেঁষে গিছিলো । আমি নিজের কাপড়ের আধখান ছিঁড়ে তাঁকে দিছিলাম ।’ ঠাকুর বললেন—‘তবে আর তোমার ভয় নাই ।’

মাষ্টার ঠাকুরের আসনের পূর্ব দিকে পাপোষে বসিয়া আছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । তুমি ওটা বুঝেছ ।

মাষ্টার । আজ্ঞা, সংস্কারের কথা ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । একবার বল দেখি কি বললাম ।

মাষ্টার । দ্রৌপদী নাইতে গিছিলেন ইত্যাদি [হাজার প্রবেশ ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

[হাজরা মহাশয় ।]

হাজরা মহাশয় এখানে দুই বৎসর আছেন । তিনি ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুরের নিকটবর্তী সিওড় গ্রামে প্রথম তাঁহাকে দর্শন করেন ১৮৮০ খৃঃ । এই গ্রামে ঠাকুরের ভাগিনেয়, পিসীতাত ভগিনী হেমাজিনী দেবীর পুত্র, শ্রীযুক্ত হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের বাস । ঠাকুর তখন হৃদয়ের বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন ।

সিওড়ের নিকটবর্তী মরাগোড় গ্রামে হাজরা মহাশয়ের নিবাস । তাঁহার বিষয় সম্পত্তি জমি প্রভৃতি এক রকম আছে । পরিবার সন্তান সন্ততি আছে । এক রকম চলিয়া যায় । কিছু দেনাও আছে, আন্দাজ হাজার টাকা ।

যৌবন কাল হইতে তাঁহার বৈরাগ্যের ভাব—কোথায় সাধু, কোথায় ভক্ত, খুঁজিয়া বেড়ান । যখন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে প্রথম আসেন ও সেখানে থাকিতে চান ঠাকুর তাঁহার ভক্তিভাব দেখিয়া, ও দেশের পরিচিত বলিয়া, ওখানে যত্ন করিয়া নিজের কাছে রাখেন ।

হাজরার জ্ঞানীর ভাব । ঠাকুরের ভক্তি ভাব ও ছোকরাদের জ্ঞান ব্যাকুলতা পছন্দ করেন না । মাঝে মাঝে তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া মনে করেন । আবার কখনও সামান্য বলিয়া জ্ঞান করেন ।

তিনি ঠাকুরের ঘরের দক্ষিণ পূর্বের বারান্দায় আসন করিয়াছেন । সেই খানে মালা লইয়া অনেক জপ করেন । রাখাল প্রভৃতি ভক্তেরা বেশী জপ করেন না বলিয়া লোকের কাছে নিন্দা করেন ।

তিনি আচারের বড় পক্ষপাতী । আচার আচার করিয়া তাঁহার এক প্রকার শুচিবাই হইয়াছে । তাঁহার বয়স প্রায় ৩৮ হইবে ।

হাজরা মহাশয় ঘরে প্রবেশ করিলেন । ঠাকুর আবার ঈষৎ ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন ও কথা কহিতেছেন ।

[ঈশ্বর প্রার্থনা কি শুনেন ? ‘ঈশ্বরের জ্ঞান ক্রন্দন কর, শুনবেন ।’]

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি) । তুমি যা করছ তা ঠিক,—কিন্তু ঠিক ঠিক বসছে না ।

দক্ষিণেশ্বর। বাবুরাম, হাজরা, মুখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে। ২০১

“কারু নিন্দা কোরো না—পোকাটীরও না। তুমি নিজেই ত বলো, লোমস মুনির কথা। যেমন ভক্তি প্রার্থনা করবে তেমনি ওটাও বলবে—‘যেন কারু নিন্দা না করি’।

হাজরা। (ভক্তি) প্রার্থনা করলে তিনি শুনবেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। এক—শো—বার!—যদি ঠিক হয়—যদি আন্তরিক হয়। বিষয়ী লোক যেমন ছেলে কি স্ত্রীর জন্য কাঁদে সেরূপ ঈশ্বরের জন্য কই কাঁদে ?

[পূর্বকথা—স্ত্রীর অসুখে কামারপুকুরবাসীর থরথর কম্প।]

“ও দেশে এক জনের পরিবারের অসুখ হয়েছিল।—সারবে না মনে করে লোকটা থর থর করে কাঁপতে লাগলো,—অজ্ঞান হয় আর কি !!

“এরূপ ঈশ্বরের জন্য কে হচ্ছে !

হাজরা ঠাকুরের পায়ের ধুলা লইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সঙ্কুচিত হইয়া)। উগুনো কি !

হাজরা। যাঁর কাছে আমি রয়েছি তাঁর পায়ের ধুলা লব না ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরকে তুষ্ট কর সকলেই তুষ্ট হবে। তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্।—ঠাকুর যখন দ্রোপদীর হাঁড়ীর শাক খেয়ে বসেন, আমি তৃপ্ত হয়েছি তখন জগৎ শুদ্ধ জীব তৃপ্ত—হেউ ঢেউ হয়েছিল। কই মুনিরা খেলে কি জগৎ তুষ্ট হয়েছিল—হেউ ঢেউ হয়েছিল ?

ঠাকুর লোকশিক্ষার্থ কিছু কন্ম করতে হয়, এই কথা বলিতেছেন।

[পূর্বকথা—বটতলার সাধুর গুরুপাদুকা ও শালগ্রাম পূজা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি)। জ্ঞানলাভের পরও লোকশিক্ষার জন্য পূজাদি কন্ম রাখে।

“আমি কালীঘরে যাই, আবার ঘরের এই সব পট নমস্কার করি,—তাই সকলে করে। তার পর অভ্যাস হয়ে গেলে যদি না করে তা হলে মন হুস্ফুস করবে।

“বটতলায় সন্ন্যাসীকে দেখলাম। যে আসনে গুরুপাদুকা রেখেছে তারই উপরে শালগ্রাম রেখেছে ! ও পূজা করছে ! আমি জিজ্ঞাসা

করলাম, ‘যদি এতদূর জ্ঞান হয়ে থাকে তবে পূজা করা কেন?’ সন্ন্যাসী বলে,—‘সবই করা যাচ্ছে—এ ও একটা করলাম। কখনও ফুলটা এ পায়ে দিলাম, আবার কখনও একটা ফুল ও পায়ে দিলাম।’

“দেহ থাকতে কৰ্ম্মত্যাগ যো নাই—পাঁক থাকতে ভুড়ভুড়ি হবেই * ।

[The three stages শাস্ত্র, গুরুমুখ, ও সাধনা । Goal প্রত্যক্ষ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরাকে) । এক জ্ঞান থাকলেই অনেক জ্ঞানও আছে ।

“শুধু শাস্ত্র পড়ে কি হবে ?

“শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশেল আছে—চিনিটুকু লওয়া বড় কঠিন । তাই শাস্ত্রের মৰ্ম্ম সাধুমুখে, গুরুমুখে, শুনে নিতে হয় । তখন আর গ্রন্থের কি দরকার ?

“চিঠিতে খবর এসেছে,—‘পাঁচ সের সন্দেশ পাঠাইবা,—আর এক খানা রেল পেড়ে কাপড় পাঠাইবা ।’ এখন চিঠিখানি হারিয়ে গেল । তখন বাস্তব হয়ে চার দিকে খোঁজে ! অনেক খোঁজবার পর চিঠিখানি পেল, পোড়ে দেখে,—লিখছে—‘পাঁচসের সন্দেশ আর একখানা রেলপেড়ে কাপড় পাঠাইবা ।’ তখন চিঠিখানি আবার ফেলে দেয় । আর কি দরকার ?—এখন সন্দেশ আর কাপড়ের যোগাড় করলেই হলো ।

(মুখ্যো, বাবুরাম, মাফটার প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি) সব সন্ধান জেনে তার পর ডুব দাও । পুকুরের অমুক যায়গায় ঘটিটা পড়ে গেছে । যায়গাটি ঠিক করে দেখে নিয়ে সেইখানে ডুব দিতে হয় ।

“শাস্ত্রের মৰ্ম্ম গুরু মুখে শুনে নিয়ে, তারপর সাধন করতে হয় । এই সাধন ঠিক ঠিক হলে তবে প্রত্যক্ষ দর্শন হয় ।

“ডুব দিলে তবে ত ঠিক ঠিক সাধন হয় ! বসে বসে শাস্ত্রের কথা নিয়ে কেবল বিচার করলে কি হবে ? শ্যালারা পথে যাবারই কথা—ঐ নিয়ে মর’ছে !—মরু শ্যালারা, ডুব দেয় না !!

ন হি দেহভূতা শকাং ত্যক্তুং কৰ্ম্মাশেষতঃ

যন্ত কৰ্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যাভিধীয়তে ॥ গীতা (১৭অ) ।

‘যদি বল ডুব দিলেও হাঙ্গর কুমীরের ভয় আছে—কাম ক্রোধাদির ভয় আছে ।—হলুদ মেখে ডুব দাও—তারা কাছে আসতে পারবে না । বিবেক বৈরাগ্য হলুদ ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

পূর্বকথা—শ্রীরামকৃষ্ণের পুরাণ, তন্ত্র ও বেদ মতের সাধনা ।

[পঞ্চবটী, বেলতলা ও চাঁদনীর সাধন । তোতার কাছে সন্ন্যাসগ্রহণ ১৮৬৬ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) । তিনি আমায় নানারূপ সাধন করিয়েছেন । প্রথম, পুরাণ মতের—তার পর তন্ত্র মতের, আবার বেদ মতের । প্রথমে পঞ্চবটীতে সাধনা করতাম্ । তুলসী কানন হলো—তার মধ্যে বসে ধ্যান করতাম । কখনও ব্যাকুল হয়ে, ‘মা ! মা !’ বলে ডাকতাম—বা ‘রাম ! রাম !’ করতাম ।

“যখন ‘রাম রাম’ কর্তাম তখন হনুমানের ভাবে হয়তো একটা ল্যাজ পরে বসে আছি ! উন্মাদের অবস্থা । সে সময়ে পূজা করতে করতে গরদের কাপড় পরে আনন্দ হতো—পূজারই আনন্দ !

“তন্ত্রমতের সাধনা বেলতলায় । তখন তুলসী গাছ—সজনের খাড়া—এক মনে হতো !

“সে অবস্থায় শিবানীর উচ্ছিষ্ট—সমস্ত রাত্রি পড়ে আছে—তা সাপে খেলে কি কিসে খেলে তার ঠিক নাই—ঐ উচ্ছিষ্টই আহার ।

“কুকুরের উপর চড়ে তার মুখে লুচি দিয়ে খাওয়াতাম, আর নিজেও খেতাম । *সব্বং বিম্বুংমম্বং জগৎ* ।—জমবে তাই আচমন । আমি সে মাটিতে পুকুর থেকে জল দিয়ে আচমন করতাম ।

“অবিষ্টাকে নাশ না করলে হবে না । আমি তাই বাঘ হতাম । হয়ে অবিষ্টাকে খেয়ে ফেলতাম ।

“বেদমতে সাধনের সময় সন্ন্যাস নিলাম । তখন চাঁদনীতে পড়ে থাকতাম—হৃদুকে বলতাম,—‘আমি সন্ন্যাসী হয়েছি, চাঁদনীতে ভাত খাবো !

[সাধন কালে নানা দর্শন ও জগন্মাতার বেদান্ত, গীতা সম্বন্ধে উপদেশ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) । হত্যা দিয়ে পড়েছিলাম ! মাকে

বল্লাম, আমি মুখ্য—তুমি আমায় জানিয়ে দাও—বেদ পুরাণ তন্ত্রে,—
নানা শাস্ত্রে,—কি আছে ।

“মা বল্লেন, বেদান্তের সার ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা । যে সচ্চিদানন্দ
ব্রহ্মের কথা বেদে আছে, তাঁকে তন্ত্রে বলে সচ্চিদানন্দঃ শিবঃ—আবার
তাঁকেই পুরাণে বলে সচ্চিদানন্দঃ কৃষ্ণঃ ।

“গীতা দশবার বল্লেন যা হয়—তাই গীতার সার । অর্থাৎ ত্যাগী ত্যাগী ।

“তাঁকে যখন লাভ হয়, বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র,—কত নীচে পড়ে
থাকে ! (হাজরাকে) ওঁঃ উচ্চারণ করবার যো নাই ।—এটি কেন হয় ?
সমাধি থেকে অনেক নেমে না এলে ওঁ উচ্চারণ করতে পারি না ।

“প্রত্যক্ষ দর্শনের পর যা যা অবস্থা হয় শাস্ত্রে আছে, সে সব
হয়েছিল । বালকবৎ, উন্মাদবৎ, পিচাশবৎ, জড়বৎ ।

“আর শাস্ত্রে যেরূপ আছে, সেরূপ দর্শনও হতো ।

“কখন দেখতাম জগৎময় আগুনের স্ফুলিঙ্গ !

“কখন চারদিকে যেন পারার হ্রদ,—ঝগ্ ঝগ্ করছে ! আবার
কখনও রূপা গলার মত দেখতাম ।

“কখন দেখতাম রঙ্গমশালের আলো যেন জ্বলছে !

“তা হলেই হলো, শাস্ত্রের সঙ্গে ঐক্য হচ্ছে ।

[শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থা—নিত্যলীলাযোগ ।]

“আবার দেখালে, তিনিই জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, হয়েছেন !
ছাদে উঠে আবার সিঁড়িতে নামা । অনুলোম বিলোম ।

“উঃ ! কি অবস্থাতেই রেখেছে !—একটা অবস্থা যায় তো আর
একটা আসে ! যেন ভেঁকির পাড় ! একদিক নীচু হয় ত আর
একদিক উঁচু হয় !

“যখন অন্তর্মুখ—সমাধিস্থ—তখনও দেখছি তিনি ! আবার যখন
বাহিরের জগতে মন এলো, তখনও দেখছি তিনি !

“যখন আরসীর এ পিঠ দেখছি তখনও তিনি !—আবার যখন উল্টো
পিঠ দেখছি তখনও তিনি !

মুখ্যে ভ্রাতৃদ্বয়, বাবুরাম প্রভৃতি ভক্তেরা অবাক হইয়া শুনিতেন ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

পূর্বকথা—শম্ভুমল্লিকের অনাসক্তি । মহাপুরুষের আশ্রয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মুখ্যে প্রভৃতিকে) । কাপ্তেনের ঠিক সাধকের অবস্থা ।

“ঐশ্বর্য থাকলেই যে তাতে আসক্ত হতেই হবে, এমন কিছু নয় । শম্ভু (মল্লিক) বল’ত, ‘হুদু, পোঁটলা বেঁধে বসে আছি’ ! আমি বলতাম, কি অলক্ষণে কথা কও !—

“তখন শম্ভু বলে, ‘না,—বলো, এ সব ফেলে যেন তাঁর কাছে যাই !’

“তাঁর ভক্তের ভয় নাই । ভক্ত তাঁর আত্মীয় । তিনি তাদের টেনে নেবেন । দুর্ঘোষনেরা গন্ধর্বের কাছে বন্দী হলে যুদ্ধিষ্ঠিরই উদ্ধার করলেন । বল্লেন, আত্মীয়দের ওরূপ অবস্থা হলে আমাদেরই কলঙ্ক ।”

[ঠাকুরবাড়ীর ব্রাহ্মণ ও পরিচারকগণ মধ্যে ভক্তিদান ।]

প্রায় নয়টা রাত্রি হইল । মুখ্যে ভ্রাতৃত্ব কলিকাতা ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন । ঠাকুর একটু উঠিয়া ঘরে ও বারান্দায় পাদচারণ করিতে করিতে বিষ্ণুঘরে উচ্চসংকীৰ্ত্তন হইতেছে শুনিতে পাইলেন । তিনি জিজ্ঞাসা করাতে একজন ভক্ত বলিলেন, তাহাদের সঙ্গে লাটু ও হরিশ জুটিয়াছে । ঠাকুর বলিলেন,—ও তাই !

ঠাকুর বিষ্ণুঘরে আসিলেন । সঙ্গে সঙ্গে ভক্তেরাও আসিলেন । তিনি শ্রীশ্রীরাধাকান্তকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ।

ঠাকুর দেখিলেন যে, ঠাকুরবাড়ীর ব্রাহ্মণেরা—যারা ভোগ রাঁধে, নৈবেদ্য করে দেয়, অতিথিদের পরিবেশন করে-এবং পরিচারকেরা, অনেকে একত্র মিলিত হইয়া নামসংকীৰ্ত্তন করিতেছে । ঠাকুর একটু দাঁড়াইয়া তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিলেন ।

উঠানের মধ্য দিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় ভক্তদের বলিতেছেন—

“ছাখো, এরা সব কেউ বেশার বাড়ী যায়, কেউ বাসন মাজে !

ঘরে আসিয়া ঠাকুর নিজ আসনে আবার বসিয়াছেন । যাহারা সংকীৰ্ত্তন করিতেছিলেন, তাহারা আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন ।

ঠাকুর তাঁহাদিগকে বলিতেছেন—“টাকার জন্ত যেমন ঘাম বার করো, তেমনি হরিনাম করে নেচে গেয়ে ঘাম বার করতে হয় ।

“আমি মনে করলাম, তোমাদের সঙ্গে নাচবো । গিয়ে দেখি যে, ফোড়ন টোড়ন সব পড়েছে—মেথি পর্য্যন্ত । (সকলের হাস্য)—আমি আর কি দিয়ে সম্বরা করবো !

“তোমরা মাঝে মাঝে হরিনাম করতে অমন এসো ।”

মুখ্যে প্রভৃতি ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন ।

ঠাকুরের ঘরের ঠিক উত্তরের ছোট বারান্দাটির পাশে মুখ্যদের গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল । গাড়ীতে বাতী জালা হইয়াছে ।

[ভক্ত বিদায় ও ঠাকুরের স্নেহ ।]

ঠাকুর সেই বারাণ্ডার চাতালের ঠিক উত্তরপূর্ব কোণে উত্তরাস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন ! একজন ভক্ত পথ দেখাইয়া একটা আলো আনিয়াছেন—ভক্তদের তুলিয়া দিবেন ।

আজ অমাবস্যা।—অন্ধকার রাত্রি ।—ঠাকুরের পশ্চিম দিকে গঙ্গা, সম্মুখে নহবৎ, পুষ্পোদ্যান ও কুঠী ; ঠাকুরের ডানদিকে সদর ফটকে যাইবার রাস্তা ।

ভক্তেরা তাঁহাব চরণে মস্তক অবলুষ্ঠিত করিয়া একে একে গাড়ীতে উঠিতেছেন । ঠাকুর একজন ভক্তকে বলিতেছেন—“ঈশানকে একবার বোলো না—ওর কর্মের জন্ত ।”

গাড়ীতে বেশী লোক দেখিয়া,—পাছে ঘোড়ার কষ্ট হয়—ঠাকুর বলিতেছেন—“গাড়ীতে অত লোক কি ধরবে ?”

ঠাকুর দাঁড়াইয়া আছেন । সেই ভক্তবৎসল মূর্তি দেখিতে দেখিতে ভক্তেরা কলিকাতা যাত্রা করিলেন ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

চতুর্থ ভাগ—একবিংশ খণ্ড ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে লাটু, মাষ্টার, মণিলাল,
মুখুষো প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন ।

আজ বৃহস্পতিবার, ২রা অক্টোবর, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ । আশ্বিন শুক্লা
দ্বাদশী-ত্রয়োদশী । শ্রীশ্রীবিজয়া দশমীর দুই দিন পরে । ১৭ই আশ্বিন
১২৯১ । গতকল্য ঠাকুর কলিকাতায় অধরের বাড়ীতে শুভাগমন করিয়া-
ছিলেন । সেখানে নারান, বাবুরাম, মাষ্টার, কেদার, বিজয় প্রভৃতি
অনেকে ছিলেন । ঠাকুর সেখানে ভক্তসঙ্গে কীৰ্ত্তনানন্দে নৃত্য করিয়া-
ছিলেন । (২য় ভাগ)

ঠাকুরের কাছে আজ কাল লাটু, রামলাল, হরীশ থাকেন । বাবুরাম
ও মাঝে মাঝে আসিয়া থাকেন । শ্রীযুক্ত রামলাল শ্রীশ্রীভবতারিণীর
সেবা করেন । হাজরা মহাশয়ও আছেন ।

আজ শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিক, প্রিয়মুখুষো, তাঁহার আত্মীয় হরি ;
শিবপুরের একটি ব্রাহ্ম (দাড়ি আছে) ; বড় বাজার ১২ নং মল্লিক
ষ্ট্রীটের মাড়োয়ারী ভক্তেরা—উপস্থিত আছেন । ক্রমে দক্ষিণেশ্বরের
কয়েকটি ছোকরা, সিঁতির মহেন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি ভক্তেরা আসিলেন ।
মণিলাল পুরাতন ব্রাহ্ম ভক্ত ।

[ব্রাহ্ম মণিলালকে উপদেশ—‘বিদ্বেষভাব Dogmatism ত্যাগকর’]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণিলাল প্রভৃতির প্রতি) । নমস্কার মানসে ই
ভাল । পায়ে হাত দিয়ে নমস্কারে কি দরকার । আর মানসে নমস্কার
করলে কেউ কুণ্ঠিত হবে না ।

“আমারই ধর্ম ঠিক, আর সকলের মিথ্যা, এ ভাব ভাল নয় ।

“আমি দেখি তিনি ই সব হ’য়ে রয়েছেন—মানুষ, প্রতিমা,

শালগ্রাম, সকলের ভিতরেই এক দেখি। একছাড়া দুই আমি দেখি না।

“অনেকে মনে করে আমাদের মত ঠিক, আর সব ভুল,—আমরা জিতেছি আর সব হেরেছে। কিন্তু যে এগিয়ে এসেছে সে হয় ত’ একটুর জন্য আটকে গেল! পেছনে যে পড়ে ছিল সে তখন এগিয়ে গেল। গোলকধাম খেলায়, অনেক এগিয়ে এসে, পোয়া (ঘুঁটী) আর পড়ল না!

“হার জিত তাঁর হাতে। তাঁর কার্য কিছু বুঝা যায় না। দেখ না, ডাব অত উচুতে থাকে, রোদ পায়, তবু ঠাণ্ডা শক্তি!—এ দিকে পানি ফল জলে থাকে—গরম গুণ।

“মানুষের শরীর দেখ। মাথা যেটা মূল (গোড়া), সেটা উপরে চলে গেল।

[শ্রীরামকৃষ্ণ, চার আশ্রম ও যোগতত্ত্ব । ব্রাহ্মসমাজ ও ‘মনোযোগ’ ।]

মণিলাল। আমাদের এখন কর্তব্য?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কোন রকম ক’রে তাঁর সঙ্গে যোগ হ’য়ে থাকা। দুই পথ আছে,—কর্মযোগ আর মনোযোগ।

“যারা আশ্রমে আছে, তাদের যোগ কর্মের দ্বারা। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। সন্ন্যাসীরা * কাম্য কর্মের ত্যাগ ক’রবে কিন্তু নিত্যকর্ম কামনাশূন্য হ’য়ে করবে! দণ্ডধারণ, ভিক্ষা করা; তীর্থযাত্রা, পূজা, জপ এ সব কর্মের দ্বারা তাঁর সঙ্গে যোগ হয়।

“আর যে কর্মই কর, ফলাকাজ্জা ত্যাগ ক’রে কামনাশূন্য হ’য়ে ক’রতে পারলে তাঁর সঙ্গে যোগ হয়।

“আর এক পথ মনোযোগ। এরূপ যোগীর বাহিরের কোন চিহ্ন নাই। অন্তরে যোগ। যেমন জড়ভরত, শুকদেব। আরও কত আছে—এরা নামজাদা। এদের শরীরে চুল দাড়ী, যেমন তেমনই থাকে।

“পরমহংস অবস্থায় কর্ম উঠে যায়। স্মরণ মনন থাকে। সর্বদাই মনের যোগ। যদি কর্ম করে সে লোক শিক্ষার জন্য।

* কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ। সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহৃত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ ত্যাগ্যং দোষবদিত্যেকৈ কর্ম প্রাহর্মণীষিণঃ। যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাগ্যমিতি চাপরে॥ গীতা, ১৮অ, ২-৩ শ্লোক।

“কন্ঠের দ্বারাই যোগ হউক, আর মনের দ্বারাই যোগ হউক, ভক্তি হ’লে সব জানতে পারা যায় ।

“ভক্তিতে কুন্তক আপনি হয়—একাগ্র মন হলেই বায়ু স্থির হ’য়ে যায়; আর বায়ু স্থির হলেই মন একাগ্র হয়, বুদ্ধি স্থির হয় । যার হয়, সে নিজে টের পায় না ।

[পূর্বকথা—সাধনাবস্থায় জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা । ভক্তিযোগ ।]

“ভক্তিযোগে সব পাওয়া যায় । আমি মা’র কাছে কেঁদে কেঁদে বলেছিলাম, ‘মা যোগীরা যোগ ক’রে যা জেনেছে, জ্ঞানীরা বিচার ক’রে যা জেনেছে—আমায় জানিয়ে দাও—আমায় দেখিয়ে দাও !’ মা আমায় সব দেখিয়ে দিয়েছেন । ব্যাকুল হ’য়ে তাঁর কাছে কাঁদলে তিনি সব জানিয়ে দেন । বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র—এ সব শাস্ত্রে কি আছে, সব তিনি আমায় জানিয়ে দিয়েছেন ।

মণিলাল । হঠযোগ ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । হঠযোগীরা দেহাভিমানী সাধু । কেবল নেতি ধোতি করছে—কেবল দেহের যত্ন । ওদের উদ্দেশ্য আয়ু বৃদ্ধি করা । দেহ নিয়ে রাত দিন সেবা । ও ভাল নয় ।

[মণি মল্লিক, সংসারী ও মনে ত্যাগ । কেশব সেনের কথা ।]

“তোমাদের কর্তব্য কি ?—তোমরা মনে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ক’রবে । তোমরা সংসারকে কাকবিষ্ঠা বলতে পার না ।

“গোস্বামীরা গৃহস্থ, তাই তাদের আমি বললাম, ‘তোমাদের ঠাকুর-সেবা রয়েছে, তোমরা সংসার ত্যাগ কি করবে ?—তোমরা সংসারকে মায়া ব’লে উড়িয়ে দিতে পার না’ ।

“সংসারীদের যা কর্তব্য চৈতন্যদেব বলেছিলেন,—‘জীবে দশা, বৈষ্ণব-সেবা, নাম-সংকীৰ্ত্তন ।’

“কেশব সেন ব’লেছিল,—‘উনি এখন ‘দুইই কর’ ব’লছেন । এক দিন কুটুস্ করে কামড়াবেন ।’ তা নয়—কামড়াব কেন ?

মণি মল্লিক । তাই কামড়ান্ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । কেন ? তুমি ত’ তাই আছ—অেমার ত্যাগ করবার কি দরকার ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

আচার্য্যের কামিনীকাঞ্চনত্যাগ, তবে লোকশিক্ষার অধিকার ।

সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম । ব্রাহ্ম মণিলালকে শিক্ষা ।

“যাদের দ্বারা তিনি লোক শিক্ষা দেবেন, তাদের সংসার ত্যাগ করা দরকার । যিনি আচার্য্য, তাঁর কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী হওয়া দরকার । তা না হ’লে উপদেশ গ্রাহ্য হয় না । শুধু ভিতরে ত্যাগ হ’লে হবে না । বাহিরে ত্যাগও চাই, তবে লোকশিক্ষা হয় । তা না হ’লে লোকে মনে করে, ইনি যদিও কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করতে বলছেন, ইনি নিজে ভিতরে ভিতরে ঐ সব ভোগ করেন ।

“এক জন কবিরাজ ঔষধ দিয়ে রোগীকে বল্লে, তুমি আর এক দিন এসো, খাওয়া দাওয়ার কথা ব’লে দিব । সে দিন তাঁর ঘরে অনেকগুলি গুড়ের নাগরি ছিল । রোগীর বাড়ী অনেক দূরে । সে আর এক দিন এসে দ্যাখা কর্লে । কবিরাজ বল্লে, ‘খাওয়া দাওয়া সাবধানে কর্বি, গুড় খাওয়া ভাল নয় ।’ রোগী চ’লে গেলে, এক জন বৈদ্যকে বল্লে, ‘ওকে অত কষ্ট দিয়ে আনা কেন ? সেই দিন বল্লেই ত’ হত !’ বৈদ্য হেসে বল্লে, ‘ওর মানে আছে । সেদিন ঘরে অনেকগুলি গুড়ের নাগরি ছিল । সে দিন যদি বলি, রোগীর বিশ্বাস হ’ত না । সে মনে কর্ত, ‘ওঁর ঘরে যেকালে এত গুড়ের নাগরি, উনি নিশ্চয় কিছু কিছু খান । তা হ’লে গুড় জিনিসটা এত খারাপ নয় ।’ আজ আমি গুড়ের নাগরি লুকিয়ে ফেলেছি, এখন বিশ্বাস হবে ।

“আদিসমাজের আচার্য্যকে দেখলাম । শুন্লাম নাকি দ্বিতীয় না তৃতীয় পক্ষের বিয়ে ক’রেছে !—বড় বড় ছেলে !

“এই সব আচার্য্য । এরা যদি বলে ‘ঈশ্বর সত্য আর সব মিথ্যা’, কে বিশ্বাস করবে !—এদের শিষ্য যা হবে, বুঝতেই পার্ছ ।

“হেগো গুরু তার পেদো শিষ্য ! সন্ন্যাসীও যদি মনে ত্যাগ করে, বাহিরে কামিনীকাঞ্চন লয়ে থাকে—তার দ্বারা লোকশিক্ষা হয় না । লোকে বল্বে, লুকিয়ে লুকিয়ে গুড় খায় ।

[শ্রীরামকৃষ্ণের কাঞ্চনত্যাগ । করিরাজের পাঁচ টাকা প্রত্যর্পণ ।]

“সিঁতির মহেন্দ্র (কবিরাজ) রামলালের কাছে পাঁচটা টাকা দিয়ে গিচ্ছলো—আমি জানতে পারি নাই ।

“রামলাল বললে পর, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কাকে দিয়াছে ? সে বললে, এখানকার জন্ম । আমি প্রথমটা ভাবলুম, দুধের দেনা আছে, না হয় সেইটে শোধ দেওয়া যাবে । ও মা ! খানিক রাত্রে ধড়মড় করে উঠে পড়েছি । বুকে যেন বিল্লি ঝাঁচড়াচ্ছে ! রামলালকে তখন গিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলুম—‘তোমার খুড়ীকে কি দিয়েছে ?’ সে বললে ‘না’ । তখন তাকে বললাম, ‘তুই এক্ষণই ফিরিয়ে দিয়ে আয় !’ রামলাল তার পর দিন টাকা ফিরিয়ে দিলে ।

“সন্ন্যাসীর পক্ষে টাকা লওয়া বা লোভে আসক্ত হওয়া কীরূপ, জানো ? যেমন ব্রাহ্মণের বিধবা অনেক কাল হবিষ্য খায়, ব্রহ্মচর্য্য করে, বাগ্দি উপপত্তি করেছিল ! (সকলে স্তম্ভিত)

“ও দেশে ভগী তেলীর অনেক শিষ্য সামন্ত হলো । শূদ্রকে সববাই প্রণাম করে দেখে, জমীদার একটা দুফট লোক লাগিয়ে দিলে । সে তার ধর্ম্ম নষ্ট করে দিলে—সাধন ভজন সব মাটি হয়ে গেলো । পতিত সন্ন্যাসী সেইরূপ ।

[সাধুসঙ্গের পর শ্রদ্ধা । কেশব সেন ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ।]

“তোমরা সংসারে আছ, তোমাদের সৎসঙ্গ (সাধুসঙ্গ) দরকার ।

“আগে সাধুসঙ্গ, তার পর শ্রদ্ধা । সাধুরা যদি তাঁর নামগুণানু-কীৰ্ত্তন না করে, তা হ’লে কেমন করে লোকের ঈশ্বরে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ভক্তি হবে ? তিন পুরুষে আমীর জানলে তবে তো লোকে মানবে ?

(মাফটারের প্রতি) জ্ঞান হলেও সর্বদা অনুশীলন চাই । গ্যাংটা বলতো, ঘটি এক দিন মাজ্লে কি হবে—ফেলে রাখলে আবার কলঙ্ক পড়বে !

“তোমার বাড়ীটায় একবার যেতে হবে । তোমার আড্ডাটা জানা থাকলে, সেখানে আরও ভক্তদের সঙ্গে দেখা হবে । ঈশানের কাছে একবার যাবে ।

(মণিলালের প্রতি) কেশব সেনের মা এসেছিল। তাদের বাড়ীর ছোকরারা হরিণাম করলে। সে তাদের প্রদক্ষিণ করে হাত-তালি দিতে লাগলো। দেখলাম শোকে কাতর হয় নাই। এখানে এসে একাদশী করলে, মালাটী লয়ে জপ করে। বেশ ভক্তি দেখলাম।

মণিলাল। কেশব বাবুর পিতামহ রামকমল সেন ভক্ত ছিলেন। তুলসীকাননের মধ্যে বসে নাম করতেন। কেশবের বাপ প্যারী-মোহনও ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বাপ ওরূপ না হলে ছেলে অমন ভক্ত হয় না। ছাথো না, বিজয়ের অবস্থা।

“বিজয়ের বাপ ভাগবত পড়তে পড়তে ভাবে অজ্ঞান হয়ে যেত। বিজয় মাঝে মাঝে ‘হরি ! হরি !’ বলে উঠে পড়ে।

‘আজ কাল বিজয় যা সব (ঈশ্বরীয় রূপ) দর্শন করছে, সব ঠিক ঠিক।

“সাকার নিরাকারের কথা বিজয় বলে—যেমন বলরূপীর রং লাল নীল, সবুজও হচ্ছে,—আবার কোন রংই নাই। কখন সগুণ কখন নিগুণ।

[‘বিজয় সরল। সরল হলে ঈশ্বর লাভ হয়।’]

“বিজয় বেশ সরল। খুব উদার সরল না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

“বিজয় কাল অধর সেনের বাড়ীতে গিছলো। তা যেন আপনার বাড়ী—সবাই যেন আপনার।

“বিষয়বুদ্ধি না গেলে উদার সরল হয় না।

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাইতেছেন—

গান—অমূল্যধন পাবি রে মন হলে খাঁটি !

“মাটি পাট করা না হলে হাঁড়ী তৈয়ার হয় না। ভিতরে বালি, টিল থাকলে হাঁড়ী ফেটে যায়। তাই কুমোর আগে মাটি পাট করে।

“আরশীতে ময়লা পড়ে থাকলে মুখ দেখা যায় না। চিত্তশুদ্ধি না হলে স্বস্বরূপ দর্শন হয় না।

“ছাথো না, যেখানে অবতার, সেই খানেই সরল। নন্দঘোষ,

দশরথ, বসুদেব—এঁরা সব সরল ।

“বেদান্তে বলে, শুদ্ধবুদ্ধি না হ’লে ঈশ্বরকে জানতে ইচ্ছা হয় না ।
শেষ জন্ম বা অনেক তপস্যা না থাকলে উদার
সরল হয় না ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

[শ্রীরামকৃষ্ণের বালকের অবস্থা]

ঠাকুরের পা একটু ফুলো ফুলো বোধ হওয়াতে তিনি বালকের গায়
চিন্তিত আছেন ।

সিঁতির মহেন্দ্র কবিরাজ আসিয়া প্রণাম করিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রিয় মুখ্যে প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি) । কাল
নারা’ণকে বল্লাম, তোর পা টিপে দেখ দেখি, ডোব হয় কি না । সে
টিপে দেখলে—ডোব হল ;—তখন বাঁচলুম ! (মুখ্যের প্রতি) তুমি
একবার তোমার পা টিপে ছাথো তো । ডোব হয়েছে ?

মুখ্যে । আজ্ঞা হাঁ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আঃ ! বাঁচলুম ।

মণি মল্লিক । কেন ? আপনি স্রোতের জলে নাইবেন । সোরা
ফোরা কেন খাওয়া । শ্রীরামকৃষ্ণ । না গো, তোমাদের
রক্তের জোর আছে,—তোমাদের আলাদা কথা !

“আমায় বালকের অবস্থায় রেখেছে ।

“ঘাস বনে একদিন কি কামড়ালে । আমি শুনেছিলাম সাপে যদি
আবার কামড়ায়, তা হ’লে বিষ তুলে লয় । তাই গর্তে হাত দিয়ে
রইলাম । একজন এসে বলে—ও কি কচ্ছেন ?—সাপ যদি সেই
খানটা আবার কামড়ায়, তা হলে হয় । অন্য জায়গায় কামড়ালে হয় না ।

“শরতের হিম ভাল, শুনেছিলাম—কলকাতা থেকে গাড়া করে
আসবার সময় মাথা বা’র করে হিম লাগাতে লাগলাম । (সকলের হাস্য)

(সিঁতির মহেন্দ্রের প্রতি) “তোমাদের সিঁতির সেই পণ্ডিতটী
বেশ । বেদান্তবাগীশ । আমায় মানে । যখন বল্লাম, তুমি অনেক

পড়েছ, কিন্তু ‘আমি অমুক পণ্ডিত’ এ অভিমান ত্যাগ করো, তখন তার খুব আহ্লাদ ।

“তার সঙ্গে বেদান্তের কথা হলো ।

[মাষ্টারকে শিক্ষা । শুদ্ধ-আত্মা, অবিद्या, ব্রহ্মমায়া । বেদান্তের বিচার ।]

(মাষ্টারের প্রতি) “যিনি শুদ্ধ-আত্মা, তিনি নির্লিপ্ত । তাঁতে মায়া বা অবিद्या আছে । এই মায়ার ভিতরে তিন গুণ আছে—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ । যিনি শুদ্ধ-আত্মা তাঁতে এই তিন গুণ রয়েছে, অথচ তিনি নির্লিপ্ত । আগুনে যদি নীল বড়ি ফেলে দাও, নীল শিখা দেখা যায় ; রাঙ্গা বড়ি ফেলে দাও, লাল শিখা দেখা যায় । কিন্তু আগুনের আপনার কোন রং নাই ।

“জলে নীল রং ফেলে দাও, নীল জল হবে । আবার ফটকির ফেলে দিলে সেই জলেরই রং ।

“মাংসের ভার লয়ে যাচ্ছে চণ্ডাল—সে শঙ্করকে ছুঁয়েছিল ! শঙ্কর যেই বলেছেন, আমায় ছুঁলি !—চণ্ডাল বললে, ঠাকুর আমিও তোমায় ছুঁই নাই,—তুমিও আমায় ছোঁও নাই ! তুমি শুদ্ধ-আত্মা—নির্লিপ্ত ।

“জড় ভরতও ঐ সকল কথা রাজা রত্নগণকে বলেছিল ।

“শুদ্ধ-আত্মা নির্লিপ্ত । আর শুদ্ধ আত্মাকে দেখা যায় না । জলে লবণ মিশ্রিত থাকলে লবণকে চক্ষের দ্বারা দেখা যায় না ।

“যিনি শুদ্ধ-আত্মা, তিনিই মহাকারণ—কারণের কারণ । স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ । পঞ্চভূত স্থূল । মন বুদ্ধি অহঙ্কার, সূক্ষ্ম । প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তি সকলের কারণ । ব্রহ্ম বা শুদ্ধ আত্মা, কারণের কারণ ।

“এই শুদ্ধ আত্মাই আমাদের স্বরূপ ।

“জ্ঞান কাকে বলে ? এই স্ব স্বরূপকে জানা আর তাঁতে মন রাখা ! এই শুদ্ধ আত্মাকে জানা ।

[কন্স্ম কত দিন ।]

“কন্স্ম কত দিন ?—যত দিন দেহ-অভিমান থাকে, অর্থাৎ দেহই আমি

দক্ষিণেশ্বর । মণিমল্লিক, মহেন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ২১৫

এই বুদ্ধি থাকে । গীতায় ঐ কথা আছে । *

“দেহে আত্মবুদ্ধি করার নামই অজ্ঞান ।

(শিবপুরের ব্রাহ্ম ভক্তের প্রতি) আপনি কি ব্রাহ্ম ?

ব্রাহ্ম । আজ্ঞা হাঁ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) । আমি নিরাকার সাধকের চোখ মুখ দেখে বুঝতে পারি । আপনি একটু ডুব দিবেন । উপরে ভাসলে রত্ন পাওয়া যায় না ।

আমি সাকার নিরাকার সব মানি ।

[মাড়োয়ারী ভক্ত ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ । জীবাত্মা । চিত্ত ।]

বড় বাজারের মাড়োয়ারী ভক্তেরা আসিয়া প্রণাম করিলেন ।
ঠাকুর তাঁহাদের সুখ্যাতি করিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) । আহা ! এরা যে ভক্ত । সকলে ঠাকুরের কাছে যাওয়া—স্তুব করা—প্রসাদ পাওয়া ! এবার যাকে পুরোহিত রেখেছেন, সেটী ভাগবতের পণ্ডিত ।

মাড়োয়ারী ভক্ত । ‘আমি তোমার দাস’ যে বলে, সে আমিটা কে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । লিঙ্গশরীর বা জীবাত্মা । মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার এই চারিটী জড়িয়ে লিঙ্গশরীর ।

মাড়োয়ারী । জীবাত্মাটি কে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । অষ্টপাশ-জড়িত আত্মা । আর চিত্ত কাকে বলে ?
যে ওহো ! করে উঠে ।

[মাড়োয়ারী—‘মৃত্যুর পর কি হয় ?’ মায়া কি ? ‘গীতার মত’ ।]

মাড়োয়ারী ভক্ত । মহারাজ, মরলে কি হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । গীতার মতে, মরবার সময় যা ভাববে, তাই হবে । ভরত রাজা হরিণ ভেবে হরিণ হয়েছিল । তাই ঈশ্বরকে লাভ করবার জন্য সাধন করা চাই । রাত দিন তাঁর চিন্তা করলে মরবার সময়ও সেই চিন্তা আসবে ।

মাড়োয়ারী ভক্ত । আচ্ছা, মহারাজ, বিষয়ে বৈরাগ্য হয় না কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । এরই নাম মায়া । মায়াতে সৎকে অসৎ,

* ন হি দেহভূতা শক্যং ত্যক্তুং কস্মাণ্যশেষতঃ ।

যন্তু কৰ্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যাভধীয়তে ॥

অসৎকে সৎ বোধ হয় ।

সৎ অর্থাৎ যিনি নিত্য,—পরব্রহ্ম । অসৎ—সংসার—অনিত্য
মাড়োয়ারী ভক্ত । শাস্ত্র পড়ি, কিন্তু ধারণা হয় না কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । পড়লে কি হবে ? সাধনা—তপস্যা চাই ! তাঁকে ডাকো ।

“সিদ্ধি সিদ্ধি বল্লে কি হবে, কিছু খেতে হয় ।

“এই সংসার কাঁটাগাছের মত । হাত দিলে রক্ত বেরোয় । যদি
কাঁটা গাছ এনে, বসে বসে বল, ‘ঐ গাছ পুড়ে গেল’, তা কি অমনি
পুড়ে যাবে ? জ্ঞানাগ্নি আহরণ কর । সেই আগুন লাগিয়ে দাও,
তবে ত পুড়বে !

“সাধনের অবস্থায় একটু খাটতে হয়, তার পর সোজা পথ । বাঁক
কাটিয়ে অনুকূল বায়ুতে নৌকা ছেড়ে দাও ।

[আগে মায়ার সংসার ত্যাগ, তার পর জ্ঞানলাভ,—ঈশ্বরলাভ ।]

“যতক্ষণ মায়ার ঘরের ভিতরে আছ, যতক্ষণ মায়া-মেঘ রয়েছে,
ততক্ষণ জ্ঞান সূর্য্য কাজ করে না । মায়াঘর ছেড়ে বাহিরে এসে
দাঁড়ালে, (কামিনীকাক্ষন ত্যাগের পর) তবে জ্ঞানসূর্য্য অবিষ্টা নাশ
করে । ঘরের ভিতরে আন্লে আতস কাচে কাগজ পুড়ে না । ঘরের
বাইরে এসে দাঁড়ালে, রোদটী কাঁচে পড়ে,—তখন কাগজ পুড়ে যায় ।

“আবার মেঘ থাকলে আতস কাচে কাগজ পুড়ে না । মেঘটী সরে
গেলে তবে হয় ।

“কামিনীকাক্ষন ঘর থেকে একটু সরে দাঁড়ালে—সরে দাঁড়ায়ে
একটু সাধনা তপস্যা করলে—তবেই মনের অন্ধকার নাশ হয়—অবিষ্টা
অহঙ্কার মেঘ পুড়ে যায়—জ্ঞানলাভ হয় !

“আবার কামিনীকাক্ষনই মেঘ ।

—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

পূর্বকথা।—লক্ষ্মীনারায়ণের দশ হাজার টাকা দিবার কথায়
শ্রীরামকৃষ্ণের অচৈতন্য হওয়া । সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম ।

(মাড়োয়ারীর প্রতি) । ত্যাগীর বড় কঠিন নিয়ম । কামিনী-
কাঞ্চনের সংস্রব লেশ মাত্রও থাকবে না । টাকা নিজের হাতে তো
লবে না,—আবার কাছেও রাখতে দেবে না ।

“লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারী, বেদান্তবাদী, এখানে প্রায় আস্তো ।
বিছানা ময়লা দেখে বল্লো, আমি দশ হাজার টাকা লিখে দোব, তার হুদে
তোমার সেবা চলবে ।

“যাই ও কথা বল্লো, অমনি যেন লাঠি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম !

“চৈতন্য হবার পর তাকে বল্লুম, তুমি অমন কথা যদি আর মুখে
বলো, তা হলে এখানে আর এস না । আমার টাকা ছোঁবার
জো নাই, কাছে ও রাখার জো নাই ।

“সে ভারি সূক্ষ্মবুদ্ধি,—বল্লো, ‘তা হলে এখনও আপনার ত্যাজ্য
গ্রাহ আছে ! তবে আপনার জ্ঞান হয় নাই ।’

“আমি বল্লাম, আমার, বাপু, এতদূর হয় নাই ! (সকলের হাস্য)

“লক্ষ্মীনারায়ণ তখন হুদের কাছে দিতে চাইলে । আমি বল্লাম, ‘তা
হলে আমার বলতে হবে ‘একে দে, ওকে দে’ ; না দিলে রাগ হবে !
টাকা কাছে থাকাই খারাপ ! সে সব হবে না ।’

“আরসীর কাছে জিনিষ থাকলে প্রতিবিশ্ব হবে না ?

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও মুক্তিতত্ত্ব । ‘কলিতে বেদমত নয়, পুরাণমত’ ।]

মাড়োয়ারী ভক্ত । মহারাজ, গঙ্গায় শরীর ত্যাগ করলে তবে
মুক্তি হবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । জ্ঞান হলেই মুক্তি । যেখানেই থাকো,—ভাগাড়েই
মৃত্যু হোক, আর গঙ্গাতীরেই মৃত্যু হোক, জ্ঞানীর মুক্তি হবে ।

“তবে অজ্ঞানের পক্ষে গঙ্গাতীর ।

মাড়োয়ারী ভক্ত । মহারাজ, কালীতে মুক্তি হয় কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । কানীতে মৃত্যু হলে শিব সাক্ষাৎকার হন।—হয়ে বলেন, ‘আমার এই যে সাকার রূপ এ মায়িক রূপ—ভক্তের জন্ম এই রূপ ধারণ করি ;—এই ছাখ্ অখণ্ড সচ্চিদানন্দে মিলিয়ে যাই !’ এই বলে সে রূপ অন্তধান হয় ।

“পুরাণমতে চণ্ডালেরও যদি ভক্তি হয়, তার মুক্তি হবে । এ মতে নাম করলেই হয় । যাগ, যজ্ঞ, তন্ত্র, মন্ত্র,—এ সব দরকার নাই ।

“বেদমত আলাদা । ব্রাহ্মণ না হলে মুক্তি হয় না । আবার ঠিক মন্ত্র উচ্চারণ না হলে পূজা গ্রহণ হয় না । যাগ, যজ্ঞ, মন্ত্র, তন্ত্র,—সব বিধি অনুসারে করতে হবে ।

[‘কৰ্ম্মযোগ বড় কঠিন । কলিতে ভক্তিযোগ’ ।]

“কলিকালে বেদোক্ত কৰ্ম্ম করবার সময় কই ?

“তাই কলিতে নারদীয় ভক্তি ।

“কৰ্ম্মযোগ বড় কঠিন । নিষ্কাম না করতে পারলে বন্ধনের কারণ হয় । তাতে আবার অন্তগত প্রাণ—সব কৰ্ম্ম বিধি অনুসারে করবার সময় নাই । দশমূল পাচন খেতে গেলে রোগীর এ দিকে হয়ে যায় ! তাই ফিবার মিক্শচার ।

“নারদীয় ভক্তি—তঁার নাম গুণ কীর্তন করা ।

“কলিতে কৰ্ম্মযোগ ঠিক নয়,—ভক্তিযোগই ঠিক ।

“সংসারে কৰ্ম্ম যত দিন ভোগ আছে করো । কিন্তু ভক্তি অনুরাগ চাই । তঁার নাম গুণ কীর্তন করলে কৰ্ম্মক্ষয় হবে ।

“কৰ্ম্ম চিরকাল করতে হয় না । তাতে যত শুদ্ধা ভক্তি ভালবাসা হবে, ততই কৰ্ম্ম কমবে । তাঁকে লাভ করলে কৰ্ম্মত্যাগ হয় । গৃহস্থের বৌর পেটে ছেলে হলে শ্বাশুড়ী কৰ্ম্ম কমিয়ে দেয় । সন্তান হলে আর কৰ্ম্ম করতে হয় না ।”

[সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম ! সংস্কার থাকলে ঈশ্বরের জন্ম ব্যাকুলতা হয় ।]

দক্ষিণেশ্বর গ্রাম হইতে কতকগুলি ছোকরা আসিয়া প্রণাম করিলেন । তাঁহারা আসন গ্রহণ করিয়া ঠাকুরকে প্রশ্ন করিতেছেন ।
বেলা ৪টা হইবে ।

দক্ষিণেশ্বর । মাড়োয়ারী, দক্ষিণেশ্বরের ছোকরা প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ২১৯

দক্ষিণেশ্বর নিবাসী ছোকরা । মহাশয়, জ্ঞান কাকে বলে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঈশ্বর সৎ আর সমস্ত অসৎ এইটী জানার নাম জ্ঞান ।

“যিনি সৎ তাঁর একটী নাম ব্রহ্ম, আর একটী নাম কাল (মহাকাল) । তাই বলে ‘কালে কত গেল—কত হলো রে ভাই !’

“কালী যিনি কালের সহিত রমণ করেন । আত্মশক্তি । কাল ও কালী,—ব্রহ্ম ও শক্তি—অভেদ ।

“সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম নিত্য—তিন কালেই আছেন—আদি-অন্ত-রহিত । তাঁকে মুখে বর্ণনা করা যায় না । হৃদ বলা যায়,—তিনি চৈতন্যস্বরূপ আনন্দস্বরূপ ।

“জগৎ অনিত্য, তিনিই নিত্য ! জগৎ ভেক্সিস্বরূপ । রাজী-করই সত্য । বাজীকরের ভেক্সি অনিত্য ।

ছোকরা । জগৎ মায়া—ভেক্সি—এ মায়া যায় না কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । সংস্কার-দোষে মায়া যায় না । অনেক জন্ম এই মায়ার সংসারে থেকে থেকে মায়াকে সত্য বলে বোধ হয় ।

“সংস্কারের কত ক্ষমতা শোন । এক জন রাজার ছেলে পূর্ব-জন্মে ধোপার ঘরে জন্মেছিল । রাজার ছেলে হয়ে যখন খেলা করছে, তখন সমবয়সীদের বলছে, ও সব খেলা থাক ! আমি উপুড় হয়ে শুই, আর তোরা আমার পিঠে হুস্ হুস্ করে কাপড় কাচ ।

[সংস্কারবান্ গোবিন্দ পাল, গোপাল সেন, নিরঞ্জন, হীরানন্দ ।

পূর্বকথা—গোবিন্দ, গোপাল ও ঠাকুরদের ছেলেদের

আগমন । ১৮৬৩-৬৪ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । এখানে অনেক ছোকরা আসে,—কিন্তু কেউ কেউ ঈশ্বরের জন্ত ব্যাকুল । তারা সংস্কার নিয়ে এসেছে ।

“সে সব ছোকরা বিবাহের কথায় অঁা অঁা করে ! বিবাহের কথা মনেই করে না । নিরঞ্জন ছেলেবেলা থেকে বলে, বিয়ে করবো না ।

“অনেক দিন হলো (কুড়ি বছরের অধিক) বরাহনগর থেকে দুটী ছোকরা আসত । এক জনের নাম গোবিন্দ পাল, আর এক জনের নাম গোপাল সেন । তাদের ছেলেবেলা থেকেই ঈশ্বরেতে মন ।

বিবাহের কথায় ভয়ে আকুল হতো । গোপালের ভাবসমাধি হতো । বিষয়ী দেখলে কুণ্ঠিত হ'তো, যেমন ইঁদুর বিড়াল দেখে কুণ্ঠিত হয় । যখন ঠাকুরদের (Tagore) ছেলেরা ঐ বাগানে বেড়াতে এসেছিল, তখন কুঠীর ঘরের দ্বার বন্ধ করলে, পাছে তাদের সঙ্গে কথা কইতে হয় ।

“গোপালের পঞ্চবটীতলায় ভাব হয়েছিল । ভাবে আমার পায়ে হাত দিয়ে বলে, ‘আমি তবে যাই । আমি আর এ সংসারে থাকতে পারছি না—আপনার এখন অনেক দেরী—আমি যাই ।’ আমিও ভাবাবস্থায় বল্লাম—‘আবার আসবে ;’ সে বলে, ‘আচ্ছা, আবার আসবো ।’

“কিছু দিন পরে গোবিন্দ এসে দেখা করলে । আমি জিজ্ঞাসা করলাম, গোপাল কই ? সে বলে, গোপাল (শরীর ত্যাগ করে) চলে গেছে ।

“অন্য ছোকরারা কি করে বেড়াচ্ছে !—কিসে টাকা হয়—বাড়ী—গাড়ী,—পোষাক,—তার পর বিবাহ—এই জন্য ব্যস্ত হয়ে বেড়ায় । বিবাহ করবে, —আগে কেমন মেয়ে খোঁজ যায় । আবার সুন্দর কি না নিজে দেখতে যায় !

“এক জন আমায় বড় নিন্দে করে । কেবল বলে, ছোকরাদের ভালবাসি । যাদের সংস্কার আছে—শুদ্ধ আত্মা—ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল,—টাকা, শরীরের সুখ, এ সবার দিকে মন নাই—তাদেরই আমি ভালবাসি ।

“যারা বিয়ে করেছে, যদি ঈশ্বরে ভক্তি থাকে, তা হলে সংসারে আসক্ত হবে না । হীরানন্দ বিয়ে করেছে । তা হোক, সে বেশী আসক্ত হবে না ।”

হীরানন্দ সিন্ধুদেশবাসী, বি, এ, পাস্, ব্রাহ্মভক্ত । দ্বিতীয় ভাগ, সপ্তবিংশতি খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

মণিলাল, শিবপুরের ব্রাহ্মভক্ত, মাড়োয়ারী ভক্তেরা ও ছোকরারা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

কর্মত্যাগ কখন ? ভক্তের নিকট ঠাকুরের অঙ্গীকার ।

সন্ধ্যা হইল । দক্ষিণের বারান্দা ও পশ্চিমের গোল বারান্দায় ফরাস আলো জালিয়া দিয়া গেল । ঠাকুরের ঘরে প্রদীপ জ্বালা হইল ও ধূনা দেওয়া হইল ।

ঠাকুর নিজের আসনে বসিয়া মার নাম করিতেছেন ও মার চিন্তা করিতেছেন । ঘরে মাষ্টার, শ্রীযুক্ত প্রিয় মুখ্যো, তাঁহার আত্মীয় হরি মেজেতে বসিয়া আছেন ।

কিয়ৎক্ষণ ধ্যান চিন্তার পরে ঠাকুর আবার ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন । এখনও ঠাকুর বাড়ীর আরতির দেরি আছে ।

[বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ । ওঁকার ও সমাধি । তত্ত্বমসি । ওঁ তৎ সৎ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । (মাষ্টারের প্রতি) যে নিশিদিন তাঁর চিন্তা কর্ছে, তার সন্ধ্যার কি দরকার !

ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী পূজা সন্ধ্যা সে কি চায় ।

সন্ধ্যা তার সন্ধ্যানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায় ॥

দয়া ব্রত দান আদি আর কিছু না মনে লয় ।

মদনেরই যাগ যজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাজ্য পায় ॥

“সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয় গায়ত্রী ওঁকারে লয় হয় ।

“একবার ওঁ বলে যখন সন্ধ্যা হয় তখন পাকা ।

“হৃষীকেশে এক জন সাধু সকাল বেলায় উঠে ভারি একটা ঝরনা, তার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় । সমস্ত দিন সেই ঝরনা ছাথে আর ঈশ্বরকে বলে—‘বাঃ বেশ করেছ ! বাঃ বেশ করেছ ! কি আশ্চর্য্য !’ তার অন্ত জপ তপ নাই । আবার রাত্রি হ’লে কুটীরে ফিরে যায় ।

“তিনি নিরাকার কি সাকার সে সব কথা ভাববারই বা কি দরকার ? নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হ’য়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে বলেই হয়,—হে ঈশ্বর তুমি যে কেমন তাই আমায় দেখা দাও !

“তিনি অন্তরে বাহিরে আছেন ।

“অন্তরে তিনিই আছেন । তাই বেদে বলে ‘তত্ত্বমসি’ (সেই তুমি) । আর বাহিরেও তিনি । মায়াতে দেখাচ্ছে নানারূপ ; কিন্তু বস্তুতঃ তিনিই রয়েছেন ।

“তাই সব নাম রূপ বর্ণনা করবার আগে, বলতে হয় ৐ তৎসৎ ।

“দর্শন করলে এক রকম, শাস্ত্র পড়ে আর এক রকম । শাস্ত্রে আভাষ মাত্র পাওয়া যায় । তাই কতকগুলো শাস্ত্র পড়বার কোন প্রয়োজন নাই । তার চেয়ে নির্ভর্যনে তাঁকে ডাকা ভাল ।

“গীতা সমস্ত না পড়লেও হয় । দশবার ‘গীতা গীতা’ বললে যা হয় তাই গীতার সার । অর্থাৎ ‘তাগী’ । হে জগীশ, সব তাগ কর রে ঈশ্বরের আরাধনা কর,—এই গীতার সার কথা ।

[শ্রীরামকৃষ্ণের ৬ভবতারিণীর আরতি দর্শন ও ভাবাবেশ ।]

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে মা কালীর আরতি দেখিতে দেখিতে ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন ! আর ঠাকুরপ্রতিমা সম্মুখে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিতে পারিতেছেন না ।

অতি সন্তুর্পনে ভক্তসঙ্গে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন । এখনও ভাবাবিষ্ট । ভাবাবস্থায় কথা কহিতেছেন !

মুখ্যের আত্মীয় হরির বয়ঃক্রম আঠার কুড়ি হইবে । তাঁহার বিবাহ হইয়াছে । আপাততঃ মুখ্যোদের বাড়ীতেই থাকেন—কর্ম্য কাজ করিবেন । ঠাকুরের উপর খুব ভক্তি ।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও মন্ত্রগ্রহণ । ভক্তের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের অঙ্গীকার ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবাবেশে, হরির প্রতি) । তুমি তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করে মন্ত্র নিও । (শ্রীযুক্ত প্রিয়কে) এঁকে (হরিকে) বলে ও দিতে পারলাম না ; মন্ত্র ত দিই না ।

“তুমি যা ধ্যান জপ করো তাই কোরো । প্রিয় । যে আজ্ঞা ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আর আমি এই অবস্থায় বলছি—কথায় বিশ্বাস কোরো । ঝাখো, এখানে ঢং ফং নাই ।

“আমি ভাবে বলেছি,—‘মা, এখানে মারা আন্তরিক টামে আসবে, তারা যেন সিদ্ধ হয়।’

সিঁতির মহেন্দ্র কবিরাজ বারান্দায় বসিয়া আছেন । শ্রীযুক্ত রামলাল, হাজরা প্রভৃতির সঙ্গে কথা কহিতেছেন । ঠাকুর নিজের আসন হইতে তাঁহাকে ডাকিতেছেন—‘মহিন্দর !’ ‘মহিন্দর !’

মাফটার তাড়াতাড়ি গিয়া কবিরাজকে ডাকিয়া আনিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কবিরাজের প্রতি) । বোসো না,—একটু শোনো ।

কবিরাজ কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া উপবেশন করিলেন ও ঠাকুরের অমৃতোপম কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন ।

[নানা ছাঁদে সেবা । বলরামের ভাব । গোরাঙ্গের তিন অবস্থা ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) । তাঁকে নানা ছাঁদে সেবা করা যায় ।

“প্রেমিক ভক্ত তাঁকে নানারূপে সন্তোষ করে । কখনও মনে করে ‘তুমি পদ্ম আমি অলি’ । কখনও ‘তুমি সচ্চিদানন্দ আমি মীন !’

“প্রেমিক ভক্ত আবার ভাবে ‘আমি তোমার নৃত্যকী !’—আর তাঁর সম্মুখে নৃত্য গীত করে । কখনও সখীভাব বা দাসীভাব । কখনও তাঁর উপর বাৎসল্য ভাব—যেমন বশোদার । কখনও বা পতিভাব—মধুর ভাব—যেমন গোপীদের ।

“বলরাম কখনও সখার ভাবে থাকতেন, কখনও বা মনে করতেন আমি কৃষ্ণের ছাতা বা আসন হ’য়েছি । সব রকমে তাঁর সেবা করতেন ।

ঠাকুর প্রেমিক ভক্তের অবস্থা বর্ণনা করিয়া কি নিজের অবস্থা বলিতেছেন ? আবার চৈতন্যদেবের তিনটি অবস্থা বর্ণনা করিয়া ইঙ্গিত করিয়া বুঝি নিজের অবস্থা বুঝাইতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । চৈতন্য দেবের তিনটি অবস্থা ছিল । অন্তর্দর্শায় সমাধিস্থ—বাহ্যশূন্য । অর্দ্ধবাহ্য দশায় আবিষ্ট হইয়া নৃত্য করতে পারতেন, কিন্তু কথা কহিতে পারিতেন না । বাহ্যদশায় সংকীর্ণন ।

(ভক্তদের প্রতি) । তোমরা এই সব কথা শুনছো—ধারণার চেষ্টা করবে । বিষয়ীরা সাধুর কাছে যখন আসে তখন বিষয় কথা, বিষয় চিন্তা, একেবারে লুকিয়ে রেখে দেয় । তার পর চলে গেলে সেইগুলি বার করে । পায়রা মটর খেলে ; মনে হ’লো যে ওর হজম হ’য়ে গেল । কিন্তু গলার ভিতর সব রেখে দেয় । গলায় মটর গিড় গিড় করে ।

[সন্ধ্যাকালীন উপাসনা । শ্রীরামকৃষ্ণ ও মুসলমান ধর্ম । জপ ও ধ্যান ।]

“সব কাজ ফেলে সন্ধ্যার সময় তোমরা তাঁকে ডাকবে ।

“অন্ধকারে ঈশ্বরকে মনে পড়ে ! সব এই দেখা যাচ্ছিল !—কে এমন করলে ! মোসলমানেরা ছাথো সব কাজ ফেলে ঠিক সময়ে নমাজটা পড়বে । মুখুয্যো । আজ্ঞা, জপ করা ভাল ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ জপ থেকে ঈশ্বর লাভ হয় ! নির্জনে গোপনে তাঁর নাম করতে করতে তাঁর কৃপা হয় । তার পর দর্শন !

“যেমন জলের ভিতর ডুবানো বাহাদুরী কাঠ আছে—তীরেতে শিকল দিয়ে বাঁধা ;—সেই শিকলের এক এক পাপ ধরে ধরে গেলে, শেষে বাহাদুরী কাঠকে স্পর্শ করা যায় ।

“পূজার চেয়ে জপ বড় । জপের চেয়ে ধ্যান বড় । ধ্যানের চেয়ে ভাব বড়, ভাবের চেয়ে মহাভাব প্রেম বড় । চৈতন্য দেবের প্রেম হ’য়েছিল । প্রেম হ’লে ঈশ্বরকে বাঁধবার দড়ি পাওয়া গেল । [হাজরা আসিয়া বসিয়াছেন ।

[রাগভক্তি, মালাজপা ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ । নারাণ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরাকে) । তাঁর উপর ভালবাসা যদি আসে তার নাম রাগভক্তি । বৈদীভক্তি আসতেও যতক্ষণ, যেতেও ততক্ষণ । রাগভক্তি স্বয়ম্ভু লিঙ্গের মত । তার জড় খুঁজে পাওয়া যায় না । স্বয়ম্ভু লিঙ্গের জড় কাশী পর্য্যন্ত ! রাগভক্তি, অবতার আর তাঁর সাক্ষোপাঙ্গের হয় । হাজরা । আহা !

শ্রীরামকৃষ্ণ । তুমি যখন জপ এক দিন কচ্ছিলে—বাহে থেকে এসে—বল্লুম, মা একি হীনবুদ্ধি, এখানে এসে মালা নিয়ে জপ কচ্ছে !—যে এখানে আসলে তার একবারে চেতন্য হবে ! তার মালা জপা অতো করতে হবে না । তুমি কলকাতায় যাও না—দেখবে হাজার হাজার মালা জপ করছে—খান্কি পর্য্যন্ত !

ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন—তুমি নারাণকে গাড়ী করে এনো ।

এঁকে (মুখুয্যেকে) ও বলে রাখলুম—নারাণের কথা । সে এলে কিছু খাওয়াবো । ওদের খাওয়ানোর অনেক মানে আছে ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলুটোলায় শ্রীযুক্ত নবীন সেনের বাড়ীতে
ব্রাহ্মভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে ।

আজ শনিবার কোলাগর পূর্ণিমা । শ্রীযুক্ত কেশব সেনের
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীন সেনের কলুটোলার বাড়ীতে ঠাকুর আসিয়াছেন ।
৪ঠা অক্টোবর, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ ; ১৯শে আশ্বিন, ১২৯১ সাল ।

গত বৃহস্পতিবারে কেশবের মা ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া অনেক
করিয়া যাইতে বলিয়া গিয়াছিলেন ।

বাহিরের উপরের ঘরে গিয়া ঠাকুর বসিলেন । নন্দলাল প্রভৃতি
কেশবের ভ্রাতৃপুত্রগণ, কেশবের মাতা ও তাঁহাদের আত্মীয় বন্ধুগণ
ঠাকুরকে খুব যত্ন করিতেছেন । উপরের ঘরেই সংকীৰ্ত্তন হইল । কলু-
টোলার সেনাদের অনেক মেয়েরাও আসিয়াছেন ।

ঠাকুরের সঙ্গে বাবুরাম, কিশোরী, আরও দু একটা ভক্ত । মাষ্টারও
আসিয়াছেন । তিনি নাচে বসিয়া ঠাকুরের মধুর সংকীৰ্ত্তন শুনিতেন ।

ঠাকুর ব্রাহ্মভক্তদের বলিতেছেন,—সংসার অনিত্য ; আর সর্বদা
মৃত্যু স্মরণ করা উচিত । ঠাকুর গান গাইতেছেন—

গান—ভেবে দেখ মন কেউ কারু নয় মিছে ভ্রম ভ্রমণ্ডলে ।

ভুলনা দক্ষিণে কালী বন্ধ হয়ে মায়াজালে ॥

দিন দুই তিনের জন্ম ভবে কর্ত্তা বলে সবাই মানে ।

সেই কর্ত্তারে দেবে ফেলে কালাকালের কর্ত্তা এলে ॥

যার জন্ম মর ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে ।

সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া অমঙ্গল হবে বলে ॥

ঠাকুর বলিতেছেন—~~ডুব দাও~~—উপরে ভাসলে কি হবে ?
দিন কতক নির্জনে, সব ছেড়ে, ষোল আনা মন দিয়ে, তাঁকে ডাকো ।
ঠাকুর গান গাইতেছেন—ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন ।

তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্নধন ॥

ঠাকুর ব্রাহ্মভক্তদের, ‘তুমি সর্বস্ব আমার!’ এই গানটি গাইতে বলিতেছেন । শ্রীকথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ ।

গান—তুমি সর্বস্ব আমার (হে নাথ) প্রাণাধার সারাৎসার ।

নাহ তোমা বিনে, কেহ ত্রিভুবনে, আপনার বলিবার ।

ঠাকুর নিজে গাহিতেছেন,—

ষশোদা নাচাত গো মা বলে নীলমণি । সেরূপ লুকালে কোথা করালবদনী ॥

(একবার নাচ গো শ্যামা) (অসি ফেলে বাঁশী লয়ে)

(মুণ্ডমালা ফেলে বনমালা লয়ে) (তোর শিব বলরাম হোক)

(তেমনি তেমনি করে নাচ গো শ্যামা) (যেরূপে ব্রজমাঝে নেচেছিলি)

(একবার বাজা গো মা, তোর মোহন বেণু)

(যে বেণুরবে গোপীর মন ভুলিত)

(যে বেণু রবে ধেনু ফিরাতিস) (যে বেণু রবে যমুনা উজান বয়) ।

গগনে বেলা বাড়িত, রাণীর মন ব্যকুল হতো, বলে ধর ধর ধর,
ধররে গোপাল, ক্ষীর সর নবনী, এলায়ে চাঁচর কেশ রাণী বেঁধে দিত বেণী ।

শ্রীদামের সঙ্গে, নাচিতে ত্রিভঙ্গে,

আবার তাথেয়া তাথেয়া, তাতা থৈয়া থৈয়া, বাজত নূপুরধ্বনি,

শুনতে পেয়ে আস ত ধৈয়ে যত ব্রজের রমণী (গো মা !) ।

এই গান শুনিয়া কেশব ঐ সুরের একটা গান বাঁধাইয়াছিলেন ।

ব্রাহ্মভক্তেরা খোল করতালি সংযোগে সেই গান গাইতেছেন—

গান—কত ভালবাস গো মা মানব সন্তানে,

মনে হলে প্রেমধারা বহে ছু নয়নে ।

তঁাহারা আবার মার নাম করিতেছেন—(শ্রীকথামৃত, চতুর্থ ভাগ ।)

অন্তরে জাগিছ গো মা অন্তর-যামিনী,

কোলে করে আছ মোরে দিবস যামিনী ।

গান—কেন রে মন ভাবিস এত, দীন হীন কাঙ্গালের মত,

আমার না ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী সিদ্ধেশ্বরী ক্ষেমঙ্করী ।

ঠাকুর এইবার হরিনাম ও শ্রীগৌরান্দের নাম করিতেছেন ও ব্রাহ্ম ভক্তদের সহিত নাচিতেছেন ।

গান— মধুর হরিনাম নসে রে, জীব যদি সুখে থাকবি ।

গান— গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায় ।

হৃদয়ে পাষণ্ড দলন এ ব্রহ্মাণ্ড তলিয়ে যায় ॥

গান— ব্রজে যাই কাঙ্গালবেশে কোপীন দাও হে ভারতী ॥

গান— গৌর নিতাই তোমরা দুভাই, পরম দয়াল হে প্রভু ।

গান— হরি বলে আমার গৌর নাচে ।

গান—কে হরিবোল হরিবোল বলিয়ে যায় । যারে মাধাই জেনে আয় ।

(আমার গৌর যায় কি নিতাই যায় রে) (যাদের সোণার নূপুর রাস্তা পায়)

(যাদের নেড়া মাথা ছেঁড়া কাঁথা, রে) (যেন দেখি পাগলের প্রায় ।)

ব্রাহ্মভক্তেরা আবার গাহিতেছেন,—(শ্রীকথামৃত, ১ম ভাগ ।)

গান— কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার ।

হয়ে পূর্ণকাম, বলবো হরিনাম, নয়নে বহিবে প্রেম অশ্রুধার ॥

ঠাকুর উচ্চ সঙ্কীৰ্ত্তন করিয়া গাহিতেছেন ও নাচিতেছেন—

গান— যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, তারা, তারা দুভাই এসেছে রে !

(যার মার খেয়ে প্রেম যাচে, তারা) (যারা আপনি কেঁদে জগৎ কাঁদায়)

গান— নদে টলমল টলমল করে, ঐ গৌর প্রেমের হিল্লোলে রে !

ঠাকুর মার নাম করিতেছেন—

গান— গো আনন্দময়ী হয়ে আমায় নিরানন্দ কোরো না ।

ব্রাহ্মভক্তেরা তাঁহাদের দুইটি গান গাহিতেছেন ।

গান— আমায় দেমা পাগল করে ।

গান— চিদাকাশে হল পূর্ণ প্রেম চন্দ্রোদয় হে ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থভাগ, একবিংশ খণ্ডে দক্ষিণেশ্বরে
ভক্তসঙ্গে আনন্দ কথা ও নবীনসেনের বাটীতে ব্রাহ্মভক্তদের সহিত
কীর্ত্তনানন্দ কথা সমাপ্ত ।

চতুর্থ ভাগ—দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে বাবুরাম, মাষ্টার, নীলকণ্ঠ, মনোমোহন
প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[হাজরা মহাশয় । অহৈতুকী ভক্তি ।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে ভক্তসঙ্গে মধ্যাহ্নসেবার পর নিজের ঘরে বসিয়া আছেন । কাছে মেজেতে মাষ্টার, হাজরা, বড় কালী, বাবুরাম, রামলাল, মুখুয্যেদের হরি প্রভৃতি,—কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া আছেন । শ্রীযুক্ত কেশবের মাতা ঠাকুরাণীর নিমন্ত্রণে গতকল্য তাঁহাদের কলুটোলার বাড়ীতে গিয়া ঠাকুর খুব কীর্তনানন্দ করিয়াছিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি) । আমি কাল কেশব সেনের এ বাটীতে (নবীন সেনের বাটীতে) বেশ খেলুম—বেশ ভক্তি করে দিলে ।

[হাজরা মহাশয় ও তত্ত্বজ্ঞান । হাজরা ও তর্কবুদ্ধি ।]

হাজরা মহাশয় অনেক দিন ঠাকুরের কাছে রহিয়াছেন । ‘আমি জ্ঞানী’ এই বলিয়া তাঁহার একটু অভিমান আছে । লোকজনের কাছে ঠাকুরের একটু নিন্দা করাও হয় । এ দিকে বারাণ্ডাতে নিজের আসনে বসিয়া একমন হইয়া মালা জপও করেন । চৈতন্যদেবকে ‘হালের অবতার’ বলিয়া সামান্য জ্ঞান করেন । বলেন, ‘ঈশ্বর যে শুদ্ধ ভক্তি দেন, তা নয় ; তাঁহার ঐশ্বর্যের অভাব নাই,—তিনি ঐশ্বর্যও দেন । তাঁকে লাভ করলে অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি শক্তিও হয় ।’ বাড়ীর দরুণ কিছু দেনাও আছে—প্রায় হাজার টাকা । সে গুলির জন্য তিনি ভাবিত আছেন ।

বড় কালী আফিসে কর্ম্ম করেন । সামান্য বেতন । ঘরে পরিবার ছেলে পুতে আছে । পরমহংস দেবের উপর খুব ভক্তি ; মাঝে মাঝে আফিস কামাই করিয়াও তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন ।

বড় কালী (হাজরার প্রতি) । তুমি যে কষ্ট পাথর হয়ে, কে ভাল
সোণা কে মন্দ সোণা, পরখ করে করে বেড়াও—পরের নিন্দা
অতো কর কেন ?

হাজরা । যা বলতে হয়, ওঁর কাছেই বলছি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তা বটে ।

হাজরা তত্ত্বজ্ঞান মানে ব্যাখ্যা করিতেছেন ।

হাজরা । তত্ত্বজ্ঞান মানে কি,—না চব্বিশ তত্ত্ব আছে, এইটী জানা ।

একজন ভক্ত । চব্বিশ তত্ত্ব কি কি ?

হাজরা । পঞ্চভূত, ছয়রিপু, পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয়—পাঁচটা কর্মে-
ন্দ্রিয়, এই সব ।

মাফটার (ঠাকুরকে সহাস্ত্রে) । ইনি বলছেন, ছয় রিপু
চব্বিশ তত্ত্বের ভিতরে !

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্ত্রে) ! ঐ ছাখো না । তত্ত্বজ্ঞানের মানে কি
করছে, আবার ছাখো । তত্ত্বজ্ঞান মানে আত্মজ্ঞান ! তৎ
মানে পরমাত্মা, ত্বং মানে জীবাত্মা । জীবাত্মা আর পরমাত্মা এক জ্ঞান
হলে তত্ত্বজ্ঞান হয় ।

হাজরা কিয়ৎক্ষণ পরে ঘর হইতে বারান্দায় গিয়া বসিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাফটার প্রভৃতিকে) । ও কেবল তর্ক করে । এই
একবার বেশ বুঝে গেল—আবার খানিক পরে যেমন তেমনি !

“বড় মাছ জোর করছে দেখে আমি সূতো ছেড়ে দিই । তা না
হলে সূতো ছিঁড়ে ফেলবে, আর যে ধরেছে, সে শুদ্ধ জলে পড়বে !
আমি তাই আর কিছু বলি না ।

[হাজরা ও মুক্তি ও ষড়ৈশ্বর্য্য । মলিন ও অহৈতুকী ভক্তি ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাফটারকে) । হাজরা বলে, ‘ব্রাহ্মণ শরীর না হলে
মুক্তি হয় না ।’ আমি বললাম, সে কি ! ভক্তি দ্বারাই মুক্তি
হবে । শবরী ব্যাধের মেয়ে, রুহিদাস যার খাবার সময় ঘণ্টা বাজতো
—এরা সব শূদ্র । এদের ভক্তিদ্বারাই মুক্তি হয়েছে ! হাজরা
বলে তবু ।

“ধ্রুবকে ল্যায় । প্রহ্লাদকে যত লয়, ধ্রুবকে তত না । নটো বলে,
‘ধ্রুবের ছেলেবেলা থেকে অতো অনুরাগ’—তখন আবার চুপ করে ।

“আমি বলি, কামনাশূন্য ভক্তি অহৈতুকী ভক্তি—এর বাড়া আর
কিছুই নাই । ও কথা সে কাটিয়ে দেয় । যারা কিছু চাইবে, তারা
এলে, বড়মানুষ ব্যাজার হয়,—বিরক্ত হয়ে বলে, ‘ঐ আসছেন’ !
এলে পরে এক রকম স্বর করে বলে ‘বসুন’ !—যেন কত বিরক্ত ।
যারা কিছু চায়, তাদের এক গাড়ীতে নিয়ে যায় না ।

“হাজরা বলে, তিনি এ সব ধনীদের মত নয় । তাঁর কি ঐশ্বর্যের
অভাব যে, দিতে কষ্ট হবে ?

“হাজরা আরও বলে—‘আকাশের জল যখন পড়ে, তখন গঙ্গা
আর সব বড় বড় নদী, বড় বড় পুকুর, এ সব বেড়ে যায় ; আবার
ডোবাটোবা গুলোও পরিপূর্ণ হয় । তাঁর কৃপা হলে জ্ঞান ভক্তিও দেন,
—আবার টাকা কড়িও দেন ।’

“কিন্তু একে মলিন ভক্তি বলে । শুদ্ধ ভক্তিতে কোন কামনা
থাকবে না । তুমি এখানে কিছু চাও না, কিন্তু (আমাকে) দেখতে
আর (আমার) কথা শুনতে ভালবাস ;—তোমার দিকেও আমার মন
পড়ে থাকে ।—কেমন আছে—কেমন আসে না—এই সব ভাবি ।

“কিছু চাও না অথচ ভালবাস—এর নাম অহৈতুকী ভক্তি, শুদ্ধা-
ভক্তি । প্রহ্লাদের এটী ছিল ; রাজ্য চায় না, ঐশ্বর্য চায় না, কেবল
হরিকে চায় ।

মাফটার । হাজরা মহাশয় কেবল ফড়র্ ফড়র্ করে বকে । চুপ
না করলে কিছু হচ্ছে না ।

[হাজরার অহঙ্কার ও লোকনিন্দা ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । এক এক বার বেশ কাছে এসে নরম হয় !—কি
গ্রহ, আবার তর্ক করে । অহঙ্কার যাওয়া বড় শক্ত । অশ্বখ গাছ এই
কেটে দিলে, আবার তার পর দিন ফেক্‌ড়ী ঝেরিয়েছে । যতক্ষণ তার
শিকড় আছে, ততক্ষণ আবার হবে ।

“আমি হাজরাকে বলি, ~~কারণকে~~ নিন্দা ~~কোরো~~ না,

নারায়ণই এই সব রূপ ধরে রয়েছেন । দুমুঠ খারাপ লোককেও পূজা করা যায় ।

“ছাখো না কুমারীপূজা । একটা হাগে মোতে, নাক দিয়ে কফ পড়ছে, এমন মেয়েকে পূজা করা কেন ? ভগবতীর একটী রূপ বলে ।

“ভক্তের ভিতর তিনি বিশেষরূপে আছেন । ভক্ত ঈশ্বরের বৈঠকখানা ।

“নাউএর খুব ডোল হলে তানপুরা ভাল হয়,—বেশ বাজে ।

(সহাস্ত্রে রামলালের প্রতি) হ্যারে রামলাল, হাজরা ওটা কি করে বলেছিল—অন্তুস্ বহিস্ যদি হরিস্ (সকার দিয়ে) ? যেমন একজন বলেছিল—‘মাতারং ভাতারং খাতারং’ অর্থাৎ মা ভাত খাচ্ছে । (সকলের হাস্য)

রামলাল (সহাস্ত্রে) । অন্তুর্বহির্ঘদিহরিস্তপসা ততঃ কিম্ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । এইটে তুমি অভ্যাস কোরো, আমায় মাঝে মাঝে বলবে ।

ঠাকুরের ঘরের রেকাবী হারাইয়াছে । রামলাল ও বৃন্দেবী রেকাবীর কথা বলিতেছেন—‘সে রেকাবী কি আপনি জানেন ?’

শ্রীরামকৃষ্ণ । কই এখন আর দেখতে পাই না ! আগে ছিল বটে—দেখেছিলাম ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধুদ্বয় সঙ্গে । ঠাকুরের পরমহংস-অবস্থা ।

আজ পঞ্চবটীতে দুইটী সাধু অতিথি আসিয়াছেন । তাঁহারা গীতা বেদান্ত এ সব অধ্যয়ন করেন । মধ্যাহ্নে সেবার পর ঠাকুরকে আসিয়া দর্শন করিতেছেন । তিনি ছোট খাটটীতে বসিয়া আছেন । সাধুরা প্রণাম করিয়া মেজ্ঞেতে সাধুরের উপর আসিয়া বসিলেন । মাষ্টার প্রভৃতিও বসিয়া আছেন । ঠাকুর হিন্দীতে কথা কহিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আপনাদের সেবা হয়েছে ? সাধুরা । জী, হাঁ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কি খেলেন ?

সাধুরা । ডাল রুটী ; আপনি খাবেন ?

[সাধু ও নিষ্কাম কৰ্ম্ম । ভক্তি কামনা । বেদান্ত । সংসারী ও মোহহং ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । না, আমি দুটী ভাত খাই । আচ্ছা জী, আপনারা যা জপধ্যান করেন, তা নিষ্কাম করেন ; না ? সাধু । জী, মহারাজ !

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঐ আচ্ছা হয়, আর ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করতে হয় ; —না ? গীতাতে ঐরূপ আছে ।

সাধু (অন্য সাধুর প্রতি) । যৎ করোষি যদশ্বাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ । যৎ তপস্যসি কোন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাঁকে একগুণ যা দেবে, সহস্র গুণ তাই পাবে । তাই সব কাজ করে জলের গণ্ডুষ অর্পণ—~~কৃষ্ণকে~~ ফল সমর্পণ ।

“যুধিষ্ঠির যখন সব পাপ কৃষ্ণকে অর্পণ করতে যাচ্ছিল, তখন একজন (ভীম) সাবধান করলে, ‘অমন কৰ্ম্ম কোরো না—কৃষ্ণকে যা অর্পণ করবে, সহস্রগুণ তাই হবে !’ আচ্ছা জী, নিষ্কাম হতে হয়—সব কামনা ত্যাগ করতে হয় ? সাধু । জী, হাঁ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমার কিন্তু ভক্তিকামনা আছে । ও মন্দ নয়, বরং ভালই হয় । মিষ্ট খারাপ জিনিষ—অন্ন হয়, কিন্তু মিছরিতে বরং উপকার হয় । কেমন ? সাধু । জী মহারাজ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আচ্ছা জী, বেদান্ত কেমন ?

সাধু । বেদান্তমে খট্ শাস্ত্র (বড় দর্শন) হয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কিন্তু বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা । আমি আলাদা কিছু নই ; আমি সেই ব্রহ্ম । কেমন ?

সাধু । জী, হাঁ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কিন্তু যারা সংসারে আছে, আর যাদের দেহ বুদ্ধি আছে, তাদের মোহহং এ ভাবটী ভাল নয় । সংসারীর পক্ষে যোগ-বাশিষ্ঠ, বেদান্ত,—ভাল নয় । বড় খারাপ । সংসারীরা সেব্য সেবক ভাবে থাকবে । ‘হে ঈশ্বর তুমি সেব্য—প্রভু, আমি সেবক—আমি তোমার দাস ।’

“যাদের দেহবুদ্ধি আছে, তাদের মোহহং এ ভাব ভাল না ।

সকলেই চুপ করিয়া আছেন । ঠাকুর আপনা আপনি একটু একটু হাসিতেছেন । আত্মারাম ! আপনার আনন্দে আনন্দিত !

এক জন সাধু অপরকে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিতেছেন—‘আরে, দেখো দেখো ! এস্কো পরমহংস অবস্থা বোল্‌তা হয় ।’

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারকে, তাঁহার দিকে তাকাইয়া) । হাসি পাচ্ছে ।

ঠাকুর বালকের ন্যায় আপনা আপনি ঈষৎ হাসিতেছেন ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ‘কামিনী’ । সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম ।

[পূর্বকথা—শ্মশুরঘর যাবার সাধ । উলোর বামনদাসের সঙ্গে দেখা ।]

সাধুরা দর্শন করিয়া চলিয়া গেলেন ।

ঠাকুর ও বাবুরাম, মাষ্টার, মুখুযোদের হরি প্রভৃতি ভক্তেরা ঘরে ও বারাগুয় বেড়াইতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারকে) । নবীন সেনের ওখানে তুমি গিছ্‌লে ?

মাষ্টার । আজ্ঞা, গিছ্‌লাম । নীচে বসে সব গান শুনেছিলাম ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তা বেশ করেছে । তোমার ওরা গিছ্‌লো । কেশব সেন ওদের খুড়তাতো ভাই ?

মাষ্টার । একটু তফাৎ আছে !

একজন ভক্তের শ্রীযুক্ত নবীন সেনেরা শ্মশুরবাড়ীর সম্পর্কীয় লোক ।

মণির সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে ঠাকুর নিভৃতে কথা কহিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । লোকে শ্মশুরবাড়ী যায় । এতো ভেবেছিলুম, বিয়ে করবো, শ্মশুরঘর যাবো—সাধ আহ্লাদ করবো ! কি হয়ে গেল !

মণি । আজ্ঞা, ‘ছেলে যদি বাপকে ধরে, সে পড়তে পারে ; বাপ যে ছেলেকে ধরেছেন সে আর পড়ে না ।’—এই কথা আপনি বলেন । আপনারও ঠিক সেই অবস্থা । মা আপনাকে ধরেছেন !

শ্রীরামকৃষ্ণ । উলোর বামনদাসের সঙ্গে—বিশ্বাসদের বাড়ীতে—
দেখা হলো । আমি বললাম, আমি তোমাকে দেখতে এসেছি । যখন চলে
এলাম, শুনতে পেলাম, সে বলছে,—‘বাবা, বাঘ যেমন মানুষকে ধরে,
তেমনই ঈশ্বরী, এঁকে ধরে রয়েছেন !’ তখন সমর্থ বয়স,—খুব মোটা ।
সর্বদাই ভাবে !

‘আমি মেয়ে বড় ভয় করি । দেখি, যেন বাঘিনী খেতে আসছে ।
আর অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, ছিদ্র সব খুব বড় বড় দেখি ! সব রাক্ষসীর মত দেখি ।

“আগে ভারী ভয় ছিল । কারুকে কাছে আসতে দিতাম না । এখন তবু
অনেক করে মনকে বুঝিয়ে, মা আনন্দময়ীর এক একটা রূপ বলে দেখি ।

“ভগবতীর অংশ । কিন্তু পুরুষের পক্ষে—সাধুর পক্ষে—ভক্তের
পক্ষে—ত্যাগ্য ।

“হাজার ভক্ত হলেও মেয়েমানুষকে বেশী ক্ষণ কাছে বসতে দিই
না । একটু পরে হয় বলি, ‘ঠাকুর দেখো গে যাও’; তাতেও যদি না
উঠে, তামাক খাবার নাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি ।

“দেখতে পাই, কারু কারু মেয়ে মানুষের দিকে আদর্শে মন নাই ।
নিরঞ্জন বলে, ‘কই আমার মেয়ে মানুষের দিকে মন নাই ।’

[হরিবাবু, নিরঞ্জন, পাঁড়ে খোটা. জয়নারাণ ।]

“হরি (উপেন ডাক্তারের ভাই) কে জিজ্ঞাসা করলাম, সে ও বলে,
—‘না, মেয়ে মানুষের দিকে মন নাই ।’

“যে মন ভগবান্কে দিতে হবে, সেই মনের বার আনা মেয়ে মানুষ
নিয়ে ফেলে । তার পর তার ছেলে হলে প্রায় সব মনটাই খরচ হয়ে
যায় । তা হলে ভগবান্কে আর কি দেবে ?

“আবার কারু কারু তাকে আগ্লাতে আগ্লাতেই প্রাণ বেরিয়ে
যায় ! পাঁড়ে জমাদার খোটা বুড়ো—তার চৌদ্দ বছরের বো ! বুড়োর
সঙ্গে তার থাকতে হয় । গোল পাতার ঘর । গোল পাতা খুলে খুলে
লোকে ছাখে । এখন মেয়েটা বেরিয়ে এসেছে !

“একজনের বো—কোথায় রাখে এখন ঠিক পাচ্ছে না । বাড়ীতে
বড় গোল হয়েছিল । মহা ভাবিত । সে কথা আর কাজ নাই ।

“আর মেয়ে মানুষের সঙ্গে থাকলেই তাদের বশ হয়ে যেতে হয় । সংসারীরা মেয়েদের কথায উঠতে বলে উঠে, বসতে বলে বসে । সকলেই আপনার পরিবারদের সুখ্যাতি করে ।

“আমি এক জায়গায় যেতে চেয়েছিলাম । রামলালের খুড়ীকে জিজ্ঞাসা করাতে বারণ করলে, আর যাওয়া হলো না । খানিক পরে ভাবলুম—উঃ ; আমি সংসার করি নাই, কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, তাতেই এই ! —সংসারীরা না জানি পরিবারদের কাছে কি রকম বশ !

মণি । কামিনীকাঞ্চনের মাঝখানে থাকলেই একটু না একটু গায়ে আঁচ লাগবেই । আপনি বলেছিলেন, জয়নারা'ণ অতো পণ্ডিত—বুড়ো হয়েছিল—আপনি যখন গেলেন, বালিস টালিস শুকুতে দিচ্ছিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কিন্তু পণ্ডিত বলে অহংকার ছিল না । আর যা বলেছিল, শেষে আইন মারফিক কাশীতে গিয়ে বাস হলো ।

ছেলেগুলো দেখলাম, বুট পায়ে দেওয়া ইংরাজী পড়া ।

[ঠাকুরের প্রেমোন্মাদ প্রভৃতি নানা অবস্থা ।]

ঠাকুর মণিকে প্রশ্নচ্ছলে নিজের অবস্থা বুঝাইতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আগে খুব উন্মাদ ছিল, এখন কমলো কেন ?—কিন্তু মাঝে মাঝে হয় ।

মণি । আপনার এক রকম অবস্থা তো নয় । যেমন বলেছিলেন, কখন ও বালকবৎ,—কখন ও উন্মাদবৎ—কখনও জড়বৎ—কখনও পিশাচবৎ—এই সব অবস্থা মাঝে মাঝে হয় । আবার মাঝে মাঝে সহজ অবস্থাও হয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ বালকবৎ । আবার ঐ সঙ্গে বাল্য, পৌগণ্ড, যুবা—এ সব অবস্থা হয় । যখন জ্ঞান উপদেশ দেবে, তখন যুবার অবস্থা ।

“আবার পৌগণ্ড অবস্থা । বারো তেরো বছরের ছোকরার মত ফচ-কিমি করতে ইচ্ছা হয় । তাই ছোকরাদের নিয়ে ফষ্টি নাষ্টি হয় ।

[নারা'ণের গুণ । কামিনীকাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসীর কঠিন সাধনা ।]

“আচ্ছা, নারাণ কেমন ? মণি । আজ্ঞা, লক্ষণ সব ভাল আছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । নাউএর ডোলটা ভাল—তান্পুরো বেশ বাজবে ।

“সে আমায় বলে, আপনি সবই (অর্থাৎ অবতার) । যার যা ধারণা, সে তাই বলে । কেউ বলে, এমনি শুধু সাধু ভক্ত ।

“যেটি বারণ করে দিয়েছি, সেটী বেশ ধারণা করে । পরদা গুটোতে বল্লাম । তা গুটোলে না ।

“গেরো দেওয়া, সেলাই করা, পরদা গুটোনো, দোর বাস্ক চাৰি দিয়ে বস্ক করা, এ সব বারণ করেছিলাম—তাই ঠিক ধারণা । যে ত্যাগ করবে, তার এই সব সাধন করতে হয় । সন্ন্যাসীর পক্ষে এই সব সাধন ।

“সাধনের অবস্থায় ‘কামিনী’ দাবানলস্বরূপ—কালসাপের স্বরূপ ! সিদ্ধ অবস্থায় ভগবান্ দর্শনের পর—তবে মা আনন্দময়ী ! তবে মার এক একটী রূপ বলে, দেখ্বে ।”

কয়েক দিন হইল, ঠাকুর নারা'ণকে কামিনী সম্বন্ধে অনেক সতর্ক করেছিলেন । বলেছিলেন—‘মেয়ে মানুষের গায়ের হাওয়া লাগাবে না ; মোটা কাপড় গায়ে দিয়ে থাক্বে, পাছে তাদের হাওয়া গায় লাগে,— আর মা ছাড়া সকলের সঙ্গে, আটহাত, নয় দু হাত, নয় অন্ততঃ এক হাত, সর্বদা তফাৎ থাক্বে ।’

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) । তার মা নারা'ণকে বলেছে, তাঁকে দেখে আমরাই মুগ্ধ হই, তুইত ছেলে মানুষ ! আর সরল না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না । নিরঞ্জন কেমন সরল !

মণি । আজ্ঞা, হাঁ ।

[নিরঞ্জন, নরেন্দ্র কি সরল ?]

শ্রীরামকৃষ্ণ । সে দিন কলকাতা যাবার সময় গাড়ীতে দেখলে না ? সব সময়েই এক ভাব—সরল । লোক ঘরের ভিতর এক রকম, আবার বাড়ীর বাহিরে গেলে আর এক রকম হয় । নরেন্দ্র এখন (বাপের মৃত্যুর পর) সংসারের ভাবনায় পড়েছে । ওর একটু হিসাব বুদ্ধি আছে । সব ছোকরা এদের মত কি হয় ?

[শ্রীরামকৃষ্ণ নবীননিয়োগীর বাড়ী । নীলকণ্ঠের যাত্রা ।]

“নীলকণ্ঠের যাত্রা আজ শুনতে গিচ্লাম—দক্ষিণেশ্বরে । নবীন নিয়োগীর বাড়ী । সেখানকার ছোঁড়া গুনো বড় খারাপ । কেবল এর নিন্দা ওর নিন্দা ! ও রকম স্থলে ভাব সম্বরণ হয়ে যায় ।

“সে বার যাত্রার সময় মধু ডাক্তারের চক্ষে ধারা দেখে, তার দিকে চেয়ে ছিলাম । আর কারু দিকে তাকাতে পার্লাম না ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ, কেশব ও ব্রাহ্মসমাজ । সমন্বয় উপদেশ ।

The Universal Catholic Church of Sri Ramkrishna.

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) । আচ্ছা, লোক যে এত আকর্ষণ হয়ে আসে এখানে, তার মানে কি ?

মণি । আমার ব্রজের লীলা মনে পড়ে । কৃষ্ণ যখন রাখাল আর বৎস হলেন, তখন রাখালদের উপর গোপীদের, আর বৎসদের উপর গাভীদের, বেশী আকর্ষণ হতে লাগলো ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । সে ঈশ্বরের আকর্ষণ । কি জান, মা এইরূপ ভেঙ্কী লাগিয়ে দেন আর আকর্ষণ হয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আচ্ছা, কেশব সেনের কাছে যত লোক যেতো, এখানে তো ততো আসে না । আর কেশব সেনকে কত লোক গণে মানে, বিলাতে পর্য্যন্ত জানে,—Queen (রাণী ভিক্টোরিয়া) কেশবের সঙ্গে কথা কয়েছে ! গীতায় তো বলেছে, যাকে অনেকে গণে মানে, সেখানে ঈশ্বরের শক্তি । এখানে তো অতো হয় না ?

মণি । কেশব সেনের কাছে সংসারী লোক গিয়েছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, তা বটে । ঐহিক লোক ।

মণি । কেশব সেন যা করে গেলেন, তা কি থাকবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । কেন, সংহিতা করে গেছে,—তাতে কত নিয়ম !

মণি । অবতার যখন নিজে কাজ করেন, তখন আলাদা কথা ।
যেমন চৈতন্যদেবের কাজ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ হাঁ, ঠিক ।

মণি । আপনি ত বলেন,—চৈতন্যদেব বলেছিলেন, আমি যা বীজ ছড়িয়ে দিয়ে গেলাম, কখন না কখন এর কাজ হবে । কার্ণাশের উপর বীজ রেখেছিল, বাড়ী পড়ে গেলে সেই বীজ আবার গাছ হবে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আচ্ছা, শিবনাথরা যে সমাজ করেছে, তাতেও অনেক লোক যায় ।
মণি । আচ্ছা, তেমনি লোক যায় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্ত্রে) হাঁ হাঁ, সংসারা লোক সব যায় । যারা ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল—কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করতে চেষ্টা করছে—এমন সব লোক কম যায় বটে । মণি । এখান থেকে একটা স্রোত যদি বয় তা হলে বেশ হয় । সে স্রোতের টানেতে সব ভেসে যাবে । এখান থেকে যা হবে সে ত আর এক ঘেয়ে হবে না ।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান । বৈষ্ণব ও ব্রহ্মজ্ঞানী ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্ত্রে) । আমি যার যা ভাব তার সেই ভাব রক্ষা করি । বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবের ভাবটাই রাখতে বলি, শাক্তকে শাক্তের ভাব । তবে, বলি, ‘একথা বোলো না—আমারই পথ সত্য আর সব মিথ্যা, ভুল !’

“হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—নানা পথ দিয়ে এক যায়গায়ই যাচ্ছে । নিজের নিজের ভাব রক্ষা করে, আন্তরিক তাঁকে ডাকলে, ভগবান লাভ হবে ।

“বিজয়ের শ্বশুড়ী বলে, ‘তুমি বলরামদের বলে দাওনা, সাকার পূজোর কি দরকার ? নিরাকার সচ্চিদানন্দকে ডাকলেই হোলো ।’

“আমি বল্লুম, ‘অমন কথা আমিই বা বলতে যাবো কেন—আর তারাই বা শুনবে কেন ?’ মা মাছ রেঁধেছে—কোনও ছেলেকে পোলওয়া রেঁধে দেয়, যার পেট ভাল নয় তাকে মাছের ঝোল করে দেয় রুচি ভেদে, অধিকারী ভেদে, একই জিনিষ নানারূপ করে দিতে হয় ।

মণি । আচ্ছা হাঁ । দেশ কাল পাত্র ভেদে সব আলাদা রাস্তা । তবে যে রাস্তা দিয়েই যাওয়া হ’ক না কেন, শুদ্ধ মন হয়ে, আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তবে তাঁকে পাওয়া যায় । এই কথা আপনি বলেন ।

[মুখুয্যেদের হরি । শ্রীরামকৃষ্ণ ও দান ধ্যান ।]

ঘরের ভিতর ঠাকুর নিজের আসনে বসিয়া আছেন ! মেজেতে মুখুয্যেদের হরি, মাফটার, প্রভৃতি বসিয়া আছেন । একটা অপরিচিত ব্যক্তি ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বসিলেন । ঠাকুর পরে বলিয়াছিলেন,

তঁাহার চক্ষুর লক্ষণ ভাল না—বিড়ালের ন্যায় কটা চক্ষু ।

ঠাকুরকে হরি তামাক সাজিয়া আনিয়া দিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হুঁকা হাতে করিয়া, হরির প্রতি) । দেখি, তোর হাত দেখি । এই যে যব রয়েছে—এ বেশ ভাল লক্ষণ ।

“হাত ভালগা কর্ দেখি । (নিজের হাত হরির হাত লইয়া যেন ওজন করিতেছেন ।) ছেলে মানসি বুদ্ধি এখনও আছে ;—দোষ এখনও কিছু হয় নাই । (ভক্তদের প্রতি) আমি হাত দেখলে খল কি সরল বলতে পারি । (হরির প্রতি) । কেন, —শুশুর বাড়ী যাবি—বৌর সঙ্গে কথা বার্তা কইবি—আর ইচ্ছে হয় একটু আমোদ আহ্লাদ করবি ।

(মাষ্টারের প্রতি) কেমন গো ? (মাষ্টার প্রভৃতির হস্ত) ।

মাষ্টার ! আজ্ঞা নতুন হাঁড়ী যদি খারাপ হয়ে যায়, তা হলে আর দুধ রাখা যাবে না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । এখন যে হয় নাই তা কি করে জানলে ?

মুখুয্যেরা দুই ভাই—মহেন্দ্র ও প্রিয়নাথ । তঁাহারা চাকরি করেন না তঁাহাদের ময়দার কল আছে । প্রিয়নাথ পূর্বের ইঞ্জিনিয়ারের কৰ্ম্ম করিতেন । ঠাকুর হরির নিকট মুখুয্যে ভ্রাতৃত্বের কথা কহিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হরির প্রতি) । বড় ভাইটী বেশ, না ?—বেশ, সরল ।

হরি : আজ্ঞা হাঁ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) । ছোট নাকি বড় সন (কৃপণ) ? —এখানে এসে নাকি অনেক ভাল হয়েছে । আমায় বল্লে আমি কিছু জানতুম না । (হরিকে) এরা কিছু দান টান করে কি ?

হরি । তেমন দেখতে পাই না । এঁদের বড় ভাই যিনি ছিলেন—তঁার কাল হয়েছে—তিনি বড় ভাল ছিলেন—খুব দান্ ধ্যান ছিল ।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও দেহের লক্ষণ । ৩মহেশ ন্যায়রত্নের ছাত্র ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টার প্রভৃতিকে) । শরীরের লক্ষণ দেখে অনেকটা বুঝা যায়, তার হবে কি না । খল হ'লে হাত ভারী হয় ।

“নাক টেপা হওয়া ভাল না । শস্তুর নাকটী টেপা ছিল । তাই অতো জ্ঞান থেকেও তত সরল ছিল না ।

“উন পাঁজুরে লক্ষণ ভাল না । আর হাড় পেকে —কনুয়ের গাঁট মোটা, হাত ছিনে । আর বিড়াল চক্ষু—বিড়ালের মতন কটা চোখ ।

“ঠোট—ডোমের মত হলে—নীচবুদ্ধি হয় । বিষ্ণুঘরের পুরুত কয়মাস একটিং কয়ে এসেছিল । তার হাতে খেতুম না—হঠাৎ মুখ দিয়ে বলে ফেলেছিলুম, ‘ও ডোম’ । তার পর সে এক দিন বলে, ‘হঁ’, আমাদের ঘর ডোম পাড়ায়--আমি ডোমের বাসন চাঙ্গারী বুনতে জানি ।’

“আরো খারাপ লক্ষণ একচক্ষু, আর টারা । বরং একচক্ষু কানা ভাল, তো টারা ভাল নয় । ভারি দুন্ট ও খল হয় ।

“মহেশের (৩মহেশ ণ্ডায়রত্নের) এক জন ছাত্র এসেছিল । সে বলে, ‘আমি নাস্তিক’ । সে হৃদেকে বলে, আমি ‘নাস্তিক, তুমি আস্তিক হয়ে আমার সঙ্গে বিচার করো’ । তখন তাকে ভাল করে দেখলাম । দেখি, বিড়াল চক্ষু !

“আবার চলনেতে লক্ষণ ভাল মন্দ টের পাওয়া যায় ।

“পুরুষাঙ্গের উপর চামড়াটা মুসলমানদের মত যদি কাটা হয় সে একটা খারাপ লক্ষণ । (মাফটার প্রভৃতির হাশ্ব ।) (মাফটারকে, সহাস্ত্রে) তুমি ওটা দেখো—ও খারাপ লক্ষণ । (সকলের হাশ্ব) ।

ঘর হইতে ঠাকুর বারান্দায় বেড়াইতেছেন । সঙ্গে মাফটার ও বাবুরাম ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজারার প্রতি) । এক জন এসেছিল,—দেখলাম বিড়ালের মতন চক্ষু । সে বলে, ‘আপনি জ্যোতিষ জানেন ?—আমার কিছু কষ্ট আছে ।’ আমি বললাম,—‘না ;—বরাহনগরে যাও, সেখানে জ্যোতিষের পণ্ডিত আছে ।

বাবুরাম ও মাফটার নীলকণ্ঠের যাত্রার কথা কহিতেছেন । বাবুরাম নবীন সেনের বাটী হইতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিয়া কাল রাত্রে এখানে ছিলেন । সকালে ঠাকুরের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে নবীন নিয়োগীর বাড়ীতে নীলকণ্ঠের যাত্রা শুনিয়াছিলেন

[শ্রীরামকৃষ্ণ, মণি ও নিভৃত চিন্তা । ‘ঈশ্বরের ইচ্ছা’ । নারা’ণের জন্ম ভাবনা ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ(মাফটার ও বাবুরামের প্রতি) । তোমাদের কি কথা হচ্ছে ?

মাষ্টার ও বাবুরাম । আজ্ঞা—নীলকণ্ঠের যাত্রার কথা হচ্ছে,—
আর সেই গানটীর কথা—‘শ্যামা পদের আশ নদীর তীরে বাস’ ।

ঠাকুর বারান্দায়—বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ মণিকে নিভূতে লইয়া
বলিতেছেন—‘ঈশ্বর চিন্তা মত লোকে তের না পায়
ততই ভাল ।’ হঠাৎ এই কথা বলিয়াই ঠাকুর চলিয়া গেলেন ।

ঠাকুর হাজারার সঙ্গে কথা কহিতেছেন ।

হাজারা । নীলকণ্ঠ ত আপনাকে বলেছে, সে আসবে । তা
ডাকতে গেলে হয় । শ্রীরামকৃষ্ণ । না, রাত্রি জেগেছে,—ঈশ্বরের
ইচ্ছায় আপনি আসে, সে এক । বাবুরামকে নারাণের বাড়ী গিয়া
দখা করিতে বলিতেছেন । নারাণকে সাক্ষাৎ নারায়ণ
দখেন । তাই তাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন । বাবুরামকে
বলিতেছেন—‘তুই বরং একখান ইংরাজী বই নিয়ে তার কাছে যাস ।’

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

[নীলকণ্ঠ প্রভৃতি ভক্তগণসঙ্গে সংকীৰ্ত্তনানন্দে ।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে নিজের আসনে বসিয়া আছেন । বেলা
প্রায় তিনটা হইবে । নীলকণ্ঠ পাঁচ সাত জন সান্নোপাঙ্গ লইয়া
ঠাকুরের ঘরে আসিয়া উপস্থিত । ঠাকুর পূর্বাস্থ হইয়া তাঁহাকে যেন
অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলেন । নীলকণ্ঠ ঘরের পূর্ব দ্বার দিয়া
আসিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন ।

ঠাকুর সম্মানিত!—তাঁহার পশ্চাতে বাবুরাম,—সম্মুখে
মাষ্টার নীলকণ্ঠ ও চমৎকৃত অন্যান্য যাত্রাওয়ালারা । খাটের উত্তর ধারে
দীননাথ খাতাঙ্গি আসিয়া দর্শন করিতেছেন । দেখিতে দেখিতে ঘর
ঠাকুরবাড়ীর লোকে পরিপূর্ণ হইল । কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরের কিঞ্চিৎ
ভাব উপশম হইতেছে । ঠাকুর মেজেতে মাছুরে বসিয়াছেন—সম্মুখে
নীলকণ্ঠ ও চতুর্দিকে ভক্তগণ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (আবিষ্ট হইয়া) । আমি ভাল আছি ।

নীলকণ্ঠ (কৃতাজ্জলি হইয়া) । আমায়ও ভাল করুন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । তুমি ত ভাল আছ । ‘ক’য়ে আকার ‘কা’,
আবার আকার দিয়ে কি হবে ? ‘কা’ এর উপর আবার আকার দিলে
সেই ‘কা’ই থাকে । (সকলের হাস্য)

নীলকণ্ঠ । আজ্ঞা, এই সংসারে পড়ে রয়েছি !

শ্রীরামকৃষ্ণ (সাহাস্তে) । তোমায় সংসারে রেখেছেন পাঁচজনের জন্ত ।

“অষ্টপাশ । তা সব যায় না । দু’একটা পাশ তিনি রেখে দেন—
লোক শিক্ষার জন্ত । তুমি এই যাত্রাটী করেছো, তোমার ভক্তি দেখে
কত লোকের উপকার হচ্ছে । আর তুমি সব ছেড়ে দিলে এঁরা
(যাত্রাওয়ালারা) কোথায় যাবেন ।

“তিনি তোমার দ্বারা কাজ করিয়ে নিচ্ছেন । কাজ শেষ হলে তুমি
আর ফিরবে না । গৃহিণী সমস্ত সংসারের কাজ সেরে,—সকলকে
খাইয়ে দাইয়ে—দাসদাসীদের পর্যান্ত খাইয়ে দাইয়ে—নাইতে যায় ;—
তখন আর ডাকাডাকি করলেও ফিরে না ।

নীলকণ্ঠ । আমায় আশীর্ব্বাদ করুন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কৃষ্ণের বিরহে যশোদা উন্মাদিনী,—শ্রীমতীর কাছে
গিয়েছেন । শ্রীমতী তখন ধ্যান করছিলেন । তিনি আবিষ্ট হয়ে
যশোদাকে বল্লেন—‘আমি সেই মূল প্রকৃতি আদ্যাশক্তি !
তুমি আমার কাছে বর নাও ।’ যশোদা বল্লেন, আর কি বর দেবে !
এই বলো, যেন কায়মনোবাক্যে তার চিন্তা, তার সেবা করতে পারি ।
কর্ণেতে যেন তার নাম গুণ গান শুনতে পাই, হাতে যেন তার ও তার
ভক্তের সেবা করতে পারি,—চক্ষে যেন তার রূপ, তার ভক্ত, দর্শন
করতে পারি ।

“তোমার যেকালে তাঁর নাম করতে চক্ষু জলে ভেসে যায়, সেকালে
আর তোমার ভাবনা কি ?—তাঁর উপর তোমার ভালবাসা এসেছে ।

“অনেক জানার নাম অজ্ঞান,—এক জানার নাম জ্ঞান—অর্থাৎ,
এক ঈশ্বর সত্য, সর্ববভূতে রয়েছেন । তাঁর সঙ্গে আলাপের নাম

দক্ষিণেশ্বর । নীলকণ্ঠ প্রভৃতি ভক্তগণ সঙ্গে সংকীৰ্ত্তনানন্দে । ২৪৩

বিজ্ঞান—তাকে লাভ করে নানা ভাবে ভালবাসার নাম বিজ্ঞান ।

“আবার আছে—তিনি এক দুয়ের পার—বাক্য মনের অতীত । লীলা থেকে নিত্য, আবার নিত্য থেকে লীলায় আসা,—এর নাম পাকা ভক্তি ।

“তোমার ও গানটী বেশ—‘শ্যামাপদে আশ নদীর তীরে বাস ।’

“তা হলেই হলো,—তঁার কৃপার উপর সব নির্ভর কচ্ছে ।

“কিন্তু তা বলে তাঁকে ডাকতে হবে,—চুপ করে থাকলে হবে না ।
উকিল হাকিমকে সব বোলে শেষে বলে—‘আমি যা বলবার বললাম,
এখন হাকিমের হাত ।’

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর বলিতেছেন—তুমি সকালে অতো গাইলে,—
আবার এখানে এসেছ কষ্ট করে । এখানে কিন্তু অনারারী honorary ।

নীলকণ্ঠ । কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । বুঝেছি, আপনি যা বলবেন ।

নীলকণ্ঠ । অমূল্য রতন নিষেধাব !!!

শ্রীরামকৃষ্ণ । সে অমূল্য রতন আপনার কাছে । আবার কয়ে
আকার দিলে কি হবে ? না হলে, তোমার গান অতো ভাল লাগে
কেন ? রামপ্রসাদ সিদ্ধ, তাই তার গান ভাল লাগে ।

“সাধারণ জীবকে বলে মানুষ । যার চৈতন্য হয়েছে, সেই
মানুষ । তুমি তাই মানুস ।

“তোমার গান হবে শুনে আমি আপনি যাচ্ছিলাম—তা নিয়োগীও
বলতে এসেছিল ।

ঠাকুর ছোট তক্তাপোষের উপর নিজের আসনে গিয়া বসিয়াছেন ।
নীলকণ্ঠকে বলিতেছেন, একটু মায়ের নাম শুনবো ।

নীলকণ্ঠ সাজোপাজ লইয়া গান গাইতেছেন—

গান—শ্যামাপদে আশ, নদীর তীরে বাস

গান—মহিমামর্দিনী

এই গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর দাঁড়াইয়া সমাপ্তি ।

নীলকণ্ঠ গানে বলিতেছেন ‘যার জটায় গঙ্গা, তিনি রাজরাজেশ্বরীকে
হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছেন ।’

ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন । নীলকণ্ঠ ও ভক্তগণ তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া গান গাইতেছেন ও নৃত্য করিতেছেন ।

গান—শিব শিব ।

এই গানের সঙ্গেও ঠাকুর ভক্তসঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন ।

গান সমাপ্ত হইল । ঠাকুর নীলকণ্ঠকে বলিতেছেন,—আমি আপনার সেই গানটী শুন্বো, কল্কাতায় যা শুনেছিলাম ।

মাফটার । শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর, নব নটবর, তপতকাঞ্চনকায় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, হাঁ ।

নীলকণ্ঠ গাইতেছেন—(শ্রীকথামৃত, চতুর্থ ভাগ, ৪৫ পৃষ্ঠা)

গান—শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর, নবনটবর, তপতকাঞ্চনকায় ॥

‘প্রেমের বন্তে ভেসে যায়’—এই ধূয়া ধরিয়া ঠাকুর নীলকণ্ঠাদি ভক্তসঙ্গে আবার নাচিতেছেন । সে অপূর্ব নৃত্য যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা কখনই ভুলিবেন না । ঘর লোকে পরিপূর্ণ, সকলেই উন্মত্তপ্রায় ! ঘরটী যেন শ্রীবাসের আগ্নিবা হইয়াছে !

শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভাবাবিষ্ট হইলেন । তাঁহার বাটীর কয়েকটি মেয়ে আসিয়াছেন ; তাঁহারা উত্তরের বারাণ্ডা হইতে এই অপূর্ব নৃত্য ও সংকীৰ্ত্তন দর্শন করিতেছেন । তাঁহাদের মধ্যেও একজনের ভাব হইয়াছিল । মনোমোহন ঠাকুরের ভক্ত ও শ্রীযুক্ত রাখালের সম্বন্ধী ।

ঠাকুর আবার গান ধরিলেন—

গান—যাদের হরি বলিতে নয়ন ঝুরে, তারা তারা দু ভাই এসেছে রে !

সংকীৰ্ত্তন করিতে করিতে ঠাকুর নীলকণ্ঠাদি ভক্তসঙ্গে নৃত্য করিতেছেন ও আঁখর দিতেছেন—

‘রাধার প্রেমে মাতোয়ারা, তারা তারা দু ভাই এসেছে রে !’

উচ্চ সংকীৰ্ত্তন শুনিয়া চতুর্দিকের লোক আসিয়া জমিয়াছে । দক্ষিণের, উত্তরের ও পশ্চিমের গোল বারাণ্ডায়, সব লোক দাঁড়াইয়া । যাঁহারা নৌকা করিয়া যাইতেছেন, তাঁহারাও এই মধুর সংকীৰ্ত্তনের শব্দ শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়াছেন ।

কীৰ্ত্তন সমাপ্ত হইল । ঠাকুর জগন্মাতাকে প্রণাম করিতেছেন ও

দক্ষিণেশ্বর । নীলকণ্ঠাদি ভক্তগণসঙ্গে সঙ্কীৰ্ত্তনানন্দে । ২৪৫

বলিতেছেন—ভাগবত, ভক্ত, ভগবান্—জ্ঞানীদের নমস্কার, যোগীদের নমস্কার, ভক্তদের নমস্কার ।

এইবার ঠাকুর নীলকণ্ঠাদি ভক্তসঙ্গে পশ্চিমের গোল বারাণ্ডায় আসিয়া বসিয়াছেন । সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে । আজ কোজাগর পূর্ণিমার পর দিন । চতুর্দিকে চাঁদের আলো । ঠাকুর নীলকণ্ঠের সহিত আনন্দে কথা কহিতেছেন ।

[ঠাকুর কে ? ‘আমি’ খুঁজে পাই নাই । ‘ঘরে আনবো চণ্ডী’ ।]

নীলকণ্ঠ । আপনিই সাক্ষাৎ গৌরী !

শ্রীরামকৃষ্ণ । ও গুণো কি !—আমি সকলের দাসের দাস ।

“গঙ্গারই ঢেউ । ঢেউএর কখন গঙ্গা হয় ?

নীলকণ্ঠ । আপনি যা বলুন, আমরা আপনাকে তাই দেখছি !

শ্রীরামকৃষ্ণ (কিঞ্চিৎ ভাবাবিষ্ট হইয়া, করুণ স্বরে) । বাপু, আমার ‘আমি’ খুঁজতে যাই, কিন্তু খুঁজে পাই না !

“হনুমান্ বলেছিলেন—হে রাম, কখন ভাবি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ, —তুমি প্রভু আমি দাস,—আবার যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়—তখন দেখি, তুমিই আমি, আমিই তুমি ।

নীলকণ্ঠ । আর কি বলবো, আমাদের কৃপা করবেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্ত্রে) । তুমি কত লোককে পার কোরছ—তোমার গান শুনে কত লোকের উদ্দীপন হচ্ছে ।

নীলকণ্ঠ । পার করছি বলছেন । কিন্তু আশীর্ব্বাদ করুন, যেন নিজে ডুবি না ! শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্ত্রে) । যদি ডোবো ত’ ঐ সুধা-হ্রদে !

ঠাকুর নীলকণ্ঠকে পাইয়া আনন্দিত হইয়াছেন । তাঁহাকে আবার বলিতেছেন—“তোমার এখানে আসা !—যাকে অনেক সাধ্য সাধনা করে তবে পাওয়া যায় ! তবে একটা গান শোনো ।—

গিরি ! গণেশ আমার শুভকারী ।

পূজে গণপতি, পেলাম হৈমবতী, যাও হে গিরিরাজ, আনো গিয়ে গৌরী ॥
বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়ে বোধন, গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন, ঘরে আনবো চণ্ডী, শুনবো কত চণ্ডী, কত আসবেন দণ্ডী, যোগী জটাধারী ॥

“চণ্ডী মেকালে এসেছেন—সেকালে কত যোগী জটাধারাও আসবে!
ঠাকুর হাসিছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মান্টার, বাবুরাম প্রভৃতি ভক্তদের
বলিতেছেন—‘আমার বড় হাসি পাচ্ছে! ভাবছি—এঁদের (গাত্রাও-
য়ালাদের) আবার আমি গান শোনাচ্ছি!’

নীলকণ্ঠ । আমরা যে গান গেয়ে বেড়াই, তার পুরস্কার আজ হ'লো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্ত্রে) । কোনো জিনিষ বেচলে এক খাঁমচা ফাউ
দেয়—তোমরা ওখানে গাইলে, এখানে ফাউ দিলে! (সকলের হাস্য)

চতুর্থ ভাগ—ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

শ্রীশ্রীরথযাত্রা বলরামমন্দিরে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[পূর্ণ, ছোট নরেন, গোপালের মা ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের বাড়ীর বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন।
আষাঢ় শুক্ল প্রতিপদ, সোমবার, ১৩ই জুলাই, ১৮৮৫; বেলা ৯টা।

কল্যা শ্রীশ্রীরথযাত্রা। রথে বলরাম ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া
আনিয়াছেন। বাড়ীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথবিগ্রহের নিত্য সেবা হয়। একখানি
ছোট রথও আছে;—রথের দিন রথ বাহিরের বারান্দায় টানা হইবে।

ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। কাছে নারা'ণ, তেজচন্দ্র,
বলরাম ও অন্যান্য অনেক ভক্তেরা। পূর্ণ সম্বন্ধে কথা হইতেছে। পূর্ণের
বয়স পনের হইবে। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । আচ্ছা, সে (পূর্ণ) কোন্ পথ
দিয়ে এসে দেখা করবে?—দ্বিজকে ও পূর্ণকে তুমিই মিলিয়ে দিও।

“এক সত্তার আর এক বয়সের লোক, আমি মিলিয়ে দিই। এর
মানে আছে। দু'জনেরি উন্নতি হয়। পূর্ণর কেমন অনুরাগ দেখেছ!

মাষ্টার। আজ্ঞা হাঁ, আমি ট্রামে ক'রে যাচ্ছি, ছাদ থেকে আমাকে

কন্ঠ্যরূপে পেয়েছিল । মেয়েটিকে বড়ই স্নেহ করে । সেই স্নেহের গুণে তিনি আটকে ছিলেন, বাপের কাছছাড়া প্রায় হ'তেন না । এক দিন সে জমিদারীর কাজ ক'রছে, ভারি ব্যস্ত, মেয়েটী ছেলের স্বভাবে কেবল বলছে, 'বাবা, এটা কি, ওটা কি ।' বাপ অনেক মিষ্টি করে বললে—'মা, এখন যাও, বড় কাজ পড়েছে ।' মেয়ে কোন মতে যায় না । শেষে বাপ অন্তমনস্ক হ'য়ে বললে, 'তুই এখান থেকে দূর হ ' মা তখন এই ছুতো করে বাড়ী থেকে চলে গেলেন । সেই সময় একজন শাঁখারী রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল । তাকে ডেকে শাঁখা পরা হ'লো । দাম দেবার কথায় বল্লেন, 'ঘরের অমুক কুলুঙ্গিতে টাকা আছে, লবে ।' এই ব'লে সেখান থেকে চ'লে গেলেন, আর দেখা গেল না । এ দিকে শাঁখারী টাকার জন্ত ডাকাডাকি ক'রছে । তখন মেয়ে বাড়ীতে নাই দেখে, সকলে ছুটে এলো । রণজিত রায় নানা স্থানে লোক পাঠালে সন্ধান করবার জন্য । শাঁখারীর টাকা ঠিক সেই কুলুঙ্গিতে পাওয়া গেল । রণজিত রায় কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় লোকজন এসে বললে যে দীঘিতে কি দেখা যাচ্ছে । সকলে দীঘির ধারে গিয়ে দেখে যে, শাঁখা পরা হাতটী জলের উপর তুলেছেন । তার পর আর দেখা গেল না । এখনও ভগবতীর পূজা ঐ মেলায় সময় হয়—বারুণীর দিনে । (মাষ্টারকে) এ সব সত্য । মাষ্টার । আচ্ছা, হাঁ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । নরেন্দ্র এখন এ সব বিশ্বাস করে ।

“পূর্ণর বিষুওর অংশে জন্ম । মানসে বিল্বপত্র দিয়ে পূজা করলুম ; তা হ'লো না ;—তুলসী চন্দন দিলাম, তখন হলো !

“তিনি নানারূপে দর্শন দেন । কখন নররূপে, কখন চিন্ময় ঈশ্বরীয় রূপে । রূপ মানতে হয় । কি বল ? মাষ্টার । আচ্ছা হাঁ ।

[গোপালের মার প্রকৃতিভাব ও রূপদর্শন ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । কামারহাটীর বামনী (গোপালের মা) কত কি দ্যাখে ! একলাটি গঙ্গার ধারে একটি বাগানে নির্জজন ঘরে থাকে, আর জপ করে । গোপাল কাছে শোয় ! (বলিতে বলিতে ঠাকুর চমকিত হইলেন) । কল্পনায় নয়, সাক্ষাৎ ! দেখলে গোপালের হাত রাঙা !

কলিকাতা—শ্রীশ্রীরথযাত্রা উপলক্ষ্যে বলরামমন্দিরে ভক্তসঙ্গে । ২৪৯

সঙ্গে সঙ্গে বেড়ায় !—মাই খায় !—কথা কয় ! নরেন্দ্র শুনে কাঁদলে !

“আমিও আগে অনেক দেখতুম্। এখন আর ভাবে তত দর্শন হয় না। এখন প্রকৃতিভাব কম পড়ছে। বেটা ছেলের ভাব আসছে। তাই ভাব অন্তরে, বাহিরে তত প্রকাশ নাই।

“ছোট নরেনের পুরুষভাব,—তাই মন লীন হয়ে যায়। ভাবাদি নাই। নিত্যগোপালের প্রকৃতিভাব। তাই খাঁচা মঁ্যাচা ;—ভাবে তার শরীর লাল হ’য়ে যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

কামিনীকাক্ষনত্যাগ ও পূর্ণাদি ।

[বিনোদ, দ্বিজ, তারক, মোহিত, তেজচন্দ্র, নারা’ণ, বলরাম, অতুল ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । আচ্ছা, লোকের তিল তিল ক’রে ত্যাগ হয়, এদের কি অবস্থা !

“বিনোদ বলে, ‘স্ত্রীর সঙ্গে শুতে হয়, বড়ই মন খারাপ হয়।’

“দেখো, সঙ্গ হউক আর নাই হউক, এক সঙ্গে শোয়াও খারাপ। গায়ের ঘর্ষণ, গায়ের গরম !

“দ্বিজর কি অবস্থা ! কেবল গা দোলায় আর আমার পানে তাকিয়ে থাকে ! একি কম ? সব মন কুড়িয়ে যদি আমাতে এলো, তা হলে তো সবই হ’লো।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার ?]

“আমি আর কি ?—তিনি । আমি মন্ত্র, তিনি মন্ত্রী । এর (আমার) ভিতর ঈশ্বরের সত্তা রয়েছে ! তাই এত লোকের আকর্ষণ বাড়ছে। ছুঁয়ে দিলেই হয় ! সে টান সে আকর্ষণ ঈশ্বরেরই আকর্ষণ ।

“তারক (বেলঘরের) ওখান থেকে (দক্ষিণেশ্বর থেকে) বাড়ী ফিরে যাচ্ছে ! দেখলাম, এর ভিতর থেকে শিখার ন্যায় জ্বল্ জ্বল্ ক’রতে ক’রতে কি বেরিয়ে গেল,—পেছু পেছু !

“কয়েক দিন পরে তারক আবার এলো (দক্ষিণেশ্বরে) । তখন সমাধিস্থ হয়ে তার বুকে পা দিলে—এর ভিতর যিনি আছেন ।

“আচ্ছা, এমন ছোকরাদের মতন আর কি ছোকরা আছে ?

মাফটার । মোহিতটী বেশ । আপনার কাছে দু একবার গিয়েছিল । দুটো পাশের পড়া পড়ছে, আর ঈশ্বরে খুব অনুরাগ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তা হ’তে পারে, তবে অত উঁচু ঘর নয় । শরীরের লক্ষণ তত ভাল নয় । মুখ খ্যাবড়ানো ।

“এদের উঁচু ঘর । তবে শরীর ধারণ করলেই বড় গোল । আবার শাপ হলো তো সাত জন্ম আস্তে হবে । বড় সাবধানে থাকতে হয় । বাসনা থাকলেই শরীর ধারণ ।

একজন ভক্ত । যাঁরা অবতার—দেহ ধারণ ক’রে এসেছেন, তাঁদের কি বাসনা ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) । দেখেছি, আমার সব বাসনা যায় নাই । এক সাধুর আলোয়ান দেখে বাসনা হয়েছিল, ঐ রকম পরি । এখনও আছে । জানি কিনা আর একবার আস্তে হবে ।

বলরাম (সহাস্যে) । আপনার জন্ম কি আলোয়ানের জন্ম ? (সকলের হাস্য) ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) । একটা সৎ কামনা রাখতে হয় । ঐ চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ হবে বলে । সাধুরা চার ধামের একধাম বাকি রাখে । অনেকে জগন্নাথক্ষেত্র বাকি রাখে । তা হলে জগন্নাথ চিন্তা ক’রতে ক’রতে শরীর যাবে ।

গেরুয়া পরা এক ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিলেন । তিনি ভিতরে ভিতরে ঠাকুরের নিন্দা করেন, তাই বলরাম হাসিতেছেন । ঠাকুর অন্তর্যামী, বলরামকে বলিতেছেন,—‘তা হোক, বলুক্কে ভণ্ড ।’

[তেজচন্দ্রের সংসারত্যাগের প্রস্তাব ।]

ঠাকুর তেজচন্দ্রের সহিত কথা কহিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (তেজচন্দ্রের প্রতি) । তোকে এত ডেকে পাঠাই,—আসিস্ না কেন ? আচ্ছা, ধ্যান ট্যান করিস, তা হ’লেই আমি সুখী হব । আমি তোকে আপনার বলে জানি, তাই ডাকি ।

তেজচন্দ্র আজ্ঞা, আপীষ যেতে হয়,—কাজের ভিড় ।

কলিকাতা—বলরামমন্দিরে । তেজচন্দ্র, নারা'ণ প্রভৃতি সঙ্গে । ২৫১

মাফটার (সহান্বে) । বাড়ীতে বিয়ে, দশ দিন আপীষের ছুটি নিয়েছিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তবে !—অবসর নাই, অবসর নাই ! এই বলি, সংসার ত্যাগ করবি ।

নারা'ণ । মাফটার মহাশয় একদিন বলেছিলেন—‘Wilderness of this World সংসার অরণ্য ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাফটারের প্রতি) । তুমি ঐ গল্পটা বল ত, এদের উপকার হবে । শিষ্য ঔষধ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে আছে । গুরু এসে বল্লেন, এর প্রাণ বাঁচতে পারে, যদি এই বড়ি কেউ খায় । এ বাঁচবে কিন্তু বড়ি যে খাবে সে মরে যাবে ।

“আর ওটাও বল—খ্যাঁচা ম্যাঁচা । সেই হঠযোগী যে মনে করেছিল যে, পরিবারাদি এরাই আমার আপনার লোক । তৃতীয়ভাগ শ্রীকথামৃত ।

মধ্যাহ্নে ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্নাথের প্রসাদ পাইলেন । বলরামের জগন্নাথ দেবের সেবা আছে । তাই ঠাকুর বলেন, ‘বলরামের শুদ্ধ অন্ন ।’ আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন ।

বৈকাল হইয়াছে । ঠাকুর ভক্তসঙ্গে সেই ঘরে বসিয়া আছেন । কর্ত্তাভজা চন্দ্রবাবুও রসিক ব্রাহ্মণটীও আছেন ; ব্রাহ্মণটীর স্বভাব এক রকম ভাঁড়ের গায়,—এক একটী কথা কন আর সকলে হাসে ।

ঠাকুর কর্ত্তাভজাদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন,—রূপ, স্বরূপ, রজঃ, বীজ, পাকপ্রণালী ইত্যাদি ।

[ঠাকুরের ভাবাবস্থা । শ্রীযুক্ত অতুল ও তেজচন্দ্রের ভ্রাতা ।]

ছুটা বাজে । গিরীশের ভ্রাতা অতুল, ও তেজচন্দ্রের ভ্রাতা আসিয়াছেন । ঠাকুর ভাবসমাধিস্থ হইয়াছেন । কিয়ৎক্ষণ পরে ভাবে বলিতেছেন,—“চৈতন্যকে ভেবে কি অচৈতন্য হয় ?—ঈশ্বরকে চিন্তা করে কেউ কি বেহেড্ হয় ?—তিনি যে বোধস্বরূপ । নিত্য, শুদ্ধ, বোধ রূপ !”

আগন্তুকদের ভিতর কেউ কি মনে করিতেছিলেন যে, বেশী ঈশ্বর চিন্তা করিয়া ঠাকুরের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে ?

[‘এগিয়ে পড়’ । কৃষ্ণধনের সামান্য রসিকতা ।]

ঠাকুর কৃষ্ণধন নামক ঐ রসিক ব্রাহ্মণকে বলিতেছেন—“কি সামান্য ঐহিক বিষয় নিয়ে তুমি রাত দিন ফষ্টিনাষ্টি করে সময় কাটাচ্ছ । ঐটা ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দাও । যে নুনের হিসাব করতে পারে, সে মিশ্রির হিসাবও করতে পারে” ।

কৃষ্ণধন (সহাস্যে) । আপনি টেনে নিন্ !

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমি কি করব, তোমার চেষ্টার উপর সব নির্ভর করছে । ‘এ মন্ত্র নয়,—এখন, মন তোর !’

“ও সামান্য রসিকতা ছেড়ে ঈশ্বরের পথে এগিয়ে পড়,—তারে বাড়া, তারে বাড়া,—আছে । ব্রহ্মচারী কাঠুরিয়াকে এগিয়ে পড়তে ব’লেছিল । সে প্রথম এগিয়ে ছাথে চন্দনের কাঠ,—তার পর ছাথে রূপার খনি,—তার পর সোণার খনি,—তার পর হীরা মাণিক !

কৃষ্ণধন । এ পথের শেষ নাই !

শ্রীরামকৃষ্ণ । যেখানে শান্তি, সেই খানে ‘তিষ্ঠ’ ।

ঠাকুর একজন আগন্তুক সন্মুখে বলিতেছেন—

“ওর ভিতর কিছু বস্তু দেখতে পেলেম না । যেন ওলম্বা কুল ।

সন্ধ্যা হইল । ঘরে আলো জ্বালা হইল । ঠাকুর জগন্মাতার চিন্তা ও মধুর স্বরে নাম করিতেছেন । ভক্তেরা চতুর্দিকে বসিয়া আছেন ।

কাল রথযাত্রা । ঠাকুর আজ এই বাটীতেই রাত্রিবাস করিবেন ।

অন্তঃপুরে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া আবার বড় ঘরে ফিরিলেন । রাত প্রায় দশটা হইবে । ঠাকুর মণিকে বলিতেছেন, ‘ঐ ঘর থেকে (অর্থাৎ পার্শ্বের পশ্চিমের ছোট ঘর থেকে) গামছাটা আন ত’ ।

ঠাকুরের সেই ছোট ঘরটীতেই শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে । রাত সাড়ে দশটা হইল । ঠাকুর শয়ন করিলেন ।

গ্রীষ্মকাল । ঠাকুর মণিকে বলিতেছেন, ‘বরং পাখাটা আনো ।’ তাঁহাকে পাখা করিতে বলিলেন । রাত বারটার সময় ঠাকুরের একটু নিদ্রা ভঙ্গ হইল । বলিলেন, ‘শীত করছে, আর কাজ নাই ।’

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

[শ্রীশ্রীরথযাত্রা দিবসে বলরামমন্দিরে ভক্তসঙ্গে ।]

আজ শ্রীশ্রীরথযাত্রা । মঙ্গলবার । অতি প্রত্যুষে ঠাকুর উঠিয়া একাকী নৃত্য করিতেছেন ও মধুর কণ্ঠে নাম করিতেছেন ।

মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করিলেন । ক্রমে ভক্তেরা আসিয়া প্রণাম করিয়া ঠাকুরের কাছে উপবিষ্ট হইলেন । ঠাকুর পূর্ণর জন্ম বড় ব্যাকুল । মাষ্টারকে দেখিয়া তাঁরই কথা কহিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তুমি পূর্ণকে দেখে কিছু উপদেশ দিতে ?

মাষ্টার । আচ্ছা, চৈতন্যচরিত পড়তে বলেছিলাম,—তা সে সব কথা বেশ বলতে পারে । আর আপনি বলেছিলেন, সত্য ধরে থাকতে, সেই কথাও বলেছিলাম ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আচ্ছা, ‘ইনি অবতার’ এ সব কথা জিজ্ঞাসা করলে কি বলত ।
মাষ্টার । আমি বলেছিলাম,
চৈতন্যদেবের মত এক জনকে দেখবে ত চল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আর কিছু ?

মাষ্টার । আপনার সেই কথা । ডোবাতে হাতী নামলে জল তোলপাড় হয়ে যায়,—ক্ষুদ্র আধার হলেই ভাব উপ্ছে পড়ে ।

“মাছ ছাড়ার কথায় বলেছিলাম, কেন অমন করলে ! হৈ চৈ হবে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাই ভাল । নিজের ভাব ভিতরে ভিতরে থাকাই ভাল ।

[ভূমিকম্প ও শ্রীরামকৃষ্ণ । জ্ঞানীর দেহ ও দেহনাশ সমান ।]

প্রায় সাড়ে ছয়টা বাজে । বলরামের বাটী হইতে মাষ্টার গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন । পথে হঠাৎ ভূমিকম্প । তিনি তৎক্ষণাৎ ঠাকুরের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন । ঠাকুর বৈঠকখানা ঘরে দাঁড়াইয়া আছেন । ভক্তেরাও দাঁড়াইয়া আছেন । ভূমিকম্পের কথা হইতেছে । কম্প কিছু বেশী হইয়াছিল । ভক্তেরা অনেকে ভয় পাইয়াছেন ।

মাষ্টার । আমাদের সব নীচে যাওয়া উচিত ছিল ।

[পূর্বকথা—আগ্নিনে ঝড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ৫ই অক্টোবর ১৮৬৯ খৃঃ]

শ্রীরামকৃষ্ণ । যে ঘরে বাস, তারই এই দশা ! এতে আবার লোকের অহঙ্কার । (মাষ্টারকে) তোমার আগ্নিনে ঝড় মনে আছে ?

মাষ্টার । আজ্ঞা, হাঁ । তখন খুব কম বয়স—নয় দশ বছর বয়স—এক ঘরে একলা ঠাকুরদের ডাকছিলাম !

মাষ্টার বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছেন—ঠাকুর হঠাৎ আগ্নিনের ঝড়ের দিনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন কেন ? আমি যে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে একাকী এক ঘরে বসে ঈশ্বরকে প্রার্থনা করেছিলাম, ঠাকুর কি সব জানেন ও আমাকে মনে করাইয়া দিতেছেন ? উনি কি জন্মাবধি আমাকে গুরুরূপে রক্ষা করুছেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । দক্ষিণেশ্বরে অনেক বেলায়—তবে কি কি রান্না হ'ল । গাছ সব উল্টে পড়েছিল । দেখ যে ঘরে বাস, তারই এ দশা !

“তবে পূর্ণ জ্ঞান হলে মরা মারা এক বোধ হয় । মলেও কিছু মরে না,—মেরে ফেলেও কিছু মরে না ।* যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য । সেই একরূপে নিত্য একরূপে লীলা । লীলারূপ ভেঙ্গে গেলেও নিত্য আছেই । জল স্থির থাকলেও জল,—হেলে ডুলেও জল । হেলে দোলা থেমে গেলেও সেই জল ।

ঠাকুর বৈঠকখানা ঘরে ভক্তসঙ্গে আবার বসিয়াছেন । মহেন্দ্র মুখুয্যে, হরিবাবু, ছোট নরেন ও অন্যান্য অনেকগুলি ছোকরা ভক্ত বসিয়া আছেন । হরিবাবু একলা একলা থাকেন ও বেদান্ত চর্চা করেন । বয়স ২৩।২৪ হবে । বিবাহ করেন নাই । ঠাকুর তাঁহাকে বড় ভাল বাসেন । সর্বদা তাঁহার কাছে যাইতে বলেন । তিনি একলা একলা থাকতে চান বলিয়া হরিবাবু ঠাকুরের কাছে অধিক যাইতে পারেন না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হরিবাবুকে) । কিগো, তুমি অনেক দিন আস নাই ।

[হরিবাবুকে উপদেশ । অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ । বিজ্ঞান ।]

“তিনি একরূপে নিত্য, একরূপে লীলা । বেদান্তে কি আছে ?—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা । কিন্তু যতক্ষণ ‘ভক্তের আমি’ রেখে দিয়েছেন,

* ‘ন হন্ততে হন্তমানে শরীরে ।’ ‘নায়াং হন্তি ন হন্ততে ।’ গীতা ।

ততক্ষণ লীলাও সত্য । ‘আমি’ যখন তিনি পুছে ফেলবেন, তখন যা আছে তাই আছে । মুখে বলা যায় না । যতক্ষণ ‘আমি’ রেখে দিয়েছেন, ততক্ষণ সবই নিতে হবে । কলাগাছের খোল ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে মাজ পাওয়া যায় । কিন্তু খোল থাকলেই মাজ আছে । মাজ থাকলেই খোল আছে । খোলেরই মাজ, মাজেরই খোল । নিত্য বল্লেই লীলা আছে বুঝায় । লীলা বল্লেই নিত্য আছে বুঝায় ।

“তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন । যখন নিষ্ক্রিয় তখন তাঁহাকে ব্রহ্ম বলি । যখন সৃষ্টি করছেন, পালন করছেন, সংহার করছেন,—তখন তাঁকে শক্তি বলি । ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ জল স্থির থাকলেও জল, হেল্পে দুল্লোও জল ।

‘আমি’ বোধ যায় না । যতক্ষণ ‘আমি’ বোধ থাকে, ততক্ষণ জীব-জগৎ মিথ্যা বলবার যো নাই । বেলের খোলাটা আর বিচীগুলো ফেলে দিলে, সমস্ত বেলটার ওজন পাওয়া যায় না ।

“যে ইট, চূণ সুর্কি থেকে ছাদ, সেই ইট, চূণ সুর্কি থেকেই সিঁড়ি । যিনি ব্রহ্ম, তাঁর সত্তাতেই জীবজগৎ ।

“ভক্তেরা—বিজ্ঞানীরা—নিরাকার সাকার দুইই লয়,—অরূপ রূপ দুইই গ্রহণ করে । ভক্তি-হিমে ঐ জলেরই খানিকটা বরফ হয়ে যায় । আবার জ্ঞানসূর্য্য উদয় হলে ঐ বরফ গলে আবার যেমন জল তেমনি হয়।

[বিচারান্তে মনের নাশ ও ব্রহ্মজ্ঞান ।]

“যতক্ষণ মনের দ্বারা বিচার, ততক্ষণ নিত্যেতে পৌঁছান যায় না । মনের দ্বারা বিচার করতে গেলেই জগৎকে ছাড়বার যো নাই,—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ,—ইন্দ্রিয়ের এই সকল বিষয়কে ছাড়বার যো নাই । বিচার বন্ধ হলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান । এ মনের দ্বারা আত্মাকে জানা যায় না । আত্মার দ্বারাই আত্মাকে জানা যায় ! শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ আত্মা, একই ।

“দেখনা, একটা জিনিষ দেখতেই কতগুলো দরকার—চক্ষু দরকার, আলো দরকার, আবার মনের দরকার । এই তিনটার মধ্যে একটা বাদ দিলে তার দর্শন হয় না । এই মনের কাজ যতক্ষণ চলছে, ততক্ষণ

কেমন করে বলবে যে, জগৎ নাই, কি আমি নাই ?

মনের নাশ হলে, সঙ্কল্প বিকল্প চলে গেলে, সমাধি হয়—ব্রহ্মজ্ঞান হয় । কিন্তু সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নী,—নীতে অনেকক্ষণ থাকা যায় না ।

[ছোট নরেনকে উপদেশ । ঈশ্বর দর্শনের পর তাঁর সঙ্গে আলাপ ।]

ছোট নরেনের দিকে তাকাইয়া ঠাকুর বলিতেছেন, শুধু ঈশ্বর আছেন, বোধে বোধ করলে কি হবে ? ঈশ্বর দর্শন হলেই যে সব হয়ে গেল, তা নয় ।

“তাকে ঘরে আনতে হয়—আলাপ করতে হয় ।

“কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে ।

“রাজাকে কেউ কেউ দেখেছে । কিন্তু দু এক জন বাড়ীতে আনতে পারে, আর খাওয়াতে দাওয়াতে পারে :

মাষ্টার গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

পূর্বকথা—৬ কাশীধামে শিব ও সোনার অন্তর্পূর্ণা দর্শন ।

অদ্য ব্রহ্মাণ্ডকে শালগ্রামরূপে দর্শন ।

বেলা দশটা বাজিয়াছে ! ঠাকুর ভক্তসঙ্গে কথা কহিতেছেন । মাষ্টার গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন ও কাছে বসিলেন ।

ঠাকুর ভাবে পূর্ণ হইয়া কত কথাই বলিতেছেন । মাঝে মাঝে অতি শুষ্ক দর্শনকথা একটু একটু বলিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । সেজ বাবুর সঙ্গে যখন কাশী গিয়েছিলাম, মণিকর্ণিকার ঘাটের কাছ দিয়া আমাদের নৌকা যাচ্ছিল । হঠাৎ শিবদর্শন । আমি নৌকার ধারে এসে দাঁড়িয়ে সন্মাম্বিস্থ । মাঝিরা হৃদেকে বলতে লাগল—‘ধর ! ধর !’ পাছে পড়ে যাই । যেন জগতের যত গন্তীর নিয়ে সেই ঘাটে দাঁড়িয়ে আছেন । প্রথমে দেখলাম দূরে

বলরামমন্দিরে নরেন্দ্র, শারদা, গোপালের মা প্রভৃতি সঙ্গে । ২৫৭
দাঁড়িয়ে, তার পর কাছে আস্তে দেখলাম, তার পর আমার ভিতরে
মিলিয়ে গেলেন !

“ভাবে দেখলাম, সম্রাসী হাতে ধরে নিয়ে যাচ্ছে । একটি
ঠাকুরবাড়ীতে ঢুকলাম—সোনার অম্বপূর্ণা দর্শন হলো !

“তিনিই এই সব হয়েছেন,—কোন কোন জিনিসে বেশী প্রকাশ ।
(মাষ্টারাদির প্রতি) শালগ্রাম তোমরা বুঝি মান না—ইংলিশ-
ম্যান্‌রা মানে না । তা তোমরা মানো আর নাই মানো । সুলক্ষণ শাল-
গ্রাম,—বেশ চক্ৰ থাকবে,—গোমুখী, আর আর সব লক্ষণ থাকবে—
তা হলে ভগবানের পূজা হয় । মাষ্টার । আঞ্জা,
সুলক্ষণযুক্ত মানুষের ভিতর যেমন ঈশ্বরের বেশী প্রকাশ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । নরেন্দ্র আগে মনের ভুল বলত ; এখন সব মানছে ।
ঈশ্বর দর্শনের কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের ভাবাবস্থা হইয়াছে ।
ভাবসমাপ্তি । ভক্তেরা একদৃষ্টে চুপ করিয়া দেখিতেছেন ।
অনেক ক্ষণ পরে ভাব সম্বরণ করিলেন ও কথা কহিতে লাগিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । কি দেখ্‌ছিলাম ! ব্রহ্মা ও একটি
শালগ্রাম !—তার ভিতর তোমার দুটো চক্ষু দেখ্‌ছিলাম !

মাষ্টার ও ভক্তেরা এই অদ্ভুত, অশ্রুতপূর্ব দর্শনকথা অবাক্ হইয়া
শুনিতেন । এই সময় আর একটি ছোকরা ভক্ত, শারদা, প্রবেশ
করিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শারদার প্রতি) । (দক্ষিণেশ্বরে) যাস্ না কেন ?
কালিকাতায় যখন আসি, তখন আসিস্ না কেন ?

শারদা । আমি খবর পাই না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । এইবার তোকে খবর দিব । (মাষ্টারকে, সহাস্যে)
একখানা ফর্দ করো তো—ছোকরাদের । (মাষ্টার ও ভক্তদের হাস্য ।)

[পূর্ণের সংবাদ । নরেন্দ্র দর্শনে ঠাকুরের আনন্দ ।]

শারদা । বাড়ীতে বিয়ে দিতে চায় । ইনি (মাষ্টার) বিয়ের কথায়
আমাদের কত বার বকেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । এখন বিয়ে কেন ? (মাষ্টারের প্রতি) শারদার বেশ

অবস্থা হয়েছে । আগে সঙ্কোচ ভাব ছিল । যেন ছিপের ফাতা টেনে নিত । এখন মুখে আনন্দ এসেছে ।

ঠাকুর এক জন ভক্তকে বলিতেছেন, ‘তুমি একবার পূর্ণর জন্ম যাবে ?’

এইবার নরেন্দ্র আসিয়াছেন । ঠাকুর নরেন্দ্রকে জল খাওয়াইতে বলিলেন । নরেন্দ্রকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন । নরেন্দ্রকে খাওয়াইয়া যেন সাক্ষাৎ নারায়ণের সেবা করিতেছেন । গায়ে হাত বুলাইয়া আদর করিতেছেন, যেন সূক্ষ্মভাবে হাত পা টিপিতেছেন ! গোপালের মা (‘কামারহাটীর বামনী’) ঘরের মধ্যে আসিলেন । ঠাকুর বলরামকে কামরাহাটীতে লোক পাঠাইয়া গোপালের মাকে আনিতে বলিয়াছিলেন । তাই তিনি আসিয়াছেন । গোপালের মা ঘরের মধ্যে আসিয়াই বলিতেছেন, ‘আমার আনন্দে চক্ষে জল পড়ছে !’ এই বলিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া নমস্কার করিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । সে কি গো ! এই তুমি আমাকে গোপাল বল,—
আবার নমস্কার !

“যাও বাড়ীর ভিতর গিয়ে একটা বেগুন রাঁধ গে—খুব ফোঁড়ন দিও—যেন এখান পর্যন্ত গন্ধ আসে । (সকলের হাস্য) ।

গোপালের মা । এঁরা (বাড়ীর লোকেরা) কি মনে করবে ।

গোপালের মা কি ভাবিতেছেন যে, এখানে নূতন এসেছি,—যদি আলাদা রাঁধ’ব বলে বাড়ীর লোকেরা কিছু মনে করে !

বাড়ীর ভিতর যাইবার আগে তিনি নরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কাতর স্বরে বলিতেছেন, ‘বাবা ! আমার কি হয়েছে, না বাকি আছে ?’

আজ রথযাত্রা । শ্রীশ্রীজগন্নাথের ভোগরাগাদি হইতে একটু দেরী হইয়াছে । এইবার ঠাকুরের সেবা হইবে । অন্তঃপুরে যাইতেছেন । মেয়ে ভক্তেরা ব্যাকুল হইয়া আছেন,—তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিবেন ।

ঠাকুরের অনেক স্ত্রীলোক ভক্ত ছিলেন । কিন্তু তিনি তাঁহাদের কথা পুরুষ ভক্তদের কাছে বেশী বলিতেন না । কেহ মেয়ে ভক্তদের কাছে যাতায়াত করিলে, বলিতেন, ‘বেশী যাস্ নাই, পড়ে যাবি !’ কখন কখন বলিতেন, ‘যদি স্ত্রীলোক ভক্তিতে গড়াগড়ি যায়, তবুও তার কাছে

যাতায়াত করবে না ।’ মেয়ে ভক্তেরা আলাদা থাকবে—পুরুষভক্তেরা আলাদা থাকবে । তবেই উভয়ের মঙ্গল । আবার বলিতেন, “মেয়ে-ভক্তদের গোপাল ভাব—‘বাৎসল্য ভাব’ বেশী ভাল নয় । ঐ ‘বাৎসল্য’ থেকেই আবার একদিন ‘তাচ্ছল্য’ হয় !”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

বলরামের রথযাত্রা । নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে—সঙ্কীৰ্ত্তনানন্দে ।]

বেলা ১টা হইয়াছে । ঠাকুর আহারান্তে আবার বৈঠকখানা ঘরে আসিয়া ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন । একটী ভক্ত পূর্ণকে ডাকিয়া আনিয়াছেন । ঠাকুর মহানন্দে মাফটারকে বলিতেছেন, ‘এই গো ! পূর্ণ এসেছে !’ নরেন্দ্র, ছোট নরেন, নারা’ণ, হরিপদ ও অন্যান্য ভক্তেরা কাছে বসিয়া আছেন ও ঠাকুরের সহিত কথা কহিতেছেন ।

[স্বাধীন ইচ্ছা Free Will ও ছোট নরেন । নরেন্দ্রের গান ।]

ছোট নরেন । আচ্ছা, আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা Free Will আছে কি না ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমি কে, খোঁজ দেখি । ‘আমি’ খুঁজতে খুজতে তিনি বেরিয়ে পড়েন ! ‘আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী’ । চীনের পুতুল দোকানে চিঠি হাতে করে যায়, শুনছে ! ঐশ্বর্যই কৰ্ত্তা । আপনাকে অকৰ্ত্তা জেনে, কৰ্ত্তার ন্যায় কাজ করো ।

“যতক্ষণ উপাধি, ততক্ষণ অজ্ঞান ; আমি পণ্ডিত, আমি জ্ঞানী, আমি ধনী, আমি মানী, আমি কৰ্ত্তা, বাবা, গুরু,—এ সব অজ্ঞান থেকে হয় । ‘আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী’—এই জ্ঞান । অন্য সব উপাধি চলে গেল । কাঠ পোড়া শেষ হলে আর শব্দ থাকে না—উত্তাপও থাকে না । সব ঠাণ্ডা ! —শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রকে) । একটু গা না ।

নরেন্দ্র । ঘরে যাই—অনেক কাজ আছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তা বাছা, আমাদের কথা শুনবে কেন ? ‘যার আছে

কানে সোনা, তার কথা আনা আনা । যার আছে পৌঁদে ট্যানা, তার
কথা কেউ শোনে না !’ (সকলের হাস্য) ।

“তুমি গুহদের বাগানে যেতে পারো । প্রায় শুনি, আজ কোথায়, না
গুহদের বাগানে !—এ কথা বলতুম না, তা তুই কেঁড়ে লি করলি —

নরেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ চুপ করে আছেন । বলছেন, যন্ত্র নাই শুধু গান—
শ্রীরামকৃষ্ণ । আমাদের বাছা যেমন অবস্থা !—এইতে পারো তো
গাও । তাতে বলরামের বন্দোবস্ত !

“বলরাম বলে, ‘আপনি নৌকা করে আসবেন,—একান্ত না হয় গাড়ী
করে আসবেন ।’ (সকলের হাস্য) । খঁটাট দিয়েছে । আজ তাই বৈকালে
নাচিয়ে নেবে (হাস্য) । এখান থেকে এক দিন গাড়ী করে দিচ্ছিলো—৮০
ভাড়া ;—আমি বললাম, বার আনায় দক্ষিণেশ্বরে যাবে ? তা বলে, ‘ও
অমন হয়’ । গাড়ী রাস্তায় যেতে যেতে একধার ভেঙ্গে পড়ে গেল !
(সকলের উচ্চহাস্য) । আবার ঘোড়া মাঝে একবারে থেমে যায় !
কোনমতে চলে না ; গাড়োয়ান এক এক বার খুব মারে, আর এক এক
বার দৌড়ায় ! (উচ্চ হাস্য) । তার পর রাম খোল বাজাবে—আর
আমরা নাচবো—রামের তালবোধ নাই (সকলের হাস্য) । বলরামের
ভাব,—আপনারা গাও, নাচো, আনন্দ করো ! (সকলের হাস্য) ।

ভক্তেরা বাটী হইতে আহাতি করিয়া ক্রমে আসিতেছেন ।

মহেন্দ্র মুখ্যোকে দূর হইতে প্রণাম করিতে দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে
প্রণাম করিতেছেন—আবার সেলাম করিতেছেন । কাছের একটি ছোকরা
ভক্তকে বলিতেছেন, ওকে বলনা, ‘সেলাম করলে’ ;—ও বড় অলকট
অলকট করে । (সকলের হাস্য) । গৃহস্থ ভক্তেরা অনেকে নিজেদের
বাটীর পরিবারদের আনিয়াছেন ;—তাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিবেন
ও রথের সম্মুখে কীর্ত্তনানন্দ দেখিবেন । রাম, গিরিশ প্রভৃতি ভক্তেরা
ক্রমে ক্রমে আসিয়াছেন । ছোকরা ভক্তেরা অনেকে আসিয়াছেন ।

এইবার নরেন্দ্র গান গাইতেছেন—

গান— **কত দিনে হবে সে প্রেমসংগার ।**

হয়ে পূর্ণকাম বোলবো হরিনাম, নয়নে বহিবে প্রেম-অশ্রুধার ॥

গান— নিবিড় আধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি ।

তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী ॥

বলরাম আজ কীৰ্ত্তনের বন্দোবস্ত করিয়াছেন,—বৈষ্ণবচরণ ও বেনোয়ারীর কীৰ্ত্তন । এইবার বৈষ্ণবচরণ গাহিতেছেন—শ্রীদুর্গানাম জপ সদা রসনা আমার । দুৰ্গমে শ্রীদুর্গা বিনে কে করে নিস্তার ॥

গান একটু শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ ! দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ ;—ছোট নরেন ধরিয়া আছেন । সহাস্যবদন । ক্রমে সব স্থির ! একঘর ভক্তেরা অবাক হইয়া দেখিতেছেন । মেয়ে ভক্তেরা চিকের মধ্য হইতে দেখিতেছেন । সাক্ষাৎ নারায়ণ বুঝি দেহ ধারণ করিয়া ভক্তের জন্ম আসিয়াছেন ! কি করে ঈশ্বরকে ভালবাসতে হয়, তাই বুঝি শিখাতে এসেছেন !

নাম করিতে করিতে অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভাঙ হইল । ঠাকুর আসন গ্রহণ করিলে, বৈষ্ণবচরণ আবার গান ধরিলেন—

গান— হরি হরি বলরে বীণে !

গান— বিফলে দিন যায় রে বীণে, শ্রীহরির সাধনা বিনে ।

এইবার আর এক কীৰ্ত্তনীয়া বেনোয়ারী রূপ গাইতেছেন । কিন্তু সদাই গান গাহিতে গাহিতে ‘আহা ! আহা !’ বলিয়া ভুমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন । তাহাতে শ্রোতার কেহ হাসে, কেহ বিরক্ত হয় ।

অপরাক্ত হইয়াছে । ইতিমধ্যে বারাণ্ডায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেই ছোট রথখানি, ধ্বজ পতাকা দিয়া সুসজ্জিত করিয়া আনা হইয়াছে । শ্রীশ্রীজগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম চন্দনচর্চিত ও বসন ভূষণ ও পুষ্পমালা দ্বারা সুশোভিত হইয়াছেন । ঠাকুর বেনোয়ারীর কীৰ্ত্তন ফেলিয়া বারাণ্ডায় রথাগ্রে গমন করিলেন,—ভক্তেরাও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন । রথের রজু ধরিয়া একটু টানিলেন—তৎপরে রথাগ্রে ভক্তসঙ্গে নৃত্য ও কীৰ্ত্তন করিতেছেন । অন্যান্য গানের সঙ্গে ঠাকুর পদ ধরিলেন—

গান— যাদের হরি বলিতে নয়ন বুঝে, তারা তারা দুভাই এসেছে রে !

যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে, তারা তারা দুভাই এসেছে রে !

আবার—নদে টলমল টলমল করে, গৌরপ্রেমের হিল্লোলে রে ।

ছোট বারাণ্ডাতে রথের সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন ও নৃত্য হইতেছে । উচ্চ সঙ্কীৰ্তন ও খোলের শব্দ শুনিয়া বাহিরের লোক অনেকে বারাণ্ডা মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে । ঠাকুর হরিপ্রেমে মাতোয়ারা ! ভক্তেরাও সঙ্গে সঙ্গে প্রেমোন্মত্ত হইয়া নাচিতেছেন !

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

[নরেন্দ্রের গান । ঠাকুরের ভাবাবেশে নৃত্য ।]

রথাগ্রে কীর্তন ও নৃত্যের পর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন । মণি প্রভৃতি ভক্তেরা তাঁহার পদসেবা করিতেছেন ।

নরেন্দ্র ভাবে পূর্ণ হইয়া তানপুরা লইয়া আবার গান গাহিতেছেন ।

গান— এসো মা এসো মা, ও হৃদয় রমা, পরাণপুতলি গো,
হৃদয়-আসনে, হও মা আসীন, নিরখি তোমারে গো ।

গান— মা স্বং হি তারা, তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা । আমি জানি
গো ও দীনদয়াময়ী, তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা ॥ তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী,
তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা । তুমি অকূলের ত্রাণকর্ত্রী, সদাশিবের মনোরমা ॥
তুমি জলে তুমি স্থলে, তুমি আচমূলে গো মা । তুমি সর্বঘণ্টে অর্ঘ্যপুটে,
সাকার আকার নিরাকারা ॥

গান— তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা ।
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা ॥

একজন ভক্ত নরেন্দ্রকে বলিতেছেন, তুমি ঐ গানটা গাইবে ?—

অস্তুরে জাগিছো গো মা অস্তুরযামিনী !

শ্রীরামকৃষ্ণ । দূর । এখন ও সব গান কি ! এখন আনন্দের গান—
“শ্যামা সুধা-তরঙ্গিনী ।”

নরেন্দ্র গাইতেছেন—কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা, সুধাতরঙ্গিনী !

তুমি রঙ্গে ভঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দাও জননী ॥

ভাবোন্মত্ত হইয়া নরেন্দ্র বার বার গাহিতে লাগিলেন

‘কভু কমলে কমলে থাকো মা পূর্ণব্রহ্মসনাতনী ।’

ঠাকুরও প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন,—ও গাইতেছেন,
ওমা পূর্ণব্রহ্মসনাতনী ! অনেকক্ষণ নৃত্যের পর ঠাকুর আবার
আসন গ্রহণ করিলেন । নরেন্দ্র ভাবাবিষ্ট হইয়া সাক্ষাৎ নয়নে গান গাহিতে
ছেন দেখিয়া ঠাকুর অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ।

রাত্রি প্রায় নয়টা হইবে, এখনও ভক্তসঙ্গে ঠাকুর বসিয়া আছেন ।
আবার বৈষ্ণবচরণের গান শুনিতেছেন ।

গান—শ্রীগোরাঙ্গ সুন্দর নব নটবর তপত কাঞ্চন কায় ।

গান—চিনিব কেমনে হে তোমায় (হরি) । ওহে বন্ধুরায়, ভুলে
আছ মথুরায় ॥ হাতীচড়া জোড়া পরা, ভুলেছ কি ধেনুচরা, ব্রজের
মাখন চুরি করা, মনে কিছু হয় ।

রাত্রি দশটা এগারটা । ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আচ্ছা, আর সববাই বাড়ী যাও । (নরেন্দ্র ও
ছোট নরেনকে দেখাইয়া) এরা দুজন থাকলেই হ'লো । (গিরিশের
প্রতি) তুমি কি বাড়ী গিয়ে থাকবে ? থাকো তো খানিক থাক ।
তামাক !—ওহ বলরামের চাকরও তেমনি । ডেকে দেখনা—দেবেনা ।
(সকলের হাস্য) । কিন্তু তুমি তামাক খেয়ে যেও ।

শ্রীযুক্ত গিরিশের সঙ্গে একটি চসমাপরা বন্ধু আসিয়াছেন । তিনি
সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া চলিয়া গেলেন । ঠাকুর গিরিশকে বলিতেছেন—
“তোমাকে আর হরে প্যালাকে বলি, জোর করে কারুকে নিয়ে এসো
না,—সমস্ত না হলে হয় না ।”

একটী ভক্ত প্রণাম করিলেন । সঙ্গে একটী ছেলে । ঠাকুর
সঙ্গেহে কহিতেছেন, ‘তবে তুমি এসো,—আবার উটি সঙ্গে ।’ নরেন্দ্র,
ছোট নরেন, আর দু একটী ভক্ত, আরও একটু থাকিয়া বাটী ফিরিলেন ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

সুপ্রভাত ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ । মধুর নৃত্য ও নামকীর্তন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ বৈঠকখানার পশ্চিম দিকের ছোট ঘরে শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন । রাত ৪টা । ঘরের দক্ষিণে বারাণ্ডা, তাহাতে এক খানি টুল পাতা আছে । তাহার উপর মাফটার বসিয়া আছেন ।

কিয়ৎক্ষণ পরেই ঠাকুর বারাণ্ডায় আসিলেন । মাফটার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন । সংক্রান্তি, বুধবার, ৩২শে আষাঢ়, ১৫ই জুলাই ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমি আর একবার উঠেছিলাম । আচ্ছা, সকাল বেলা কি যাবো ?

মাফটার । আজ্ঞা, সকাল বেলায় ঢেউ একটু কম থাকে ।

ভোর হইয়াছে । এখনও ভক্তেরা আসিয়া জুটেন নাই । ঠাকুর মুখ ধুইয়া মধুর স্বরে নাম করিতেছেন । পশ্চিমের ঘরটির উত্তর দরোজার কাছে দাঁড়াইয়া নাম করিতেছেন । কাছে মাফটার । কিয়ৎক্ষণ পরে অনতিদূরে গোপালের মা আসিয়া দাঁড়াইলেন । অন্তঃপুরের দ্বারের অন্তরালে ২১টী স্ত্রীলোক ভক্ত আসিয়া ঠাকুরকে দেখিতেছেন । যেন শ্রীবৃন্দাবনের গোপীরা শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিতেছেন ! অথবা নবদ্বীপের ভক্ত মহিলারা প্রেমোন্মত্ত শ্রীগোরাঙ্গকে আড়াল হইতে দেখিতেছেন !

রামনাম করিয়া ঠাকুর কৃষ্ণনাম করিতেছেন । কৃষ্ণ কৃষ্ণ ! গোপীকৃষ্ণ ! গোপী ! গোপী ! রাখালজীবন কৃষ্ণ !—নন্দনন্দন কৃষ্ণ ! গোবিন্দ ! গোবিন্দ !

আবার শ্রীগোরাঙ্গের নাম করিতেছেন—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ । হরেকৃষ্ণ হরে রাম, রাধে গোবিন্দ !

আবার বলিতেছেন আলেশ নিরঞ্জন ! নিরঞ্জন বলিয়া কাদিতেছেন । তাঁহার কান্না দেখিয়া ও কাতর স্বর শুনিয়া, কাছে দণ্ডায়মান ভক্তেরা কাদিতেছেন । তিনি কাদিতেছেন আর বলিতেছেন, নিরঞ্জন ! আয় বাপ—থারে নেরে—কবে তোরে খাইয়ে জন্ম সফল কর্বো ! তুই আমার জন্ম দেহ ধারণ করে নররূপে এসেছিস্ ।

জগন্নাথের কাছে আর্তি করিতেছেন—জগন্নাথ ! জগবন্ধু !
দীনবন্ধু ! আমি তো জগৎছাড়া নই নাথ, আমায় দয়া কর !

প্রেমোন্মত্ত হইয়া গাহিতেছেন—‘উড়িষ্যা জগন্নাথ ভজ বিরাজ জি !’

এইবার নারায়ণের নাম কীর্তন করিতে করিতে নাচিতেছেন ও
গাহিতেছেন,—শ্রীমন্নারায়ণ ! শ্রীমন্নারায়ণ ! নারায়ণ ! নারায়ণ !

নাচিতে নাচিতে আবার গান গাহিতেছেন—

গান— হলাম যার জন্ম পাগল, তারে কই পেলাম সই ।

ব্রহ্মা পাগল বিষ্ণু পাগল আর পাগল শিব,

তিন পাগলে যুক্তি করে ভাঙ্গলে নবদ্বীপ ।

আর এক পাগল দেখে এলাম বৃন্দাবনের মাঠে,

রাইকে রাজা সাজায়ে, আপনি কোটাল সাজে !

এইবার ঠাকুর ভক্তসঙ্গে ছোট ঘরটিতে বসিয়াছেন । দিগন্তর !
যেন পাঁচ বৎসরের বালক ! মাফটার, বলরাম আরও দুই একটা ভক্ত
বসিয়া আছেন ।

[রূপদর্শন কখন ? গুহ্য কথা । শুদ্ধ আত্মা ছোকরাতে নারায়ণ দর্শন ।]

(রামলালা । নিরঞ্জন, পূর্ণ, নরেন্দ্র, বেলঘরের তারক, ছোট নরেন ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করা যায় । যখন উপাধি সব
চলে যায়,—বিচার বন্ধ হয়ে যায়,—তখন দর্শন । তখন মানুষ অবাক
সমাধিস্থ হয় ! থিয়েটারে গিয়ে বসে লোকে কত গল্প করে,—এ গল্প
সে গল্প । যাই পর্দা উঠে যায় সব গল্প টল্ল বন্ধ হয়ে যায় । যা দেখে,
তাইতেই মগ্ন হয়ে যায় !

“তোমাদের অতি গুহ্য কথা বলছি । কেন পূর্ণ, নরেন্দ্র,
এদের সব এত ভালবাসি । জগন্নাথের সঙ্গে মধুর ভাবে আলিঙ্গন কর্তে
গিয়ে হাত ভেঙ্গে গেল । জানিয়ে দিলে, ‘তুমি শরীর ধারণ করেছ
—এখন নররূপের সঙ্গে সখা, বাৎসল্য এই সব ভাব লয়ে থাকো ।’

“রামলালার উপর যা যা ভাব হ’তো, তাই পূর্ণাদিকে দেখে
হচ্ছে ! রামলালাকে নাওয়াতাম, খাওয়াতাম, শোয়াতাম,—সঙ্গে সঙ্গে
নিয়ে বেড়াতাম,—রামলালার জন্ম বসে বসে কাঁদতাম ; ঠিক এই সব

ছেলেদের নিয়ে তাই হ'য়েছে ! দেখ না নিরঞ্জন । কিছুতেই—লিপ্ত নয় । নিজের টাকা দিয়ে গরীবদের ডাক্তারখানায় নিয়ে যায় । বিবাহের কথায় বলে, 'বাপরে ! ও বিশালক্ষ্মীর দ !' ওকে দেখি যে, একটা জ্যোতির উপর বসে রয়েছে !

“পূর্ণ উঁচু সাকার ঘর—বিষ্ণুর অংশে জন্ম । আহা কি অনুরাগ !

(মাষ্টারের প্রতি) “দেখলে না,—তোমার দিকে চাইতে লাগলো—যেন গুরুভাইএর উপর—যেন ইনি আমার আপনার লোক ! আর একবার দেখা কর'বে বলেছে । বলে কাপ্তানের ওখানে দেখা হবে ।

[নরেন্দ্রের কত গুণ : ছোট নরেনের গুণ ।]

“নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর—নিরাকারের ঘর । পুরুষের সত্তা । এতো ভক্ত আসছে, এর মত একটি নাই ।

“এক একবার বসে বসে খতাই । তা দেখি, অণু পদ্ম কারু দশদল, কারু ষোড়শদল, কারু শতদল ; কিন্তু পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল !

“অন্যেরা কলসী, ঘটী এসব হ'তে পারে ;—নরেন্দ্র জালা !

“ডোবা পুষ্করিণী মধ্যে নরেন্দ্র বড় দিঘী !—যেমন হালদার পুকুর ।

“মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙাচক্ষু বড় রুই, আর সব নানা রকম মাছ—পোনা কাঠী বাটা, এই সব ।

“খুব আধার,—অনেক জিনিষ ধরে । বড় ফুটোওলা বাঁশ ।

“নরেন্দ্র কিছুর বশ নয় । ও আসক্তি, ইন্দ্রিয়-সুখের বশ নয় । পুরুষ পায়রা । পুরুষ পায়রার ঠোঁট ধরলে ঠোঁট টেনে ছিনিয়ে লয়,—মাদী পায়রা চুপ কবে থাকে ।

“বেলঘরের তারককে মৃগেল বলা যায় ।

“নরেন্দ্র পুরুষ, গাড়ীতে তাই ডানদিকে বসে । ভবনাথের মেদী ভাব. ওকে তাই অন্যদিকে বসতে দিই ।

‘নরেন্দ্র সভায় থাকলে আমার বল ।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মুখ্যো আসিয়া প্রণাম করিলেন । বেলা আটটা হইবে । হরিপদ, তুলসীরাম, ক্রমে আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন । বাবুরামের জ্বর হইয়াছে,—আসিতে পারেন নাই ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারাদির প্রতি) । ছোট নরেন এলো না ?
মনে করেছে, আমি চলে গেছি । (মুখুয্যের প্রতি) কি আশ্চর্য্য ! সে
(ছোট নরেন) ছেলেবেলায়, স্কুল থেকে এসে, ঈশ্বরের জন্ম
কাঁদতো ! (ঈশ্বরের জন্ম) কান্না কি কমেতে হয় !

“আবার বুদ্ধি খুব ! বাঁশের মধ্যে বড় ফুটো ওলা বাঁশ !

“আর আমার উপর সব মনটা । গিরিশ ঘোষ বলে, নবগোপালের
বাড়ী যেদিন কীর্তন হয়েছিল, সেদিন (ছোট নরেন) গিছিল,—কিন্তু ‘তিনি
কই’ বলে আর হুঁস নাই,—লোকের গায়ের উপর দিয়েই চলে যায় !

“আবার ভয় নাই—যে বাড়ীতে বকবে । দক্ষিণেশ্বরে তিন রাত্রি
সমানে থাকে ।

— — —

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

ভক্তিয়োগের গূঢ় রহস্য । জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় ।

[মুখুয্যে, হরিবাবু, পূর্ণ, নিরঞ্জন, মাষ্টার, বলরাম ।]

মুখুয্যে । হরি (বাগবাজারের হরিবাবু) আপনার কালকের কথা
শুনে অবাক ! বলে ‘সাংখ্যদর্শনে, পাতঞ্জলে, বেদান্তে—ও সব কথা
আছে । ইনি সামান্য নন !’

শ্রীরামকৃষ্ণ । কৈ, আমি সাংখ্য, বেদান্ত পড়ি নাই ।

“পূর্ণ জ্ঞান আর পূর্ণ ভক্তি একই । ‘নেতি’ ‘নেতি’ করে বিচারের
শেষ হলে, ব্রহ্মজ্ঞান ।—তার পর যা ত্যাগ করে গিছিল, তাই আবার
গ্রহণ । ছাদে উঠবার সময় সাবধানে উঠতে হয় । তার পর দেখে যে,
ছাদও যে জিনিষে—ইট চূণ সুরকি—সিঁড়ি ও সেই জিনিষে তৈয়ারী !

“যার উচ্চ বোধ আছে, তার নীচ বোধ আছে । জ্ঞানের পর,
উপর নীচে এক বোধ হয় ।

“প্রহ্লাদের যখন তত্ত্বজ্ঞান হ’ত, সোহহং হয়ে থাকতেন । যখন
দেহবুদ্ধি আস্ত, ‘দাসোহহম্’, ‘আমি তোমার দাস’, এই ভাব আস্ত ।

“হনুমানেরও কখনও ‘সোহহম্’ কখন ‘দাস আমি’ কখন ‘আমি তোমার অংশ’ এই ভাব আস্ত ।

“কেন ভক্তি নিষেধ থাকে ?—তা না হলে মানুষ কি নিষেধ থাকে ! কি নিষেধ দিন কাটায়ে !

‘আমি’ তো মাঝার নয়, ‘আমি’ ষড়্ থাকতে সোহহং হয় না । সমাধিস্থ হলে ‘আমি’ পুছে যায়,—তখন যা আছে তাই । রাম প্রসাদ বলে, ‘তার পর আমি ভাল কি তুমি ভাল, তা তুমিই জানবে ।

“যতক্ষণ ‘আমি’ রয়েছে, ততক্ষণ ভক্তের মত থাকাই ভাল ! ‘আমি ভগবান্’ এটি ভাল না । হে জীব ভক্তবৎ নচ কৃষ্ণবৎ !—তবে যদি নিজে টেনে লন, তবে আলাদা কথা । যেমন মনিব চাকরকে ভাল বেসে বলছে, আয় আয় কাছে বোস্, আমিও যা তুইও তা ।

“গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউয়ের গঙ্গা হয় না !

“শিবের দুই অবস্থা । যখন আত্মারাম তখন সোহহং অবস্থা,—যোগেতে সব স্থির । যখন ‘আমি’ একটি আলাদা বোধ থাকে, তখন ‘রাম ! রাম !’ করে নৃত্য ।

“ঘাঁর অটল আছে, তাঁর টলও আছে !

“এই তুমি স্থির । আবার তুমিই কিছুক্ষণ পরে কাজ করবে ।

“জ্ঞান আর ভক্তি একই জিনিস ।—তবে এক জন বলছে ‘জল,’ আর এক জন ‘জলের খানিকটা চাপ’ ।

[দুই সমাধি । সমাধির প্রতিবন্ধক—কামিনীকাঞ্চন ।]

“সমাধি মোটামুটি দুই রকম ।—জ্ঞানের পথে, বিচারকর্তে কর্তে অহং নাশের পর যে সমাধি, তাকে স্থির সমাধি বা জড় সমাধি (নির্বিকল্প সমাধি) বলে । ভক্তিপথের সমাধিকে ভাব সমাধি বলে ! এতে সন্তোগের জন্ম,—আনন্দের জন্ম, রেখার মত একটু অহং থাকে । কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি থাকলে এ সুর ধারণা হয় না ।

“কেদারকে বল্লুম, কামিনীকাঞ্চনে মন থাকলে হবে না । ইচ্ছা হ’ল,

একবার তার বুকে হাত বুলিয়ে দি,—কিন্তু পারলাম না । ভিতরে অঙ্কট বন্ধট ! ঘরে বিষ্ঠার গন্ধ ঢুকতে পারলাম না । যেমন স্বয়ম্ভু লিঙ্গ কাশী পর্য্যন্ত জড় । সংসারে আসক্তি,—কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি,—থাকলে হ'বে না ।

“ছোকরাদের ভিতর এখনও কামিনী কাঞ্চন ঢোকে নাই ; তাইত ওদের অত ভালবাসি । হাজরা বলে, ‘ধনীর ছেলে দেখে,—সুন্দর ছেলে দেখে,—তুমি ভাল বাস’ । তা যদি হয়, হরীশ, নোটো, নরেন্দ্র,—এদের ভালবাসি কেন ? নরেন্দ্রের ভাত খুন দে খাবার পয়সা জোটে না !

“ছোকরাদের ভিতর বিষয়বুদ্ধি এখনও ঢোকে নাই । তাই অন্তর অত শুদ্ধ ।

“আর অনেকেই নিত্যসিদ্ধ । জন্ম থেকেই ঈশ্বরের দিকে টান । যেমন বাগান একটা কিনেছ । পরিষ্কার কর্তে কর্তে এক জায়গায়, বসানো জলের কল পাওয়া গেল । একবারে জল কল কল করে বেরুচ্ছে !

[পূর্ণ ও নিরঞ্জন ! মাতৃসেবা । বৈষ্ণবদের মহোৎসবের ভাব ।]

বলরাম । মহাশয়, সংসার মিথ্যা, একবারে জ্ঞান, পূর্ণের কেমন করে হ'ল ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । জন্মান্তরীণ । পূর্ব পূর্ব জন্মে সব করা আছে । শরীরই ছোট হয় আবার বৃদ্ধ হয়—আত্মা সেইরূপ নয় ।

“ওদের কেমন জান,—ফল আগে তার পর ফুল । আগে দর্শন,—তার পর গুণ মহিমা শ্রবণ ; তার পর মিলন !

“নিরঞ্জনকে দেখ—লেনা দেনা নাই !—যখন ডাক পড়বে যেতে পারবে । তবে মতক্ষণ মা আছে, মাকে দেখতে হবে । আমি মাকে ফুল চন্দন দিয়ে পূজা কর্তাম । সেই জগতের মা-ই মা হ'য়ে এসেছেন । তাই কারু শ্রদ্ধ,—শেষে ইচ্ছের পূজা হ'য়ে পড়ে । কেউ মরে গেলে বৈষ্ণবদের মহোৎসব হয়, তারও এই ভাব ।

“মতক্ষণ নিজের শরীরের খপল আছে ততক্ষণ মার খপল নিতে হবে । তাই হাজরাকে বলি, নিজের কাশি হ'লে মিছরি মরিচ কর্তে হয়, মরিচ লবনের জোগাড় কর্তে হয় ;

—যতক্ষণ এসব করতে হয়, ততক্ষণ মার খপরও নিতে হয় ।

“তবে যখন নিজের শরীরের খপর নিতে পাচ্ছি না,—তখন অগ্র কথা । তখন ঈশ্বরই সব ভার লন ।

“নাবালক নিজের ভার নিতে পারে না । তাই তার (Guardian) অছি হয় । নাবালকের অবস্থা,—যেমন চৈতন্য দেবের অবস্থা !
মাষ্টার গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন ।

নবম পরিচ্ছেদ ।

শ্রীরামকৃষ্ণের কুঠী । পূর্বকথা—ঠাকুরের ঈশ্বরদর্শন ।

রামলক্ষ্মণ ও পার্শ্ব-সারথি দর্শন । ন্যাঙটা পরমহংস মূর্তি ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে সেই ছোট ঘরে কথা কহিতেছেন । মহেন্দ্র মুখুয্যে, বলরাম, তুলসী, হরিপদ, গিরিশ প্রভৃতি ভক্তেরা বসিয়া আছেন । গিরিশ ঠাকুরের কৃপা পাইয়া সাত আট মাস যাতায়াত করিতেছেন । মাষ্টার ইতিমধ্যে গঙ্গা স্নান করিয়া ফিরিয়াছেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কাছে বসিয়াছেন । ঠাকুর তাঁহার অদ্ভুত ঈশ্বরদর্শনকথা একটু একটু বলিতেছেন ।

“কালী ঘরে এক দিন ন্যাঙটা আর হলধারী অধ্যাত্ম (রামায়ণ) পড়ছে । হঠাৎ দেখলাম নদী, তার পাশে বন, সবুজ রং গাছপালা,—রাম লক্ষ্মণ জাগিয়া পরা, চলে যাচ্ছেন ! এক দিন কুঠীর সম্মুখে অর্জুনের রথ দেখলাম !—সারথির বেশে ঠাকুর বসে আছেন । সে এখনও মনে আছে ।

“আর একদিন, দেশে কীর্তন হচ্ছে,—সম্মুখে পৌরীন্দ্র মূর্তি !

“একজন ন্যাঙটা সঙ্গে সঙ্গে থাকত—তার ধনে হাত দিয়ে ফচ্কিমি করতুম । তখন খুব হাসতুম । এ ন্যাঙটা মূর্তি আমারই ভিতর থেকে বেরত । পরমহংস মূর্তি,—বালকের শায় ।

• “ঈশ্বরীয় রূপ কত যে দর্শন হয়েছে, তা বলা যায় না । সেই সময়ে

বড় পেটের ব্যাম । ঐ সকল অবস্থায় পেটের ব্যাম বড় বেড়ে যে'ত ।
তাই রূপ দেখলে শেষে থুথু কর্তুম —কিন্তু পেছনে গিয়ে ভূতে পাওয়ার
মত, আবার আমায় ধর'ত ! ভাবে বিভোর হ'য়ে থাকতাম, দিন রাত কোথা
দিয়ে যে'ত । তার পরদিন পেট ধুয়ে ভাব বেরুত ! (হাস্য)

গিরিশ (সহাস্যে) । আপনার কুষ্ঠী দেখছি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) । দ্বিতীয়ার চাঁদে জন্ম । আর রবি চন্দ্র বুধ,
—এ ছাড়া আর কিছু বড় একটা নাই । গিরিশ । কুন্ত রাশি ।
ককট আর বৃষে রাম আর কৃষ্ণ ;—সিংহে চৈতন্যদেব ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । দুটি সাধ ছিল ।—প্রথম ভক্তের রাজা
হন ; দ্বিতীয়, স্ত্রুটকে সাধু হব না ।

[শ্রীরামকৃষ্ণের কুষ্ঠী । ঠাকুরের সাধন কেন । ব্রহ্মযোনি দর্শন ।]

গিরিশ (সহাস্যে) । আপনার সাধন করা কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) ভগবতী শিবের জন্ম অনেক কঠোর সাধন
করেছিলেন,—পঞ্চতপা, শীতকালে জলে গা বুড়িয়ে থাকা, সূর্যের
দিকে এক দৃষ্টি চেয়ে থাকা !

“স্বয়ং কৃষ্ণ রাধাযন্ত্র নিয়ে অনেক সাধন করে ছিলেন । যন্ত্র ব্রহ্ম
যোনি,—তঁারই পূজা, ধ্যান ! এই ব্রহ্মযোনি থেকে কোটি কোটি
ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি হচ্ছে ।

“অতিগুহ্য কথা ! বেলতলায় দর্শন হতো,—লক্ লক্ কোরতো !

[পূর্বকথা—বেলতলায় তন্ত্রের সাধন । বামনীর যোগাড় ।]

“বেলতলায় অনেক তন্ত্রের সাধন হয়েছিল । মড়ার মাথা নিয়ে ।
আবার * * আসন । বামনী সব যোগাড় করতো ।

(হরিপদর দিকে অগ্রসর হইয়া) “সেই অবস্থায় ছেলেদের ধন, ফুল
চন্দন দিয়ে পূজা না করলে, থাকতে পারতাম না”

“আর একটি অবস্থা হ'ত । যে দিন অহংকার করতুম তার পর দিনই
অসুখ হ'ত ।

মাষ্টার শ্রীমুখনিঃসৃত অশ্রুতপূর্বক বেদান্তবাক্য শুনিয়া অবাক হইয়া

চিত্রাৰ্পিতের গায় বসিয়া আছেন । ভক্তেরাও যেন সেই পূতসলিলা
পতিতপাবনী শ্রীমুখনিঃসৃত ভাগবতগঙ্গায় স্নান করিয়া বসিয়া আছেন !

সকলে চুপ করিয়া আছেন । তুলসী । ইনি হাসেন না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ভিতরে হাসি আছে । ফল্গুনদীর উপরে বালি, —
খুঁড়লে জল পাওয়া যায় ।

(মাষ্টারের প্রতি) তুমি জিহ্ব ছোলো না ! রোজ জিহ্ব ছুলবে ।

বলরাম । আচ্ছা, এঁর (মাষ্টারের) কাছে পূর্ণ আপনার কথা
অনেক শুনেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ । আগেকার কথা,—ইনি জানেন,—আমি জানি না ।

বলরাম । পূর্ণ স্বভাবসিদ্ধ । তরে এঁরা ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । এঁরা হেতুমাত্র ।

নয়টা বাজিয়াছে । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করিবেন,—
তাহার উদ্যোগ হইতেছে । বাগবাজারের ৩ অন্নপূর্ণার ঘাটে নৌকা ঠিক
করা আছে । ঠাকুরকে ভক্তেরা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন ।

ঠাকুর দুই একটি ভক্তের সহিত নৌকায় গিয়া বসিলেন । গোপালের
মা ঐ নৌকায় উঠিলেন,—দক্ষিণেশ্বরে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া বৈকালে
হাঁটিয়া কামারহাটি যাইবেন ।

ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরের ঘরের ক্যাম্পখাটটি Camp khat সারাইতে
দেওয়া হইয়াছিল । সেখানিও নৌকায় তুলিয়া দেওয়া হইল । এই খাট
খানিতে শ্রীযুক্ত রাখাল প্রায় শয়ন করিতেন ।

আজ কিন্তু মঘা নক্ষত্র । যাত্রা বদলাইতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আগত
শনিবারে বলরামের বাটীতে আবার শুভাগমন করিবেন ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থভাগ, ত্রয়োবিংশ খণ্ডে বলরামমন্দিরে

শ্রীশ্রীরথযাত্রাদিবসে ভক্তসঙ্গে সঙ্কীৰ্ত্তনানন্দ কথা সমাপ্ত ।

চতুর্থ ভাগ—চতুর্বিংশ অঙ্ক।

দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, মাষ্টার, মহিমাচরণ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[দ্বিজ, দ্বিজের পিতা, ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ । মাতৃস্বর্ণ ও পিতৃস্বর্ণ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে সেই পূর্বপরিচিত ঘরে রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন । বেলা তিনটা চারটা ।

ঠাকুরের গলার অস্থখের সূত্রপাত হইয়াছে । তথাপি সমস্ত দিন কেবল ভক্তদের মঙ্গলচিন্তা করিতেছেন—কিসে তাহারা সংসারে বদ্ধ না হয়,—কিসে তাহাদের জ্ঞানভক্তি লাভ হয়,—ঈশ্বরলাভ হয় ।

দশ বার দিন হইল, ২৮শে জুলাই মঙ্গলবার, তিনি কলিকাতায় শ্রীযুক্ত নন্দ বসুর বাটীতে ঠাকুরদের ছবি দেখিতে আসিয়া, বলরাম প্রভৃতি অন্যান্য ভক্তদের বাড়ী, শুভাগমন করিয়াছিলেন ।

শ্রীযুক্ত রাখাল বৃন্দাবন হইতে আসিয়া কিছু দিন বাড়ীতে ছিলেন । আজকাল তিনি, লাটু, হরীশ, ও রামলাল ঠাকুরের কাছে আছেন ।

শ্রীশ্রীমা কয়েক মাস হইল, ঠাকুরের সেবার্থ দেশ হইতে শুভাগমন করিয়াছেন । তিনি নবতে আছেন । ‘শোকাতুরা ব্রাহ্মণী’ আসিয়া কয়েক-দিন তাঁহার কাছে আছেন ।

ঠাকুরের কাছে দ্বিজ, দ্বিজর পিতা ও ভাইরা, মাষ্টার প্রভৃতি বসিয়া আছেন । আজ ৯ই আগষ্ট ১৮৮৫ খৃঃ ।

দ্বিজর বয়স ষোল বছর হইবে । তাঁহার মাতার পরলোকপ্রাপ্তির পর পিতা দ্বিতীয় সংসার করিয়াছেন । দ্বিজ মাষ্টারের সহিত প্রায় ঠাকুরের কাছে আসেন,—কিন্তু তাঁহার পিতা তাহাতে বড় অসন্তুষ্ট ।

দ্বিজের পিতা অনেক দিন ধরিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিবেন বলিয়াছিলেন । তাই আজ আসিয়াছেন । কলিকাতায় সদাগর আফিসের

তিনি একজন কর্মচারী—ম্যানেজার । হিন্দুকলেজে ডি এল রিচার্ডসনের কাছে পড়িয়াছিলেন ও হাইকোর্টের ওকালতী পাশ করিয়াছিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (দ্বিজের পিতার প্রতি) । আপনার ছেলেরা এখানে আসে, তাতে কিছু মনে করবে না ।

“আমি বলি, চৈতন্য লাভের পর সংসারে গিয়ে থাক । অনেক পরিশ্রম করে যদি কেউ সোণা পায়, সে মাটির ভিতর রাখতে পারে,—বাস্কের ভিতরও রাখতে পারে, জলের ভিতরও রাখতে পারে,—সোণার কিছু হয় না ।

“আমি বলি অনাসক্ত হয়ে সংসার কর । হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙ্গ—তা হলে হাতে আটা লাগবে না ।

“কাঁচা মনকে সংসারে রাখতে গেলে মন মলিন হয়ে যায় । জ্ঞান লাভ করে তবে সংসারে থাকতে হয় ।

“শুধু জলে দুধ রাখলে দুধ নষ্ট হয়ে যায় । মাখন তুলে জলের উপর রাখলে আর কোন গোল থাকে না ।

দ্বিজের পিতা । আজ্ঞা, হাঁ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) । আপনি যে এদের বকেন টকেন, তার মানে বুঝেছি । আপনি ভয় দেখান্ । ব্রহ্মচারী সাপকে বল্লে,—‘তুই ত বড় বোকা ! তোকে কামড়াতেই আমি বারণ করেছিলাম । তোকে ফাঁস করতে বারণ করি নাই ! তুই যদি ফাঁস্ কত্তিস্, তা হলে তোর শত্রুরা তোকে মারতে পারত না ।’ আপনি ছেলেদের বকেন ঝকেন,—সে কেবল ফাঁস করেন । [দ্বিজের পিতা হাসিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ভাল ছেলে হওয়া পিতার পুণ্যের চিহ্ন । যদি পুষ্করিণীতে ভাল জল হয়—সেটা পুষ্করিণীর মালিকের পুণ্যের চিহ্ন ।

“ছেলেকে আত্মজ বলে । তুমি আর তোমার ছেলে কিছু তফাৎ নয় । তুমি একরূপে ছেলে হয়েছ । একরূপে তুমি বিষয়ী, আফিসের কাজ করছো, সংসারে ভোগ করছো ;—আর একরূপে তুমিই ভক্ত হয়েছ—তোমার সম্ভানরূপে । শুনেছিলাম, আপনি খুব ঘোর বিষয়ী । তা ত নয় ! (সহাস্যে) ‘এ সব ত আপনি জানেন । তবে আপনি নাকি

আট পিটে, এতেও হুঁ দিয়ে যাচ্ছেন' । [দ্বিজের পিতা ঈষৎ হাসিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । এখানে এলে, আপনি কি বস্তু, তা এরা জানতে পারবে । বাপ কত বড় বস্তু ! বাপ আমাকে ফাঁকি দিয়ে যে ধম্ম করলে, তার ছাই হবে !

[পূর্ববক্তা—বৃন্দাবনে শ্রীরামকৃষ্ণের মার জন্য চিন্তা ।]

“মানুষের অনেকগুলি ঋণ আছে । পিতৃ-ঋণ, দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ । এ ছাড়া আবার মাতৃঋণ আছে । আবার পরিবারের সম্বন্ধেও ঋণ আছে—প্রতিপালন করতে হবে । সতী হলে, মরবার পরও তার জন্ত কিছু সংস্থান করে যেতে হয় ।

“আমি মার জন্ত বৃন্দাবনে থাকতে পারলাম না । যাই মনে পড়ল—মা দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে আছেন, অমনি আর বৃন্দাবনে মন টিকল না !

“আমি এদের বলি, সংসারও কর, আবার ভগবানেতেও মন রাখ ।—সংসার ছাড়তে বলি না,—এও কর ওও কর ।

পিতা । আমি বলি, পড়া শুনা ত চাই,—আপনার এখানে আসতে বারণ করি না । তবে ছেলেদের সঙ্গে ইয়ারকি দিয়ে সময় না কাটে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । এর (দ্বিজের) অবশ্য সংস্কার ছিল । এ দুই ভায়ের হল'না কেন ? আর এরই বা হল কেন ?

“জোর করে আপনি কি বারণ করতে পারবেন । যার যা (সংস্কার) আছে, তাই হবে ।

পিতা । হাঁ তা বটে ।

ঠাকুর মেজেতে দ্বিজের পিতার কাছে আসিয়া মাদুরের উপর বসিয়াছেন । কথা কহিতে কহিতে এক এক বার তাঁহার গায়ে হাত দিতেছেন ।

সন্ধ্যা আগতপ্রায় । ঠাকুর মাষ্টার প্রভৃতিকে বলিতেছেন, “এদের সব ঠাকুর দেখিয়ে আনো—আমি ভাল থাকলে সঙ্গে যেতাম” ।

ছেলেদের সন্দেশ দিতে বলিলেন । দ্বিজের পিতাকে বলিলেন, “এরা একটু খাবে, মিষ্টমুখ করতে হয় ।”

দ্বিজর বাবা দেবালয় ও ঠাকুরদের দর্শন করিয়া বাগানে একটু

বেড়াইতেছেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরে দক্ষিণপূর্ব বারাণ্ডায় ভূপেন, দ্বিজ, মাষ্টার, প্রভৃতির সহিত আনন্দে কথা কহিতেছেন । ক্রীড়াচ্ছলে ভূপেন ও মাষ্টারের পিঠে চাপড় মারিলেন । দ্বিজকে সহাস্যে বলিতেছেন,—“তোমার বাপকে কেমন বললাম ।”

সন্ধ্যার পর দ্বিজের পিতা আবার ঠাকুরের ঘরে আসিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরেই বিদায় লইবেন ।

দ্বিজের পিতার গরম বোধ হইয়াছে—ঠাকুর নিজে হাতে করিয়া পাখা দিতেছেন ।

পিতা বিদায় লইলেন—ঠাকুর নিজে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ।

—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

[ঠাকুর মুক্তকণ্ঠে । শ্রীরামকৃষ্ণ কি সিদ্ধপুরুষ না অবতার ।]

রাত্রি আটটা হইয়াছে । ঠাকুর মহিমাচরণের সহিত কথা কহিতেছেন । ঘরে রাখাল, মাষ্টার, মহিমাচরণের দু একটা সঙ্গী,—আছেন ।

মহিমাচরণ আজ রাত্রে থাকিবেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আচ্ছা, কেদারকে কেমন দেখেছো ?—দুধ দেখেছে না খেয়েছে ?

মহিমা । হাঁ, আনন্দ ভোগ করছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । নৃত্যগোপাল ?

মহিমা । খুব !—বেশ অবস্থা ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ । আচ্ছা, গিরীশ ঘোষ কেমন হয়েছে ?

মহিমা । বেশ হয়েছে । কিন্তু ওদের থাক আলাদা ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । নরেন্দ্র ?

মহিমা । আমি পনের বৎসর আগে যা ছিলাম, এ তাই ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ছোট নরেন ? কেমন সরল ?

মহিমা । হাঁ খুব সরল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঠিক বলেছ । (চিন্তা করতে করতে) আর কে আছে ।

“যে সব ছোকরা এখানে আসছে, তাদের—দু’টি জিনিষ জান্লেই

দক্ষিণেশ্বর। রাখাল, মাফটার, মহিমা প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে। ২৭৭

হ'ল। তা হলে আর বেশী সাধন ভজন কত্তে হবে না। প্রথম, আমি কে—তার পর, ওরা কে। ছোকরারা অনেকেই অন্তরঙ্গ।

“যারা অন্তরঙ্গ, তাদের মুক্তি হবে না। বায়ুকোণে আর একবার (আমার) দেহ হবে।

“ছোকরাদের দেখে আমার প্রাণ শীতল হয়! আর যারা ছেলে করেছে, মামলা মোকদ্দমা করে বেড়াচ্ছে—কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে রয়েছে—তাদের দেখলে কেমন করে আনন্দ হবে? শুদ্ধ-আত্মা না দেখলে কেমন করে থাকি!

মহিমাচরণ শাস্ত্র হইতে শ্লোক আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেছেন,—আর তন্ত্রোক্ত ভূচরী খেচরী শাস্ত্রবী প্রভৃতি নানা মুদ্রার কথা বলিতেছেন।
[ঠাকুরের পাঁচপ্রকার সমাধি—ষট্চক্রভেদ—যোগতত্ত্ব—কুণ্ডলিনী।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা, আমার আত্মা সমাধির পর মহাকাশে পাখীর মত উড়ে বেড়ায়, এই রকম কেউ কেউ বলে।

“হুশাকেশ সাধু এসেছিল। সে বললে যে, সমাধি পাঁচ প্রকার—তা তোমার সবই হয় দেখছি। পিপীলিকাবৎ, মীনবৎ, কপিবৎ, পক্ষিবৎ, তিৰ্য্যগ্‌বৎ।

“কখনও বায়ু উঠে পিপড়ের মত শিড়্ শিড়্ করে!—কখনও সমাধি অবস্থায় ভাব-সমুদ্রের ভিতর আত্মা-মীন আনন্দে খেলা করে!

“কখনও পাশ ফিরে রয়েছে, মহাবায়ু বানরের ন্যায় আমায় ঠেলে—আমোদ করে! আমি চুপ করে থাকি। সেই বায়ু হঠাৎ বানরের ন্যায় লাফ দিয়ে সহস্রারে উঠে যায়! তাই ত তিড়িং করে লাফিয়ে উঠি!

“আবার কখনও পাখীর মত এ ডাল থেকে ও ডাল, ও ডাল থেকে এ ডাল,—মহাবায়ু উঠতে থাকে! যে ডালে বসে, সে স্থান আগুনের মত বোধ হয়। হয়ত মূলাধার থেকে স্বাধিষ্ঠান, স্বাধিষ্ঠান থেকে হৃদয়, এইরূপ ক্রমে মাথায় উঠে!

“কখনও বা মহাবায়ু তিৰ্য্যাক্ গতিতে চলে—এঁকে বেঁকে! ঐরূপ চলে চলে শেষে মাথায় এলে সমাধি হয়।

[পূর্বকথা—২২।২৩ বছরে প্রথম উন্মাদ ১৮৫৮ খৃঃ । ঘটচত্র ভেদ ।]

“কুলকুণ্ডলিনী না জাগলে চৈতন্য হয় না ।

“মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী । চৈতন্য হলে তিনি সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়ে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর এই সব চক্র ভেদ করে, শেষে শিরোমধ্যে গিয়ে পড়েন । এরি নাম মহাবায়ুর গতি—তবেই শেষে সমাধি হয় ।

“শুধু পুঁথি পড়লে চৈতন্য হয় না—তাকে ডাকতে হয় । ব্যাকুল হলে তবে কুলকুণ্ডলিনী জাগেন । শুনে, বই পড়ে, জ্ঞানের কথা !—তাতে কি হবে !

“এই অবস্থা যখন হোলো, তার ঠিক আগে আমায় দেখিয়ে দিলে—কিরূপ কুলকুণ্ডলিনীশক্তি জাগরণ হয়ে, ক্রমে ক্রমে সব পদ্যগুলি ফুটে যেতে লাগলো, আর সমাধি হলো । এ অতি গুহ্য কথা । দেখলাম, ঠিক আমার মতন বাইশ তেইস বছরের ছোকরা, সুষুম্না নাড়ীর ভিতর গিয়ে, জিহ্বা দিয়ে, যোনিরূপ পদ্মের সঙ্গে রমণ করছে ! প্রথমে, গুহ্য লিঙ্গ নাভি । চতুর্দল ষড়দল দশদল পদ্য সব অধোমুখ হয়েছিল—উদ্ধমুখ হ’ল !

“হৃদয়ে যখন এলো—বেশ মনে পড়ছে—জিহ্বা দিয়ে রমণ করবার পর দ্বাদশদল অধোমুখপদ্য উদ্ধমুখ হলো,—আর প্রস্ফুটিত হলো ! তার পর কণ্ঠে ষোড়শদল, আর কপালে দ্বিদল । শেষে সহস্রদল পদ্য প্রস্ফুটিত হলো ! সেই অবধি আমার এই অবস্থা ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

[পূর্বকথা । ঠাকুর মুক্তকণ্ঠ । ঠাকুর শিদ্ধপুরুষ না অবতার ?]

ঈশ্বরের সঙ্গে কথা—মায়াদর্শন—ভক্ত আসিবার আগে তাদের দর্শন—কেশব সেনকে ভাবাবেশে দর্শন—অখণ্ডসচ্চিদানন্দ দর্শন ও নরেন্দ্র—ও কেদার—প্রথম উন্মাদে জ্যোতির্ময় দেহ—বাবার স্বপ্ন—গ্যাঙটা, ও তিন দিনে সমাধি—মথুরের ১৪ বৎসর সেবা ১৮৫৮-৭১—কুঠীর উপর ভক্তদের জগ্ন্য ব্যাকুলতা—অবিরত সমাধি । সব রকম সাধন ।

দক্ষিণেশ্বর । রাখাল, মহিমাচরণ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে—মুক্তকণ্ঠ । ২৭৯

ঠাকুর এই কথা বলিতে বলিতে নামিয়া আসিয়া মেজেতে মহিমাচরণের নিকট বসিলেন । কাছে মাফটারও আর ও দু একটি ভক্ত । ঘরে রাখালও আছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি) । আপনাকে অনেক দিন বলবার ইচ্ছা ছিল, পারি নাই—আজ বলতে ইচ্ছা হচ্ছে ।

“আমার যা অবস্থা—আপনি বলেন, সাধন করলেই ও রকম হয়, তা নয় । এতে (আমাতে) কিছু বিশেষ আছে ।

মাফটার, রাখাল, প্রভৃতি ভক্তেরা অবাক হইয়া ঠাকুর কি বলিবেন উৎসুক হইয়া শুনিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কথা কহেছে !—শুধু দর্শন নয়—কথা কয়েছে ! বটতলায় দেখলাম, গঙ্গার ভিতর থেকে উঠে এসে—তার পর কত হাসি ! খেলার ছলে আঙ্গুল মটকান হলো । তার পর কথা ।—কথা কহেছে !

“তিন দিন করে কেঁদেছি আর বেদ পুরাণ তন্ত্র—এ সব শাস্ত্রে কি আছে—(তিনি) সব দেখিয়ে দিয়েছেন !

“মহামায়ার আশ্রয় যে কি, তা একদিন দেখালে । ঘরের ভিতর ছোট জ্যোতি ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগলো ! আর জগৎকে ঢেকে ফেলতে লাগলো !

“আবার দেখালে,—যেন মস্ত দিঘী, পানায় ঢাকা ! হাওয়াতে পানি একটু সরে গেল,—অমনি জল দেখা গেল । কিন্তু দেখতে দেখতে চার দিক্কার পানি, নাচতে নাচতে এসে, আবার ঢেকে ফেলল ! দেখালে, ঐ জল যেন সচ্চিদানন্দ, আর পানি যেন আশ্রয় । মায়ার দরুণ সচ্চিদানন্দকে দেখা যায় না,—যদিও এক একবার চকিতের ন্যায় দেখা যায়, তো আবার মায়াতে ঢেকে ফেলে !

“কিরূপ লোক (ভক্ত) এখানে আসবে, আসবার আগে, দেখিয়ে দেয় । বটতলা থেকে বকুলতলা পর্য্যন্ত চৈতন্যদেবের সংকীৰ্ত্তনের দল দেখালে । তাতে বলরামকে দেখলাম—না হলে মিছরি এ সব দেবে কে ? আর এঁকে দেখেছিলাম ।

[শ্রীরামকৃষ্ণ, কেশব সেন ও তাঁহার সমাজে হরিনাম ও মায়ের নাম প্রবেশ ।]

“কেশব সেনের সঙ্গে দেখা হবার আগে, তাকে দেখলাম ! সমাধি অবস্থায় দেখলাম, কেশব সেন আর তার দল । এক ঘর লোক আমার সামনে বসে রয়েছে । কেশবকে দেখাচ্ছে, যেন একটা ময়ূর তার পাখা বিস্তার করে বসে রয়েছে ! পাখা অর্থাৎ দল বল । কেশবের মাথায় দেখলাম লালমণি । ওটা রজোগুণের চিহ্ন । কেশব শিষ্যদের বলছে—‘ইনি কি বলছেন, তোমরা সব শোনো’ । মাকে বললাম, মা এদের ইংরাজী মত,—এদের বলা কেন । তার পর মা বুঝিয়ে দিলে যে, কলিতে এ রকম হবে । তখন এখান থেকে হরিনাম আর মায়ের নাম ওরা নিয়ে গেল । তাই মা কেশবের দল থেকে বিজয়কে নিলে ! কিন্তু আদিসমাজে গেল না ।

(নিজেকে দেখাইয়া) “এর (আমার) ভিতর একটা কিছু আছে । গোপালসেন বলে একটা ছেলে আস্তো—অনেক দিন হ’ল । এর ভিতর যিনি আছেন, গোপালের বুকে পা দিলে । সে ভাবে বলতে লাগলো, ‘তোমার এখন দেবী আছে । আমি ঐহিকদের সঙ্গে থাকতে পারছি না’,—তার পর ‘যাই’ বলে বাড়ী চলে গেল । তার পর শুন্-লাম দেহত্যাগ করেছে । সেই বোধ হয় নিত্যগোপাল !

“আশ্চর্য্য দর্শন সব হয়েছে । অথ গু সচ্চিদানন্দ দর্শন ! তার ভিতর দেখছি, মাঝে বেড়া দেওয়া দুই থাক । একধারে কেশব, চুণী, আর আর অনেক সাকারবাদী ভক্ত । বেড়ার আর এক ধারে টকটকে লাল সুরকীর কাঁড়ির মত ‘জ্যোতিঃ ! তার মধ্যে বসে নরেন্দ্র !—সমাধিস্থ !

“ধ্যানস্থ দেখে বল্লুম, ‘ও নরেন্দ্র !’ একটু চোখ চাইলে !—বুল্লুম ওই একরূপে সিমলেতে কায়েতের ছেলে হয়ে আছে !—তখন বললাম, ‘মা, ওকে মায়ায় বদ্ধ কর !—তা না হলে সমাধিস্থ হয়ে দেহত্যাগ করবে !’—কেশব সাকারবাদী, উঁকি মেরে দেখে শিউরে উঠে পলালো !

“তাই ভাবি এর (নিজের) ভিতর মা স্বয়ং ভক্ত লয়ে লীলা

দক্ষিণেশ্বর । রাখাল, মাফটার, মহিমাди ভক্তসঙ্গে ঠাকুর মুক্তকণ্ঠ । ২৮১

করছেন । যখন প্রথম এই অবস্থা হোলো, তখন জ্যোতিতে দেহ জ্বল্ জ্বল্ করতো । বুক লাল হয়ে যেতো ! তখন বল্লম, ‘মা, বাইরে প্রকাশ হোয়ো না, ঢুকে যাও ঢুকে যাও !’ তাই এখন এই হীন দেহ ।

“তা না হলে লোকে জ্বালাতন করতো । লোকের ভিড় লেগে যেতো—সেরূপ জ্যোতির্ময় দেহ থাকলে । এখন বাহিরে প্রকাশ নাই । এতে আগাছা পালায়—যারা শুদ্ধি ভক্ত, তারাই কেবল থাকবে । এই ব্যারাম হয়েছে কেন ?—এর মানে ঐ । যাদের সকাম ভক্তি, তারা ব্যারাম অবস্থা দেখলে চলে যাবে ।

“সাধ ছিল—মাকে বলেছিলাম, ‘মা, ভক্তের রাজা হব !’

“আবার মনে উঠলো, ‘শেষ আন্তরিক ঈশ্বরকে ডাকবে, তার এখানে আসতেই হবে ! আসতেই হবে !’ ঠাখো, তাই হচ্ছে—সেই সব লোকই আসছে !

“এর ভিতরে কে আছেন, আমার বাপেরা জানতো । বাপ गयाতে সঙ্গে দেখেছিলেন,—রঘুবীর বলছেন, ‘আমি তোমার ছেলে হব ।’

“এর ভিতরে তিনিই আছেন । কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ! একি আমার কন্ম ! স্ত্রীসন্তোগ স্বপনেও হোলা না !

“শ্রীমন্তি। বেদান্তের উপদেশ দিলে । তিন দিনেই সমাধি । মাধবীতলায় ঐ সমাধি অবস্থা দেখে সে হতবুদ্ধি হয়ে বলছে, ‘আর এ কে ছা রে !’ পরে সে বুঝতে পারলে—এর ভিতর কে আছে । তখন আমায় বলে, ‘তুমি আমায় ছেড়ে দাও !’ ও কথা শুনে আমার ভাবাবস্থা হয়ে গেল ;—আমি সেই অবস্থায় বললাম, ‘বেদান্ত বোধ না হলে তোমার যাবার যো নাই ।’

“তখন রাত দিন তার কাছে । কেবল বেদান্ত ! বামনী বলতো, ‘বাবা, বেদান্ত শুনে না !—ওতে ভক্তির হানি হবে ।’

“মাকে যাই বললাম, ‘মা, এ দেহ রক্ষা কেমন করে হবে, আর সাধু ভক্ত লয়ে কেমন করে থাকবো !—একটা বড় মানুষ জুটিয়ে দাও !’ তাই সেক্ষেত্রে চৌদ্দ বৎসর ধরে সেবা করলে !

“এর ভিতর যিনি আছে, আগে থাকতে জানিয়ে দেয়, কোন

থাকের ভক্ত আসবে । যাই দেখি গৌরাঙ্গরূপ সাম্নে এসেছেন, অমনি বুঝতে পারি, গৌরভক্ত আসছে । যদি শাক্ত আসে, তা হলে শাক্তিরূপ,—কালীরূপ—দর্শন হয় ।

“কুঠীর উপর থেকে আরতির সময় চেঁচাতাম, ‘ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয় !’ ছাখো, এখন সব ক্রমে ক্রমে এসে জুটছে !

“এর ভিতর তিনি নিজে রয়েছেন—যেন নিজে থেকে এই সব ভক্ত লয়ে কাজ করছেন ।

“এক এক জন ভক্তের অবস্থা কি আশ্চর্য্য । ছোট নবেন—এর কুস্তক আপনি হয় !—আবার সমাধি ! এক এক বার কখন কখন আড়াই ঘণ্টা ! কখনও বেশী । কি আশ্চর্য্য !

“সব রকম সাধন এখানে হয়ে গেছে—জ্ঞানমোক্ষ ভক্তি-মোক্ষ কর্মমোক্ষ । হঠাৎমোক্ষ পর্য্যন্ত—আয়ু বাড়াবার জন্য । এর ভিতর এক জন আছে । তা না হলে সমাধির পর ভক্তি ভক্ত লয়ে কেমন করে আছি । কোয়ার সিং বলতো, ‘সমাধির পর ফিরে আসা লোক কখন দেখি নাই ।—তুমিই নানক ।’

[পূর্বকথা—কেশব, প্রতাপ ও কুক Cook সঙ্গে জাহাজে, ১৮৮১]

“চার দিকে ঐহিক লোক—চার দিকে কামিনীকামধেন —এতোর ভিতর থেকে এমন অবস্থা !—সমাধি, ভাব, লেগেই রয়েছে । তাই প্রতাপ (ব্রাহ্মসমাজের শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার)—কুক সাহেব যখন এসেছিল, জাহাজে আমার অবস্থা (সমাধি অবস্থা) দেখে বল্লেন, ‘বাবা । যেন ভূতে পেয়ে রয়েছে !’

রাখাল, মাফটার প্রভৃতি অবাক হইয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে এই সকল আশ্চর্য্য কথা শুনিতেছেন ।

মহিমাচরণ কি ঠাকুরের ইঙ্গিত বুঝিলেন ? এই সমস্ত কথা শুনিয়াও তিনি বলিতেছেন,—‘আজ্ঞা, আপনার প্রারব্ধশতঃ এরূপ সব হয়েছে ।’ তাঁহার মনের ভাব,—ঠাকুর একটা সাধু বা ভক্ত । ঠাকুর তাঁহার কথায় সায় দিয়া বলিতেছেন, ‘হাঁ, প্রাক্তন । যেন বাবুর অনেক বাড়ী আছে—এখানে একটা বৈঠকখানা । ভক্ত তাঁর বৈঠকখানা ।’

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

মহিমাচরণের ব্রহ্ম চক্র । পূর্বকথা—তোতাপুরীর উপদেশ ।

[‘স্বপ্নে দর্শন কি কম ?’ নরেন্দ্রের ঈশ্বরীষ রূপ দর্শন ।]

রাত নয়টা হইল । ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন । মহিমা-চরণের সাধ—যের ঠাকুর থাকিবেন—ব্রহ্মচক্র রচনা করিবেন । তিনি রাখাল, মাষ্টার, কিশোরী ও আর দু একটা ভক্তকে লইয়া মেজেতে চক্র করিলেন ! সকলকে ধ্যান করিতে বলিলেন । রাখালের ভাবাবস্থা হইয়াছে । ঠাকুর নামিয়া আসিয়া তাঁহার বুকে হাত দিয়া মার নাম করিতে লাগিলেন । রাখালের ভাব সম্বর হইল ।

রাত একটা হইবে । আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথি । চতুর্দিকে নিবিড় অন্ধকার । দু একটা ভক্ত গঙ্গার পোস্তার উপর একাকী বেড়াইতেছেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একবার উঠিয়াছেন । তিনিও বাহিরে আসিলেন ও ভক্তদের বলিতেছেন, ঝাংটা বলতো, ‘এই সময়ে—এই গভীর রাত্রে—অন্যাত শব্দ শোনা যায় !’

শেষ রাত্রে মহিমাচরণ ও মাষ্টার ঠাকুরের ঘরেই মেজেতে শুইয়া আছেন । রাখালও ক্যাম্প খাটে শুইয়াছেন ।

ঠাকুর পাঁচ বছরের ছেলের ন্যায় দিগম্বর হইয়া মাঝে মাঝে ঘরের মধ্যে পাদচারণ করিতেছেন ।

প্রত্যুষ হইল । ঠাকুর মার নাম করিতেছেন । পশ্চিমের বারাগুয় গিয়া গঙ্গা দর্শন করিলেন । ঘরের মধ্যস্থিত দেবদেবীর যত পট ছিল, কাছে গিয়া নমস্কার করিলেন । ভক্তেরা শয্যা হইতে উঠিয়া প্রণামাদি করিয়া প্রাতঃকৃত্য করিতে গেলেন ।

ঠাকুর পঞ্চবটীতে একটা ভক্তসঙ্গে কথা কহিতেছেন । তিনি স্বপ্নে চৈতন্যদেবকে দর্শন করিয়াছিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবাবিষ্ট হইয়া) । আহা ! আহা !

ভক্ত । আজ্ঞা, ও স্বপ্নে । শ্রীরামকৃষ্ণ । স্বপ্ন কি কম !

ঠাকুরের চক্ষে জল । গদ গদ স্বর ।

একজন ভক্তের জাগরণ অবস্থায় দর্শন-কথা শুনিয়া বলিতেছেন—
‘তা আশ্চর্য্য কি ! আজ কাল নরেন্দ্র ও ঈশ্বরীয় রূপ দেখে !’

মহিমাচরণ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, ঠাকুরবাড়ীর প্রাঙ্গণের পশ্চিম দিকের শিবের মন্দিরে গিয়া, নির্জনে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন ।

বেলা আটটা হইয়াছে । মণি গঙ্গাস্নান করিয়া ঠাকুরের কাছে আসিলেন । ‘শোকাতুরা ব্রাহ্মণী’ও দর্শন করিতে আসিয়াছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মণীর প্রতি) । এঁকে কিছু প্রসাদ খেতে দাও তো গা ; লুচি টুচি । তাকের উপর আছে ।

ব্রাহ্মণী । আপনি আগে খান । তার পর উনি প্রসাদ পাবেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তুমি আগে জগন্নাথের আটকে খাও, তার পর প্রসাদ ।

প্রসাদ পাইয়া মণি শিবমন্দিরে শিব দর্শন করিয়া ঠাকুরের কাছে আবার আসিলেন ও প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সম্মুখে) । তুমি এসো । আবার কাজে যেতে হবে ।

চতুর্থ ভাগ—পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে রাখাল, মাষ্টার,

পণ্ডিত শ্যামাপদ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

সমাধিমন্দিরে । পণ্ডিত শ্যামাপদের প্রতি কৃপা ।

শ্রীরামকৃষ্ণ দু একটা ভক্তসঙ্গে ঘরে বসিয়া আছেন । অপরাহ্ন পাঁচটা ; বৃহস্পতিবার, ১২ই ভাদ্র, শ্রাবণ কৃষ্ণা দ্বিতীয়া, ২৭ আগষ্ট, ১৮৮৫ ।

ঠাকুরের অস্থখের সূত্রপাত হইয়াছে । তথাপি ভক্তেরা কেহ আসিলে শরীরকে শরীর জ্ঞান করেন না । হয়ত সমস্ত দিন তাঁহাদের লইয়া কথা কহিতেছেন,—কখনও বা গান করিতেছেন ।

দক্ষিণেশ্বর । পণ্ডিত শ্যামাপদ, মাষ্টার, রাখাল, প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ২৮৫

শ্রীযুক্ত মধু ডাক্তার প্রায় নৌকা করিয়া আসেন—ঠাকুরের চিকিৎসার জন্ত । ভক্তেরা বড়ই চিন্তিত হইয়াছেন । মধু ডাক্তার যাহাতে প্রত্যহ আসিয়া দেখেন, এই তাঁহাদের ইচ্ছা । মাষ্টার ঠাকুরকে বলিতেছেন, ‘উনি বহুদর্শী লোক, উনি রোজ দেখলে ভাল হয় ।’

পণ্ডিত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিলেন । ইঁহার নিবাস আঁটপুর গ্রামে । সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া পণ্ডিত ‘সন্ধ্যা করিতে যাই’, বলিয়া গঙ্গাতীরে চাঁদনীর ঘাটে গমন করিলেন ।

সন্ধ্যা করিতে করিতে পণ্ডিত কি আশ্চর্য্য দর্শন করিলেন । সন্ধ্যা সমাপ্ত হইলে ঠাকুরের ঘরে আসিয়া মেজেতে বসিলেন । ঠাকুর মার নাম ও চিন্তার পর নিজের আসনেই বসিয়া আছেন । পাপোষের উপর মাষ্টার, রাখাল, লাটু প্রভৃতি ঘরে যাতায়াত করিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি, পণ্ডিতকে দেখাইয়া) । ইনি একজন বেশ লোক । (পণ্ডিতের প্রতি) ‘নেতি’ ‘নেতি’ করে যেখানে মনের শান্তি হয়, সেইখানেই তিনি ।

[ঈশ্বর দর্শনের লক্ষণ ও পণ্ডিত শ্যামাপদ । ‘সমাধিমন্দিরে’ ।]

“সাত দেউড়ীর পর রাজা আছেন । প্রথম দেউড়ীতে গিয়ে দেখে যে, একজন ঐশ্বর্য্যবান্ পুরুষ অনেক লোকজন নিয়ে বসে আছেন ; খুব জাঁক জমক ! রাজাকে যে দেখতে গিয়েছে, সে সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলে, ‘এই কি রাজা ?’ সঙ্গী ঈষৎ হেসে বলে, ‘না’ ।

“দ্বিতীয় দেউড়ী আর অন্যান্য দেউড়ীতেও ঐরূপ বলে । ছাখে, যত এগিয়ে যায়, ততই ঐশ্বর্য্য ! আর জাঁকজমক ! সাত দেউড়ী পার হয়ে যখন দেখলে, তখন আর সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলে না !—রাজার অতুল ঐশ্বর্য্য দর্শন করে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো !—বুঝলে এই রাজা !—এবিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই !

[ঈশ্বর, মায়া, জীবজগৎ । আধ্যাত্ম রামায়ণ । যমলার্জ্জুনের স্তব ।]

পণ্ডিত । মায়ার রাজ্য ছাড়িয়ে গেলে তাঁকে দেখা যায় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাঁর সাক্ষাৎকারের পর আবার ছাখে, এই মায়া জীবজগৎ তিনিই হয়েছেন ! এই সংসার ধোকার টাটী—স্বপ্নবৎ,—

এই বোধ হয়, যখন ‘নেতি’ ‘নেতি’ বিচার করে । তাঁর দর্শনের পর আবার ‘এই সংসার মজার কুটী !’

“শুধু শাস্ত্র পড়লে কি হবে ? পণ্ডিতেরা কেবল বিচার করে ।

পণ্ডিত । আমায় কেউ পণ্ডিত বলে ঘৃণা হয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঐটী তাঁর কৃপা ! পণ্ডিতেরা কেবল বিচার করে । কিন্তু কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে । সাক্ষাৎকারের পর সব নারায়ণ দেখবে—**নারায়ণই সব হয়েছেন** ।

পণ্ডিত নারায়ণের স্তব শুনাইতেছেন । ঠাকুর আনন্দে বিভোর ।

পণ্ডিত । সর্বভূতস্বমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ । আপনার অধ্যাত্ম (রামায়ণ) দেখা আছে ?

পণ্ডিত । আছে হাঁ, একটু দেখা আছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ওতে জ্ঞান ভক্তি পরিপূর্ণ । শবরীর উপাখ্যান, অহল্যার স্তব, সব ভক্তিতে পরিপূর্ণ !

“তবে একটা কথা আছে । তিনি বিষয়বুদ্ধি থেকে অনেক দূর ।

পণ্ডিত । যেখানে বিষয়বুদ্ধি, তিনি ‘সুদূরম্’,—আর যেখানে তা নাই, সেখানে তিনি ‘অদূরম্’ । উত্তরপাড়ার এক জমিদার মুখ্য্যেকে দেখে এলাম—বয়স হয়েছে—কেবল নভেলের গল্প শুনছেন !

শ্রীরামকৃষ্ণ । অধ্যাত্মে আর একটা বলছে যে, তিনিই জীব জগৎ !

পণ্ডিত আনন্দিত হইয়া যমলার্জ্জুনের এই ভাবের স্তব শ্রীমদ্ভাগবত, দশম স্কন্ধ, হইতে আবৃত্তি করিতেছেন—‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ ত্বমাচ্ছঃ পুরুষঃ পরঃ । ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রহ্মণো বিদুঃ ॥ ত্বমেকঃ সর্বভূতানাং দেহস্বাত্মেন্দ্রিয়েশ্বরঃ । ত্বং মহান্ প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা রজঃসত্ত্ব-তমোময়ী । ত্বমেব পুরুষোহধ্যক্ষঃ সর্বক্ষেত্রবিচারবিৎ ॥’

[শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ । ‘আন্তরিক ধ্যান জপ করলে আসতেই হবে’ ।]

ঠাকুর স্তব শুনিয়া সমাধিস্থ । দাঁড়াইয়াছেন । পণ্ডিত বসিয়া । পণ্ডিতের কোলে ও বক্ষে একটা চরণ রাখিয়া ঠাকুর হাসিতেছেন ।

পণ্ডিত চরণ ধারণ করিয়া বলিতেছেন, ‘**গুরো চৈতন্য**

দোহ !’ ঠাকুর ছোট তক্তার কাছে পূর্বাস্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন ।

পণ্ডিত ঘর হইতে ঢলিয়া গেলে ঠাকুর মাফটারকে বলিতেছেন,—
আমি যা বলি মিলছে ? মারা আন্তরিক ধ্যান জপ
করেছে তাদের এখানে আসতেই হবে ।

রাত দশটা হইল । ঠাকুর একটু সামান্য স্ফুজির পায়স খাইয়া শয়ন
করিয়াছেন । মণিকে বলিতেছেন, ‘পায়ে হাতটা বুলিয়ে দাও ত ।’

কিয়ৎক্ষণ পরে গায়ে ও বক্ষঃস্থলে হাত বুলাইয়া দিতে বলিতেছেন ।

সামান্য নিদ্রার পর মণিকে বলিতেছেন, ‘তুমি শোওগে ;—দেখি,
একলা থাকলে যদি ঘুম হয় ।’ ঠাকুর রামলালকে বলিতেছেন, ‘ঘরের
ভিতর ইনি (মণি) আর রাখাল শু’লে হয়’ ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও যীশুখৃষ্ট JESUS CHRIST.

প্রত্যুষ হইল । ঠাকুর গাত্রোত্তান করিয়া মার চিন্তা করিতেছেন ।
অসুস্থ হওয়াতে ভক্তেরা শ্রীমুখ হইতে সেই মধুর নাম শুনিতে পাইলেন
না । ঠাকুর প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ঘরে নিজের আসনে আসিয়া
বসিয়াছেন । মণিকে বলিতেছেন, আচ্ছা, রোগ কেন হলো ?

মণি । আজ্ঞা, মানুষের মতন সব না হলে জীবের সাহস হবে না ।
তারা দেখছে যে, এই দেহের এত অসুখ, তবুও আপনি ঈশ্বর বই আর
কিছুই জানেন না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । বলরামও বলে, ‘আপনারই এই, তা হলে
আমাদের আর হবে না কেন ?’

“সীতার শোকে রাম ধনুক তুলতে না পারাতে লক্ষ্মণ আশ্চর্য
হয়ে গেল । কিন্তু পঞ্চভুতের কাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে ।

মণি । ভক্তের দুঃখ দেখে যীশুখৃষ্টও অন্য লোকের মত কেঁদে-
ছিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কি হয়েছিল ?

মণি । মার্থা Martha মেরী Mary দুই ভগ্নী, আর ল্যাজেরাস্ Lazarus ভাই—তিন জনই যীশুখ্রীষ্টের ভক্ত । ল্যাজেরাসের মৃত্যু হয় । যীশু তাদের বাড়ীতে আসছিলেন । পথে এক জন ভগ্নী, মেরী, দৌড়ে গিয়ে পদতলে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে, ‘প্রভু তুমি যদি আসতে, তা হলে সে মরতো না !’ যীশু তার কান্না দেখে কেঁদেছিলেন ।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও সিদ্ধাই Miracles.]

“তার পর তিনি গোরের কাছে গিয়ে নাম ধরে ডাকতে লাগলেন ।
অমনি ল্যাজেরাস প্রাণ পেয়ে উঠে এলো !

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমার কিন্তু উগুণো হয় না ।

মণি । সে আপনি করেন না—ইচ্ছা করে । ও সব সিদ্ধাই Miracle তাই আপনি করেন না । ও সব করলে লোকদের দেহেতেই মন যাবে—
শুদ্ধা ভক্তির দিকে মন যাবে না । তাই আপনি করেন না ।

“আপনার সঙ্গে যীশুখ্রীষ্টের অনেক মেলে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । আর কি কি মেলে ?

মণি । আপনি ভক্তদের উপবাস কর্তে কি অন্য কোন কঠোর কর্তে বলেন না—খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধেও কোন কঠিন নিয়ম নাই । যীশুখ্রীষ্টের শিষ্যেরা রবিবারে নিয়ম না করে খেয়েছিল, তাই যারা শাস্ত্র মেনে চলত, তারা তিরস্কার করেছিল । যীশু বলেন, ‘ওরা খাবে, খুব করবে ; যত দিন বরের সঙ্গে আছে, বরযাত্রীরা আনন্দই করবে’ !

শ্রীরামকৃষ্ণ । এর মানে কি ?

মণি । অর্থাৎ যতদিন অবতারের সঙ্গে সঙ্গে আছে, সাক্ষোপাসঙ্গণ কেবল আনন্দই করবে—কেন নিরানন্দ হবে ? তিনি যখন স্বধামে চলে যাবেন, তখন তাদের নিরানন্দের দিন আসবে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । আর কিছু মেলে ?

মণি । আজ্ঞা, আপনি যেমন বলেন—‘ছোকরাদের ভিতর কামিনী-কাঞ্চন ঢুকে নাই ; ওরা উপদেশ ধারণা করতে পারবে,—যেমন নূতন হাঁড়িতে দুধ রাখা যায় ! দই পাতা হাঁড়িতে রাখলে নষ্ট হতে পারে’, তিনিও সেইরূপ বলতেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কি বলতেন ?

মণি । ‘পুরাণো বোতলে নূতন মদ রাখ্লে বোতল ফেটে যেতে পারে । আর পুরাণো কাপড়ে নূতন তালি দিলে শীঘ্র ছিঁড়ে যায় ।’

“আবার যেমন বলেন, ‘মা আর আপনি এক’, তিনিও তেমনি বলতেন, ‘বাবা আর আমি এক !’ (I and my Father are one.)

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) । আর কিহু ?

মণি । আপনি যেমন বলেন, ‘ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন’ । তিনিও বলতেন, ‘ব্যাকুল হয়ে দোরে যা মারো, দোর খোলা পাবে’ ! (‘Knock and it shall be opened unto you’.)

শ্রীরামকৃষ্ণ । আচ্ছা, অবতার যদি হয়, তা পূর্ণ, না অংশ, না কলা ? কেউ কেউ বলে পূর্ণ ।

মণি । আজ্ঞা, পূর্ণ অংশ কলা ও সব ভাল বুঝতে পারি না । তবে যেমন বলেছিলেন, ঐটে বেশ বুঝেছি । পাঁচিলের মধ্যে গোল ফাঁক ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কি বল দেখি ?

মণি । প্রাচীরের ভিতর একটি গোল ফাঁক—সেই ফাঁকের ভিতর দিয়ে প্রাচীরের ওধারের মাঠ খানিকটা দেখা যাচ্ছে ! সেইরূপ আপনার ভিতর দিয়ে সেই অনন্ত ঈশ্বর খানিকটা দেখা যায় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, দু তিন ফ্রেশ একবারে দেখা যাচ্ছে !

মণি চাঁদনীর ঘাটে গঙ্গাস্নান করিয়া আবার ঠাকুরের কাছে ঘরে উপনীত হইলেন । বেলা আটটা হইয়াছে ।

মণি লাটুর কাছে আটকে চাইছেন—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আটকে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ কাছে আসিয়া মণিকে বলিতেছেন, ‘তুমি ওটা (প্রসাদ খাওয়া) কোরো—যারা ভক্ত হয়, প্রসাদ না হলে খেতে পারে না ।’

মণি । আজ্ঞা, আমি কাল অবধি বলরাম বাবুর বাড়ী থেকে জগন্নাথের আটকে এনেছি—তাই রোজ একটি দুটি খাই ।

মণি ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন ও বিদায় গ্রহণ করিতেছেন । ঠাকুর সন্মুখে বলিতেছেন, তবে তুমি সকাল সকাল এসো—আবার ভাদ্র মাসের রৌদ্র—বড় খারাপ ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত । [1885, 31st August.

চতুর্থ ভাগ—ষড়্বিংশ অঙ্ক ।

দাক্ষিণেশ্বরমন্দিরে জন্মাষ্টমী-দিবসে ভক্তসঙ্গে ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

সুবোধের আগমন । পূর্ণ, মাষ্টার, গঙ্গাধর, ক্ষীরোদ, নিতাই ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পূর্বপরিচিত ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন । রাত আটটা । সোমবার ১৬ই ভাদ্র, শ্রাবণ-কৃষ্ণা-ষষ্ঠী ; ৩১ আগষ্ট, ১৮৮৫ ।

ঠাকুর অসুস্থ—গলার অসুখের সূত্রপাত হইয়াছে । কিন্তু নিশিদিন এক চিন্তা, কিসে ভক্তদের মঙ্গল হয় । এক এক বার বলেকের ন্যায় অসুখের জন্ম কাতর ;—পরক্ষণেই সব ভুলিয়া গিয়া ঈশ্বরের প্রেমে মাতোয়ারা ! আর ভক্তের প্রতি স্নেহ ও বাৎসল্যে উন্মত্তপ্রায় ।

দুই দিন হইল—গত শনিবার রাত্রে—শ্রীযুক্ত পূর্ণ পত্র লিখিয়াছেন—‘আমার খুব আনন্দ হয় । মাঝে মাঝে রাত্রে আনন্দে ঘুম হয় না !’

ঠাকুর পত্রপাঠ শুনিয়া বলিয়াছিলেন,—‘আমার গায়ে রোমাঞ্চ হচ্ছে ! ঐ আনন্দের অবস্থা ওর পরে থেকে যাবে ; দেখি চিঠিখানা ।’

পত্রখানি হাতে করে মুড়ে টিপে বলিতেছেন,—‘অন্যের চিঠি ছুঁতে পারি না ; এর বেশ ভাল চিঠি ।’

সেই রাত্রে একটু শুইয়াছেন । হঠাৎ গায়ে ঘাম—শয্যা হইতে উঠিয়া বলিতেছেন,—‘আমার বোধ হচ্ছে, এ অসুখ সারবে না ।’

এই কথা শুনিয়া ভক্তেরা সকলেই চিন্তিত হইয়াছেন ।

শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের সেবা করিবার জন্ম আসিয়াছেন ও অতি নিভৃতে নবতে বাস করেন । তিনি যে নবতে আছেন, ভক্তেরা প্রায় কেহ জানিতেন না । একটা ভক্ত স্ত্রীলোকও কয়দিন নবতে আছেন । তিনি ঠাকুরের ঘরে প্রায় আসেন ও দর্শন করেন ।

ঠাকুর তাঁহাকে পর দিন রবিবারে বলিতেছেন,—‘তুমি অনেক দিন এখানে আছ, লোকে কি মনে করবে ? বরং দশ দিন বাড়ী গিয়ে থাকগে ।’ মাষ্টার এই সমস্ত কথা শুনিলেন ।

আজ সোমবার । ঠাকুর অসুস্থ রহিয়াছেন । রাত প্রায় আটটা হইয়াছে । ঠাকুর ছোট খাটটীতে পেছন ফিরিয়া দক্ষিণ দিকে শিয়র করিয়া শুইয়া আছেন । গঙ্গাধর সন্ধ্যার পর কলিকাতা হইতে মাষ্টারের সহিত আসিয়াছেন । তিনি তাঁহার চরণপ্রান্তে বসিয়া আছেন । ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । দুটী ছেলে এসেছিল । শঙ্কর ঘোষের নাতির ছেলে (সুবোধ) আর একটী তাদের পাড়ার ছেলে (ক্ষারোদ) । বেশ ছেলে দুটী । তাদের বল্লুম, আমার এখন অসুখ, তোমার কাছে গিয়ে উপদেশ নিতে । তুমি একটু যত্ন কোরো ।

মাষ্টার । আজ্ঞা হাঁ, আমাদের পাড়ায় তাদের বাড়ী ।

[অসুখের সূত্রপাত । ভগবান্ ডাক্তার । নিতাই ডাক্তার ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । সে দিন আবার গায়ে ঘাম দিয়ে যুম ভেঙ্গে গিছলো । এ অসুখটা কি হ'ল !

মাষ্টার । আজ্ঞা, আমরা একবার ভগবান্ রুদ্রকে দেখাব ঠিক করেছি । এম-ডি পাশ করা । খুব ভাল ডাক্তার ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কত নেবে ?

মাষ্টার । অন্য যায়গা কুড়ি পঁচিশ টাকা নিতো ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তবে থাক ।

মাষ্টার । আজ্ঞা, আমরা হদ্দ চার পাঁচ টাকা দেবো ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আচ্ছা, এই রকম করে যদি একবার বলো, ‘দয়া করে তাঁকে দেখবেন চলুন ।’ এখানকার কথা কিছু শুনে নাই ?

মাষ্টার । বোধ হয় শুনেছে । এক রকম কিছু নেবে না বলেছে, তবে আমরা দেবো ; কেন না, তা হলে আবার আসবে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । নিতাই (ডাক্তারকে) আনো তো সে বরং ভাল । আর ডাক্তাররা এসেই বা কি করছে ? কেবল টিপে বাড়িয়ে দেয় ।

রাত নয়টা । ঠাকুর একটু সুজির পায়েস খাইতে বসিলেন ।

খাইতে কোন কষ্ট হইল না । তাই আনন্দ করিতে করিতে মাষ্টারকে বলিতেছেন,—‘একটু খেতে পারলাম, মনটায় বেশ আনন্দ হলো’ ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

জন্মাষ্টমীদিবসে নরেন্দ্র, রাম, গিরীশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ।

[বলরাম, মাষ্টার, গোপালের মা, রাখাল, লাটু, ছোট নরেন, পঞ্জাবী
সাধু, নবগোপাল, কাটোয়ার বৈষ্ণব, রাখাল ডাক্তার]

আজ জন্মাষ্টমী, মঙ্গলবার । ১৭ই ভাদ্র ; ১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫ ।

ঠাকুর স্নান করিবেন । একটী ভক্ত তেল মাখাইয়া দিতেছেন ।
ঠাকুর দক্ষিণের বারান্দায় বসিয়া তেল মাখিতেছেন । মাষ্টার গঙ্গাস্নান
করিয়া আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন ।

স্নানান্তে ঠাকুর গামছা পরিয়া দক্ষিণাশ্রু হইয়া সেই বারান্দা হইতেই
ঠাকুরদের উদ্দেশ্য করিয়া প্রণাম করিতেছেন । শরীর অসুস্থ বলিয়া
কালীঘরে বা বিষ্ণুঘরে যাইতে পারিলেন না ।

আজ জন্মাষ্টমী । রামাদি ভক্তেরা ঠাকুরের জন্ম নববস্ত্র আনিয়া-
ছেন । ঠাকুর নববস্ত্র পরিধান করিয়াছেন—বৃন্দাবনী কাপড় ও গায়ে
লাল চেলী । তাঁহার শুদ্ধ অপাপবিন্দ দেহ নববস্ত্রে শোভা পাইতে
লাগিল । বস্ত্র পরিধান করিয়াই তিনি ঠাকুরদের প্রণাম করিলেন ।

আজ জন্মাষ্টমী । গোপালের মা গোপালের জন্ম কিছু
খাবার করিয়া কামারহাটী হইতে আনিয়াছেন । তিনি আসিয়া ঠাকুরকে
দুঃখ করিতে করিতে বলিতেছেন,—তুমি ত খাবে না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । এই ঢাখো, অসুখ হয়েছে ।

গোপালের মা । আমার অদৃষ্ট !—একটু হাতে করো !

শ্রীরামকৃষ্ণ । তুমি আশীর্বাদ করো ।

গোপালের মা ঠাকুরকেই গোপাল বলিয়া সেবা করিতেন ।

ভক্তেরা মিছরি আনিয়াছেন । গোপালের মা বলিতেছেন, ‘এ
মিছরি নবতে নিয়ে যাই ।’ শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, ‘এখানে ভক্তদের
দিতে হয় । কে একশ বার চাইবে, এইখানেই থাক ।’

বেলা এগারটা । কলিকাতা হইতে ভক্তেরা ক্রমে ক্রমে আসিতে-
ছেন । শ্রীযুক্ত বলরাম, নরেন্দ্র, ছোট নরেন, নবগোপাল, কাটোয়া-

হইতে একটি বৈষ্ণব, ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটলেন । রাখাল, লাটু আজ কাল থাকেন । একটি পঞ্জাবী সাধু পঞ্চবটীতে কয়দিন রহিয়াছেন ।

ছোট নরেনের কপালে একটি আব আছে । ঠাকুর পঞ্চবটীতে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিতেছেন, ‘তুই আবটা কাট না, ও ত গলায় নয় —মাথায় । ওতে আর কি হবে—লোকে একশিরা কাটাচ্ছে’ । (হাস্য) ।

পঞ্জাবী সাধুটী উঠানের পথ দিয়া যাইতেছেন । ঠাকুর বলিতেছেন —আমি ওকে টানি না । জ্ঞানীর ভাব । দেখি যেন শুকনো কাঠ !

ঘরে ঠাকুর ফিরিয়াছেন । শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্যের কথা হইতেছে ।

বলরাম । তিনি বলেছেন যে, নরেন্দ্রের যেমন বুক পা দিয়ে (ভাবাবেশ) হয়েছিলো, কই আমার ত তা হয় নাই !

শ্রীরামকৃষ্ণ । কি জান, কামিনীকান্ধনে মন থাকলে ছড়ান মন কুড়ান দাস্য ওর সালিসী করতে হয়, বলেছে । আবার বাড়ীর ছেলের বিষয় ভাবতে হয় । নরেন্দ্রাদির মন ত ছড়ানো নয় —ওদের ভিতর এখনো কামিনীকান্ধন ঢোকে নাই ।

“কিন্তু (শ্যামাপদ) খুব লোক !

কাটোয়ার বৈষ্ণব ঠাকুরকে প্রশ্ন করিতেছেন । বৈষ্ণবটী একটু টারা ।

[জন্মান্তরের খপর । ভক্তি লাভের জন্যই মানুষজন্ম ।]

বৈষ্ণব । ম’শয়, আবার জন্ম কি হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । গীতায় আছে, মৃত্যুসময় যে যা চিন্তা করে দেহত্যাগ করবে, তার সেই ভাব লয়ে জন্মগ্রহণ করতে হয় । হরিণকে চিন্তা করে ভরত রাজার হরিণ-জন্ম হয়েছিল ।

বৈষ্ণব । এটী যে হয়, কেউ চোখে দেখে বলে ত বিশ্বাস হয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তা জানি না বাপু । আমি নিজের ব্যামো সারাতে পারছি না—আবার মলে কি হয় !

“তুমি যা বলছো এ সব হীনবুদ্ধির কথা । ঈশ্বরে কিসে ভক্তি হয়, এই চেষ্টা করো । ভক্তিলভের জন্যই মানুষ হয়ে জন্মেছে । বাগানে আম খেতে এসেছ, কত হাজার ডাল, কত লক্ষ পাতা, এ সব খপরে কাজ কি ? জন্মজন্মান্তরের খপর !

[গিরীশ ঘোষ ও অবতারবাদ । কে পবিত্র ? যার বিশ্বাস ভক্তি ।]

শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষ দুই একটা বন্ধু সঙ্গে গাড়ী করিয়া আসিয়া উপস্থিত । কিছু পান করিয়াছেন । কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছেন । ও ঠাকুরের চরণে মাথা দিয়া কাঁদিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ সন্নেহে তাঁহার গা চাপড়াইতে লাগিলেন ! একজন ভক্তকে ডাকিয়া বলিতেছেন—‘ওরে, একে তামাক খাওয়া ।’

গিরীশ মাথা তুলিয়া হাত জোড় করিয়া বলিতেছেন,—তুমিই পূর্ণ ব্রহ্ম ! তা যদি না হয়, সবই মিথ্যা !

“বড় খেদ রইলো, তোমার সেবা করতে পেলুম না ! (এই কথাগুলি এরূপ স্বরে বলিতেছেন যে, দু একটা ভক্ত কাঁদিতেছেন !)

“দাও বল ভগবান্, এক বৎসর তোমার সেবা করবো । মুক্তি ছড়াছড়ি—প্রস্তাব করে দি । বল, সেবা এক বৎসর করবো ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । এখানকার লোক ভাল নয়—কেউ কিছু বলবে !

গিরীশ । তা হবে না, বলো—

শ্রীরামকৃষ্ণ । আচ্ছা, তোমার বাড়ীতে যখন যাবো—

গিরীশ । না, তা নয় । এই খানে করবো

শ্রীরামকৃষ্ণ (জিদ দেখিয়া) । আচ্ছা, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা ।

ঠাকুরের গলায় অশ্রুথ । গিরীশ আবার কথা কহিতেছেন,—“বল আরাম হয়ে যাক !—আচ্ছা, আমি ঝাড়িয়ে দেবো । কালী ! কালী !”

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমার লাগবে ! গিরীশ । ভাল হয়ে যা ! (ফঁ)
ভাল যদি না হয়ে থাকে তো—যদি আমার ও পায়ে কিছু ভক্তি থাকে, তবে অবশ্য ভাল হবে !—বল, ভাল হয়ে গেছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া) । যা বাপু, আমি ও সব বলতে পারি না । রোগ ভাল হবার কথা মাকে বলতে পারি না ।

“আচ্ছা, ঈশ্বরের ইচ্ছায় হবে ।

গিরীশ । আমায় ভুলোনো ! তোমার ইচ্ছামত !

শ্রীরামকৃষ্ণ । ছি, ও কথা বলতে নাই । ভক্তবৎ ন চ কৃষ্ণ-
বৎ । তুমি যা ভাবো, তুমি ভাবতে পারো । আপনার গুরু তো ভগবান্

—তা বলে ও সব কথা বলায় অপরাধ হয়—ও কথা বলতে নাই ।

গিরীশ । বল, ভাল হয়ে যাবে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আচ্ছা, যা হয়েছে তা যাবে ।

গিরীশ নিজের ভাবে মাঝে মাঝে ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—‘হ্যাঁগা, এবার রূপ নিয়ে আস নাই কেন গা ?’

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিতেছেন,—‘এবার বুঝি বাগ্নলা উদ্ধার !’

কোন কোন ভক্ত ভাবিতেছেন, বাগ্নলা উদ্ধার, সমস্ত জগৎ উদ্ধার !

গিরীশ আবার বলিতেছেন, ‘ইনি এখানে রয়েছেন কেন, কেউ বুঝছে ? জীবের দুঃখে কাতর হয়ে এসেছেন ; তাদের উদ্ধার করার জন্য !’

গাড়েয়ান ডাকিতেছিল । গিরীশ গাত্রোথান করিয়া তাহার কাছে যাইতেছেন । শ্রীরামকৃষ্ণ মাফটারকে বলিতেছেন, ‘ছাথো, কোথায় যায়—মারবে না তো !’ মাফটারও সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন ।

গিরীশ আবার ফিরিয়াছেন ও ঠাকুরকে স্তুব করিতেছেন—‘ভগবন্, পবিত্রতা আমায় দাও ! যাতে কখনও একটুও পাপ-চিন্তা না হয় !’

শ্রীরামকৃষ্ণ । তুমি পবিত্র ত আছো !—তোমার যে বিশ্বাস ভক্তি ! তুমি ত আনন্দে আছ ?

গিরীশ । আচ্ছা না । মন খারাপ—অশান্তি—তাই খুব মদ খেলুম ।

কিয়ৎক্ষণ পরে গিরীশ আবার বলিতেছেন,—‘ভগবন্, আশ্চর্য্য হচ্ছি যে, পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের সেবা করছি ! এমন কি তপস্যা করছি যে, এই সেবার অধিকারী হয়েছি !’

ঠাকুর মধ্যাহ্নের সেবা করিলেন । অস্থখ হওয়াতে অতি সামান্য একটু আহার করিলেন ।

ঠাকুরের সর্বদাই ভাবাবস্থা—জোর করিয়া শরীরের দিকে মন আনিতেছেন । কিন্তু শরীর রক্ষা করিতে বালকের ন্যায় অক্ষম । বালকের ন্যায় ভক্তদের বলিতেছেন,—‘এখন একটু খেলুম—একটু শোবো । তোমরা একটু বাহিরে গিয়ে বসো ।’

ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিয়াছেন । ভক্তেরা আবার ঘরে বসিয়াছেন ।

[গিরীশ ঘোষ । গুরুই ইষ্ট । দ্বিবিধ ভক্ত ।]

গিরীশ । হ্যাঁ গা, গুরু আর ইষ্ট ;—গুরু-রূপটী বেশ লাগে—ভয় হয় না—কেন গা ? ভাব দেখলে দশহাত তফাতে যাই ! ভয় হয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । যিনি ইষ্ট, তিনিই গুরুরূপ হয়ে আসেন । শব-সাধনের পর যখন ইষ্ট দর্শন হয়, গুরুই এসে শিষ্যকে বলেন—এ (শিষ্য) ঐ (তোর ইষ্ট) । এই কথা বলেই ইষ্টরূপে লীন হয়ে যান । শিষ্য আর গুরুকে দেখতে পায় না । যখন পূর্ণ জ্ঞান হয়, তখন কে বা গুরু, কে বা শিষ্য । ‘সে বড় কঠিন ঠাই । গুরুশিষ্যে দেখা নাই ।’

একজন ভক্ত । গুরুর মাথা শিষ্যের পা । গিরীশ (আনন্দে) হাঁ ।

নবগোপাল । শোনো মানে । শিষ্যের মাথাটা গুরুর জিনিস, আর গুরুর পা শিষ্যের জিনিস । শুনলে ?

গিরীশ । না, ও মানে নয় ! বাপের ঘাড়ে ছেলে কি চড়ে না ? তাই শিষ্যের পা ।

নবগোপাল । সে তেমনি কচি ছেলে থাকলে ত হয় !

[পূর্বকথা—শিখভক্ত । দুই থাক ভক্ত—বানরের ছা ও বিল্লীর ছা ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । দু রকম ভক্ত আছে । এক থাকের বিল্লীর ছার স্বভাব । সব নির্ভর—মা যা করে । বিল্লীর ছা কেবল মিউ মিউ করে । কোথায় যাবে, কি করবে—কিছুই জানে না । মা কখন হেঁশালে রাখছে—কখন বা বিছানার উপরে রাখছে । এরূপ ভক্ত ঈশ্বরকে আশ্রয়িতারা (বকলমা) দেয় । আশ্রয়িতারি দিহে নিশ্চিত ।

“শিখরা বলেছিল—ঈশ্বর দয়ালু । আমি বললাম, তিনি আমাদের মা বাপ, তিনি আবার দয়ালু কি ? ছেলেদের জন্ম দিয়ে বাপ মা লালন পালন করবে না,—তো কি বামনপাড়ার লোকেরা এসে করবে ? এ ভক্তদের ঠিক বিশ্বাস—তিনি আপনার মা, আপনার বাপ ।

“আর এক থাক ভক্ত আছে, তাদের বানরের ছার স্বভাব । বানরের ছা নিজে যো সো করে মাকে আঁকড়ে ধরে । এদের একটু কর্তৃত্ব বোধ আছে । আমায় তীর্থ করতে হবে, জপ তপ করতে হবে, ষোড়শোপচারে পূজা করতে হবে, তবে আমি ঈশ্বরকে ধবতে পারবো,—এদের এই ভাব ।

“দুজনেই ভক্ত । (ভক্তদের প্রতি) যত এগোবে, ততই দেখবে, তিনিই সব হসেছেন—তিনিই সব করছেন । তিনিই গুরু, তিনিই ঈশ্ট । তিনিই জ্ঞান ভক্তি সব দিচ্ছেন ।

[পূর্বকথা—কেশবসেনকে উপদেশ, ‘এগিয়ে পড়ো’ ।]

“যত এগোবে, দেখবে, চন্দন কাঠের পরও আছে ;—রূপার খনি,—সোণার খনি,—হীরে মাণিক ! তাই এগিয়ে পড় !

“আর ‘এগিয়ে পড়’ এ কথাই বা বলি কেমন করে !—সংসারী লোকদের লেশী এগোতে গেলে সংসার টংসার ফক্ক হসে শ্যাম । কেশব সেন উপাসনা কচ্ছিলো,—বলে, ‘হে ঈশ্বর, তোমার ভক্তিনদীতে যেন ডুবে যাই’ । সব হয়ে গেলে আমি কেশবকে বললাম, ওগো, তুমি ভক্তিনদীতে ডুবে যাবে কি করে ? ডুবে গেলে, চিকের ভিতর যারা আছে তাদের কি হবে ! তবে এক কর্ম কোরো—মাঝে মাঝে ডুব দিও, আর এক এক বার আড়ায় উঠো ! (সকলের হাস্য)

[বৈষ্ণবের ‘কলকলানি’ । ‘ধারণা করো’ । সত্যকথা তপস্যা ।]

কাটোয়ার বৈষ্ণব তর্ক করিতেছিলেন । ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন—“তুমি কলকলানি ছাড় । ঘি কাঁচা থাকলেই কলকল করে ।

“একবার তাঁর আনন্দ পেলে বিচারবুদ্ধি পালিয়ে যায় । মধুপানের আনন্দ পেলে আর ভন্ডনানি থাকে না ।

“বই পড়ে কতকগুলো কথা বলতে পারলে কি হবে ? পণ্ডিতেরা কত শ্লোক বলে—‘শীর্ণা গোকুলমণ্ডলী !’—এই সব ।

“সিদ্ধি সিদ্ধি মুখে বলে কি হবে ? কুলকুচো করলেও কিছু হবে না । পেটে ঢুকতে হবে ! তবে নেশা হবে । ঈশ্বরকে নিজ্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে না ডাকলে, এ সব কথা ধারণা হয় না ।

ডাক্তার রাখাল ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন । তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিতেছেন—‘এসো গো বসো !’

বৈষ্ণবের সহিত কথা চলিতে লাগিল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । মানুষ আর মানহঁস্ । যার চৈতন্য হয়েছে, সেই মানহঁস্ ! চৈতন্য না হলে হুথ্য মানুষজন্ম !

[পূর্বকথা—কামারপুকুরে ধার্মিক সত্যবাদী দ্বারা সালিসী ।]

“আমাদের দেশে পেটমোটা গোঁফওয়ালা অনেক লোক আছে । তবু দশ ক্রোশ দূর থেকে ভাল লোককে পান্ধী করে আনে কেন—ধার্মিক সত্যবাদী দেখে । তারা নিবাদ মিটায়ে । শুধু যারা পণ্ডিত, তাদের আনে না ।

“সত্যকথা কলির তপস্যা । ‘সত্যকথা, অধীনতা, পরস্তু মাতৃ-সমান’ ।

ঠাকুর বালকের মত ডাক্তারকে বলিতেছেন—বাবু, আমার এটা ভাল করে দাও ।

ডাক্তার । আমি ভাল কোরবো ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । ডাক্তার নারায়ণ । আমি সব মানি ।

[Reconciliation of Free Will and God's Will ; o Liberty and Necessity. ঈশ্বরই মাহুত নারায়ণ ।]

“যদি বলো সব নারায়ণ, তবে চুপ করে থাকলেই হয় ; তা আমি মাহুত নারায়ণও মানি । প্রথমভাগ, প্রথমখণ্ড ।

“শুদ্ধ মন আর শুদ্ধ আত্মা একই ! শুদ্ধ মনে যা উঠে, সে তাঁরই কথা । তিনিই ‘মাহুত নারায়ণ’ ।

“তাঁর কথা শুনবো না কেন ? তিনিই কর্তা । ‘আমি’ যতক্ষণ রেখেছেন, তাঁর আদেশ শুনে কাজ করবো ।

ঠাকুরের গলার অসুখ এইবার ডাক্তার দেখিবেন । ঠাকুর বলিতেছেন,—মহেন্দ্র সরকার জিহ্বা টিপেছিল, যেমন গরুর জিহ্বাকে টিপে !

ঠাকুর আবার বালকের ন্যায় ডাক্তারের জামায় বারংবার হাত দিয়ে বলিতেছেন,—বাবু ! বাবু ! তুমি এইটে ভাল করে দাও ।

Laryngoscope দেখিয়া ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন—বুঝেছি, এতে ছায়া পড়বে ।

নরেন্দ্র গান গাইলেন । ঠাকুরের অসুখ বলিয়া বেশী গান হইল না ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

[শ্রীযুক্ত ডাক্তার ভগবান্ রুদ্র ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ্নে সেবা করিয়া নিজের আসনে বসিয়া আছেন । ডাক্তার ভগবান্ রুদ্র ও মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন । ঘরে রাখাল, লাটু প্রভৃতি ভক্তেরাও আছেন ।

আজ বুধবার, নন্দোৎসব, ১৮ই ভাদ্র, শ্রাবণ অষ্টমী নবমী তিথি ; ২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দ । ঠাকুরের অসুখের বিষয় সমস্ত ডাক্তার শুনিলেন । ঠাকুর নীচে মেজেতে আসিয়া ডাক্তারের কাছে বসিয়াছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঢাখো গা, ঔষধ সহ্য হয় না ! ধাত্ আলাদা ।

[টাকা স্পর্শন, গিরোবান্কা, সঞ্চয়—এ সব ঠাকুরের অসম্ভব ।]

“আচ্ছা, এটা তোমার কি মনে হয় ? টাকা ছুঁলে হাত এঁকে বেঁকে যায় ! নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় ! আর যদি আমি গিরো (গ্রন্থি) বাঁধি, যতক্ষণ না গিরো খোলা হয়, ততক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ হয়ে থাকবে !

এই বলিয়া একটি টাকা আনিতে বলিলেন । ডাক্তার দেখিয়া অবাক যে, হাতের উপর টাকা দেওয়াতে হাত বাঁকিয়া গেল ; আর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল ! টাকাটী স্থানান্তরিত করিবার পর, ক্রমে ক্রমে তিন বার দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িয়া, তবে হাত পুনর্বার শিথিল হইল ।

ডাক্তার মাষ্টারকে বলিতেছেন, Action on the nerves (স্নায়ুর উপর ক্রিয়া)’

[পূর্বকথা—শম্ভু মল্লিকের বাগানে আফিম সঞ্চয় । জন্মভূমি

কামারপুকুরে আম পাড়া । সঞ্চয় অসম্ভব ।]

ঠাকুর আবার ডাক্তারকে বলিতেছেন,—“আর একটি অবস্থা আছে । কিছু সঞ্চয় করবার যো নাই ! শম্ভু মল্লিকের বাগানে এক দিন গিছলাম । তখন বড় পেটের অসুখ । শম্ভু বলিল—একটু একটু আফিম খেও, তা হলে কম পড়বে । আমার কাপড়ের খোঁটে একট

আফিম বেঁধে দিলে । যখন ফিরে আসছি, ফটকের কাছে, কে জানে ঘুরতে লাগলাম—যেন পথ খুঁজে পাচ্ছি না । তার পর যখন আফিমটা খুলে ফেলে দিলে, তখন আবার সহজ অবস্থা হয়ে বাগানে ফিরে এলাম ।

“দেশেও আম পেড়ে নিয়ে আসছি—আর চলতে পারলাম না ; দাঁড়িয়ে পড়লাম ! তার পর সেগুলো একটা ডোবের মতন যায়গায় রাখতে হলো—তবে আসতে পারলাম ! আচ্ছা, ওটা কি ?

ডাক্তার । ওর পেছনে আর একটা (শক্তি) আছে : মনের শক্তি ।

মণি । ইনি বলেন এটা Godforce ঈশ্বরের শক্তি । আপনি বলছেন মনের শক্তি Will-force ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি) । আবার এমনি অবস্থা, যদি কেউ বলে, ‘কমে গেছে,’ ত অমনি অনেকটা কমে যায় । সে দিন ব্রাহ্মণী বলে, ‘আট আনা কমে গেছে,—অমনি নাচতে লাগলুম !

ঠাকুর ডাক্তারের স্বভাব দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন । তিনি ডাক্তারকে বলিতেছেন, “তোমার স্বভাবটী বেশ । জ্ঞানের দুটী লক্ষণ—শান্ত স্বভাব, আর অভিমান থাকবে না ।”

মণি । এঁর (ডাক্তারের) স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি) । আমি বলি, তিন টান হলে ভগবান্কে পাওয়া যায় । মা'য়ের ছেলের উপর টান, সতীর পতির উপর টান, বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান ।

“যা হ'ক, আমার বাবু এটা ভাল করো ।

ডাক্তার এইবার অস্থূখের স্থানটী দেখিবেন । গোল বারাণ্ডায় এক খানি কেদারাতে ঠাকুর বসিলেন । ঠাকুর প্রথমে ডাক্তার সরকারের কথা বলিতেছেন,—‘শালা, যেন গরুর জিহ্বা টিপ্লে !’

ভগবান । তিনি বোধ হয় ইচ্ছা করে ওরূপ করেন নাই ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । না তা নয়, খুব ভাল করে দেখাবে বলে টিপেছিল ।

চতুর্থ ভাগ—সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

শ্যামপুকুর বাটীতে ডাক্তার সরকার, নরেন্দ্র, শশী,

শরৎ, মাষ্টার, গিরীশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুর বাটীতে চিকিৎসার্থ ভক্তসঙ্গে বাস করিতেছেন । আজ কোজাগর পূর্ণিমা, শুক্রবার । ২৩ অক্টোবর ১৮৮৫, বেলা ১০টা । ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন ।

মাষ্টার তাঁহার পায়ে মোজা পরাইয়া দিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) Comforterটা কেটে পায় পরলে হয় না ? বেশ গরম । [মাষ্টার হাসিতেছেন ।

গত কলা বৃহস্পতিবার রাতে ডাক্তার সরকারের সহিত অনেক কথা হইয়া গিয়াছে । শ্রীশ্রীকথামৃত প্রথমভাগে এ সব কথা প্রকাশিত হইয়াছে । ঠাকুর সে সকল কথা উল্লেখ করিয়া মাষ্টারকে হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন—‘কাল কেমন তুঁত তুঁত বল্লম !’

[পূর্বকথা—উন্মাদাবস্থায় কুঠীর পেছনে যেন গায়ে হোমাগ্নি জ্বলন ।

পণ্ডিত পদ্যালোচনের বিশ্বাস ও তাঁহার মৃত্যু ।]

ঠাকুর কাল বলিয়াছিলেন,—জীবেরা ত্রিতাপে জ্বলছে, তবু বলে বেশ আছি । বেঁকা কাঁটা দিয়ে হাত কেটে যাচ্ছে, দরদর করে রক্ত পড়ছে,—তবু বলে, ‘আমার হাতে কিছু হয় নাই’ । জ্ঞানাগ্নি দিয়ে এই কাঁটা তো পোড়াতে হবে ।

ছোট নরেন এ কথা স্মরণ করিয়া বলিতেছেন,—‘কালকের বাঁকা কাঁটার কথাটা বেশ ! জ্ঞানাগ্নিতে জ্বালিয়ে দেওয়া ’

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমার সাক্ষাৎ এ সব অবস্থা হোতো ।

“কুঠীর পেছন দিয়ে যেতে যেতে—গায়ে যেন হোমাগ্নি জ্বলে গেল !

“পদ্যালোচন বলেছিল,—‘তোমার অবস্থা সভা করে লোকদের বলবো !’ তার পর কিন্তু তার মৃত্যু হলো ।

বেলা এগারটার সময় ঠাকুরের সংবাদ লইয়া ডাক্তার সরকারের বাটীতে মণি আসিয়াছেন ।

ডাক্তার ঠাকুরের সংবাদ লইয়া তাঁহারই বিষয় কথাবার্তা কহিতেছেন—তাঁহার কথা শুনিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন ।

ডাক্তার (সহাস্তে) । আমি কাল কেমন বল্লাম, ‘তুঁছ তুঁছ’ বলতে গেলে তেমনি ধুনুরির হাতে পড়তে হয় !

মণি । আচ্ছা হাঁ, তেমন গুরুর হাতে না পড়লে অহঙ্কার যায় না ।

‘কাল ভক্তির কথা কেমন বল্লেন !—ভক্তি মেয়ে মানুষ, অন্তঃপুর পর্য্যন্ত যেতে পারে ।

ডাক্তার । হাঁ ওটী বেশ কথা ।

কিন্তু তা বলে জ্ঞান তো আর ছেড়ে দেওয়া যায় না ।

মণি । পরমহংসদেব তা ত বলেন না । তিনি জ্ঞান ভক্তি দুইই লন—নিরাকার সাকার । তিনি বলেন, ভক্তি হিমে জলের খানিকটা বরফ হলো, আবার জ্ঞানসূর্য্য উদয় হলে বরফ গলে গেল । অর্থাৎ ভক্তিযোগে সাকার, জ্ঞান যোগে নিরাকার ।

“আর দেখেছেন ঈশ্বরকে এত কাছে দেখেছেন যে তাঁর সঙ্গে সর্বদা কথা কচ্ছেন । ছোট ছেলেটির মত বলছেন,—‘মা বড় লাগছে !’

“আর কি Observation (দর্শন) ! Museumএ, (যাদুঘরে) fossil (জানোয়ার পাথর) হয়ে গেছে দেখেছিলেন । অমনি সাধুসঙ্গের উপমা হয়ে গেল ! পাথরের কাছে থেকে থেকে পাথর হয়ে গেছে, তেমনি সাধুর কাছে থাকতে থাকতে সাধু হয়ে যায় ।

ডাক্তার । ঈশান বাবু কাল অবতার অবতার করছিলেন । অবতার আবার কি !—মানুষকে ঈশ্বর বলা !

মণি । ওঁদের যা যা বিশ্বাস, তা আর interfere (তাতে হস্তক্ষেপ) করে কি হবে ?

ডাক্তার । হাঁ, কাজ কি ।

মণি । আর ও কথাটীতে কেমন হাসিয়েছেন !—‘একজন দেখে গেল, একটা বাড়ী পড়ে গেছে কিন্তু খপরের কাগজে ওটী লিখা নাই । এত-এব ও বিশ্বাস করা যাবে না ।’

ডাক্তার চুপ করিয়া আছেন—কেননা ঠাকুর বলিয়াছিলেন, ‘তোমার

Scienceএ অবতারের কথা নাই, এতএব অবতার নাই !’

বেলা দ্বিপ্রহর হইল । ডাক্তার মণিকে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন ।
অন্যান্য রোগী দেখিয়া অবশেষে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে যাইবেন ।

ডাক্তার সে দিন গিরীশের নিমন্ত্রণে ‘বুদ্ধলীলা’ অভিনয় দেখিতে
গিয়াছিলেন । তিনি গাড়ীতে বসিয়া মণিকে বলিতেছেন,—‘বুদ্ধকে
দয়ার অবতার বলে ভাল হতো,—বিষ্ণুর অবতার কেন বলে ।’

ডাক্তার মণিকে হেড়য়ার চৌমাথায় নামাইয়া দিলেন ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

ঠাকুরের পরমহংসঅবস্থা । চতুর্দিকে আনন্দের কোয়াসা
দর্শন । ভগবতীর রূপ দর্শন—যেন বলছে, লাগ ভেকী ।

বেলা ৩টা । ঠাকুরের কাছে ২১টী ভক্ত বসিয়া আছেন । তিনি
‘ডাক্তার কখন আসিবে’ আর ‘কটা বেজেছে’, বালকের ন্যায় অধৈর্য্য
হইয়া বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন । ডাক্তার আজ সন্ধ্যার পর
আসিবেন । হঠাৎ ঠাকুরের বালকের ন্যায় অবস্থা হইয়াছে !

বালিস কোলে করিয়া যেন বাৎসল্যরসে আপ্লুত হইয়া ছেলেকে
দুধ খাওয়াইতেছেন ! ভাবাবিষ্ট ! বালকের ন্যায় হাসিতেছেন—
আর, এক রকম করিয়া কাপড় পরিতেছেন !

মণি প্রভৃতি অবাক হইয়া দেখিতেছেন ।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভাব উপশম হইল । ঠাকুরের খাবার সময়
হইয়াছে, তিনি একটু স্নজি খাইলেন ।

মণির কাছে নিভূতে অতিগুহ্য কথা বলিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি, একান্তে) । এতক্ষণ ভাবাবস্থায় কি
দেখছিলাম জান ?—“তিন চার ফ্রোশ ব্যাগী সিঙড়ে
স্বাবার স্নাস্তার মাঠ । সেই মাঠে আমি একাকী !—সেই
যে পনের ষোল বছরের ছকরার মত পরমহংস বটতলায় দেখেছিলাম,
আবার ঠিক সেই রকম দেখলাম !

“চতুর্দিকে আনন্দের কোয়াস!—তারই ভিতর থেকে ১৩।১৪ বছরের একটি ছেলে উঠলো, মুখটিদেখা যাচ্ছে । পূর্ণরূপ । দুই জনেই দিগম্বর!—তারপর আনন্দে মাঠে দুই জনে দৌড়াদৌড়ি আর খেলা ।

“দৌড়াদৌড়ি করে পূর্ণর জলতৃষ্ণা পেলে । সে একটা পাত্রে করে জল খেলে । জল খেয়ে আমায় দিতে আসে । আমি বললাম, ‘ভাই, তোর এঠো খেতে পারব না’ । তখন সে হাসতে হাসতে গিয়ে গ্রাস্টি ধুয়ে আর এক গ্রাস্ জল এনে দিলে ।

[‘ভয়ঙ্করা কালকামিনী’—দেখাচ্ছেন, সব ভেলকী ।]

ঠাকুর আবার সমাধিস্থ । কিয়ৎক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার মণির সহিত কথা কহিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আবার অবস্থা বদলাচ্ছে!—প্রসাদ খাওয়া উঠে গেল!—সত্য মিথ্যা এক হয়ে যাচ্ছে!—আবার কি দেখছিলাম জান?—ঈশ্বরীয় রূপ! ভগবতী মূর্তি—পেটের ভিতর ছেলে—তাকে বার করে আবার গিলে ফেলছে!—ভিতরে যতটা যাচ্ছে, ততটা শূন্য হয়ে! আমায় দেখাচ্ছে যে, সব শূন্য!

“যেন বলছে, লাগ! লাগ! লাগ! ভিক্ষি! লাগ!

মণি ঠাকুরের কথা ভাবিতেছেন । ‘বাজিকরই সত্য আর সব মিথ্যা’ ।

[সিদ্ধাই ভাল নয়। নীচু ঘরের সিদ্ধাই ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । আচ্ছা, তখন পূর্ণকে আকর্ষণ কলাম, ত হোলো না কেন? এইতে একটু বিশ্বাস কমে যাচ্ছে!

মণি । ও সব ত সিদ্ধাই । শ্রীরামকৃষ্ণ । ঘোর সিদ্ধাই!

মণি । সেই অধরসেনের বাড়ী থেকে গাড়ী করে আপনার সঙ্গে আমরা যখন দক্ষিণেশ্বরে আসছিলাম—বোতল ভেঙ্গে গেল । একজন বল্লেন যে, এতে কি হানি হবে, আপনি একবার দেখুন । আপনি বল্লেন, দায় পড়েছে, দেখবার জন্ম—ও সব ত সিদ্ধাই!

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঐ রকম হরির লুটের ছেলে!—রোগ ভাল করা!

কলিকাতা, শ্যামপুকুরে, ডাক্তার সরকার, গিরিশ প্রভৃতি সঙ্গে । ৩০৫
—এ সব সিদ্ধাই। মারা অতি নীচু মন, তানাই
ঈশ্বরকে ডাকে রোগ ভালর জন্য !

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

[পূর্ণজ্ঞান । দেহ ও আত্মা আলাদা । শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত ।]

সন্ধ্যা হইল । শ্রীরামকৃষ্ণ শয্যায় বসিয়া মার চিন্তা ও নাম করিতে-
ছেন । ভক্তেরা অনেকে তাঁহার কাছে নিঃশব্দে বসিয়া আছেন ।

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার সরকার আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ঘরে
লাটু, শশী, শরৎ, ছোট নরেন, পন্টু, ভূপতি, গিরীশ প্রভৃতি অনেক
ভক্তেরা আসিয়াছেন । গিরীশের সঙ্গে থিয়েটারের শ্রীযুক্ত রামতারণ
আসিয়াছেন—গান গাইবেন ।

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) । কাল রাত তিনটার সময় আমি
তোমার জন্ম বড় ভেবেছিলুম । রুষ্টি হ'ল,—ভাবলুম দোর টোর খুলে
রেখেছে—না কি করেছে, কে জানে !

শ্রীরামকৃষ্ণ ডাক্তারের স্নেহ দেখিয়া প্রসন্ন হইয়াছেন । আর
বলিতেছেন, ‘বল কি গো !’

“যতক্ষণ দেহটা আছে, ততক্ষণ যত্ন করতে হয় ।

“কিন্তু দেখছি যে, এটা আলাদা । কামিনীকাঞ্চনের উপর ভাল-
বাসা যদি একবারে চলে যায়, তা হলে ঠিক বুঝতে পারা যায় যে, দেহ
আলাদা আর আত্মা আলাদা । নার্কেলের জল সব শুকিয়ে গেলে
মালা আলাদা, শাঁস আলাদা, হয়ে যায় । তখন নার্কেল টের পাওয়া
যায়,—ঢপর্ ঢপর্ করছে । যেমন খাপ্ আর তরবার—খাপ্ আলাদা,
তরবার আলাদা ।

“তাই দেহের অস্থির জন্ম তাঁকে বেশী বলতে পারি না ।

গিরীশ । পণ্ডিত শশধর বলেছিলেন, ‘আপনি সমাধি অবস্থায়
দেহের উপর মনটা আনবেন,—তা হলে অস্থির সেরে যাবে ।’ ইনি ভাবে
দেখলেন যে, শরীরটা যেন ধ্যাড় ধ্যাড় করছে !

[পূর্বকথা—Museum দর্শন ও পীড়ার সময় প্রার্থনা ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । অনেক দিন হলো,—আমার তখন খুব ব্যামো । কালীঘরে ব'সে আছি,—মার কাছে প্রার্থনা করতে ইচ্ছা হলো ! কিন্তু ঠিক আপনি বলতে পারলাম না । বল্লুম,—মা, হৃদে বলে তোমার কাছে ব্যামোর কথা বলতে । আর বেশী বলতে পারলাম না—বলতে বলতে অমনি দপ্ করে মনে এলো সুসাইট Asiatic Society's Museum । সেখানকার তারে বাঁধা মানুষের হাড়ের দেহ skeleton । অমনি বল্লুম—‘মা, তোমার নাম গুণ করে বেড়াব—দেহটা একটু তার দিয়ে এঁটে দাও, সেখানকার মত !’

সিদ্ধাই চাইবার জো নাই !

“প্রথম প্রথম হৃদে বলেছিল—হৃদের অণ্ডার under ছিলাম কিনা—‘মার কাছে একটু ক্ষমতা চেও’ । কালীঘরে ক্ষমতা চাইতে গিয়ে দেখলাম—ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের রাঁড়—কাপড় তুলে ভড়্ ভড়্ করে হাগ্ছে ! তখন হৃদের উপর রাগ হলো,—কেন সে সিদ্ধাই চাইতে শিথিয়ে দিলে ।

[শ্রীযুক্ত রামতারণের গান । ঠাকুরের ভাবাবস্থা ।]

গান—আমার এই সাধের বীণে, যত্নে গাঁথা তারের হার ।

যে যত্ন জানে, বাজায় বীণে, উঠে সুখা অনিবার ॥

তানে মানে বাঁধলে ডুরী, শত ধারে বয় মাধুরী ।

বাজেনা আল্গা তারে, টানে ছিঁড়ে কোমল তার ॥

ডাক্তার (গিরীশের প্রতি) । গান এ সব কি original (নূতন) ?

গিরীশ । না Edwin Arnoldএর thought. (আর্নল্ড সাহেবের ভাব লয়ে গান)

রামতারণ প্রথমে বুদ্ধচরিত হইতে গান গাহিতেছেন ।—

জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই, কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই,
ফিরে ফিরে আসি কত কাঁদি হাসি, কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই ।

* * * * *

কর হে চেতন কে আছ চেতন, কত দিনে আর ভাবিবে স্বপন,
কে আছ চেতন ঘুমাইও না আর, দারুণ এ ঘোর নিবিড় অঁধার,

কলিকাতা শ্যামপুকুর। ডাক্তার সরকার, ছোটনরেন প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ৩০৭

কর তমো নাশ হও হে প্রকাশ, তোমা বিনে আর নাহিক উপায়,

তব পদে তাই শরণ চাই !

এই গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন ।

গান—কোঁ কোঁ কোঁ বহরে ঝড় ।

[সূর্য্যের অন্তর্যামী দেবতা দর্শন ।]

এই গানটি সমাপ্ত হইলে ঠাকুর বলিতেছেন,—“এ কি করলে !—
পায়েসের পর নিম ঝোল !”—

“যাই গাইলে—‘কর তমোনাশ’, অম্নি দেখ্লাম সূর্য্য !—উদয়
হবা মাত্র চার দিকের অন্ধকার ঘুচে গেল ! আর সেই সূর্য্যের পায়ে
সব শরণাগত হয়ে পড়ছে !”

রামতারণ আবার গাহিতেছেন—(শ্রীকথামৃত, তৃতীয় ভাগ ।)

গান—দীনতারিণী ছুরিতবারিণী, সত্ত্বরজঃতমঃ ত্রিগুণধারিণী,

সৃজনপালননিধনকারিণী, সগুণা নিগুণা সর্ববস্বরূপিণী ।

গান—ধরম করম সকলি গেল, শ্যামাপূজা বুঝি হলো না ।

মন নিবারিতে নারি কোন মতে, ছি, ছি, কি জালা বলনা ॥

এই গান শুনিয়া ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইলেন ।

গান—রাঙ্গা জবা কে দিলে তোর পায়ে মুটো মুটো ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

[ছোট নরেন প্রভৃতির ভাবাবস্থা । সন্ন্যাসী ও গৃহস্থের কর্তব্য ।]

গান সমাপ্ত হইল । ভক্তেরা অনেকে ভাবাবিষ্ট । নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া
আছেন । ছোট নরেন ধ্যানে মগ্ন । কাষ্ঠের ন্যায় বসিয়া আছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । (ছোট নরেনকে দেখাইয়া, ডাক্তারকে) । এ অতি
শুদ্ধ ! বিষয়বুদ্ধির লেশ এতে লাগে নাই ।

ডাক্তার নরেনকে দেখিতেছেন । এখনও ধ্যান ভঙ্গ হয় নাই ।

মনোমোহন (ডাক্তারের প্রতি, সহাস্যে) । আপনার ছেলের কথায়
বলেন,—‘ছেলেকে যদি পাই, বাপকে চাই না !’

ডাক্তার । অই তো !—তাইতো বলি, তোমরা ছেলে নিয়েই ভোলো ! (অর্থাৎ ঈশ্বরকে ছেড়ে অবতার বা ভক্তকে নিয়ে ভোলো)

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । বাপকে চাই না —তা বলছি না ।

ডাক্তার । তা বুঝিছি !—এ রকম দু'একটা না বললে হবে কেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তোমার ছেলেটি বেশ সরল । শম্ভু রাজা মুখ করে বলেছিল—‘সরল ভাবে ডাকলে তিনি শুন্বেনই শুন্বেন ।’ ছোকরাদের অত ভালবাসি কেন, জান ? ওরা খাঁটি দুধ, একটু ফুটিয়ে নিলেই হয়—ঠাকুরসেবায় চলে ।

“জোলো দুধ, অনেক জ্বাল দিতে হয়—অনেক কাঠ পুড়ে যায় !

“ছোকরারা ঘেন নূতন হাঁড়ি—পাত্র ভাল—দুধ নিশ্চিত হয়ে রাখা যায় । তাদের জ্ঞানোপদেশ দিলে শীঘ্র চৈতন্য হয় । বিষয়ী লোকদের শীঘ্র হয় না । দই পাতা হাঁড়িতে দুধ রাখতে ভয় হয়, পাছে নষ্ট হয় ।

“তোমার ছেলের ভিতর বিষয়বুদ্ধি—কামিনীকাঞ্চন—টোকে নাই ।

ডাক্তার । বাপের খাচ্ছেন, তাই !—

“নিজের ক'রতে হ'লে দেখতুম, বিষয়বুদ্ধি টোকে কি না !

[সন্ন্যাসী ও নারী ত্যাগ । সন্ন্যাসী ও কাঞ্চন ত্যাগ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । তা বটে, তা বটে । তবে কি জানো, তিনি বিষয়-বুদ্ধি থেকে অনেক দূর, তা না হলে হাতের ভিতর । (সরকার ও ডাক্তার দোকড়ীর প্রতি) কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ আপনাদের পক্ষে নয় । আপনারা মনে ত্যাগ করবে । গোস্বামীদের তাই বল্লাম—তোমরা ত্যাগের কথা কেন বোল্ছো ?—ত্যাগ করলে তোমাদের চলবে না—শ্যাম-সুন্দরের সেবা রয়েছে ।

“সন্ন্যাসীর পক্ষে ত্যাগ । তারা স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্য্যন্ত দেখবে না । মেয়ে মানুষ তাদের পক্ষে বিষবৎ । অন্ততঃ দশ হাত অন্তরে, একান্ত পক্ষে এক হাত অন্তরে থাকবে । হাজার ভক্ত স্ত্রীলোক হলেও তাদের সঙ্গে বেশী আলাপ করবে না ।

“এমন কি সন্ন্যাসীর এরূপ স্থানে থাকা উচিত, যেখানে স্ত্রীলোকের মুখ দেখা যায় না,—বা অনেক কাল পরে দেখা যায় ।

কলিকাতা শ্যামপুকুর । ডাক্তার সরকার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ৩০৯

“টাকাও সন্ন্যাসীর পক্ষে বিষ । টাকা কাছে থাকলেই ভাবনা, অহঙ্কার, দেহের সুখের চেষ্টা, ক্রোধ,—এই সব এসে পড়ে । রজোগুণ বৃদ্ধি করে । আবার রজোগুণ থাকলেই তমোগুণ । তাই সন্ন্যাসী কাঞ্চন স্পর্শ করে না । কামিনীকাঞ্চন ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয় ।

[ডাক্তারকে উপদেশ । টাকার ঠিক ব্যবহার । গৃহস্থের পক্ষে স্বদারা ।]

“তোমরা জান্বে যে, টাকাতে ডাল ভাত হয়, পরবার কাপড়;— থাকবার একটি স্থান হয়, ঠাকুরের সেবা,—সাধু ভক্তের সেবা হয় ।

“জমাবার চেষ্টা মিথ্যা । অনেক কষ্টে মৌমাছি ঢাক তৈয়ার করে,— আর একজন এসে ভেঙ্গে নিয়ে যায় !

ডাক্তার । জমাচ্ছেন কার জন্য ?—না, একটা বদ ছেলের জন্য !

শ্রীরামকৃষ্ণ । বদ ছেলে !—পরিবারটা হয়তো নষ্ট—উপপত্তি করে !—তোমারই ঘড়ি, তোমারই চেন, তাকে দেবে !

“তোমাদের পক্ষে স্ত্রীলোক একবারে ত্যাগ নয় । স্ব-দারায় গমন দোষের নয় । তবে ছেলে পুনে হসে গেলে, ভাই ভগ্নীর মত থাকতে হয় ।

“কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি থাকলেই বিচার অহঙ্কার, টাকার অহঙ্কার উচ্চপদের অহঙ্কার—এই সব হয় ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

[ডাক্তার সরকারকে উপদেশ । অহঙ্কার ভাল নয় । ‘বিচার আমি’ ভাল—তবে লোকশিক্ষা (Lecture) হয় ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । অহঙ্কার না গেলে জ্ঞান লাভ করা যায় না । উচু টিপিতে জল জমে না । খাল জমিতে চারদিক্কার জল ছড় ছড় করে আসে ।

ডাক্তার । কিন্তু খাল জমিতে যে চারদিক্কার জল আসে, তার ভিতর ভাল জলও আছে, খারাপ জলও আছে,—ঘোলা জল, হেগো জল,—এ সবও আছে । পাহাড়ের উপরও খাল জমি আছে । নৈনিতাল, মান-সরোবর—যেখানে কেবল আকাশের শুদ্ধ জল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কেবল আকাশের জল,—বেশ ।

ডাক্তার । আর উঁচু জায়গার জল চারিদিকে দিতে পারবে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । একজন সিদ্ধ মন্ত্র পেয়েছিল । সে পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলে দিলে—তোমরা এই মন্ত্র জপে ঈশ্বরকে লাভ করবে । ডাক্তার । হাঁ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তবে একটা কথা আছে, যখন ঈশ্বরের জন্ম প্রাণ ব্যাকুল হয়, ভাল জল—হেগো জল—এ সব হিসাব থাকে না । তাঁকে জান্বার জন্ম কখন ভাল লোকের কাছেও যায়, কখন কাঁচা লোকের কাছেও যায় । কিন্তু তাঁর কৃপা হলে ময়লা জলে কিছু হানি করে না । যখন তিনি জ্ঞান দেন, কোন্টা ভাল কোন্টা মন্দ, সব জানিয়ে দেন ।

“পাহাড়ের উপর খাল জমি থাকতে পারে, কিন্তু বজ্জাৎ-আমি-রূপ পাহাড়ে থাকে না । বিছার আমি, ভক্তের আমি, যদি হয়,—তবেই আকাশের শুদ্ধ জল এসে জমে ।

“উঁচু জায়গার জল চারদিকে দিতে পারা যায় বটে । সে বিছার আমি রূপ পাহাড় থেকে হতে পারে ।

“তাঁর আদেশ না হলে লোকশিক্ষা হয় না । শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানের পর ‘বিছার আমি’ রেখেছিলেন—লোকশিক্ষার জন্ম । তাঁকে লাভ না করে লেকচার (Lecture) ! তা’তে লোকের কি উপকার হবে ?

[পূর্বকথা—সামাধ্যায়ীর লেকচার । নন্দনবাগান সমাজ দর্শন ।]

“নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজে গিচ্লাম । তাদের উপাসনার পর বেদীতে বসে লেকচার দিলে ।—লিখে এনেছে !—পড়বার সময় আবার চারদিকে চায় !—ধ্যান কচ্ছে, তা এক একবার আবার চায় !

“যে ঈশ্বর দর্শন করে নাই, তার উপদেশ ঠিক ঠিক হয় না । একটা কথা যদি ঠিক হলো, তো আর একটা গোলমালে হয়ে যায় ।

“সামাধ্যায়ী লেকচার দিলে । বলে,—ঈশ্বর বাক্য মনের অতীত—তাঁতে কোন রস নাই—তোমরা প্রেমভক্তিরূপ রস দিয়ে তাঁর ভজনা কর । ছাখো, মিনি রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, তাঁকে এইরূপ বলছে ! এ লেকচারে কি হবে ? এতে কি লোকশিক্ষা হয় ?

কলিকাতা শ্যামপুকুর। ডাক্তার সরকার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে। ৩১১

এক জন বলেছিল—আমার মামার বাড়িতে এক গোয়াল ঘোঁড়া আছে !
গোয়ালে আবার ঘোঁড়া ! (সকলের হাস্য)। তাতে বুঝতে হবে
ঘোঁড়া নাই !

ডাক্তার (সহাস্যে)। গরুও নাই। (সকলের হাস্য ।)

ভক্তদের মধ্যে যাঁহারা ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন, সকলে প্রকৃতিস্থ
হইয়াছেন। ভক্তদের দেখিয়া ডাক্তার আনন্দ করিতেছেন।

মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ‘ইনি কে’ ‘ইনি কে’। পল্টু, ছোট
নরেন, ভূপতি, শরৎ, শশী প্রভৃতি ছোকরা ভক্তদিগকে মাষ্টার এক
একটী করিয়া দেখাইয়া ডাক্তারের কাছে পরিচয় দিতেছেন।

শ্রীযুক্ত শশী * সম্বন্ধে মাষ্টার বলিতেছেন—‘ইনি বি, এ (B A.)
পরীক্ষা দিবেন।’—ডাক্তার একটু অশ্রমস্ক হইয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। ছাথো গো ! ইনি কি বলছেন।

ডাক্তার শশীর পরিচয় শুনিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারকে দেখাইয়া, ডাক্তারের প্রতি)। ইনি সব
ইস্কুলের ছেলেদের উপদেশ দেন। ডাক্তার। তা শুনেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি আশ্চর্য্য, আমি মুখ !—তবু লেখাপড়া-ওয়ালারা
এখানে আসে, এ কি আশ্চর্য্য ! এতে ত বলতে হবে ঈশ্বরের খেলা !

আজ কোজাগর পূর্ণিমা। রাত প্রায় নয়টা হইবে। ডাক্তার
ছয়টা হইতে বসিয়া আছেন ও এই সকল ব্যাপার দেখিতেছেন।

গিরীশ (ডাক্তারের প্রতি)। আচ্ছা, মশায়, এ রকম কি আপনার
হয় ?—এখানে আসবো না আসবো না করছি,—যেন কে টেনে আনে !
—আমার নাকি হয়েছে, তাই বলছি।

ডাক্তার। তা এমন বোধ হয় না। তবে heartএর (হৃদয়ের) কথা
heartই (হৃদয়ই) জানে। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) আর এ সব বলাও
কিছু নয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত চতুর্থভাগ, সপ্তবিংশখণ্ডে, কোজাগর পূর্ণিমা
দিনে, শ্যামপুকুরে ভক্তসঙ্গ কথা সমাপ্ত।

* শশী ১৮৮৪ খৃঃ শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত । [1885, 24th October.

চতুর্থ ভাগ—অষ্টবিংশ অঙ্ক।

শ্যামপুর বাটীতে নরেন্দ্র, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[ডাক্তার সরকার ও সর্ষধর্ম্য পরীক্ষা (Comparative Religion,]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্র, মহিমাচরণ, মাষ্টার, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে শ্যামপুকুরের বাটীতে দ্বিতলা ঘরে বসিয়া আছেন । বেলা প্রায় একটা । ২৪এ অক্টোবর, ১৮৮৫ ; ৯ই কার্তিক ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তোমার এ (হোমিওপ্যাথিক) চিকিৎসা বেশ ।

ডাক্তার । এতে রোগীর অবস্থা বইয়ের সঙ্গে মেলাতে হয় । যেমন ইংরাজী-বাজনা,—দেখে পড়া আর গাওয়া ।

‘গিরীশ ঘোষ কই ?—থাক্ থাক্ কাল জেগেছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আচ্ছা, সিদ্ধির নেশার মত ভাবাবস্থায় হয়, ওটা কি ?

ডাক্তার (মাষ্টারকে) । Nervous centres,—action বন্ধ হয়, তাই অসাড়—এ দিকে পা টলে; যত Energies brain এর দিকে যায় । এই nervous system নিয়ে Life । ঘাড়ের কাছে আছে—Medulla Oblongata ; তার হানি হলে Life extinct হ’তে পারে ।

শ্রীযুক্ত মহিমা চক্রবর্তী সূক্ষ্মা নাড়ীর ভিতরে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির কথা বলিতেছেন ;—“Spinal Cord এর ভিতর সূক্ষ্মা নাড়ী সূক্ষ্মভাবে আছে—কেউ দেখতে পায় না । মহাদেবের বাক্য ।

ডাক্তার । মহাদেব man in the maturityকে examine করেছে । Europeanরা Embryo থেকে maturity পর্য্যন্ত সমস্ত stage দেখেছে । Comparative history সব জানা ভাল । সাঁওতালদের history পড়ে জানা গেছে যে, কালী একজন সাঁওতালী মাগী ছিল—খুব লড়াই করেছিল । (সকলের হাস্য ।)

‘তোমরা হেঁসো না । আবার Comparative anatomyতে কত

কলিকাতা শ্যামপুকুর । নরেন্দ্র,মহিমা, সরকার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ৩১৩

উপকার হয়েছে, শোনো । প্রথমে pancreatic juice ও bileএর পিত্তের) actionএর (ক্রিয়ার) তফাৎ বোঝা যাচ্ছিল না । তার পর Claude Bernard খরগোষের stomach, liver, প্রভৃতি examine করে দেখালে যে,bileএর action আর ঐ juiceএর action আলাদা ।

“তা হলেই দাঁড়ালো যে, lower animalদের আমাদের দেখা উচিত—শুধু মানুষকে দেখলে হবে না ।

“সেইরূপ Comparative Religionতে বিশেষ উপকার ।

“এই যে ইনি (পরমহংসদেব) যা বলেন, তা অত অন্তরে লাগে কেন ? এঁর সব ধর্ম দেখা আছে—হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, শাক্ত, বৈষ্ণব,—এ সব ইনি নিজে করে দেখেছেন । মধুকর নানা ফুলে বসে মধু সঞ্চয় করলে তবেই চাক্টি বেশ হয় ।

মাস্টার (ডাক্তারকে) । ইনি (মহিমা) খুব Science পড়েছেন ।

ডাক্তার (সহাস্ত্রে) । কি,Maxmuller's Science of Religion ?

মহিমা (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) । আপনার অমুখ, ডাক্তারেরা আর কি করবে ? যখন শুন্লাম যে আপনার অমুখ করেছে, তখন ভাবলাম যে, ডাক্তারের অহঙ্কার বাড়াচ্ছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ইনি খুব ভাল ডাক্তার । আর খুব বিদ্যা ।

মহিমাচরণ । আজ্ঞা হাঁ, উনি জাহাজ, আর আমরা সব ডিজি ।

ডাক্তার বিনীত হইয়া হাত জোড় করিতেছেন ।

মহিমা । তবে ওখানে (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে) সবই সমান ।

ঠাকুর নরেন্দ্রকে গান গাইতে বলিতেছেন । ~~নরেন্দ্রের~~ গান—

গান—তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা ।

গান—অহঙ্কারে মত্ত সদা, অপার বাসনা ।

গান—চমৎকার অপার, জগৎ রচনা তোমার ! শোভার আগার বিশ্ব সংসার ।

গান—মহা সিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ, তোমারি রচিত ছন্দ মহান্ বিশ্বের গীত । মর্ত্যের মৃত্তিকা হয়ে,ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লয়ে, আমিও দুয়ারে তব, হয়েছি হে উপনীত । কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন

মাগি,তোমাংরে শোনাব গীতি এসেছি তাহারি লাগি । গায় যথা রবি শশী,
সেই সভা মাঝে বসি, একান্তে গাইতে চাহে এই ভকতের চিত ।

গান—ওহে রাজরাজেশ্বর, দেখা দাও ! করুণা-ভিখারী আমি
করুণা কটাক্ষে চাও ॥ চরণে উৎসর্গ দান করিতেছি এই প্রাণ,
সংসার-অনলকুণ্ডে ঝলসি গিয়াছে তাও ॥ কলুষ-কলঙ্কে তাহে আবরিত
এ হৃদয় । মোহে মুগ্ধ মৃতপ্রায়, হয়ে আছি দয়াময়, মৃতসঞ্জীবনী মস্ত্রে
শোধন করিয়ে লও ॥

গান—-হরি রস মদিরা পিয়ে মম মানস মাতো রে ।

লুটায়ে অবনীতল হরি হরি বলি কাঁদো রে ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ । আর ‘মো কুচ হাস্য সো তুঁহি হাস্য ?’

ডাক্তার । আহা ! [গান সমাপ্ত হইল । ডাক্তার মুগ্ধপ্রায় হইয়াছেন ।

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার অতি ভক্তিভাবে হাত জোড় করিয়া
ঠাকুরকে বলিতেছেন, ‘তবে আজ যাই,—আবার কাল আস্বো ।’

শ্রীরামকৃষ্ণ । একটু থাকো না ! গিরীশ ঘোষকে খপর দিয়েছে ।

(মহিমাকে দেখাইয়া) “ইনি বিদ্বান্ হরিনামে নাচেন ; অহঙ্কার নাই
—কোন্নগরে চলে গিছিলেন—আমরা গিছলাম বলে ; আবার স্বাধীন,
ধনবান্, কারু চাকরী করতে হয় না । (নরেন্দ্রকে দেখাইয়া) এ কেমন ?

ডাক্তার । খুব ভাল !

শ্রীরামকৃষ্ণ । আর ইনি—

ডাক্তার । আহা !

মহিমাচরণ । হিন্দুদের দর্শন না পড়লে দর্শন পড়াই হয় না ।

সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ইউরোপ জানে না—বুঝতেও পারে না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । কি তিন পথ তুমি বলো ?

মহিমা । সৎপথ—জ্ঞানের পথ । চিত্তপথ, যোগের । কৰ্ম্মযোগ ।
তাই চার আশ্রমের ক্রিয়া, কি কি কর্তব্য, এর ভিতর আসছে । আনন্দপথ
—ভক্তিপ্রেমের পথ ।—আপনাতে তিন পথেরই ব্যাপার—আপনি তিন
পথেরই খপর বাত্লে দেন । (ঠাকুর হাসিতেছেন ।)

মহিমা । আমি আর কি বলবো ? জনক বক্তা, শুকদেব শ্রোতা !

ডাক্তার বিদায় গ্রহণ করিলেন ।

কলিকাতা শ্যামপুকুর । নরেন্দ্র, মহিমা, সরকার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ৩১৫

[সন্ধ্যার পর সমাধিস্থ । নিত্যগোপাল ও নরেন্দ্র । জপাং সিদ্ধি ।]

সন্ধ্যার পর চাঁদ উঠিয়াছে । আজ কোজাগর পূর্ণিমার পরদিন, শনিবার, ৯ই কার্তিক । ঠাকুর সমাধিস্থ । দাঁড়াইয়া আছেন । নিত্যগোপালও তাঁহার কাছে ভক্তিভাবে দাঁড়াইয়া আছেন ।

ঠাকুর উপবিষ্ট হইয়াছেন—নিত্যগোপাল পদসেবা করিতেছেন । দেবেন্দ্র, কালীপদ প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্ত কাছে বসিয়া আছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (দেবেন্দ্র প্রভৃতির প্রতি) । এমনি মনে উঠছে, নিত্যগোপালের এ অবস্থাগুলো এখন যাবে,—ওর সব মন কুড়িয়ে আমাতেই আসবে,—যিনি এর ভিতর আছেন, তাঁতে ।

“নরেন্দ্রকে দেখছো না ?—সব মনটা ওর আমারি উপর আসছে !

ভক্তেরা অনেকে বিদায় লইতেছেন । ঠাকুর দাঁড়াইয়া আছেন । একজন ভক্তকে জপের কথা বলিতেছেন—“জপ করা কিনা নির্জনে নিঃশব্দে তাঁর নাম করা । একমনে নাম করতে করতে—জপ করতে করতে—তাঁর রূপ দর্শন হয়—তাঁর সাক্ষাৎকার হয় । শিকলে বাঁধা কড়িকাঠ গঙ্গার গর্ভে ডুবান আছে—শিকলের আর একদিক্ তীরে বাঁধা আছে । শিকলের এক একটা পাপ (Link) ধরে ধরে গিয়ে, ক্রমে ডুব মেরে শিকল ধরে ধরে যেতে যেতে ঐ কড়িকাঠ স্পর্শ করা যায় ! ঠিক সেই রূপ জপ করতে করতে মগ্ন হয়ে গেলে ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয় ।”

কালীপদ (সহাস্রে, ভক্তদের প্রতি) ! আমাদের এ খুব ঠাকুর ! —জপ, ধ্যান, তপস্যা করতে হয় না !

এই সময় ঠাকুর হঠাৎ বলিতেছেন—‘এটা কেমন কচ্ছে !’

ঠাকুরের গলায় অসুখ করিতেছে । দেবেন্দ্র বলিতেছেন—‘এ কথায় আর ভুলি না !’ দেবেন্দ্রের এই মনের ভাব যে, ঠাকুর কেবল ভক্তদের ভুলাইবার জন্য অসুখ দেখাইতেছেন ।

ভক্তেরা বিদায় গ্রহণ করিলেন । রাত্রে কয়েকটা ছোকরা ভক্ত পালা করিয়া থাকিবেন । আজ মার্চটারও রাত্রে থাকিবেন ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থভাগ, অষ্টবিংশ খণ্ড সমাপ্ত ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত । [1885, 27th October.

চতুর্থ ভাগ—উনত্রিংশ অঙ্ক ।

—:~:—

শ্যামপুকুর বাটীতে নরেন্দ্র, মণি প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[অস্থখ কেন । নরেন্দ্রের প্রতি সন্ন্যাসের উপদেশ ।]

ঠাকুর শ্যামপুকুর বাটীতে নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন ।
বেলা দশটা । আজ ২৭ অক্টোবর ১৮৮২, মঙ্গলবার, আশ্বিন কৃষ্ণা চতুর্থী,
১২ই কার্তিক । ২৬শে অক্টোবর, ১১ই কার্তিকের কথা ও ডাক্তার
সরকারের সহিত বিচার, শ্রীকথামৃত প্রথম ভাগে প্রকাশিত হইয়াছে ।

ঠাকুর নরেন্দ্র, মণি প্রভৃতির সহিত কথা কহিতেছেন ।

নরেন্দ্র । ডাক্তার কাল কি করে গেল !

একজন ভক্ত । সূতোয় মাছ গিঁথেছিল, ছিড়ে গেল !

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । বঁড়শি বেঁধা আছে, মরে ভেসে উঠবে ।

নরেন্দ্র একটু বাহিরে গেলেন, আবার আসিবেন । ঠাকুর মণির
সহিত পূর্ণ সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ । তোমায় বলছি—এ সব জীবের শূন্যে নাই—
প্রকৃতিভাবে পুরুষকে (ঈশ্বরকে) আলিঙ্গন চুষন করতে ইচ্ছা হয় ।

মণি । নানা রকম খেলা—আপনার রোগ পর্যাণ্ড খেলার মধ্যে ।
এই রোগ হয়েছে বলে এখানে নূতন নূতন ভক্ত আসছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । ভূপতি বলে, রোগ না হলে শুধু বাড়ী
ভাড়া করলে লোকে কি ব'লত ।—আচ্ছা, ডাক্তারের কি হ'ল ?

মণি । এদিকে দাস্ত্র মানা আছে—‘আমি দাস তুমি প্রভু’ ।
আবার বলে—মানুষ উপমা আনো কেন !

শ্রীরামকৃষ্ণ । দেখলে ! আজ কি আর তুমি তার কাছে যাবে ?

মণি । খপর দিতে যদি হয়, তবে যাব ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । বন্ধিম ছেলেটি কেমন ? এখানে যদি আসতে না
পারে, তুমি না হয় তারে সব বলবে ।—চৈতন্য হবে ।

কলিকাতা শ্যামপুকুর । নরেন্দ্র, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি সঙ্গে । ৩১৭

[আগে সংসারের গোছগাছ, না ঈশ্বর ? কেশব ও নরেন্দ্রকে ইঙ্গিত ।]

নরেন্দ্র আসিয়া কাছে বসিলেন । নরেন্দ্র পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হওয়াতে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন । মা ও ভাই এরা আছেন, তাহাদের ভরণ পোষণ করিতে হইবে । নরেন্দ্র আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন । মধ্যে বিদ্যাসাগরের বৌবাজারের স্কুলে কয়েক মাস শিক্ষকতা করিয়াছিলেন । বাটীর একটা ব্যবস্থা করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন,— এই চেষ্টা কেবল করিতেছেন । ঠাকুর সমস্তই অবগত

আছেন—নরেন্দ্রকে একদৃষ্টে সন্মুখে দেখিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারকে) । আচ্ছা, কেশব সেনকে বল্লাম,—~~সদৃশ~~ লাভ । যে বড় ঘরের ছেলে, তার খাবার জন্য ভাবনা হয় না—সে মাসে মাসে মুসোহারা পায় । তবে নরেন্দ্রের অত উঁচু ঘর, তবু হয় না কেন ? ভগবানে মন সব সমর্পণ করলে তিনি ত সব জোগাড় করে দিবেন !

মাষ্টার । আজ্ঞা হবে ; এখনও ত সব সময় যায় নাই ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কিন্তু তীব্র বৈরাগ্য হলে ওসব হিসাব থাকে না । ‘বাড়ীর সব বন্দোবস্ত করে দিব, তার পরে সাধনা করবো’—তীব্র বৈরাগ্য হলে এরূপ মনে হয় না । (সহাস্তে) গৌঁসাই লেকচার দিয়ে ছিল । তা বলে, দশ হাজার টাকা হলে ঐ থেকে খাওয়া দাওয়া এই সব হয়—তখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঈশ্বরকে বেশ ডাকা যেতে পারে !’

“কেশব সেনও ঐ ইঙ্গিত করেছিল । বলেছিল,—‘মহাশয়, যদি কেউ বিষয় আশয় ঠিক ঠাক করে, ঈশ্বর চিন্তা করে—তা পারে কি না ? তার তাতে কিছু দোষ হতে পারে কি ?’

“আমি বল্লাম, তীব্র বৈরাগ্য হলে সংসার পাতকুয়া, আত্মীয় কাল সাপের মত, বোধ হয় । তখন, ‘টাকা জমাবো,’ ‘বিষয় ঠিক ঠাক করবো’ এ সব হিসাব আসে না । **ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু !**—ঈশ্বরকে ছেড়ে বিষয়চিন্তা !

“একটা মাগীর ভারি শোক হয়েছিল । আগে নংটা কাপড়ের আঁচলে বাঁধলে,—তার পর ‘ওগো ! আমার কি হলো গো !’ বলে আছড়ে পড়লো—কিন্তু খুব সাবধান, নংটা না ভেঙ্গে যায় ।

সকলে হাসিতেছেন । নরেন্দ্র এই সকল কথা শুনিয়া বাগবিদ্বের ন্যায় একটু কাইত্ হইয়া শুইয়া পড়িলেন । তাঁর মনের অবস্থা বুঝিয়া—

মাষ্টার (নরেন্দ্রের প্রতি সহাস্ত্রে) । শুয়ে পড়লে যে !

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি, সহাস্ত্রে) । ‘আমি তো আপনার ভাসুরকে নিয়ে আছি তাইতেই লজ্জায় মরি, এরা সব (অন্য মাগীরা) পরপুরুষ নিয়ে কি করে থাকে !’

মাষ্টার নিজে সংসারে আছেন, লজ্জিত হওয়া উচিত । নিজের দোষ কেহ দেখে না— অপরের ছাথে ! ঠাকুর এই কথা বলিতেছেন । এক জন স্ত্রীলোক ভাসুরের সঙ্গে নষ্ট হইয়াছিল । সে নিজের দোষ কম অন্য নষ্ট স্ত্রীলোকদের দোষ বেশী, মনে করিতেছে । বলে, ‘ভাসুর তো আপনার লোক, তাইতেই লজ্জায় মরি !’

[মুক্তহস্ত কে ? চাকরী ও খোসামোদের টাকায় বেশী মায়া ।]

নীচে একজন বৈষ্ণব গান গাইতেছিল । ঠাকুর শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন । বৈষ্ণবকে কিছু পয়সা দিতে বলিলেন । একজন ভক্ত কিছু দিতে গেলেন । ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কি দিলে ? একজন ভক্ত বলিলেন—‘তিনি দু পয়সা দিয়াছেন !’

ঠাকুর বলিতেছেন—‘চাকরি করা টাকা কিনা !—অনেক কর্মের টাকা—খোসামোদের টাকা ! মনে করেছিলাম, চার আনা দিবে !’

[Electricity তাড়িতযন্ত্র ও বাগ্‌চী চিত্রিত ষড়ভূজ ও রামচন্দ্রের আলেখ্য দর্শন । পূর্বকথা—দক্ষিণেশ্বরে দীর্ঘকেশ সন্ন্যাসী ।]

ছোট নরেন ঠাকুরকে যন্ত্র আনিয়া তাড়িতের প্রকৃতি দেখাইবেন বলিয়াছিলেন । আজ আনিয়া দেখাইলেন ।

বেলা দুইটা । ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন । অতুল একটা বন্ধু মুনসেফ্‌কে আনিয়াছেন । শিকদারপাড়ার প্রসিদ্ধ চিত্রকর বাগ্‌চী আসিয়াছেন । কয়েকখানি চিত্র ঠাকুরকে উপহার দিলেন ।

ঠাকুর আনন্দের সহিত পট দেখিতেছেন । ষড়ভূজ মূর্তি দর্শন করিয়া ভক্তদের বলিতেছেন—‘ছাথো দ্যাথো, কেমন হয়েছে !’

ভক্তদের আবার দেখাইবার জন্য ‘অহল্যা পাষণীর’ পট আনিতে

কলিকাতা শ্যামপুকুর । নরেন্দ্র, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ৩১৯
বলিলেন । পটে শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিয়া আনন্দ করিতেছেন ।

শ্রীযুক্ত বাগ্‌চীর মেয়েদের মত লম্বা চুল । ঠাকুর বলিতেছেন,
অনেক কাল হ'ল দক্ষিণেশ্বরে একটা সন্ন্যাসী দেখেছিলাম । ন হাত
লম্বা চুল । সন্ন্যাসীটী 'রাধে, রাধে' করতো । ঢং নাই ।

কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র গান গাইতেছেন । গান গুলি বৈরাগ্য পূর্ণ ।
ঠাকুরের মুখে তীব্র বৈরাগ্যের কথা ও সন্ন্যাসের উপদেশ শুনিয়া কি
নরেন্দ্রের উদ্দীপন হইল ? নরেন্দ্রের গান—

গান—যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিছে,

গান—অন্তরে জাগিছে ওমা অন্তরঙ্গামিনী ।

গান—কি মুখ জীবনে মম ওহে নাথ দয়াময় হে,

যদি চরণ-সরোজে, পরাণ-মধুপ, চির মগন না রয় হে !

—:—

চতুর্থ ভাগ—ত্রিংশ খণ্ড ।

—:—

[শ্যামপুকুর বাটীতে হরিবল্লভ, নরেন্দ্র, মিশ্র, প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ।]

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

শ্রীযুক্ত বলরামের জন্য চিন্তা । শ্রীযুক্ত হরিবল্লভ বয়স ।

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুরের বাটীতে ভক্তসঙ্গে চিকিৎসার্থ বাস করিতে-
ছেন । আজ শনিবার । আশ্বিন, কৃষ্ণা অষ্টমী তিথি ; ১৬ই কার্তিক ।
বেলা নয়টা । ৩১ অক্টোবর, ১৮৮৫ খৃঃ ।

এখানে ভক্তেরা দিবারাত্রি থাকেন—ঠাকুরের সেবার্থ । এখনও কেহ
সংসার ত্যাগ করেন নাই ।

বলরাম সপরিবারে ঠাকুরের সেবক । তিনি যে বংশে জন্মিয়াছেন,
সে অতি ভক্তবংশ । পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন বৃন্দাবনে একাকী
বাস করেন—তঁাহাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের কুঞ্জে তঁাহার

পিতৃব্যপুত্র শ্রীযুক্ত হরিবল্লভ বসু ও বাটীর অন্যান্য সকলেই বৈষ্ণব ।

হরিবল্লভ কটকের প্রধান উকিল । পরমহংসদেবের কাছে বলরাম যাতায়াত করেন—বিশেষতঃ মেয়েদের লইয়া যান—শুনিয়া বিরক্ত হইয়াছেন । দেখা হইলে, বলরাম বলিয়াছিলেন, তুমি তাঁহাকে একবার দর্শন কর—তার পর যা হয় বোলো ।

আজ হরিবল্লভ আসিয়াছেন, তিনি ঠাকুরকে দর্শন করিয়া অতি ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কি করে ভাল হবে !—আপনি কি দেখ্‌ছো, শব্দ ব্যামো ? হরিবল্লভ । আজ্ঞা, ডাক্তারেরা বলতে পারেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । মেয়েরা পায়ের ধূলা লয় । তা ভাবি একরূপে তিনিই (ঈশ্বর) ভিতরে আছেন—হিসাব আনি ।

হরিবল্লভ । আপনি সাধু ! আপনাকে সকলে প্রণাম করবে, তাতে দোষ কি ? শ্রীরামকৃষ্ণ । সে ঋব, প্রহ্লাদ, নারদ, কপিল,—এরা কেউ হলে হতো । আমি কি ! আপনি আবার আসবেন ।

হরি । আজ্ঞা, আমাদের টানেই আস্বো—আপনি বলছেন কেন ।

হরিবল্লভ বিদায় লইবেন—প্রণাম করিতেছেন । পায়ের ধূলা লইতে যাইতেছেন—ঠাকুর পা সরাইয়া লইতেছেন । কিন্তু হরিবল্লভ ছাড়িলেন না—জোর করিয়া পায়ের ধূলা লইলেন ।

হরিবল্লভ গাত্রোখান করিলেন । ঠাকুর যেন তাঁহাকে খাতির করিবার জন্য দাঁড়াইলেন । বলিতেছেন,—“বলরাম অনেক দুঃখ করে । আমি মনে কল্লাম, একদিন যাই—গিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা করি । তা আবার ভয় হয় । পাছে তোমরা বল, ‘একে কে আনলে !’”

হরি । ও সব কথা কে বলেছে । আপনি কিছু ভাববেন না ।

হরিবল্লভ চলিয়া গেলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । ভক্তি আছে—তা না হলে জোর করে পায়ের ধূলা নিলে কেন ?

“সেই যে চোমায় বলেছিলাম, ‘ভাবে দেখলাম ডাক্তার ও আর এক জনকে’—এই সেই আর একজন ! তাই দেখো এসেছে !

কলিকাতা, শ্যামপুকুর । নরেন্দ্র, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি সঙ্গে । ৩২১

মাফটার । আজ্ঞে, ভক্তিরই ঘর । শ্রীরামকৃষ্ণ । কি সরল !

ডাক্তার সরকারের কাছে ঠাকুরের অমৃতের সংবাদ দিবার জন্য মাফটার শাঁখারিটোলায় আসিয়াছেন । ডাক্তার আজ আবার ঠাকুরকে দেখিতে যাইবেন ।

ডাক্তার ঠাকুরের ও মহিমাচরণ প্রভৃতি ভক্তদের কথা বলিতেছেন ।

ডাক্তার । কৈ, তিনি (মহিমাচরণ) সে বইতো আনেন নাই—যে বই আমাকে দেখাবেন বলেছিলেন ! বল্লে, ভুল হয়েছে । তা হতে পারে—আমারও হয় । মাফটার । তাঁর বেশ পড়া শুনা আছে ।

ডাক্তার । তা হলে এই দশা !

ঠাকুরের সম্বন্ধে ডাক্তার বলিতেছেন, “শুধু ভক্তি নিয়ে কি হবে—জ্ঞান যদি না থাকে !”

মাফটার । কেন, ঠাকুর ত বলেন—জ্ঞানের পর ভক্তি । তবে তাঁর জ্ঞান ভক্তি—আর আপনাদের ‘জ্ঞান ভক্তি’র মানে অনেক তফাৎ ।

“তিনি যখন বলেন—‘জ্ঞানের পর ভক্তি’ তার মানে—তত্ত্বজ্ঞানের পর ভক্তি, ব্রহ্মজ্ঞানের পর ভক্তি—ভগবানকে জানার পর ভক্তি । আপনাদের জ্ঞান মানে—sense-knowledge (ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে পাওয়া জ্ঞান ।) প্রথমটী not verifiable by our standard তত্ত্বজ্ঞান ইন্দ্রিয়লভ্য জ্ঞানের দ্বারা ঠিক করা যায় না । দ্বিতীয়টী, (জড়জ্ঞান) verifiable.

ডাক্তার চুপ করিয়া ; আবার অবতার সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন ।

ডাক্তার । অবতার আবার কি ? আর পায়ের ধূলা লওয়া কি !

মাফটার । কেন, আপনি তো বলেন experiment সময় তাঁর সৃষ্টি দেখে ভাব হয়, মানুষ দেখলে ভাব হয় । তা যদি হয়, ঈশ্বরকে কেন না মাথা নোয়াবো ! মানুষের হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর আছেন ।

“হিন্দু ধর্ম্মে আছে সর্বভূতে নারায়ণ । এটা তত আপ-
নার জানা নাই । সর্বভূতে যদি থাকেন, তাঁকে প্রণাম কর্তে কি ?

“পরমহংসদেব বলেন, কোনো কোনো জিনিসে তিনি বেশী প্রকাশ ।
সূর্য্যের প্রকাশ জলে, আর্শীতে । জল সব জায়গায় আছে—কিন্তু নদীতে

পুঙ্খনীর্তে, বেশী প্রকাশ । ঈশ্বরকেই নমস্কার করা হয়—মানুষকে নয় ।

God is God—not, Man is God.

“তাকে তো reasoning (সামান্য বিচার) করে জানা যায় না—
সমস্ত বিশ্বাসের উপর নির্ভর । এই সব কথা ঠাকুর বলেন ।

আজ মাফটারকে ডাক্তার তাঁহার রচিত একখানি বই উপহার দিলেন
—Physiological Basis of Psychology—‘as a token of
brotherly regards’.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও Jesus Christ. তাঁহাতে খৃষ্টের আবির্ভাব ।]

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন । বেলা এগারটা । মিশ্রনামক
একটি খৃষ্টান ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন । মিশ্রের বয়ঃক্রম
৩৫ বৎসর হইবে । মিশ্র খৃষ্টানবংশে জন্মিয়াছেন । যদিও সাহেবের
পোষাক,—ভিতরে গেরুয়া আছে । এখন সংসার ত্যাগ করিয়াছেন ।
ইহার জন্মস্থান পশ্চিমাঞ্চলে । একটি ভ্রাতার বিবাহের দিনে তাঁহার
এবং আর একটি ভ্রাতার এক দিনে মৃত্যু হয় । সেই দিন হইতে মিশ্র
সংসার ত্যাগ করিয়াছেন । তিনি Quaker সম্প্রদায়ভুক্ত ।

মিশ্র । ‘ওহি রাম ঘট ঘটমে লেটা !’

শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট নরেনকে আস্তে আস্তে বলিতেছেন,—যাহাতে
মিশ্রও শুনিতে পান—‘এক রাম তাঁর হাজার নাম ।’

“খ্রীষ্টানেরা যাকে God বলে, হিন্দুরা তাঁকেই রাম, কৃষ্ণ, ঈশ্বর,—
এই সব বলে । পুকুরে অনেকগুলি ঘাট । এক ঘাটে হিন্দুরা জল খাচ্ছে,
বল্ছে জল । খ্রীষ্টানরা আর এক ঘাটে খাচ্ছে—বল্ছে ‘Water’ ; God,
যীশু । মুসলমানেরা আর এক ঘাটে খাচ্ছে—বল্ছে, পানি ; আল্লা ।

মিশ্র । মেরির ছেলে Jesus নয় । Jesus স্বয়ং ঈশ্বর ।

(ভক্তদেরপ্রতি) ইনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) এখন এই আছেন—আবার
এক সময় সাক্ষাৎ ঈশ্বর !

কলিকাতা শ্যামপুকুর । নরেন্দ্র, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি সঙ্গে । ৩২৩

“আপনারা (ভক্তেরা) এঁকে চিন্তে পাচ্ছেন না । আমি আগে থেকে এঁকে দেখেছি—এখন সাক্ষাৎ দেখছি । দেখেছিলাম—একটি বাগান, উনি উপরে আসনে বসে আছেন ; মেজের উপর আর একজন বসে আছেন ;—তিনি তত advanced (উন্নত) নন ।

“এই দেশে চার জন দ্বারবান্ আছেন । বোম্বাই অঞ্চলে তুকারাম ও কাশ্মীরে Robert Michael ;—এখানে ইনি ;—আর পূর্বদেশে আর এক জন আছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তুমি কিছু দেখতে টেকে পাও ?

মিশ্র । আজ্ঞা, বাটীতে যখন ছিলাম তখন থেকে জ্যোতি দর্শন হ’ত । তার পর যীশুকে দর্শন করেছি । সে রূপ আর কি বলব !—সে সৌন্দর্য্যের কাছে কি স্ত্রীর সৌন্দর্য্য !

কিয়ৎক্ষণ পরে ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে মিশ্র জামা পেণ্টলুন খুলিয়া ভিতরের গেরুয়ার কোপীন দেখাইলেন ।

ঠাকুর বারাণ্ডা হইতে আসিয়া বলিতেছেন—“বাহে হলো না—এ কে (মিশ্রকে) দেখলাম, বীরের ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে আছে ।”

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর সম্মানিত হইতেছেন । পশ্চিমাশ্র হইয়া দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ ।

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া মিশ্রকে দেখিতে দেখিতে হাসিতেছেন । এখনও দাঁড়াইয়া । ভাবাবেশে মিশ্রকে shake hand (হস্তধারণ) করিতেছেন ও হাসিতেছেন ! হাত ধরিয়া বলিতেছেন, তুমি যা চাইছ তা হয়ে যাবে ।’

ঠাকুরের বুঝি যীশুর ভাব হইল ! তিনি আর যীশু কি এক ?

মিশ্র (করযোড়ে) । আমি সে দিন থেকে মন, প্রাণ, শরীর,—সব আপনাকে দিয়েছি ! [ঠাকুর ভাবাবেশে হাসিতেছেন ।

ঠাকুর উপবেশন করিলেন । মিশ্র ভক্তদের কাছে তাঁহার পূর্বকথা সব বর্ণনা করিতেছেন । তাঁহার দুই ভাই বরের সভায় সামিয়ানা চাপা পড়িয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন,—তাহাও বলিলেন ।

ঠাকুর মিশ্রকে যত্ন করিবার কথা ভক্তদের বলিয়া দিলেন ।

[নরেন্দ্র, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি সঙ্গে কীৰ্ত্তনানন্দে ।]

ডাক্তার সরকার আসিয়াছেন । ডাক্তারকে দেখিয়া ঠাকুর সম্মানিত । কিঞ্চিৎ ভাব উপশমের পর ঠাকুর ভাবাবেশে বলিতেছেন—“কারণানন্দের পর সচ্চিদানন্দ !—কারণের কারণ !” ডাক্তার বলিতেছেন, হাঁ !

শ্রীরামকৃষ্ণ । বেহুঁশ হই নাই ।

ডাক্তার বুঝিয়াছেন যে, ঠাকুরের ঈশ্বরের আবেশ হইয়াছে ! তাই বলিতেছেন,—“না, তুমি খুব ছুঁশে আছ !”

ঠাকুর সহাস্তে বলিতেছেন—

গান । সুরাপান করি না আমি সুধা খাই জয়কালী বলে, মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে । গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি তায় মশলা দিয়ে (মা), জ্ঞান শুঁড়িতে চুয়ায় ভাঁটি, পান করে মোর মন মাতালে । মূলমন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি বলে তারা, প্রসাদ বলে এমন সুরা, খেলে চতুর্বর্গ মেলে ।’

গান শুনিয়া ডাক্তার ভাবাবিষ্টপ্রায় হইলেন । ঠাকুরেরও আবার ভাবাবেশ হইল । ভাবে ডাক্তারের কোলে চরণ বাড়াইয়া দিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে ভাব সম্বরণ হইল,—তখন চরণ গুটাইয়া লইয়া ডাক্তারকে বলিতেছেন—“উহ্ ! তুমি কি কথাই বলেছ ! তাঁরি কোলে বসে আছি, তাঁকে ব্যারামের কথা বোলবো না ত কাকে বোলব !—ডাকতে হয়, তাঁকেই ডাকবো !”

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল ।

আবার ভাবাবিষ্ট ।—ভাবে ডাক্তারকে বলিতেছেন—“তুমি খুব শুদ্ধ ! তা না হলে পা রাখতে পারি না !” আবার বলিতেছেন, “শাস্ত ও হি হাস্য মো রামরস চাখে !”

“বিষয় কি ?—ওতে আছে কি ?—টাকা, কড়ি, মান, শরীরের সুখ, —ওতে আছে কি ? রামকে মো চিনা নাই দিলু চিনা হাস্য মো কেসা নে !”

এত অসুখের উপর ঠাকুরের ভাবাবেশ হইতেছে দেখিয়া ভক্তেরা

কলিকাতা, শ্যামপুকুর । নরেন্দ্র, সরকার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ৩২৫
চিন্তিত হইয়াছেন । ঠাকুর বলিতেছেন,—“ঐ গানটি হলে আমি
থাম্বো—“হরিনামসমাদিলা” । নরেন্দ্র কক্ষান্তরে ছিলেন, তাঁকে
ডাকান হইল । তিনি তাঁহার দেবদুর্লভ কণ্ঠে গান শুনাইতেছেন—

গান—হরিনামসমাদিলা পিছে মম মানস মাতে রে !

(একবার) লুটায়ে অবনীতল হরি হরি বলি কাঁদো রে ।

গভীর নিনাদে হরিনামে গগন ছাও রে,

নাচো হরি ব'লে দু বাহু তুলে, হরিনাম বিলাও রে ।

হরিপ্রেমানন্দরসে অনুদিন ভাসো রে,

গাও হরিনাম হও পূর্ণকাম, নীচ বাসনা নাশো রো !

শ্রীরামকৃষ্ণ । আর সেইটি ? ‘চিদানন্দসিঙ্কুনীরে ?’

নরেন্দ্র গাইতেছেন—

চিদানন্দসিঙ্কুনীরে প্রেমানন্দের লহরী,

মহাভাব রসলীলা কি মাধুরী—মরি মরি ।

মহাযোগে সব একাকার হইল, দেশকাল ব্যবধান সব ঘুচিল রে,

এখন আনন্দে মাতিয়া, দু'বাহু তুলিয়া, বল রে মন হরি হরি ।

গান—চিন্তয় মম মানস হরি চিদানন্দ নিরঞ্জন ।

ডাক্তার একাগ্রমনে শুনিতেন । গান সমাপ্ত হইলে বলিতেছেন,
‘চিদানন্দসিঙ্কুনীরে, ঐটি বেশ !’ ডাক্তারের আনন্দ দেখিয়া ঠাকুর বলিতে-
ছেন—“ছেলে বলেছিল, ‘বাবা, একটু (মদ) চেখে দেখ, তার পর আমায়
ছাড়তে বল ত ছাড়া যাবে ।’ বাবা খেয়ে বল্লে, ‘তুমি বাছা ছাড় আপত্তি
নাই,—কিন্তু আমি ছাড়ছি না !’ (ডাক্তার ও সকলের হাস্য ।)

“সে দিন মা দেখালে দু'টি লোককে । ইনি তার ভিতর একজন ।
খুব জ্ঞান হবে দেখলাম,—কিন্তু শুক । (ডাক্তারকে,সহাস্ত্রে) কিন্তু তুমি
রোস্বে !” [ডাক্তার চুপ করিয়া আছেন ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থভাগ, ত্রিংশৎখণ্ডে মিশ্রাদি ভক্তসঙ্গে
আনন্দ ও যীশুর আবেশ-কথা সমাপ্ত ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত । [1885, 23rd December.

চতুর্থ ভাগ—একত্রিংশ অধ্যায়

কাশীপুর উদ্যানে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

কৃপাসিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণ । মাষ্টার, নিরঞ্জন, ভবনাথ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে কাশীপুরে বাস করিতেছেন । এতো অস্থখ—
কিন্তু এক চিন্তা—কিসে ভক্তদের মঙ্গল হয় । নিশিদিন কোনো না
কোনো ভক্তের বিষয় চিন্তা করিতেছেন ।

শুক্রবার ১১ই ডিসেম্বর, ২৭এ অগ্রহায়ণ, শুক্লা পঞ্চমীতে শ্যাম-
পুকুর হইতে ঠাকুর কাশীপুরের বাগানে আইসেন । আজ বারো দিন ।

ছোকরা ভক্তেরা ক্রমে কাশীপুরে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছেন—
ঠাকুরের সেবার জন্য । এখনও বাটী অনেকে যাতায়াত করেন । গৃহী
ভক্তেরা প্রায় প্রত্যহ দেখিয়া যান—মধ্যে মধ্যে রাত্রিও থাকেন ।

ভক্তেরা প্রায় সকলেই জুটিয়াছেন । ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভক্ত-
সমাগম হইতেছে । শেষের ভক্তেরা সকলেই আসিয়া পড়িয়াছেন ।
১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষী শশী ও শরৎ ঠাকুরকে দর্শন করেন ;
কালেজের পরীক্ষাদির পর ১৮৮৫র মাঝামাঝি হইতে তাঁহারা সর্বদা
যাতায়াত করেন । ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ষ্টার থিয়েটারে
শ্রীযুক্ত গিরীশ (ঘোষ) ঠাকুরকে দর্শন করেন । তিন মাস পরে
অর্গাৎ ডিসেম্বরের প্রারম্ভ হইতে তিনি সর্বদা যাতায়াত করেন । ১৮৮৪,
ডিসেম্বরের শেষে শারদা ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে দর্শন করেন ।
সুবোধ ও ক্ষীরোদ ১৮৮৫র আগষ্ট মাসে ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন ।

আজ সকালে প্রেমের ছড়াছড়ি । নিরঞ্জনকে বলছেন, ‘তুই আমার
বাপ, তোর কোলে বসব ।’ কালীপদর বক্ষ স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন,
‘চৈতন্য হও !’ আর চিবুক ধরিয়া তাহাকে আদর করিতেছেন ;
আর বলিতেছেন, ‘যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডেকেছে বা সন্ধ্যা আহ্নিক
করেছে, তার এখানে আসতেই হবে ।’ আজ সকালে দুইটি ভক্ত

স্ত্রীলোকের উপরও কৃপা করিয়াছেন । সমাধিস্থ হইয়া তাহাদের বক্ষে চরণ দ্বারা স্পর্শ করিয়াছেন । তাঁহারা অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন ; একজন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, ‘আপনার এত দয়া !’ প্রেমের ছড়াছড়ি ! সিঁতির গোপালকে কৃপা করিবেন বলিয়া বলিতেছেন, ‘গোপালকে ডেকে আন ।’

আজ বুধবার, ৯ই পৌষ ; অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া, ২৩ ডিসেম্বর, ১৮৮৫ । সন্ধ্যা হইয়াছে । ঠাকুর জগন্মাতার চিন্তা করিতেছেন ।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর অতি মৃদুস্বরে দু একটি ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন । ঘরে কালী, চুণীলাল, মাষ্টার, নবগোপাল, শশী, নিরঞ্জন প্রভৃতি ভক্তেরা আছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । একটি টুল কিনে আনবে—এখানকার জন্ত । কত নেবে ?
মাষ্টার । আজ্ঞা, দু তিন টাকার মধ্যে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । জলপিড়ি যদি বারো আনা, ওর দাম অত হবে কেন ?
মাষ্টার । বেশী হবে না,—ওরই মধ্যে হয়ে যাবে !

শ্রীরামকৃষ্ণ । আচ্ছা, কাল আবার হুহুস্পত্তিবারের বার-বেলা,—তুমি তিনটের আগে আসতে পারবে না ?

মাষ্টার । যে আজ্ঞা, আসব ।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার ? অসুখের গুহ উদ্দেশ্য ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । আচ্ছা, এ অসুখটা কদিনে সারবে ?

মাষ্টার । একটু বেশী হয়েছে—দিন নেবে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কত দিন ? মাষ্টার । পাঁচ ছ মাস হতে পারে ।

এই কথায় ঠাকুর বালকের ন্যায় অধৈর্য্য হইলেন । আর বলিতেছেন—‘বল কি ?’
মাষ্টার । আজ্ঞা, সব সারতে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাই বল ।—আচ্ছা, এত ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন, ভাব, সমাধি !—তবে এমন ব্যাম কেন ?

মাষ্টার । আজ্ঞা, খুব কষ্ট হচ্ছে বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য আছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কি উদ্দেশ্য ?

মাষ্টার । আপনার অবস্থা পরিবর্তন হবে । নিরাকারের দিকে ঝাঁক

হচ্ছে ।—‘বিছার আমি’ পর্য্যন্ত থাকছে না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, লোকশিক্ষা বন্ধ হচ্ছে—আর বলতে পারি না ।
সব লামামস দেখছি !—এক একবার মনে হয়, কাকে
আর বলব ! ছাখো না,—এই বাড়ী ভাড়া হয়েছে বলে, কত রকম
ভক্ত আসছে ।

“কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন’বা শশধরের মত সাইন্স বোর্ড ত হবে না,—
‘অমুক সময় লেকচার হইবে !’ (ঠাকুরের ও মাষ্টারের হাশ্ব ।)

মাষ্টার । আর একটি উদ্দেশ্য, লোক বাছা । পাঁচ বছরে তপস্যা
করে যা না হতো, এই কয় দিনে ভক্তদের তা হয়েছে । সাধনা,
প্রেম, ভক্তি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, তা হলো বটে । এই নিরঞ্জন বাড়ী গিছলো ।

(নিরঞ্জনের প্রতি) তুই বল দেখি কি রকম বোধ হয় ।

নিরঞ্জন । আজ্ঞে, আগে ভালবাসা ছিল বটে,—কিন্তু এখন ছেড়ে
থাকতে পারবার যো নাই !

মাষ্টার । আমি এক দিন দেখেছিলাম, এরা কত বড় লোক !

শ্রীরামকৃষ্ণ । কোথায় ? মাষ্টার । আজ্ঞা, এক পাশে
দাঁড়িয়ে শ্যামপুকুরের বাড়ীতে দেখেছিলাম । বোধ হোলো, এরা এক এক
জন কত বিঘ্ন বাধা ঠেলে ওখানে এসে বসে রয়েছে—সেবার জন্য ।

[সমাধিমন্দিরে । আশ্চর্য্য অবস্থা । নিরাকার । অন্তরঙ্গ নির্বাচন ।]

এই কথা শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন । কিয়ৎক্ষণ
নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন । সমাধিস্থ !

ভাবের উপশম হইলে মাষ্টারকে বলিতেছেন—“দেখলাম,
সাকার থেকে সব নিরাকারে যাচ্ছে !—আর আর
কথা বলতে ইচ্ছা যাচ্ছে কিন্তু পারছি না ।

“আচ্ছা, ঐ নিরাকারে ঝাঁক, ওটা কেবল লয় হবার জন্য ; না ?

মাষ্টার (অবাক হইয়া) । আজ্ঞা, তাই হবে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । এখনও দেখছি নিরাকার অর্থ শু সচ্চিদা-
নন্দ এই রকম করে রয়েছে ! * * * কিন্তু চাপলাম খুব কষ্টে ।

কাশীপুর। শ্রীরামকৃষ্ণ কে ? মণির কাছে মুক্তকণ্ঠ। ৩২৯

“লোক বাছা যা বলছ, তা ঠিক। এই অস্থখ হওয়াতে কে অন্তরঙ্গ কে বহিরঙ্গ, বোঝা যাচ্ছে। স্মারক সংসার ছেড়ে এখানে আছে, তারা অন্তরঙ্গ। আর যারা একবার এসে ‘কেমন আছেন মশাই’ জিজ্ঞাসা করে, তারা বহিরঙ্গ।

“ভবনাথকে দেখলে না? শ্যামপুকুরে বরটী সেজে এলো। জিজ্ঞাসা করলে, ‘কেমন আছেন’—তার পর আর দেখা নাই! নরেন্দ্রের খাতিরে ঐ রকম তাকে করি, কিন্তু মন নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত ! শ্রীরামকৃষ্ণ কে ? মুক্তকণ্ঠ]

আহুত্বাম্ ঋষয়ঃ সর্বৈ দেবর্ষিনীন্দস্তথা।

অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ংৈব ত্রবীষি মে ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)। তিনি ভক্তের জন্য দেহ ধারণ করে যখন আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ভক্তরাও আসে। কেউ অন্তরঙ্গ, কেউ বহিরঙ্গ। কেউ রসদান।

“দশ এগারো বছরের সময় দেশে বিশালক্ষী দেখতে গিয়ে মাঠে প্রথম এই অবস্থা। হস্ত। কি দেখলাম!—একবারে বাহুশূন্য!

“যখন বাইশ তেইশ বছর বয়স * কালীঘরে (দক্ষিণেশ্বরে) বসে, ‘তুই কি অক্ষর হতে চাস?’—অক্ষর মানে জানি না! জিজ্ঞাসা করলাম—হলধারী বসে, ‘ক্ষর মানে জীব, অক্ষর পরমাত্মা’।

“যখন আরতি হোতো, কুঠীর উপর থেকে টীংকার করতাম, ‘ওরে কে কোথায় ভক্ত আছিস আয়! ঐহিক লোকদের সঙ্গে আমার প্রাণ যায়!’ ইংলিশম্যানকে (ইংরাজি-পড়া লোককে) বললাম। তারা বলে, ‘ও সব মনের ভুল!’ তখন ‘তাই হবে’ বলে শান্ত হলাম! কিন্তু এখন ত সেই সব মিলছে!—সব ভক্ত এসে জুটেছে!

“আবার দেখালে পাঁচ জন সেবায়েত। প্রথম, সেজো বাবু (অথুর্ন

* যখন ২২।২৩ বয়স, অর্থাৎ ১৮৫৮।৫৯ খৃঃ, তখন প্রথম এই অবস্থা।

বাবু)। তার পর শঙ্কু অলিঙ্ক,—তাকে আগে কখন দেখি নাই। ভাবে দেখলাম,—গৌরবর্ণপুরুষ, মাথায় তাজ। যখন অনেকদিন পরে শঙ্কুকে দেখলাম, তখন মনে পড়ল,—একেই আগে ভাবাবস্থায় দেখেছি! আর তিন জন সেবায়েত এখনও ঠিক হয় নাই। কিন্তু সব গৌরবরণ। সুব্রহ্মাণ্ড অনেকটা রসদার বলে বোধ হয়।

“এই অবস্থা যখন হ’লো, ঠিক আমার মত একজন এসে, ঈড়া পিঙ্গলা, সুযুগ্মা নাড়ী সব ঝেড়ে দিয়ে গেল! ষড়চাক্রের এক একটা পদমে জিহ্বা দিয়ে রমণ করে, আর অধোমুখ পদ উর্দ্ধমুখ হয়ে উঠে! শেষে সহস্রার পদ প্রস্ফুটিত হয়ে গেল।

“যখন যেরূপ লোক আসবে, আগে দেখিয়ে দিতো! এই চক্ষে—ভাবে নয়—দেখলাম, চৈতন্য দেবের সঙ্কীর্ণ বটতলা থেকে বকুলতলার দিকে যাচ্ছে। তাতে বলরামকে দেখলাম, আর যেন তোমাকে দেখলাম। চুণীকে আর তোমাকে আনাগোনাতে উদ্দীপন হয়েছে।

শশী আর শরৎকে

দেখেছিলাম, ঋষি কৃষ্ণের (Christ) দলে ছিল।

“বটতলায় একটা ছেলে দেখেছিলাম। হৃদে বল্লে, ‘তবে তোমার একটা ছেলে হবে’। আমি বল্লাম, ‘আমার যে মাতৃঘোনি! আমার ছেলে কেমন করে হবে?’ সেই ছেলে লুপ্ত!।

“বল্লাম, মা এ রকম অবস্থা যদি কর্লে, তা হলে এক জন বড় মানুষ জুটিয়ে দাও। তাই সেজবাবু চৌদ্দ বছর * ধরে সেবা কল্লে। সে কত কি!—আলাদা ভাঁড়ার করে দিলে—সাধু-সেবার জন্ত।—গাড়ী, পান্ধী—যাকে যা দিতে বলেছি, তাকে তা দেওয়া! বামনী খতাতো—প্রতাপরুদ্র।

“বিজ্ঞান এই রূপ (অর্থাৎ ঠাকুরের মূর্তি) দর্শন করেছে। এ কি বলো দেখি?—বলে, ‘তোমায় যেমন ছোঁয়া, ঐরূপ ছুঁয়েছি!’

“নোটো (লাটু) খতালে, একত্রিশ জন ভক্ত। কৈ তেমন বেশী

* মথুরের চৌদ্দবৎসর সেবা। ১৮৫৮ হইতে ১৮৭১ খৃঃ। মথুরের মৃত্যু ১লা শ্রাবণ ১২৭৮; 14-7-1871.

কৈ !—তবে কেদার আর বিজয় কতকগুলো কচ্ছে !

‘ভাবে দেখালে শেষে পায়ের খেয়ে থাকতে হবে !

‘এ অসুখে পরিবার (ভক্তদের শ্রীশ্রী মা) পায়ের খাইয়ে দিচ্ছিল, তখন কাঁদলাম এই বলে,—‘এই কি পায়ের খাওয়া ! এই কষ্টে !’
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থভাগ, একত্রিশখণ্ডে মুক্তকণ্ঠে কথা সমাপ্ত ।

চতুর্থ ভাগ—দ্বাত্রিংশ খণ্ড

—:~:—

কাশীপুর উদ্যানে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

নরেন্দ্রকে জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সমন্বয় উপদেশ ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরের বাগানে হলঘরে ভক্তসঙ্গে অবস্থান করিতেছেন । রাত্রি প্রায় আটটা । ঘরে নরেন্দ্র, শশী, মাষ্টার, ‘বুড়ো-গোপাল’, শরৎ । আজ বৃহস্পতিবার,—২৮শে ফাল্গুন, ১২৯২ সাল ; ফাল্গুন মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথি ; ১১ই মার্চ, ১৮৮৬ খৃঃ ।

ঠাকুর অসুস্থ—একটু শুইয়া আছেন । ভক্তেরা কাছে বসিয়া । শরৎ ঝাঁড়াইয়া পাখা করিতেছেন । ঠাকুর অসুখের কথা বলিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ভোলানাথের কাছে গেলে তেল দেবে । আর সে বলে দেবে, কি রকম করে লাগাতে হবে ।

বুড়োগোপাল । তা হলে কাল সকালে আমরা গিয়ে আনবো ।

মাষ্টার । আজ কেউ গেলে বলে দিতে পারে ।

শশী । আমি যেতে পারি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শরৎকে দেখাইয়া) । ও যেতে পারে ।

শরৎ কিয়ৎক্ষণ পরে দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে মুহুরী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে তেল আনিতে যাত্রা করিলেন ।

ঠাকুর শুইয়া আছেন । ভক্তেরা নিঃশব্দে বসিয়া আছেন । ঠাকুর হঠাৎ উঠিয়া বসিলেন । নরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) । ব্রহ্ম অলেন্স । তিন গুণ তাঁতে আছে, কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত ।

“যেমন বায়ুতে স্নগন্ধ দুর্গন্ধ দুই-ই পাওয়া যায়, কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত ।

“কাশীতে শঙ্করাচার্য্য পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন ! চণ্ডাল মাংসের ভার নিয়ে যাচ্ছিল—হঠাৎ ছুঁয়ে ফেলেন । শঙ্কর বলেন, ছুঁয়ে ফেললি ! চণ্ডাল বলে,—ঠাকুর তুমিও আমায় ছোঁও নাই ! আমিও তোমায় ছুঁই নাই ! আত্মা নির্লিপ্ত । তুমি সেই শুদ্ধ আত্মা ।

“ব্রহ্ম আর মায়া । জ্ঞানী মায়া ফেলে দেয় ।

“মায়া আবরণস্বরূপ । এই দেখ এই গাম্ছা আড়াল করলাম,—আর প্রদীপের আলো দেখা যাচ্ছে না ।

ঠাকুর গাম্ছাটা আপনার ও ভক্তদের মাঝখানে ধরিলেন । বলিতেছেন,—“এই দেখ, আমার মুখ আর দেখা যাচ্ছে না ।

“রামপ্রসাদ যেমন বলেছে—‘মশারি তুলিয়া দেখ—

“ভক্ত কিন্তু মায়া ছেড়ে দেয় না । মহামায়ার পূজা করে । শরণাগত হয়ে বলে, ‘মা, পথ ছেড়ে দাও ! তুমি পথ ছেড়ে দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হবে ।’ জাগ্রৎ স্বপ্ন, সুষুপ্তি,—এই তিন অবস্থা জ্ঞানীরা উড়িয়ে দেয় । ভক্তরা এ সব অবস্থাই লয়—ষতক্ষণ আমি আছে, ততক্ষণ সবই আছে ।

“ষতক্ষণ আমি আছে, ততক্ষণ ঘাখে যে, তিনিই মায়া, জীবজগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সব হয়েছেন । [নরেন্দ্র প্রভৃতি চুপ করিয়া আছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । মায়াবাদ শুকনো । কি বললাম, বল দেখি ।

নরেন্দ্র । শুকনো ।

ঠাকুর নরেন্দ্রের হাত মুখ স্পর্শ করিতে লাগিলেন । আবার কথা কহিতেছেন—“এ সব (নরেন্দ্রের সব) ভক্তের লক্ষণ । জ্ঞানীর সে আলাদা লক্ষণ,—মুখ চেহারা শুকনো হয় ।

“জ্ঞানী জ্ঞানলাভ করবার পরও বিছামায়া নিয়ে থাকতে পারে—ভক্তি, দয়া, বৈরাগ্য—এই সব নিয়ে থাকতে পারে । এর দুটা উদ্দেশ্য । প্রথম, লোকশিক্ষা হয়, তার পর রসাস্বাদনের জন্ম ।

“জ্ঞানী যদি সমাধিস্থ হয়ে চুপ করে থাকে, তা হলে লোক শিক্ষা হয় না । তাই শঙ্করাচার্য্য ‘বিচার আমি’ রেখেছিলেন ।

“আর ঈশ্বরের আনন্দ ভোগ করবার জন্য—সন্তোগ করবার জন্য—ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকে ।

“এই ‘বিচার আমি’ ‘ভক্তের আমি’—এতে দোষ নাই । ‘বজ্জাং আমি’তে দোষ হয় । তাঁকে দর্শন করবার পর বালকের স্বভাব হয় । ‘বালকের আমি’তে কোন দোষ নাই । যেমন আশির মুখ—লোককে গালাগাল দেয় না । পোড়া দড়ি দেখতেই দড়ির আকার, ফুঁ দিলে উড়ে যায় । জ্ঞানাগ্নিতে অহঙ্কার পুড়ে গেছে । এখন আর কারও অনিষ্ট করে না । নামমাত্র ‘আমি’ ।

“নিত্যেতে পৌঁছে আবার লীলায় থাকা । যেমন ওপারে গিয়ে আবার এপারে আসা । লোকশিক্ষা আর বিলাসের জন্য ;—আমাদের জন্য ।

ঠাকুর অতি মৃদুস্বরে কথা কহিতেছেন । একটু চুপ করিলেন । আবার ভক্তদের বলিতেছেন—“শরীরের এই রোগ—কিন্তু অবিচার-মায়া রাখে না । এই ছাখো, রামলাল, কি বাড়ী, কি পরিবার, আমার মনে নাই !—কে না পূর্ণ কাম্বোজ, তার জন্য ভাবছি ।—ওদের জন্য ত ভাবনা হয় না !

“তিনিই বিচারমায়া রেখে দিয়েছেন—লোকের জন্য—ভক্তের জন্য ।

“কিন্তু বিচারমায়া থাকলে আবার আস্তে হবে । অবতারাди বিচারমায়া রাখে ! একটু বাসনা থাকলেই আস্তে হয়—ফিরে ফিরে আস্তে হয় । সব বাসনা গেলে মুক্তি । ভক্তরা কিন্তু মুক্তি চায় না !

“যদি কাশীতে কারু দেহত্যাগ হয়, তা হলে মুক্তি হয়—আর আস্তে হয় না । জ্ঞানীদের মুক্তি ।

নরেন্দ্র । সে দিন মহিম চক্রবর্তীর বাড়ীতে আমরা গিচ্ছলাম ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । তার পর ?

নরেন্দ্র । ওর মত এমন শুদ্ধ জ্ঞানী দেখি নাই !

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । কি হয়েছিল ?

নরেন্দ্র । আমাদের গান গাইতে বল্লে । গঙ্গাধর গাইলে—

গান ।—শ্যামনামে প্রাণ পেয়ে ইতি উতি চায়,

সন্মুখে তমালবৃক্ষ দেখিবারে পায় ।

‘‘গান শুনে বল্লে—ও সব গান কেন ? প্রেম ট্রেম ভাল লাগে না !

তা ছাড়া, মাগ ছেলে নিয়ে থাকি, এ সব গান এখানে কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । ভয় দেখেছ !

চতুর্থভাগ, দ্বাত্রিংশখণ্ডে, নরেন্দ্রের শিক্ষাকথা সমাপ্ত ।

চতুর্থ ভাগ—ত্রয়ত্রিংশখণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[কাশীপুর উদ্যানে নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর বাগানে ভক্তসঙ্গে বাস করিতেছেন । শরীর খুব অসুস্থ—কিন্তু ভক্তদের মঙ্গলের জন্য সর্বদাই ব্যাকুল । আজি শনিবার, ৫ই বৈশাখ, চৈত্র শুক্লা চতুর্দশী । পূর্ণিমাও পড়িয়াছে ।

কয়দিন ধরিয়া প্রায় প্রত্যহ নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছেন—পঞ্চবটীতে ঈশ্বর-চিন্তা করেন—সাধনা করেন । আজ সন্ধ্যার সময় ফিরিলেন । সঙ্গে শ্রীযুক্ত তারক ও কালী ।

রাত আটটা হইয়াছে । জ্যোৎস্না ও দক্ষিণে হাওয়া বাগানটাকে সুন্দর করিয়াছে । ভক্তেরা অনেকে নিচের ঘরে ধ্যান করিতেছেন । নরেন্দ্র মণিকে বলিতেছেন—‘এরা ছাড়াচ্ছে’ (অর্থাৎ ধ্যান করিতে করিতে উপাধি বর্জন করিতেছে) ।

কিয়ৎক্ষণ পরে অনি উপরের হলঘরে ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন । ঠাকুর তাঁহাকে ডাবর ও গামছা পরিষ্কার করিয়া আনিতে আজ্ঞা করিলেন । তিনি পশ্চিমের পুষ্করিণীর ঘাট হইতে টাঁদের আলোতে ঐগুলি ধুইয়া আনিলেন ।

পরদিন সকালে ঠাকুর মণিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন । তিনি গঙ্গা-স্নানের পর ঠাকুরকে দর্শন করিয়া হলঘরের ছাদে গিয়াছিলেন ।

পরিবার পুত্রশোকে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছেন । ঠাকুর তাঁহাকে বাগানে

আসিবার কথা, ও এখানে আসিয়া প্রসাদ পাইতে, বলিলেন ।

ঠাকুর ইসারা করিয়া বলিতেছেন—“এখানে আস্তে বলবে ;—
দুদিন থাকবে ;—কোলের ছেলেটাকে যেন নিয়ে আসে ;—আর
এখানে এসে খাবে ।”

মণি । যে আজ্ঞা । খুব ঈশ্বরে ভক্তি হয়, তা হলে বেশ হয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ইসারা করিয়া বলিতেছেন—“উঁহুঃ—(শোক) ঠেলে
দেয় (ভক্তিকে) । আর এত বড় ছেলে ।

“কৃষ্ণকিশোরের ভবনাথের মত দুই ছেলে । দুটো
আড়াইটে পাশ ! মারা গেল । অতো বড় জ্ঞানী !—প্রথম প্রথম
সামলাতে পারলে না । আমায় ভাগ্যিস্ ঈশ্বর দেন নি !

“অজ্ঞান অত বড় জ্ঞানী । সঙ্গে কৃষ্ণ । তবু অভিমন্যুর শোকে
একবারে অধীর ! কিশোরী আসে না কেন ?

একজন ভক্ত । সে রোজ গঙ্গাস্নানে যায় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ‘এখানে আসে না কেন ?’ ভক্ত । ‘আজ্ঞে আস্তে বলবো’

শ্রীরামকৃষ্ণ (লাটুর প্রতি) । হরীশ আসে না কেন ?

[মেয়েদের লজ্জাই ভূষণ । পূর্বকথা—মাফটারের বাড়ীতে শুভাগমন ।]

মাফটারের বাটীর নয় দশ বছরের দুটী মেয়ে ঠাকুরের কাছে
কাশীপুর বাগানে আসিয়া ‘দুর্গানাম জপ সদা’, ‘মজলো আমার মন
ভ্রমরা’ ইত্যাদি গান শুনাইতেছিল । ঠাকুর যখন মাফটারের শ্যাম-
পুকুর তেলিপাড়ার বাটীতে শুভাগমন করেন (২০ অক্টোবর ১৮৮৪ ;
১৫ই কার্তিক, বৃহস্পতিবার, উথান একাদশীর দিন), তখন এই দুটী
মেয়ে ঠাকুরকে গান শুনাইয়াছিল । ঠাকুর গান শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট
হইয়াছিলেন । যখন ঠাকুরের কাছে কাশীপুর বাগানে আজ তাহারা
উপরে গান গাইতেছিল, ভক্তেরা নীচে হইতে শুনিয়াছিলেন । তাহারা
আবার তাহাদের নীচে ডাকাইয়া গান শুনিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাফটারের প্রতি) । তোমার মেয়েদের আর গান
শিখিও না । আপনা আপনি গায় সে এক । যার তার কাছে গাইলে
লজ্জা ভেঙ্গে যাবে । লজ্জা মেয়েদের বড় দরকার ।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মপূজা । ভক্তদের প্রসাদ প্রদান ।]

ঠাকুরের সম্মুখে পুষ্পপাত্রে ফুল চন্দন আনিয়া দেওয়া হইয়াছে ।
ঠাকুর শয্যায় বসিয়া আছেন । ফুল চন্দন দিয়া আপনাকেই পূজা
করিতেছেন । সচন্দন পুষ্প কখনও মস্তকে, কখনও কণ্ঠে, কখনও
হৃদয়ে, কখনও নাভিদেশে, ধারণ করিতেছেন ।

মনোমোহন কোন্নগর হইতে আসিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম
করিয়া উপবিষ্ট হইলেন । ঠাকুর আপনাকে এখনও পূজা করিতেছেন ।
নিজের গলায় পুষ্পমালা দিলেন ।

কিয়ৎক্ষণ পরে যেন প্রসন্ন হইয়া মনোমোহনকে নির্ম্মালা প্রদান
করিলেন । মণিকে একটি চম্পক দিলেন ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

বুদ্ধদেব কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিতেন ? নরেন্দ্রকে শিক্ষা ।

বেলা নয়টা হইয়াছে ; ঠাকুর মাফটারের সহিত কথা কহিতেছেন ;
ঘরে শশীও আছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাফটারের প্রতি) নরেন্দ্র আর শশী কি
বলছিল—কি বিচার করছিল ?

মাফটার (শশীর প্রতি) । কি কথা হচ্ছিল গা ?

শশী । নিরঞ্জন বুঝি বলেছে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । ‘ঈশ্বর নাস্তি অস্তি’, এই সব কি কথা হচ্ছিল ?

শশী (সহাস্তে) । (নরেন্দ্রকে) ডাক্ ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । ডাক্ । [নরেন্দ্র আসিয়া উপবেশন করিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাফটারের প্রতি) । তুমি কিছু জিজ্ঞাসা কর । কি কথা
হচ্ছিল, বল্ । নরেন্দ্র । পেট গরম হয়েছে । ও আর কি বোলবো ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । সেরে যাবে ।

মাফটার (সহাস্তে) । বুদ্ধ অবস্থা কি রকম ?

নরেন্দ্র । আমার কি হয়েছে, তাই বোলবো ।

মাষ্টার । ঈশ্বর আছেন—তিনি কি বলেন ?

নরেন্দ্র । ঈশ্বর আছেন কি করে বলছেন ? তুমিই জগৎ সৃষ্টি ক'রছো । Berkeley কি বলেছেন, জানো ত ?

মাষ্টার । হাঁ তিনি বলেছেন বটে—Their esse is percipii—
(The existence of external objects depends upon their perception.)—‘যতক্ষণ ইন্দ্রিয়ের কায চলেছে, ততক্ষণই জগৎ !’

[পূর্বকথা—তোতাপুরীর ঠাকুরকে উপদেশ—‘মনেই জগৎ’ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । গ্যাংটা বলতো, ‘মনেই জগৎ, আবার মনেতেই লয় হয় ।’

‘কিন্তু যতক্ষণ আমি আছে ততক্ষণ সেবা সেবকই ভাল ।

নরেন্দ্র (মাষ্টারের প্রতি) । বিচার যদি কর, তা হ'লে ঈশ্বর আছেন, কেমন করে বলবে ? আর বিশ্বাসের উপর যদি যাও, তা হলে সেবা-সেবক মানতেই হবে । তা যদি মানো—আর মানতেই হবে— তা হলে দয়াময়ও বলতে হবে ।

‘তুমি কেবল দুঃখটাই মনে করে রেখেছ । তিনি যে এত সুখ দিয়েছেন, তা ভুলে যাও কেন ? তাঁর কত কৃপা ! তিনটি বড় বড় জিনিস আমাদের দিয়েছেন—মানুষজন্ম, ঈশ্বরকে জানবার ব্যাকুলতা, আর মহাপুরুষের সঙ্গ, দিয়েছেন ।’ ‘মনুষ্যজন্ম মুমুকুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ ।’ [সকলে চুপ করিয়া আছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) । আমার কিন্তু বেশ বোধ হয়, ভিতরে একটা আছে ।

রাজেন্দ্রলাল দত্ত আসিয়া বসিলেন । হোমিওপ্যাথিক মতে ঠাকুরের চিকিৎসা করিতেছেন । ঔষধাদির কথা হইয়া গেলে, ঠাকুর অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া মনোমোহনকে দেখাইতেছেন ।

ডাক্তার রাজেন্দ্র—‘উনি আমার মামা’ত ভায়ের ছেলে ।’

নরেন্দ্র নীচে আসিয়াছেন । আপনা আপনি গান গাইতেছেন ।

গান—‘সব দুঃখ দূর করিলে দরশন দিয়ে ; মোহিলে প্রাণ । সপ্ত লোক ভুলে শোক তোমারে পাইয়ে, কোথা আমি অতি দীন হীন ।’

নরেন্দ্রের একটু পেটের অসুখ করিয়াছে । মাস্টারকে বলিতেছেন—
'প্রেম ভক্তির পথে থাকলে দেহে মন আসে । তা না হ'লে আমি কে ?
মানুষও নই—দেবতাও নই—আমার সুখও নাই, দুঃখও নাই ।'

[ঠাকুরের আত্মপূজা । সুরেন্দ্রকে প্রসাদ । সুরেন্দ্রের সেবা ।]

রাত্রি নয়টা হইল । সুরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা ঠাকুরের কাছে পুষ্পমালা
আনিয়া নিবেদন করিয়াছেন । ঘরে বাবুরাম, সুরেন্দ্র, লাটু,
মাষ্টার প্রভৃতি আছেন । ঠাকুর সুরেন্দ্রের মালা নিজে
গলায় ধারণ করিয়াছেন । সকলেই চুপ করিয়া বসিয়া আছেন ।

যিনি অন্তরে আছেন, ঠাকুর তাঁহারই বুঝি পূজা করিতেছেন ।

হঠাৎ সুরেন্দ্রকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিতেছেন । সুরেন্দ্র শয্যার
বাহে আসিলে প্রসাদী মালা (যে মালা নিজে পরিয়াছিলেন) লইয়া
নিজে তাঁহার গলায় পরাইয়া দিলেন !

সুরেন্দ্র মালা পাইয়া প্রণাম করিলেন । ঠাকুর আবার তাঁহাকে
ইঙ্গিত করিয়া পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে বলিতেছেন । সুরেন্দ্র কিয়ৎ-
ক্ষণ ঠাকুরের পদসেবা করিলেন ।

[কালীপুর উত্তানে ভক্তগণের সংকীৰ্ত্তন ।]

ঠাকুর যে ঘরে আছেন, তাহার পশ্চিম দিকে একটা পুষ্করিণী
আছে । এই পুষ্করিণীর ঘাটের চাতালে কয়েকটা ভক্ত খোল করতাল
লইয়া গান গাইতেছেন । ঠাকুর লাটুকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন
—‘তোমরা একটু হরিনাম কর ।’

মাষ্টার, বাবুরাম প্রভৃতি এখনও ঠাকুরের কাছে বসিয়া
আছেন । তাঁহারা শুনিতেন, ভক্তেরা গাহিতেছেন ।

‘হরি বলে আমার গৌর নাচে !’

ঠাকুর গান শুনিতে শুনিতে বাবুরাম, মাস্টার প্রভৃতিকে ইঙ্গিত
করিয়া বলিতেছেন—‘তোমরা নীচে যাও । ওদের সঙ্গে গান কর ;—
আর নাচবে ।’ তাঁহারা নীচে আসিয়া কীৰ্ত্তনে যোগদান করিলেন ।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর আবার লোক পাঠাইয়াছেন । বলেছেন,
এই আঁখরগুলি দেবে—গৌর নাচতেও জানে রে ! গৌরের ভাবের

বালাই যাই রে ! গৌর আমার নাচে দুই বাহু তুলে !

কীর্তন সমাপ্ত হইল । সুরেন্দ্র ভাবাবিষ্টপ্রায় গাইতেছেন—
গান—আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা ।

আমি তাদের পাগল ছেলে, আমার মায়ের নাম শ্যামা ॥

বাবা বব বম্ বলে, মদ খেয়ে মা গায়ে পড়ে ঢলে, শ্যামার এলো-
কেশ দোলে ; রাঙ্গা পায়ে ভ্রমর গাজে, ঐ নূপুর বাজে শুন না ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

[নরেন্দ্র ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব । ভবনাথ । পূর্ণ । সুরেন্দ্র ।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া হীরানন্দ গাড়ীতে উঠিতেছেন ।
গাড়ীর কাছে নরেন্দ্র, রাখাল দাঁড়াইয়া তাঁহার সহিত মিষ্টালাপ করিতে-
ছেন । বেলা দশটা । হীরানন্দ আবার কাল আসিবেন । সে সকল
কথা শ্রীকথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ, সপ্তবিংশ খণ্ডে বিবৃত আছে ।

আজ বুধবার, ৯ই বৈশাখ, চৈত্র কৃষ্ণা তৃতীয়া । ২১এপ্রেল, ১৮৮৬ ।
নরেন্দ্র উদ্যানপথে বেড়াইতে বেড়াইতে মণির সহিত কথা কহিতেছেন ।
বাটীতে মা ও ভাইদের বড় কষ্ট—এখনও সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতে
পারেন নাই । তজ্জন্ম চিন্তিত আছেন ।

নরেন্দ্র । বিদ্যাসাগরের ইচ্ছুলের কস্মি আর আমার দরকার নাই ।
গয়াতে যাব মনে করেছি । একটা জমীদারীর ম্যানেজারের কস্মের
কস্ম এক জন বলেছে ! ঈশ্বর টীশ্বর নাই !

মণি (সহাস্ত্রে) । সে তুমি এখন বলছ, পরে বলবে না ।
Scepticism ঈশ্বর লাভের পথের একটা stage ; এই সব stage
পার হলে, আরও এগিয়ে পড়লে, তবে ভগবান্কে পাওয়া যায়,—
পরমহংসদেব বলেছেন ।

নরেন্দ্র । যেমন গাছ দেখছি, অমনি করে কেউ ভগবান্কে
দেখেছে ? মণি । হাঁ, ঠাকুর দেখেছেন ।

নরেন্দ্র । সে মনের ভুল হতে পারে ।

মণি । যে যে অবস্থায় যা দেখে, সেই অবস্থায় তা তার পক্ষে reality সত্য । যতক্ষণ স্বপন দেখছে একটা বাগানে গিয়েছে, ততক্ষণ বাগানটী তোমার পক্ষে reality ; কিন্তু তোমার অবস্থা বদলালে—যেমন জাগরণ অবস্থায়—তোমার ওটা ভুল বলে বোধ হতে পারে । যে অবস্থায় ঈশ্বর দর্শন করা যায়,—সে অবস্থা হলে তখন reality (সত্য) বোধ হবে ।

নরেন্দ্র । আমি Truth চাই । সে দিন পরমহংস মশায়ের সঙ্গেই খুব তর্ক করলাম । মণি (সহাস্তে) । কি হয়েছিল ?

নরেন্দ্র । উনি আমায় বলছিলেন, ‘আমাকে কেউ কেউ ঈশ্বর বলে ।’ আমি বললাম, ‘হাজার লোকে ঈশ্বর বলুক, আমার যতক্ষণ সত্য বলে না বোধ হয়, ততক্ষণ বলবো না ।’

“তিনি বলেন—‘অনেকে যা বলবে, তাই ত সত্য—তাই ত ধর্ম !’

“আমি বললাম, ‘নিজে ঠিক না বুঝলে অন্য লোকের কথা শুন্ব না ।’

মণি (সহাস্তে) । তোমার ভাব Copernicus, Berkeley,—এদের মত । জগতের লোক বলছে—সূর্যই চলছে, Copernicus তা শুন্লে না ;—জগতের লোক বলছে external world জগৎ আছে, Berkeley তা শুন্লে না । তাই Lewis বলেছেন, ‘Why was not Berkeley a philosophical Copernicus ?’

নরেন্দ্র । একখানা History of Philosophy দিতে পারেন ?

মণি । কি, Lewis ?

নরেন্দ্র । না, Ueberweg ;—German পড়তে হবে ।

মণি । তুমি বলছো, ‘সামনে গাছের মতন কেউ কি দেখেছে ?’ তা ঈশ্বর মানুষ হয়ে যদি এসে, বলেন, ‘আমি ঈশ্বর !’ তা হ’লে তুমি কি বিশ্বাস করবে ? তুমি Lazarusএর গল্প ত জান ? যখন Lazarus পরলোকে গিয়ে Abrahamকে বলে যে, আমি আত্মীয় বন্ধুদের বলে আসি যে, সত্যিই পরলোক আর নরক আছে । Abraham বলেন, তুমি গিয়ে বলে কি তারা বিশ্বাস করবে ? তারা বলবে, কে একটা জোচ্চোর এসে এই সব কথা বলছে ।

“ঠাকুর বলেছেন, তাঁকে বিচার করে জানা যায় না । বিশ্বাসেই সমস্ত হয়,—জ্ঞান, বিজ্ঞান । দর্শন, আলাপ,—সব ।

ভবনাথ বিবাহ করিয়াছেন । তাঁহার অন্তর্চিন্তা হইয়াছে । তিনি মাষ্টারের কাছে আসিয়া বলিতেছেন, ‘বিদ্যাসাগরের নূতন ইকুল হবে, শুনলাম । আমারও তো খাঁটের যোগাড় করতে হবে । ইকুলের একটা কাজ করলে হয় না ?’

[রামলাল । পূর্ণের গাড়ীভাড়া । সুরেন্দ্রের খসখসের পরদা ।]

বেলা তিনটে চারটে । ঠাকুর শুইয়া আছেন । রামলাল পদ-সেবা করিতেছেন । ঘরে সিঁতির গোপাল ও মণিও আছেন । রামলাল দক্ষিণেশ্বর হইতে আজ ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন ।

ঠাকুর মণিকে জানালা বন্ধ করিয়া দিতে বলিতেছেন—ও পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে ।

শ্রীযুক্ত পূর্ণকে গাড়ী ভাড়া করিয়া কাশীপুরের উত্তানে আসিতে বলিয়াছিলেন । তিনি দর্শন করিয়া গিয়াছেন । গাড়ীভাড়া মণি দিবেন । ঠাকুর গোপালকে ইঞ্জিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ‘এঁর কাছে পেয়েছ ?’ গোপাল বলিতেছেন,—‘আজ্ঞা, হাঁ ।’

রাত নয়টা হইল । সুরেন্দ্র, রাম প্রভৃতি কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন ।

বৈশাখ মাসের রৌদ্র—দিনের বেলা ঠাকুরের ঘর বড়ই গরম হয় । সুরেন্দ্র তাই খসখস আনিয়া দিয়াছেন । পরদা করিয়া জানালায় টাঙ্গাইয়া দিলে ঘর বেশ ঠাণ্ডা হইবে ।

সুরেন্দ্র । কৈ, খসখস কেউ পরদা করে টাঙ্গিয়ে দিলে না ?
কেউ মনোযোগ করে না !

একজন ভক্ত (সহাস্তে) । ভক্তদের এখন ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা । এখন সোহং ;—জগৎ মিথ্যা । আবার ‘তুমি প্রভু, আমি দাস’ এই জীব যখন আসবে তখন এই সব সেবা হবে ! (সকলের হাস্য)

চতুর্থ ভাগ—বরাহনগর মঠ ।

নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি মঠের ভাইদের ৬ শিবরাত্রি ব্রত ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

বরাহনগর মঠ । শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি আজ ৬ শিবরাত্রির উপবাস করিয়া আছেন । দুই দিন পরে ঠাকুরের জন্মতিথিপূজা হইবে ।

বরাহনগর মঠ সবে পাঁচ মাস স্থাপিত হইয়াছে । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিত্যধামে বেশী দিন যান নাই । নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি ভক্তদের তীব্র বৈরাগ্য । এক দিন রাখালের পিতা বাড়ী ফিরিয়া যাইবার জন্ত রাখালকে অনুরোধ করিতে আসিয়াছিলেন । রাখাল বলিলেন, “কেন আপনারা কষ্ট করে আসেন ! আমি এখানে বেশ আছি । এখন আশীর্বাদ করুন, যেন আপনারা আমায় ভুলে যান, আর আমি আপনাদের ভুলে যাই !” সকলেরই তীব্র বৈরাগ্য ! সর্বদা সাধন ভজন লইয়া আছেন । এক উদ্দেশ্য—কিসে ভগবান দর্শন হয় ।

নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা কখনও জপ ধ্যান করেন, কখনও শাস্ত্রপাঠ করেন । নরেন্দ্র বলেন, “গীতায় ভগবান্ যে নিকাম কৰ্ম্ম করতে বলেন, —সে পূজা, জপ, ধ্যান এই সব কৰ্ম্ম—অন্য কৰ্ম্ম নহে ।”

আজ সকালে নরেন্দ্র কলিকাতায় আসিয়াছেন । বাটীর মোকদ্দমার তদ্বির করিতে হইতেছে । আদালতে সাক্ষী দিতে হয় ।

মাষ্টার বেলা নয়টার সময় মঠে উপনীত হইয়াছেন । দানাদের ঘরে প্রবেশ করিলে পর, তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীযুক্ত তারক আনন্দে শিবেন্দ্র গান ধরিলেন—‘তা থৈয়া তা থৈয়া নাচে ভোলা !’

তাঁহার গানের সহিত রাখালও যোগ দিলেন । আর গান গাহিয়া দুইজনেই নৃত্য করিতেছেন । এই গান নরেন্দ্র সবে বাঁধিয়াছেন ।

‘তা থৈয়া তা থৈয়া নাচে ভোলা, বববম্ বাজে গাল ।

ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে, তুলিছে কপাল-মাল ॥

হাগরজে গজা জটা মাঝে, উগরে অনল ত্রিশূল রাজে ।

ধক্ ধক্ ধক্ মৌলি বন্ধ, জ্বলে শশাক ভাল ॥

মঠের ভাইয়েরা সকলে উপবাস করিয়া আছেন । ঘরে এখন নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, কালী, বাবুরাম, তারক, হরীশ, সিত্তির গোপাল, শারদা, মাফটার আছেন । যোগিন, লাটু শ্রীবৃন্দাবনে আছেন । তাঁহারা এখনও মঠ দেখেন নাই ।

আজ সোমবার ৩শিবরাত্রি ২১ ফেব্রুয়ারী । আগামী শনিবারে শরৎ, কালী, নিরঞ্জন শারদা, শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনার্থ, ৩পুরীধামে যাত্রা করিবেন ।

শ্রীযুক্ত শশী দিনরাত ঠাকুরের সেবা লইয়া আছেন ।

পূজা হইয়া গেল । শরৎ তানপুরা লইয়া গান গাহিতেছেন ।—

শিব শঙ্কর বম্ বম্ (ভোলা), কৈলাসপতি মহারাজরাজ ।

উড়ে শৃঙ্গ কি খেয়াল, গলে ব্যাল-মাল, লোচন বিশাল, লালে লাল ;
ভালে চন্দ্র শোভে, সুন্দর বিরাজে !

নরেন্দ্র কলিকাতা হইতে এই মাত্র আসিয়াছেন । এখনও স্নান করেন নাই । কালী নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘মোকদ্দমার কি খবর ?’

নরেন্দ্র (বিরক্ত হইয়া) । তোদের ও সব কথায় কাজ কি ?

নরেন্দ্র তামাক খাইতেছেন ও মাফটার প্রভৃতির সহিত কথা কহিতেছেন ।—“কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না করলে হ’বে না । কামিনী নরকস্ত ঘারম্ । ষত লোক স্ত্রীলোকের বশ । শিব আর কৃষ্ণ এদের আলাদা কথা । শক্তিকে শিব দাসী করে রেখেছিলেন । শ্রীকৃষ্ণ সংসার করেছিলেন বটে, কিন্তু কেমন নির্লিপ্ত !—ফস্ করে বৃন্দাবন কেমন ত্যাগ করলেন !” রাখাল । আবার ঘারিকা কেমন ত্যাগ করলেন !

নরেন্দ্র গঙ্গাস্নান করিয়া মঠে ফিরিলেন । হাতে ভিজ্জে কাপড় ও গামছা । শারদা এতক্ষণ সমস্ত গায়ে মাটি মাখা—আসিয়া নরেন্দ্রকে মাফট হইয়া নমস্কার করিলেন । তিনিও শিবরাত্রের উপবাস করিয়াছেন—গঙ্গাস্নানে যাইবেন । নরেন্দ্র ঠাকুরঘরে গিয়া ঠাকুর প্রণাম করিলেন ও উপবিষ্ট হইয়া কিয়ৎ কাল ধ্যান করিলেন ।

ভবনাথের কথা হইতেছে । ভবনাথ বিবাহ করিয়াছেন, কৰ্ম্ম কাটছেন-করিতে হইতেছে । নরেন্দ্র বলিতেছেন, ‘ওরা ত সংসারী কীট !’

অপরাক্ত হইল । শিবরাত্রির পূজার আয়োজন হইতেছে । বেল

ও বিলম্বপত্র আহরণ করা হইল । পূজান্তে হোম হইবে ।

সন্ধ্যা হইয়াছে । ঠাকুরঘরে ধূনা দিয়া শশী অন্ত্যস্ত ঘরেও ধূনা লইয়া গেলেন । প্রত্যেক দেবদেবীর পটের কাছে প্রণাম করিয়া অতি ভক্তি-ভরে নাম উচ্চারণ করিতেছেন । “শ্রীশ্রীগুরুদেবায় নমঃ ! শ্রীশ্রীকালিকায়ৈ নমঃ ! শ্রীশ্রীজগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামেভ্যো নমঃ ! শ্রীশ্রীষড়্ভুজায় নমঃ ! শ্রীশ্রীরাধাবল্লভায় নমঃ ! শ্রীনিত্যানন্দায়, শ্রীঅদ্বৈতায়, শ্রীভক্তেভ্যো নমঃ ! শ্রীগোপালায়, শ্রীশ্রীযশোদায়ৈ নমঃ ! শ্রীরামায়, শ্রীলক্ষ্মণায়, শ্রীবিশ্বামিত্রায় নমঃ !

মঠের বেলতলায় শিবপূজার আয়োজন । রাত্রি নয়টা । এইবার প্রথম পূজা হইবেক । সাড়ে এগারটার সময় দ্বিতীয় পূজা । চারি প্রহরে চার পূজা । নরেন্দ্র, রাখাল, শরৎ, কালী, সিতির গোপাল প্রভৃতি মঠের ভাইরা সকলেই বেলতলায় উপস্থিত । ভূপতি ও মাষ্টারও আছেন । মঠের ভাইদের মধ্যে এক জন পূজা করিতেছেন ।

কালী গীতা পাঠ করিতেছেন । সৈন্যদর্শন,—সাম্রাজ্য-যোগ,—কর্ম-যোগ । পাঠের মধ্যে মধ্যে নরেন্দ্রের সহিত কথা ও বিচার হইতেছে ।

কালী । আমিই সব । আমি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছি ।

নরেন্দ্র । আমি সৃষ্টি করছি কই ? আর এক শক্তিতে আমায় করাচ্ছে । এই নানা কার্য্য,—চিন্তা পর্য্যন্ত,—তিনি করাচ্ছেন ।

মাষ্টার (স্বগত) । ঠাকুর বলেন, যতক্ষণ আমি ‘ধ্যান করছি’ এই বোধ, ততক্ষণ ও আত্মশক্তির এলাকা ! শক্তি মান্তেই হবে ।

কালী নিস্তব্ধ হইয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিতেছেন । তার পর বলিতে ছেন—“কার্য্য যা বলে, ও সব মিথ্যা !—চিন্তা আদপেই হয় নাই—ও সব মনে কল্পে হাসি পায়—”

নরেন্দ্র । “সোহং” বললে যে ‘আমি’ বোঝায়, সে এ ‘আমি’-নয় । মন, দেহ, এ সব বাদ দিলে যা থাকে, সেই ‘আমি’ ।

গীতাপাঠান্তে কালী শান্তিবাদ করিতেছেন-শান্তিঃ ! শান্তিঃ ! শান্তিঃ !

এইবার নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা সকলে দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্য গীত করিতে গেলেন । বিলম্বমূল বার বার পরিক্রমণ করিতেছেন । মাঝে মাঝে সমস্বরে

‘শিব গুরু ! শিব গুরু !’ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন ।
গভীর রাত্রি । কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতিথি । চারি দিক
অন্ধকার ! জীব জন্তু সকলই নিশ্চব্দ !

গৈরিক-বস্ত্রধারী, এই কোমার-বৈরাগ্যবান্ ভক্তগণের কণ্ঠে উচ্চা-
রিত—‘শিবগুরু ! শিবগুরু !’ এই মহামন্ত্রধ্বনি মেঘগম্ভীর রবে অনন্ত
আকাশে উঠিয়া অথ গু সচ্চিদানন্দ লীন হইতে লাগিল !

পূজা সমাপ্ত হইল । অরুণোদয় হয় হয় । নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ
ব্রাহ্মমূর্ত্তে গঙ্গাস্নান করিলেন ।

সকাল হইল । স্নানান্তে ভক্তগণ মঠে ঠাকুরঘরে গিয়া ঠাকুরকে
প্রণামান্তর দানাদের ঘরে (অর্থাৎ বৈঠকখানা ঘরে) ক্রমে ক্রমে আসিয়া
একত্রিত হইতেছেন । নরেন্দ্র সুন্দর নব গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিয়া-
ছেন । বসনের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে তাঁহার মুখের ও দেহের তপস্যাসম্মত
অপূর্ব স্বর্গীয় পবিত্র জ্যোতিঃ মিশাইয়াছে ! বদনমণ্ডল তেজঃপরিপূর্ণ,
আবার প্রেমানুরঞ্জিত ! যেন অথ গু সচ্চিদানন্দ-সাগরের একটী ফুট
জ্ঞানভক্তি শিখাইবার জন্য দেব-দেহ ধারণ করিয়াছেন—অবতার-লীলায়
সহায়তার জন্য । যে দেখিতেছে, সে আর চক্ষু ফিরাইতে পারিতেছে
না ! নরেন্দ্রের বয়ঃক্রম ঠিক চতুর্বিংশতি বৎসর । ঠিক এই বয়সে
শ্রীচৈতন্য সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন ।

ভক্তদের পারণের জন্য শ্রীযুক্ত বলরাম তাঁহার বাটী হইতে ফল
মিষ্টান্নাদি পূর্বদিনেই (শিবরাত্রির দিনে) পাঠাইয়াছেন ।

রাখাল প্রভৃতি দু একটী ভক্তসঙ্গে নরেন্দ্র ঘরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া
কিঞ্চিৎ জলযোগ করিতেছেন । একটী ছুটী খাইয়াই আনন্দ করিতে
করিতে বলিতেছেন, ‘ধন্য বলরাম !’ ‘ধন্য বলরাম !’ (সকলের হাস্য ।)

এইবার নরেন্দ্র বালকের ন্যায় রহস্য করিতেছেন । রসগোল্লা মুখে
করিয়া একবারে স্পন্দহীন ! চক্ষু নিমেষশূন্য ! নরেন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া
একজন ভক্ত ভাণ করিয়া তাঁহাকে ধারণ করিলেন—পাছে পড়িয়া যান ।

কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র—(রসগোল্লা মুখে রহিয়াছে)—চোখ চাহিয়া
বলিতেছেন, ‘আমি—ভাল—আছি !’ (সকলের উচ্চহাস্য ।)

মাষ্টার প্রভৃতিকে সিদ্ধি ও ৩ প্রসাদ মিষ্টান্ন বিতরণ করা হইল ।

..... হাট দেখিতেছেন । ভক্তেরা জঃধ্বনি করিতেছেন—

‘জয় গুরু মহারাজ ! জয় গুরু মহারাজ !’

